তফসীরে নূরুল কোরআন

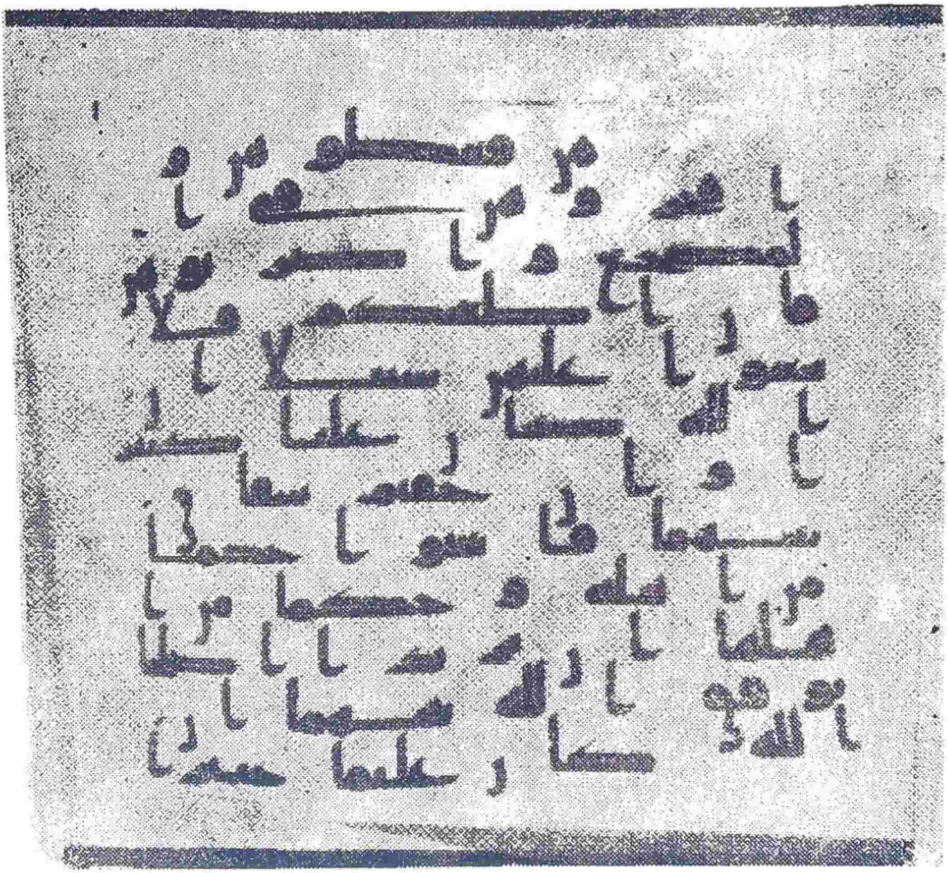
প্রথম পারা

১

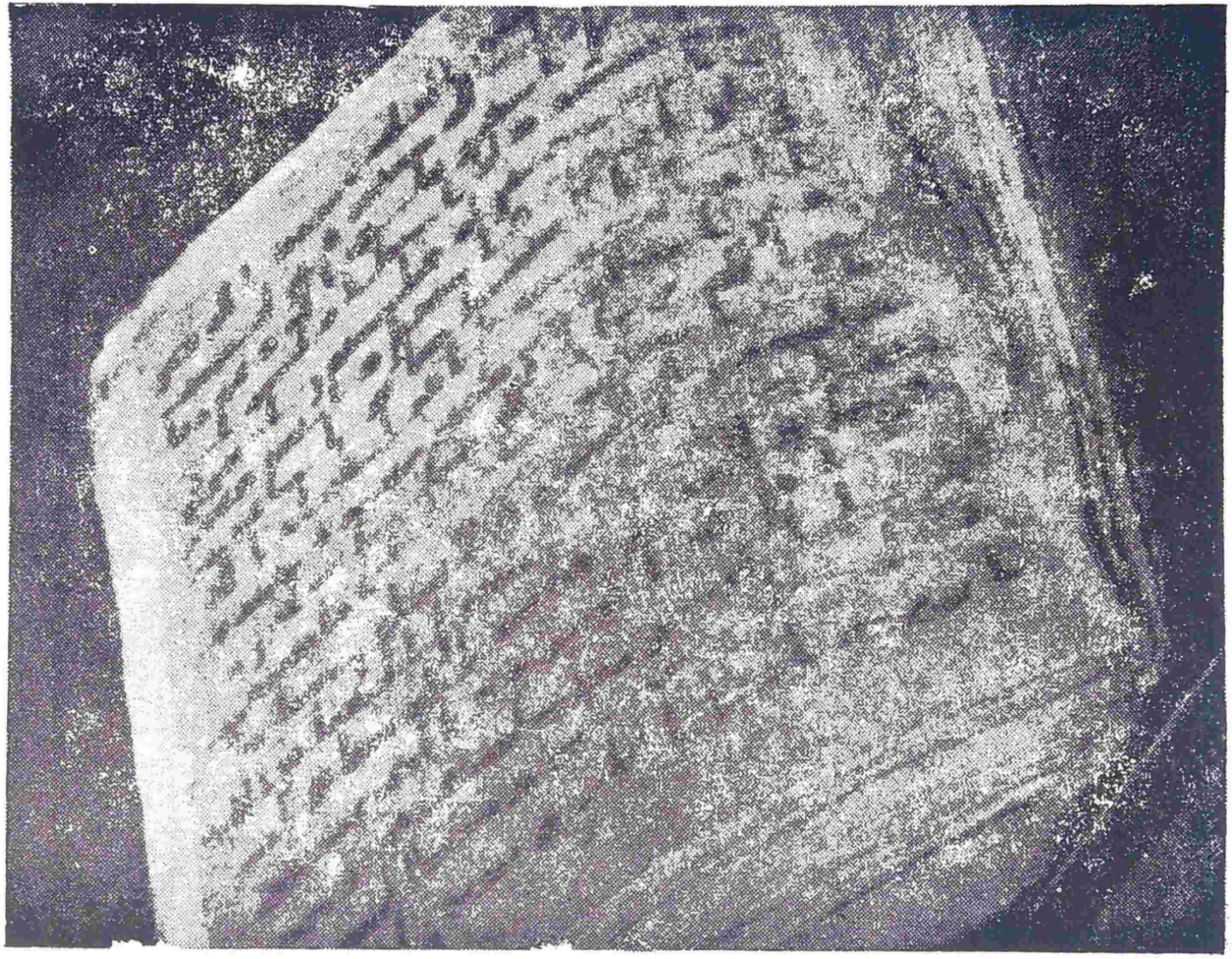
মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

প্রথম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf



তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পূর্ব মুহূর্তে যে কোরআন শরীফখানি তেলাওয়াত করছিলেন, তার অংশ বিশেষের ফটোকপি। এই কোরআন শরীফখানি বর্তমানে তাশখন্দ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে, যা এই লেখক স্বচক্ষে দেখে এসেছেন।



পবিত্র কোরআনের প্রাচীনতম কপি যা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ হয়েছিল।



তফসীরে নূরুল কোরআন

প্রথম পারা

১

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ হাফেজ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

পঞ্চম প্রকাশ ঃ মহররম ১৪৩৩ হিঃ
পৌষ ১৪১৮ বাং
জানুয়ারী ২০১২ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৪০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস আর প্রিন্টি প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৮৯১৩
এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯
আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (1) 01, Hazrat Mawlana Mohammed Aminul Islam (Rh.) Published by Al-Balag Publications.12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A, Dhaka-1207
Price : 400.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের আরজ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন্ ভাষায় শোকর আদায় করবো, যিনি আমার মত একজন নগণ্য তালেবে এলমকে তাঁর পাক কালাম পবিত্র কোরআনের সামান্য খেদমত করার তওফিক দান করেছেন। এজন্যে দরবারে এলাহীতে শোকর আদায়ের শক্তিও যে আমার নেই। কেননা, শোকর গুজারীর শক্তি সীমিত, আর আল্লাহ্ পাকের মহান দান অনন্ত অসীম ও অসামান্য।

পবিত্র কোরআন সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে পথ-প্রদর্শক বা আলোক-দিশারী রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। সকল যুগের মানুষের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এজন্যেই আরবী, ফার্সী, উর্দু সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিগত চৌদ্দশ' বছরে পবিত্র কোরআনের বহু বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার এ উন্নততর যুগে দুনিয়ার মানুষ আজ দিশেহারা, সুখ-সামগ্রী সংগ্রহে সকলেই সদা ব্যস্ত, অথচ শান্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি ফিরে পেতে হলে চাই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনাদর্শ। বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের এতদ্ব্যতীত কোন বিকল্প পন্থা নেই।

এ উপলব্ধি শুধু আমার নয়; বরং প্রতিটি কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী মানুষের। আর যতদিন অতিবাহিত হচ্ছে এ উপলব্ধি ততই তীব্রতর হচ্ছে। বলাবাহুল্য, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের এ তীব্রতর উপলব্ধিই আমাকে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তথা তফসীর রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু যা বাস্তব, যা সত্য তাহলো, এ পর্যায়ে আমার জ্ঞানের দৈন্যের অনুভূতি এ সাধনার পথে বারে বারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, পবিত্র কোরআন হলো জ্ঞানের মহা সমুদ্র। এ মহা সমুদ্রের ডুবুরী হয়ে তার তলদেশ থেকে মণি-মানিক্য তুলে আনা তো দূরের কথা, শুধু জ্ঞানের এ মহা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছি এবং সমুদ্র-তীরের বালু চরে ঘোরাফেরা করছি। বিগত দু' যুগের অধিক সময় ধরে এ সাধনা অব্যাহত রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভ-দৃষ্টির বরকতে বহু দিনের অক্লান্ত সাধনার ফলশ্রুতি স্বরূপ "তফসীরে নূরুল কোরআন" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ শুভ-লগ্নে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করছি কেননা-

جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے

جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

"যা কিছু হয়েছে হে আল্লাহ! তোমার দানেই হয়েছে আর যা কিছু হবে তা-ও তোমার দানেই হবে"।

আর একথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআনের খেদমত আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত সম্ভব নয়।

ایں سعادت بزور بازو نیست

تازہ بخشد خدادے بخشندہ

"এ সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হয়না, যে পর্যন্ত পরম করুণাময়ের করুণা-ধারা বর্ষিত না হয়"।

১৯৫৪ সালে সর্ব প্রথম ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে "কোরআনে হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী" শিরোনামে পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা শুরু করি।

এরপর সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার উপর আমার যে ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তন্মধ্যে যে গ্রন্থটি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে তা হলো, "বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান"।

এসব গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে "যুগ সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন", "পবিত্র কোরআনের মর্মকথা", "পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন", "জীবন ও কোরআন", "এনায়েতুল কোরআন", "বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অবদান", "আদর্শ ও বাস্তবায়ন" প্রভৃতি।

এ সমস্ত গ্রন্থ রচনা কালে যে নির্মম সত্যটি উপলব্ধি করি তা হলোঃ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার পর থেকে বিগত চৌদ্দশ' বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় কোন মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ আজো রচিত হয়নি। তখন থেকে আমার মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় তা হলোঃ বাংলা ভাষায় এমন একটি তফসীর গ্রন্থ রচনা করা, যা হবে মৌলিক, প্রামাণ্য এবং বিস্তারিত, যা হবে অন্যান্য ভাষায় রচিত মূল্যবান তফসীর গ্রন্থ সমূহের নির্যাস। এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনের তরজমায় হাত দেই এবং সর্ব প্রথম 'পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদের প্রথম খন্ড রচিত ও প্রকাশিত হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার পাঁচ হাজার কপি নিঃশেষ হয়ে যায়।

এরপর তফসীরের কাজে আত্মনিয়োগ করি, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ মহান কাজ বিলম্বিত হতে থাকে। নিয়মিত ভাবে বিগত ১৯৮১ সাল থেকে এই মহৎ সাধনায় রত হই। একই বছরের সেপ্টেম্বর থেকে আল্লাহর রহমতে মাসিক আল-বালাগ প্রকাশিত হয়, তাতে ধারাবাহিক ভাবে এই তফসীর প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞানপিপাসু পাঠকবৃন্দের উৎসাহ এই তফসীর সম্পর্কে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁদের এ উৎসাহ আমার দুঃসাহসকে সৎ সাহসে পরিণত করে। তাই ১৯৮৩ সালের শেষার্দ্ধ থেকে "তফসীরে নূরুল কোরআন" নামকরণ করে প্রথম খন্ড ছাপা আরম্ভ হয়, প্রায় এক বছরে ছাপা শেষ হয়।

তফসীর তথা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ আয়াত দ্বারা একথা বলেছেন বলে দাবী করা। অথচ আল্লাহ পাক কোন্ কথা দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন তা মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? মূলত এ কারণেই এ পথ অত্যন্ত বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ, যে কোন মুহূর্তে সামান্য ভুলের কারণেও বিপদের আশঙ্কা থাকে অহরহ। এজন্যে তফসীরের একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা পাওয়ার চেষ্টা করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে যা শ্রবণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, তা সংগ্রহ করা। মূলতঃ বিখ্যাত তফসীরকারগণ যেমন আল্লামা এবনে জরীর (রঃ), আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ), ইমাম রাজী (রঃ) প্রমুখ বিশ্ব বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম এভাবেই তফসীর করেছেন। কিন্তু যা কিছু জ্ঞান তাঁরা বিতরণ করেছেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত অমূল্য রত্ন বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থ সমূহ থেকে আহরণ করে বাংলা ভাষায় পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছি "তফসীরে নূরুল কোরআনের" মাধ্যমে। এ প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে তা পাঠক সমাজেরই বিচার্য। এ পর্যায়ে যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে সেজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মহান ক্ষমাপ্রার্থী আর যা কিছু ভাল হয়েছে তা তাঁরই মেহেরবানী এবং দয়া। আল্লাহ পাক যেন আমাদের এ সাধনা কবুল করেন এজন্যে তাঁরই মহান দরবারে মোনাজাত পেশ করি এবং পাঠকবৃন্দের নিকট এজন্যে দোয়া প্রার্থী।

আজ মনে পড়ে আমার সেই শ্রদ্ধেয় ওস্তাদগণের কথা যাঁদের সান্নিধ্যে এসে জ্ঞানের সাধনায় ব্রতী হতে অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমার বাল্যকালের ওস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুর রহমান নিচনপুরী (রঃ), হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ (রঃ), হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রঃ), হযরত মাওলানা গিয়াসউদ্দিন সাহেব (রঃ), হযরত মাওলানা আবদুস সোবহান (রঃ), হযরত মাওলানা মুফতী আমীমুল এহসান (রঃ) এবং বিশেষভাবে শেয়খুল ইসলাম হযরত মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এর কথা, আল্লাহ পাক তাঁদের প্রতি অনন্ত অসীম রহমত নাযিল করুন।

এ পর্যায়ে একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও আম্মাজান শৈশব থেকে আমাকে দ্বীন ইসলামের তথা পবিত্র কোরআনের খেদমতের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন। আজও তাঁরা আমার জন্যে দোয়া ও মুনাজাতে রত থাকেন। আল্লাহ পাক তাঁদের হায়াত দারাজ করুন এবং আমাকে তাঁদের খেদমত করার অধিকতর তওফিক দান করুন।

এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তাঁদের, যাঁরা আমাকে এ মহান সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহিত করেছেন এবং সাহায্য করেছেন।

এ পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবী জনাব কে, বি আহমদ সাহেবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য কেননা, এ তফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে

থাকবে। আল্লাহ পাক ইহকাল ও পরকাল- উভয় জাহানে তাঁকে সন্তোষ ও কল্যাণ দান করুন। তাঁর মরহুম পিতা-মাতার প্রতিও এর বরকতে রহমত নাযিল করুন।

এতদ্ব্যতীত, জনাব কাজী গোফরান সাহেবের কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি কেননা, তিনি সর্বদা আমাকে এজন্যে উৎসাহিত করেছিলেন।

আরও যাঁদেরকে স্মরণ করা কর্তব্য মনে করি তাঁরা হলেন, আলহাজ্জ আরেফীন সাহেব, আলহাজ জনাব মোহাম্মদ আহমদ সাহেব ও জনাব কমর সাহেব কেননা, সর্ব প্রথম তাঁরাই আমাকে এ মহান সাধনায় উৎসাহিত করেছিলেন।

মুদ্রণ বিভ্রাট এবং অন্যান্য ভুল-ত্রুটি নিতান্ত অসুন্দর তবে অস্বাভাবিক নয়, তাই এজন্যে সাফাই পেশ করে আমার অপরাধের ফিরিস্তি সুদীর্ঘ করতে চাইনা। যদি এ সম্পর্কে দয়া করে আমাকে অবহিত করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের চেষ্টা করবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আজ একটিই মোনাজাতঃ

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

"হে পরওয়ারদেগার, কবুল কর আমাদের তরফ থেকে, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله

واصحابه اجمعين

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২১/০৫/৮৪

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তৃতীয় সংস্করণে লেখকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের তওফিক দান করেছেন। কোন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও বিরাট সৌভাগ্যের পরিচায়ক। এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত সেজদায়ে শোকরানা।

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, সে ভুল মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, আর এজন্যেই আল্লাহ পাক মানুষকে দয়া করে মাফ করে থাকেন।

তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল, বর্তমান সংস্করণে আমরা তা সংশোধনের সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছি। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ড রচনা ও প্রকাশনার সময় আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান ও আম্মাজান পৃথিবীতে ছিলেন এবং আমার জন্যে সর্বদা দোয়া করতেন, আজ তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে চলে গেছেন অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো তাঁদের জন্যে দোয়া করা।

তফসীরে নূরুল কোরআনের পাঠক মাত্রের খেদমতে তাই আমার বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করেন।

আল্লাহ পাক তফসীরে নূরুল কোরআনের সকল পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি খাছ রহমত নাযিল করুন। আমীন।

(মওলানা) মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১৬/০৮/২০০০

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	১
২।	অবতরণিকা	৯
৩।	বিশ্ব-গ্রন্থ	৯
৪।	পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব	১২
৫।	আব্বাসীয় খলীফা মামুনের দরবারের একটি ঘটনা	১৩
৬।	পবিত্র কোরআনের হেফাজত যুগে যুগে	১৩
৭।	প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোরআনে পাক লিপিবদ্ধ করার প্রথম পদক্ষেপ	১৫
৮।	হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে পবিত্র কোরআন সংকলন	১৬
৯।	হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগে পবিত্র কোরআন সংকলন	১৯
১০।	সহজভাবে কোরআনে পাক তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা গ্রহণ	২১
১১।	পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা	২৩
১২।	তওহীদ	২৩
১৩।	রেসালত	২৭
১৪।	আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস	২৮
১৫।	সমাজ-জীবনে পবিত্র কোরআন	৪৪
১৬।	নারী অধিকার সংরক্ষণে	৪৬
১৭।	মানবীয় সমতা ও মর্যাদা রক্ষায়	৪৬
১৮।	ফাজায়েলে কোরআন	৪৭
১৯।	পবিত্র কোরআন পাঠ করলে যে নেকী পাওয়া যায়	৫০
২০।	কোরআন শরীফ তেলাওয়াত	৫২
২১।	পবিত্র কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গ	৫৫
২২।	নিজস্ব মতানুসারে তফসীর	৫৭
২৩।	এজতেহাদের অনুমতি	৫৭
২৪।	বর্তমান যুগের গোমরাহী	৬০
২৫।	পবিত্র কোরআনে একই ঘটনাকে বারে বারে উল্লেখ করার কারণ	৬১
২৬।	তফসীর সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা	৬৩

	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭।	পবিত্র কোরআনের সূরা, মঞ্জিল, আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীরের বক্তব্য	৬৩
২৮।	"সূরা" শব্দের তাৎপর্য	৭৬
২৯।	পবিত্র কোরআন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ কিভাবে ওহী নাযিল হতো	৭৭
৩০।	সূরা, আয়াত ও বাক্যের সংখ্যা	৭৮
৩১।	আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) যাঁদের নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে.	৭৯
৩২।	পবিত্র কোরআনে যে সমস্ত ফেরেশতার নাম উল্লেখিত হয়েছে	৭৯
৩৩।	যে সাহাবীর নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে	৭৯
৩৪।	কাফেরদের নাম যা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে	৭৯
৩৫।	পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য	৮০
৩৬।	পবিত্র কোরআন মানব মনে যে বিপ্লব সৃষ্টি করে	৮২
৩৭।	হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) যখন বন্দী হলেন	৮৩
৩৮।	প্রথম যুগের তফসীরকারগণ	৯০
৩৯।	হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)	৯০
৪০।	হযরত আলী (রাঃ)	৯১
৪১।	হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)	৯২
৪২।	হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)	৯৩
৪৩।	দ্বিতীয় যুগের তফসীরকারগণ	৯৪
৪৪।	হযরত মুজাহেদ (রঃ)	৯৪
৪৫।	হযরত সাঈদ বিন যোবায়ের (রঃ)	৯৪
৪৬।	হযরত একরামা (রঃ)	৯৫
৪৭।	দ্বিতীয় স্তর	৯৫
৪৮।	তৃতীয় স্তর	৯৫
৪৯।	চতুর্থ স্তর	৯৬
৫০।	পঞ্চম স্তর	৯৬
৫১।	ষষ্ঠ স্তর	৯৬
৫২।	সপ্তম স্তর	৯৬
৫৩।	অষ্টম স্তর	৯৬
৫৪।	নবম স্তর	৯৭

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৫।	দশম স্তর	৯৭
৫৬।	একাদশ স্তর	৯৭
৫৭।	উপমহাদেশে পবিত্র কোরআন	৯৭
৫৮।	বাংলা ভাষায় যারা পবিত্র কোরআনের তফসীর বা তরজমা করেছেন	৯৮
৫৯।	পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গ	৯৯
৬০।	পবিত্র কোরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গ	১০৬
৬১।	জীবন-সাধনার সাফল্যের একমাত্র পথ মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ	১০৯
৬২।	রহমতুল্লিল আলামীন	১১০
৬৩।	খাতেমুন নবিয়্যীন	১১১
৬৪।	সিরাজাম মুনীরা	১১৪
৬৫।	যাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ রয়েছে	১২৮
৬৬।	প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি আদব	১২৯
৬৭।	যাঁর আদেশ পালন একান্ত কর্তব্য	১২৯
৬৮।	যাঁর অনুকরণে রয়েছে হেদায়েত	১২৯
৬৯।	মকামে মাহমুদ যাঁর জন্যে নির্দিষ্ট	১২৯
৭০।	যাঁর আগমনের খোশখবরী দিয়েছেন হযরত ঈসা (আঃ)	১২৯
৭১।	রউফ ও রহীম	১৩০
৭২।	প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজকে আল্লাহ পাকের কাজ বলে ঘোষণা করা	১৩০
৭৩।	প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি তা'যীম	১৩১
৭৪।	আল্লাহর রসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট দেয়ার শাস্তি	১৩২
৭৫।	চিরন্তন ঘোষণা	১৩৩
৭৬।	কোরআনে পাকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অঙ্গ মোবারকের উল্লেখ	১৩৩
৭৭।	মক্কী মদনী সূরা	১৩৪
৭৮।	সকল জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কোরআন	১৩৮
৭৯।	পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর ও তরজমা	১৪১
৮০।	প্রথম তফসীর গ্রন্থ	১৪৫
৮১।	সর্বাধিক বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ সমূহ	১৪৬

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮২।	পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম পন্ডিতদের অভিমত	১৪৬
৮৩।	পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী	১৪৯
৮৪।	সূরা আল-ফাতেহাঃ ফাযায়েলুল কোরআন	১৫৩
৮৫।	মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য	১৫৫
৮৬।	মাসায়েলুল কোরআন	১৫৫
৮৭।	আ'মালুল কোরআন	১৫৭
৮৮।	সূরা ফাতেহার ফজিলত	১৬৯
৮৯।	নামকরণ	১৬০
৯০।	মাসায়েলুল কোরআন	১৬৪
৯১।	আ'মালুল কোরআন	১৬৫
৯২।	সূরা বাকারাহ	১৬৬
৯৩।	সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক	১৬৬
৯৪।	আ'মালুল কোরআন	১৭১
৯৫।	মাসায়েলুল কোরআন	১৭৮
৯৬।	আল্লাহর নাফরমানীর শোচনীয় পরিণতি	১৮২
৯৭।	মুনাফেকদের অবস্থার প্রথম দৃষ্টান্ত	১৯২
৯৮।	মুনাফেকীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	১৯৪
৯৯।	আমলে সালেহ কি?	২০৫
১০০।	একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	২০৭
১০১।	আ'মালুল কোরআন	২০৮
১০২।	সোবাহানাল্লাহ'র তফসীর	২১৮
১০৩।	হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে কতক্ষণ ছিলেন?	২২৪
১০৪।	"ইসরাঈল" শব্দের ব্যাখ্যা	২৩৩
১০৫।	সত্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত	২৩৬
১০৬।	একটি প্রশ্নঃ (বে-আমল আলেমদের ওয়াজ নসিহত করা সম্পর্কে)	২৪২
১০৭।	নামাজ	২৪৬
১০৮।	সবর	২৭৪
১০৯।	ফেরাউন প্রসঙ্গ	২৫২
১১০।	"মান্না সালোয়া"	২৬৫
১১১।	একটি ছোট পাথর থেকে ৬ লক্ষ মানুষের জন্যে পানির ব্যবস্থা হলো	২৭২

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১২।	আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত	২৭২
১১৩।	অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা	২৭৩
১১৪।	যা বিবেকবান মানুষকে আকৃষ্ট করে	২৭৩
১১৫।	বনী ইসরাঈল জাতির শাস্তির ঘোষণা	২৭৫
১১৬।	ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা পবিত্র কোরআনের ঘোষণার পরিপন্থী নয়	২৭৬
১১৭।	সাম্প্রতিক কালের ঘটনায় (পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ)	২৭৯
১১৮।	"আইলা" নামক স্থানের ঘটনা	২৯১
১১৯।	যারা বানরে পরিণত হয়েছে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে	২৯২
১২০।	গরু জবেহ করার ঘটনা	২৯৪
১২১।	আ'মালুল কোরআন	৩০২
১২২।	জড় পদার্থও কি আল্লাহকে ভয় করে?	৩০৬
১২৩।	পাথরের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের আরও একটি অর্থ	৩১০
১২৪।	সূরার নামকরণের তাৎপর্য	৩১১
১২৫।	আ'মালুল কোরআন	৩১১
১২৬।	পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার নির্দেশ	৩২৭
১২৭।	রুহুল কুদুস	৩৩৫
১২৮।	আ'মালুল কোরআন	৩৪৮
১২৯।	মাসায়েলুল কোরআনঃ মৃত্যু কামনা কি বৈধ?	৩৫০
১৩০।	হযরত সোলায়মান (আঃ)	৩৬২
১৩১।	পশু-পক্ষীর ভাষা-জ্ঞান	৩৬২
১৩২।	বায়ু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা	৩৬৩
১৩৩।	জ্বীন ও অন্যান্য জীব-জন্তুর নিয়ন্ত্রণ	৩৬৩
১৩৪।	হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্পর্কে এ ঘোষণা কেন?	৩৬৪
১৩৫।	পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ	৩৬৫
১৩৬।	যাদু বিদ্যা	৩৬৮
১৩৭।	যাদু সম্পর্কে শরীয়তের বিধান	৩৬৮
১৩৮।	বাবিল	৩৬৯
১৩৯।	হারুত মারুত	৩৭০
১৪০।	হারুত মারুত কেন এসেছেন	৩৭০
১৪১।	যাদু বিদ্যার শিক্ষা কেন দিলেন	৩৭০
১৪২।	মোযেজা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য	৩৭১

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৩।	মোমেনদের উচ্চ মর্যাদা	৩৭৫
১৪৪।	অমুসলিমদের অনুসরণ অবৈধ	৩৭৬
১৪৫।	প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শানে বেআদবী	৩৭৭
১৪৬।	তওহীদের প্রতি বিশ্বাসের তাৎপর্য	৩৮৬
১৪৭।	প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব	৩৮৭
১৪৮।	মুসলমানদেরকে কাফের বানাবার অপচেষ্টা	৩৯০
১৪৯।	মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার অপচেষ্টা অব্যাহত	৩৯১
১৫০।	ঈমানী শক্তির মূল উৎস	৩৯২
১৫১।	নাজাতের একমাত্র পন্থা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য	৩৯৫
১৫২।	নিকৃষ্ট সৃষ্টি	৩৯৭
১৫৩।	উত্তম সৃষ্টি	৩৯৮
১৫৪।	সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম	৩৯৯
১৫৫।	সর্বশ্রেষ্ঠ জালেমের শাস্তি	৪০০
১৫৬।	লন্ডনে সর্ব প্রথম মসজিদ	৪০১
১৫৭।	আল্লাহ পাকের কোন সন্তান নেই, সবই তাঁর সৃষ্টি	৪০৭
১৫৮।	আল্লাহর প্রতি এ'কীনই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ	৪১১
১৫৯।	ইসলামী আদর্শের মূলকথা	৪১২
১৬০।	এ'কীনের তাৎপর্য	৪১৩
১৬১।	প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান	৪২১
১৬২।	একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	৪২১
১৬৩।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর অনুগত	৪২৬
১৬৪।	বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার তাৎপর্য	৪৩২
১৬৫।	আল্লাহর ঘরের সম্মান না করার পরিণতি	৪৩৩
১৬৬।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল হলো	৪৩৪
১৬৭।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ)	৪৩৭
১৬৮।	বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের ইতিকথা	৪৩৮
১৬৯।	কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণের পূর্ব প্রস্তুতি	৪৪০
১৭০।	জমজম কূপের আবিষ্কার	৪৪১
১৭১।	কা'বা শরীফের নির্মাণ যুগে যুগে	৪৪৩
১৭২।	হযরত আদম (আঃ)-এর নির্মাণ	৪৪৩

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৩।	হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুনঃ নির্মাণ	৪৪৪
১৭৪।	জুরহাম, আমালিকা, কোরায়শদের নির্মাণ	৪৪৪
১৭৫।	হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) নির্মাণ	৪৪৫
১৭৬।	জমজম	৪৪৭
১৭৭।	হাজারে আস্‌ওয়াদ	৪৪৭
১৭৮।	কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়া	৪৪৮
১৭৯।	তওবার তাৎপর্য	৪৫০
১৮০।	প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের জন্যে দোয়া	৪৫০
১৮১।	প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বংশ তালিকা	৪৫২
১৮২।	"ইসলাম" শব্দটির ব্যাখ্যা	৪৬০
১৮৩।	হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অসিয়ত	৪৬৩
১৮৪।	ইসলাম বিশ্ব-ধর্ম	৪৭০
১৮৫।	সকলের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান	৪৭০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আজকের পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় একশত ত্রিশ কোটি। এত অধিক সংখ্যক মুসলমান একসঙ্গে ইতোপূর্বে কখনও ছিলনা। অথচ এমনও সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে মাত্র কয়েকজন মানুষ কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর ৩য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যুদ্ধ ওহোদের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০।

মদীনা তৈয়্যেবাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিনবার আদমশুমারী করিয়েছিলেন। প্রথম আদমশুমারীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫০০, ২য় আদমশুমারীতে ৭০০ এবং ৩য় আদমশুমারীতে ছিল ১,৫০০। তখন সকলে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করেছিলেন যে, আল্লাহ পাক তাঁর খাস-রহমতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, কেননা তাঁরা সে করুণ অবস্থা বিস্মৃত হননি যা মক্কায়ে মোয়াজ্জমার জীবনে ছিল, যখন সারা পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা চল্লিশজনও ছিল না, যখন তাঁরা এত অসহায় ছিলেন যে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যখন সর্বদা জালেমদের জুলুমের শিকার হতে হতো মুসলমান মাত্রকে। তখনকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۞

(সূরা আনফাল)

"এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন তোমরা ছিলে অল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল হিসেবে পরিগণিত হতে, এই ভয় করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে হটাৎ ধরে নিয়ে যেতে পারে। অতঃপর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেন। নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তু সমূহ জীবিকা হিসেবে দান করেন, যেন তোমরা তাঁর শোকর-গুজার হও"।

বস্তুতঃ সেই একদিন ছিল যখন এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা করেই ইসলামী কাফেলার অভিযান শুরু হয়েছিল, যে অভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

(সূরা আলে-এমরান)

"(এই পৃথিবীতে সকল যুগের সমস্ত মানুষের মধ্যে হে মুসলমানগণ!) তোমরাই উত্তম দল, কারণ তোমাদেরকে সমগ্র মানব-জাতির উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা উত্তম কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ আর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর"।

কিন্তু সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এই, অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই মুসলমানগণ পৃথিবীর চেহারা বদলে দিলেন; যে পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য পরস্পর হাজার বছর ধরে যুদ্ধরত ছিল, তারা দশ বছরও মুসলমানদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হলোনা। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে উভয় শক্তি ঈমানী বলে বলীয়ান মুসলমানগণের নিকট পরাভূত হলো। এভাবে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হলো সারা বিশ্বে, মুসলিম জাতি ছড়িয়ে পড়ল আলজেরিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত, কলেমায়ে তৌহীদের ডংকা বাজল, আজানধ্বনি আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করলো, খোলাফায়ে রাশেদীনের ত্রিশ বছরের বাস্তবধর্মী কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনার পর উমাইয়া বংশ দামেশকে নব্বই বছর, অতঃপর আব্বাসীয় বংশ বাগদাদে ছয়শত বছর তারই পাশাপাশি স্পেনে মুসলমানগণ আটশত বছর এবং দিল্লীতে সাতশত বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করলো।

কিন্তু সময়ের আবর্তন-বিবর্তন ও পরিবর্তনে সেই ঈমানী শক্তির অভাব দেখা দিল যা মুসলমানদের শক্তির মূল উৎস ছিল। সেই অদৃশ্য শক্তি ক্রমশঃ লোপ পেতে লাগলো যা পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতো, মুসলমানরা সেই চরিত্র মাধুর্য হারাতে লাগলো যার শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সে সব দেশ হারাতে লাগলো যার প্রতিটি ইঞ্চি জমির মূল্য দিয়েছিলেন হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ), আবু ওবায়দাহ এবনুল জাররাহ (রাঃ), সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ), তারেক (রহঃ), মোহাম্মদ বিন কাসেম, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী, সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবী প্রমুখ মুজাহেদীনে মিল্লাত তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে। এক কালে যাঁরা ছিলেন এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য, তারা আজ বিচ্ছিন্ন।

নামাজের জামাত আজও কায়েম হয়, মুসলমানগণ সারিবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হন, কাঁধে কাঁধ মিলে ঠিকই কিন্তু অন্তর থেকে অন্তর থাকে বিচ্ছিন্ন।

تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى

"তুমি তাদেরকে একত্রিত মনে কর অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন"।

যারা এক কালে উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতায় অন্যদের জন্যে অনুকরণীয় ছিল আজ তারাই পতনোন্মুখ এবং তারা এত অসহায় ও নিরুপায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই ওসিয়তের উপর তারা আমল করতে পারে না।

اخرجوا اليهود والنّصرٰى من جزيرة العرب

অর্থাৎ "ইহুদী এবং নাসারাদেরকে আরবভূমি থেকে বের করে দাও"।

মওলানা হালী যথার্থই বলেছেনঃ

اے خاصۂ خاصان رسل یہ وقت دعا ہے
امت پہ تری اکے عجب وقت پڑا ہے

"হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! বিশেষ দোয়ার প্রয়োজন কেননা, আপনার উম্মতের উপর অত্যন্ত কঠিন সময় এসে পড়েছে"।

এখন প্রশ্ন হলো, মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্গতি এবং দুর্দশার কারণ কি?

যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সামান্য তখন সারা বিশ্বকে তারা প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন, আর আজ এত অধিক সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও এ দূরবস্থা কেন?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবে, তিনি এরশাদ করেছেনঃ "এমন সময় আসবে যখন পৃথিবীর অন্য জাতির লোকেরা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে একে অন্যকে এভাবে ডাকবে যেভাবে তোমরা দস্তরখানে একে অন্যকে খাবার গ্রহণের উদ্দেশ্যে ডাক"। সাহাবায়ে কেরাম তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ দুর্গতি কি আমাদের সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে হবে"? তিনি এরশাদ করলেনঃ "না, তখন তোমাদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে (কিন্তু তোমাদের ভয় তাদের অন্তরে থাকবে না; বরং তাদের ভয় তোমাদের অন্তরে থাকবে) কারণ তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার লোভ এবং মৃত্যুর ভয় স্থান পাবে"।

বস্তুতঃ এই হাদীসের আলোকে যদি আমরা আমাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখব যে–

১. আমাদের মধ্যে অনেক লোক রয়েছে, যারা মুসলমান নামে পরিচিত কিন্তু শেরক–বেদআতে পর্যন্ত লিপ্ত।

২. এমন বহু লোক রয়েছে, যারা পৈত্রিক সম্পত্তির মত ইসলামকেও ওয়ারিশ সূত্রেই পেয়েছে; ইসলামের ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব আছে কি-না সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াও জরুরী মনে করেনা।

৩. এমনও লোক রয়েছে, যারা পবিত্র কোরআন শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারেনা; এজন্যে চেষ্টাও করেনা, এ কাজকে জরুরীও মনে করেনা।

৪. এমন লোকের সংখ্যা অনেক বেশী, যাদের পবিত্র কোরআনের অর্থ বা মর্মকথা সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আর এই না জানাকেও তারা গৌরবের বিষয় বলে মনে করে।

৫. এমনও লোক রয়েছে, যারা পবিত্র কোরআন শিক্ষার বিরোধিতা করাকে ফ্যাশন বলে মনে করে।

৬. এমনও লোক রয়েছে, যারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল যুগের কোন খবরই রাখে না, এমনকি বর্তমান যুগের দুর্গতি সম্পর্কেও সচেতন হতে রাজী হয় না। এমন অবস্থায় যদি কোন জাতির ভাগ্যরবি অস্তমিত হয়, তবে তা আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

মুসলিম জাতির উত্থান হয়েছিল আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত দু'টি নেয়ামত গ্রহণের কারণে, আর এখন পতনও হচ্ছে সে দু'টি নেয়ামত বর্জনের কারণে। সে দু'টি নেয়ামত হলো–

(১) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন।

(২) বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের অবতরণ।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে একই আয়াতে এ দু'টি নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۙ

(সূরা ইব্রাহীম)

"এই কিতাব, (হে রসূল!) আপনার নিকট নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ

(সূরা তাগাবুন)

"অতএব, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, এবং সেই নূরের প্রতি যা, আমি নাযিল করেছি (অর্থাৎ পবিত্র কোরআন)"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ۞

(সূরা মায়েদা)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট আগমন করেছে একটি নূর, (অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন)"।

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'নূর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক তাঁকে স্বীয় নূর থেকে এক মুঠো নূর নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এজন্যেই তাঁর অনুসরণকে আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা লাভের উপকরণ বলেও ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۞

(সূরা আলে এমরান)

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

এমনিভাবে সূরা নেসার একখানি আয়াতে এ নেয়ামত দু'য়ের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا۞ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا۞

"হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক অকাট্য প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি (এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বোরহান বা অকাট্য প্রমাণ এবং পবিত্র কোরআনকে নূর বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহর কোরআন উভয়ই আল্লাহর নূর, উভয়ই আল্লাহর নেয়ামত)। অতঃপর যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান আনবে, তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে গ্রহণ ও বরণ করে নেবে এবং ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকবে, আল্লাহ্ পাক অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে স্বীয় রহমত দানে ধন্য করবেন এবং তাদেরকে সরল–সঠিক পথ দেখাবেন"।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং আল্লাহর নূর পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত থেকে দূরে থাকবে তারা আল্লাহর রহমত, দান এবং সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং বিপদগ্রস্ত হবে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আজকের পৃথিবীতে মুসলিম জাতির দুর্গতির এটিই একমাত্র কারণ।

درس قران نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا
یہ زمانہ نہ زمانے نے دیکھایا ہوتا

"যদি আমরা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বিস্মৃত না হতাম, তবে আমাদের এ দুর্দিন দেখতে হতো না"।

সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় অত্যন্ত কম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কোরআনের নূর দ্বারা নিজেদের অন্তকরণকে আলোকিত করেছিলেন এবং জীবন-সাধনার চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে, যিনি মা'সুম, যিনি চির নির্দোষ, চির নিঃষ্পাপ, যাঁর দ্বারা দোষ হওয়া সম্ভব নয়, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, তাঁর কথা স্বয়ং আল্লাহ পাকেরই কথা, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۞

(সূরা নজম)

"তিনি নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, যা ওহীরূপে তাঁর নিকট আসে তাই তিনি বলেন"।

পাবত্র কোরআনে আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

(সূরা নেছা)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তাবেদারী করে সে বস্তুতঃ আল্লাহ পাকেরই তাবেদারী করে"।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, আজকের মুসলমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান জীবনাদর্শ থেকে যেমন দূরে, তেমনি পবিত্র কোরআনের হেদায়েত থেকেও স্ব-ইচ্ছায় বঞ্চিত। অথচ এ সত্য সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, পবিত্র কোরআন মানব জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে, মানুষকে সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের পাতায় রয়েছে তার অসংখ্য প্রমাণ যার দু' একটি দৃষ্টান্ত এখানেও উল্লেখযোগ্য। সু-বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম

আসমায়ী (রঃ) ভ্রমণকালে একবার ডাকাত দল কর্তৃক আক্রান্ত হন। ডাকাতরা অর্থ-সম্পদের লোভে এমন একজন সাধক ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তিনিও হয়েছেন তাদের জুলুম-অত্যাচারের শিকার, কেননা তারা ছিল মানবতার দুশমন। যখন তাদের তল্লাশী শেষ হয় তখন তিনি তাদেরকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা ডাকাতি করে কেন মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার কর"?

তারা বললো, "আমাদের উপজীবিকার সন্ধানেই আমরা ডাকাতি করে থাকি। এটাই আমাদের পেশা"।

তখন ইমাম আসমায়ী (রঃ) পবিত্র কোরআনের কয়েকখানি আয়াত তেলাওয়াত করেন; এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মানুষের রিয্‌কের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۞

(সূরা হুদ)

অর্থাৎ "এই পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেরই রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহ পাকের। তিনি তাদের স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে অবগত। আর সব কিছুই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ۞

(সূরা যারিয়াত)

"এবং আসমানে রয়েছে তোমাদের রিয্‌ক, আর যা কিছুর প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে"।

অর্থাৎ আসমানে তোমাদের রিয্‌কের সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, আর তা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।

ইমাম আসমায়ীর (রঃ) কণ্ঠ থেকে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহ শ্রবণ করে দুর্বৃত্তের দল তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

এ ঘটনার ঠিক তিন বছর পর ইমাম আসমায়ী (রঃ) যখন মক্কা শরীফে পবিত্র কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলেন ঠিক সে মুহূর্তে একজন অপরিচিত লোক তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করলো এবং আন্তরিক ও অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলো।

ইমাম আসমায়ী (রঃ) লোকটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বললোঃ "জনাব, আপনি হয়তো স্মরণ রাখতে পারেন সেই ডাকাত দলের কথা যারা আপনার প্রতি আক্রমণ করেছিল, আমি সেই ডাকাতদেরই একজন। তবে আপনি সেদিন পবিত্র কোরআনের যে আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেছিলেন তার কারণে আমাদের মনোজগতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে তওবা করেছিলাম, আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি অর্জন করেছিলাম এবং নব জীবন লাভ করেছিলাম"।

এভাবে পবিত্র কোরআন মানব মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। তাই, আমি বিশ্বাস করি বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে হলে, মানব জীবনকে সুন্দরতর, উন্নততর করে গড়ে তুলতে হলে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রচার-প্রসার একান্ত প্রয়োজনীয়।

اگر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقران زیستن

"যদি তুমি মুসলমানরূপে জীবন-যাপন করতে চাও, তবে পবিত্র কোরআন ব্যতীত গত্যন্তর নেই"।

کب تك یون جئے جائگا غیرون کے سہارے
تو ذرا کھول کے دیکھ قرآن کے پار ے

"কতকাল আর এভাবে পরের অনুসরণে জীবন যাপন করবে? তুমি একটু খুলে দেখ পবিত্র কোরআন, কি আছে তাতে"।

শুধু এ কারণেই নিজের অযোগ্যতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের এ ক্রান্তিলগ্নে পবিত্র কোরআনের তফসীরের এ দুরুহ এবং মহান কাজে হাত দিয়েছি। শুধু আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেছি আর শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করছি, তাঁর তওফিক হলেই এ কঠিন কাজ সহজ এবং সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যেই সকলের নিকট দোয়ার দরখাস্ত পেশ করছি।

আমি বিশ্বাস করি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা ব্যতীত মুসলিম জাতির কল্যাণের কোন বিকল্প পথ নেই। এ বিশ্বাসই আমাকে এ বন্ধুর পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার একটি মাত্র আবেদন, আসুন! আমরা প্রত্যেকটি মুসলমান পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করি, এর মর্মবাণী উপলব্ধি করি এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে বরণ করে পবিত্র কোরআনের পয়গামকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরি, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করি এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিরশান্তির পথ সুগম করি। আল্লাহ পাক আমাদের তওফিক দান করুন। আমীন।

অবতরণিকা

বিশ্ব মানবের চরম দুর্দিনে যখন মানবতা অবহেলিত, উপেক্ষিত এমনকি অপমানিত এবং নির্যাতিত, মানবতার ফরিয়াদ শ্রবণের জন্যে যখন দুনিয়ার বুকে কেউ নেই, জড়বাদ, বস্তুবাদ এবং ভোগবাদের মরফিয়া পান করে যখন সকলেই হুঁশহারা, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত, মানব জাতির এমনি সংকটময় মুহূর্তে বিশ্ব মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন তথা সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দান স্বরূপ পবিত্র কোরআন নাযিল হলো। বিপন্ন এবং অসহায় মানবতা পরিত্রাণ পেলো, মানুষ বেঁচে উঠলো, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নতুন করে গড়ে উঠলো এবং ঘনিষ্ঠতর হলো, অশান্তি ও জুলুমে জর্জরিত দুনিয়ার বুকে শান্তি ফিরে এলো। মানুষের যাবতীয় গোমরাহী, অধঃপতন এবং অকল্যাণকে দূরীভূত করে এবং সকল অবনতির কলঙ্ককে মুছে দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ হয়ে উঠলো আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা।

বস্তুতঃ মানব জাতির ইতিহাস পরিবর্তনে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে পবিত্র কোরআনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআন মানুষের চিন্তার জগতে, নৈতিক জগতে অভূতপূর্ব ইনকিলাব এনেছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক কথায় জীবনের সকল পর্যায়ে এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এ বিপ্লবের অধিনায়ক হলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর এর সংবিধান হলো পবিত্র কোরআন।

বিশ্ব-গ্রন্থ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট আল্লাহর প্রেরিত মুক্তিদূত, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনও সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা পূর্ণ পরিণত, যুক্তি সঙ্গত, পরীক্ষিত সত্য, অদ্বিতীয়, সকল যুগের উপযোগী এবং মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী। পবিত্র কোরআনের বিধান সর্বকালে গ্রহণীয়, বরণীয় এবং সকলের জন্যে একান্ত করণীয়, তাই পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র একখানা গ্রন্থ নয়, বরং বিশ্ব-গ্রন্থ, এর আবেদন বিশ্বজনীন।

পবিত্র কোরআনে শুধু ধর্মীয় নীতিকথাই নেই; বরং এতে রয়েছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সমাজের সকল নিয়ম–কানুন, মানব মনের সকল জিজ্ঞাসার জবাব। ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র এককথায় সকলের জন্যে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত; মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে এতে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

মানুষের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কথা, মানুষের অমরত্বের কথা, মানুষের শক্তি সম্ভাবনার কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ ভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্কের তাৎপর্য, এ পর্যায়ে মানুষের কর্তব্য, আল্লাহ পাকের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মানুষের সম্পর্ক, তাঁর প্রতি মানুষের দায়িত্ব এবং মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক; বিশেষতঃ মুসলমানদের সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের অধিকার, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, সমাজ গঠনের মূলতত্ত্ব, শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় মানুষের কর্তব্য- এসবই পবিত্র কোরআনে বিধৃত। আর এ কারণেই যুগে যুগে দেশে দেশে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, মানব-মনকে দোলা দিয়েছে।

বস্তুতঃ যেভাবে আল্লাহ পাক যমীনের বুকে রেখেছেন সর্বকালের মানুষের রিয্‌কের ব্যবস্থা, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনেও রেখেছেন তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক খাদ্য সম্ভার, আর যেভাবে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যমীন মানুষের খাদ্য সরবরাহ করে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে, ঠিক তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে বেহেশতী নূর পরিবেশন করেছেন মানুষের সমগ্র সত্ত্বার শিরায় শিরায়, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তা-ও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, মানুষের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবে। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত হারেস আ'ওয়ার বর্ণনা করেন, আমি একবার মসজিদে প্রবেশ করে দেখি কিছু লোক বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে। আমি তখন হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট হাযির হলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "এ বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে"? আমি বললাম, "জ্বী-হ্যাঁ"। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "শুনে রাখ, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; তিনি এরশাদ করেছেনঃ "হুশিয়ার থাক! শীঘ্রই একটি বড় ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে"। আমি আরজ করলাম, "সে ফেতনা থেকে নাজাত পাওয়ার উপায় কি হবে"? তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ পাকের কিতাব"।

"এই কিতাবে তোমাদের পূর্বের লোকদের অবস্থা বর্ণিত আছে এবং তোমাদের পরে যা কিছু ঘটবে তারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর তোমাদের পরস্পরের বিষয় সমূহের মীমাংসাও রয়েছে। এই কিতাবই চূড়ান্ত ফয়সালা। যে বিদ্রোহী ব্যক্তি এই কিতাবকে অবজ্ঞা করবে আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করবেন। আর যে ব্যক্তি এই কিতাব ফেলে রেখে অন্য কিছু দ্বারা হেদায়েত পাওয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ পাক তাকে গোমরাহ করে দেন। এটি আল্লাহ পাকের একটা শক্ত রজ্জু। জ্ঞান-বিজ্ঞানে

পরিপূর্ণ এই কিতাব একটি চিরস্মরণীয় বস্তু। এটিই সরল–সঠিক পথ। এই কিতাব থাকা অবস্থায় মনের কামনা সমূহ মানুষকে গোমরাহ করতে পারে না। জ্ঞান-পিপাসু মানুষের জ্ঞান–পিপাসা কখনো মেটে না। বার বার পাঠ করলেও এর নুতনত্ব শেষ হয় না। এর অবাক করে দেয়া কথাগুলোর বিস্ময় কখনও শেষ হয় না। এটি সেই কিতাব যার কথাগুলো শ্রবণ করা মাত্রই জ্বীন সম্প্রদায় বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছিল, "নিঃসন্দেহে আমরা এমন এক কোরআন শুনেছি যা হেদায়েতের দিকে পথ-নির্দেশ করছে, সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করে ঈমান আনলাম"। যে ব্যক্তি এই কিতাবের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলবে সে সত্য কথা বলবে। যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন অনুযায়ী আমল করবে সে পুরস্কৃত হবে। যে ব্যক্তি এর ভিত্তিতে কিছু মীমাংসা করবে সে ইনসাফ করবে। যে ব্যক্তি এই কিতাবের দিকে আহবান করবে সে সরল–সঠিক পথের দিকে আহবান করবে। হে আ'ওয়ার! এই কথাগুলো সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর"।

এ বরকতময় উক্তিগুলোতে মহান শিক্ষা রয়ে গেছে; বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর চিন্তা করুনঃ

(১) ফেতনার যুগে কোরআনে পাকই নাজাতের মাধ্যম।

(২) এ কিতাবই আমাদের মধ্যে বিরাজমান সকল বিতর্কের মীমাংসা।

(৩) এ কিতাবকে অবজ্ঞা করা একটি বড় বিদ্রোহ এবং এ বিদ্রোহের কারণে মানুষ আল্লাহ পাকের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর গজবে পতিত হয়।

(৪) পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান স্থাপন করার পর তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন গোমরাহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৫) পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পবিত্র কোরআন যতবারই পাঠ করা হোক না কেন তা কোন দিনই পুরাতন মনে হবে না অথচ মানব-রচিত গ্রন্থ একবার পাঠ করলে তার প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না।

পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআনের নুতনত্বে এতটুকুও ব্যতিক্রম হয়নি কোন দিন। এমনিভাবে যাঁরা বিদ্যোৎসাহী, তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা সত্য-সন্ধানী বা প্রকৃত আলেম তাঁরা কখনও পবিত্র কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করে শেষ করতে পারেন না, তাঁদের অতৃপ্তির বেদনাই তাঁদেরকে বাধ্য করে কোরআনের মর্মবাণীর সন্ধানে সর্বক্ষণ সাধনায় মগ্ন থাকতে। এভাবে পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্য কোনদিন শেষ হয় না; বরং যুগে যুগে নব নব জিজ্ঞাসার বিস্ময়কর জবাব পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ ۞

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব

পবিত্র কোরআনের এটিও একটা বৈশিষ্ট্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞

(সূরা হিজর)

"নিশ্চয় আমি কোরআনকে নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর হেফাজতকারী"।

তাই দেখা যায় যে, কোরআনে করীম অবতীর্ণ হবার পর চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু পবিত্র কোরআন রয়েছে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত এবং সংরক্ষিত; কালের ঘূর্ণিচক্র বা যুগের আবর্তন-বিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এতদ্ব্যতীত আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, সকল যুগে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলমান পবিত্র কোরআনকে হেফজ বা কণ্ঠস্ত করে তার হেফাজত করে আসছেন। দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থ সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের হেফাজতের ব্যাপারে যে ঘোষণা করেছেন, এ ঘোষণা অনুযায়ী যদি আমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে বিস্ময়াভিভূত হওয়া ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকেনা। যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বিগত চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হবার পরও পবিত্র কোরআনের মধ্যে একটি যের যবরেরও পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি। পবিত্র কোরআনের ভাষা, এর পাঠ করার ভঙ্গি, লেখার নিয়ম, অর্থ ও মর্ম এককথায় সব কিছুর হেফাজত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে এত নিখুঁতভাবে করা হচ্ছে যার কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থের ব্যাপারে নেই। যাঁরা ক্বারী তাঁরা কোরআনে করীমের তেলাওয়াতের মাধ্যমে এর হেফাজতের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যাঁরা হাফেজ রয়েছেন তাঁরাতো কোরআনের হেফাজতের ব্যাপারেই নিয়োজিত রয়েছেন। আর যাঁরা অনুবাদে অথবা তফসীর তথা পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় রত রয়েছেন, তাঁরা কোরআনের মর্মকথার হেফাজতে মশগুল রয়েছেন। এভাবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ পবিত্র কোরআনের হেফাজত কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন। এমনকি, পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করার যে নিয়ম-নীতি রয়েছে তাতেও কোন পরিবর্তন হয়নি, যেমন موسى লিপিবদ্ধ করার এই নিয়ম শুরু থেকেই পালিত হয়ে আসছে কিন্তু তাকে عيسى موسا

عيسا এভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অর্থাৎ শব্দ দু'টির শেষ অক্ষর "ইয়া" হবে, তার উপর "আলিফ" বসবে অথচ তা পাঠ করা হয় না কিন্তু লিখতে হলে ওভাবে লিখতে হবে। এমনিভাবে الرحمٰن। শব্দটি লিপিবদ্ধ করার সময় মীমের উপর ছোট আলিফ বসবে, মীমের সাথে আলিফ বসবে না। অর্থাৎ الرحمان। এভাবে লেখা হবেনা, এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শুধু শব্দ বা অর্থের হেফাজতই করা হচ্ছেনা, বরং পবিত্র কোরআন লেখার যে ভঙ্গি বা ধরণ রয়েছে তারও হেফাজত করা হচ্ছে।

আব্বাসীয় খলীফা মামুনের দরবারের একটি ঘটনা

ইমাম কুরতবী (রঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা মামুনের দরবারে সর্বদা জ্ঞানী–গুণী পন্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ হতো। একবার এক ইহুদী জ্ঞানী ব্যক্তি হাযির হলো যার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা দরবারের সকলকে মুগ্ধ করলো, মামুন জিজ্ঞাসা করে জানলো লোকটি ইহুদী; তাই মামুন বললো, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করবো। সে বললোঃ আমি কোন অবস্থাতেই আমার ধর্ম পরিত্যাগ করবো না।

এ ঘটনার ঠিক এক বছর পর লোকটি পুনরায় মামুনের দরবারে হাযির হলো, তবে এখন সে মুসলমান হয়ে এসেছে।

মামুন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তো গত বছর ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেনা, পরে কি কারণে ইসলাম কবুল করেছ? সে বললোঃ আমি পেশাগতভাবে একজন লেখক। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে বাজারে বিক্রয় করে এর দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ করি।

আমি পরীক্ষামূলকভাবে তৌরাতের তিনটি কপি ও ইঞ্জিলের তিনটি কপি এবং পবিত্র কোরআনের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করি, প্রত্যেকটিতে আমি বহু পরিবর্তন করি এবং ক্রেতাদের নিকট পেশ করি। তৌরাত ও ইঞ্জিলের কপি সমূহ অতি সহজেই বিক্রয় হয়। কেউ সেগুলোর ভুল সমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনা। কিন্তু পবিত্র কোরআনের কোন কপি বিক্রয় হলোনা। ক্রেতারা ভুল ধরলেন, একটি কপিও ক্রয় করলেন না। তখন আমি এ সত্য উপলব্ধি করলাম যে, পবিত্র কোরআন সত্যিই আল্লাহ পাকের কালাম, এর হেফাজত স্বয়ং আল্লাহ পাক করছেন। তাই আমি ইসলাম কবুল করলাম।

পবিত্র কোরআনের হেফাজত যুগে যুগে

কোরআনে পাক পরিপূর্ণভাবে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি; বরং প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোরআনে পাক গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি।

এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ থেকে কোরআনে পাককে বিশেষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দানের জন্যে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার পূর্বে অধিক সংখ্যক হাফেজদের অন্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছেঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেনঃ

"আমি আপনার প্রতি এমন একটি গ্রন্থ নাযিল করবো যাকে পানি মুছে ফেলতে পারবে না"।

কোরআনে পাক অবতীর্ণ হওয়ার চৌদ্দশ' বছর পরও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ পাক যেভাবে কোরআনে করীম নাযিল করেছেন আজও সেভাবেই পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে; অথচ অন্যান্য সকল আসমানী গ্রন্থ তৌরাত, যবুর ও ইঞ্জিল অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে করীম হাফেজদের অন্তরে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে বিলোপ হওয়ার সকল পন্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রয়েছে।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোরআনে পাকের কোন আয়াত অথবা সূরা নাযিল হওয়ার পর তার হেফাজতের জন্যে তা কণ্ঠস্ত করার প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেও প্রথমতঃ কণ্ঠস্ত করার চেষ্টা করতেন, এতে তাঁর কিছুটা কষ্টই হতো, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে এমনি কষ্ট করতে বারণ করে এরশাদ করলেনঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝

(সূরা ক্বেয়ামাহ)

"(হে রসূল!) আপনি তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার লক্ষ্যে তা পাঠ করার জন্যে রসনাকে চালিত করবেন না, ওহীকে সংরক্ষিত রাখা এবং তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব"।

অর্থাৎ আপনি কোরআনকে কণ্ঠস্ত করার উদ্দেশ্যে এভাবে আপনার রসনা চালনা করবেন না। কোরআনকে হেফাজত করা ও পরে আপনার কণ্ঠ দিয়ে পাঠ করাবার দাযিত্ব আমার নিজের।

এ আয়াত দ্বারা একথা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরআনে পাক হেফজ ও কণ্ঠস্ত করার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর নবীর অন্তরে কোরআনে পাক সংরক্ষণ করে তাঁকেই প্রথম হাফেজ হওয়ার মর্যাদা প্রদান করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদাই কোরআনে করীম তেলাওয়াত করতেন এবং

প্রতি রমজান মাসে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সহ "দাওর" তথা পরস্পর পরস্পরকে মুখস্ত পাঠ করে শোনাতেন।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু নিজেই যে কোরআনে পাক হেফজ করার জন্যে উদগ্রীব থাকতেন তা নয়, বরং সাহাবায়ে কেরামকে পবিত্র কোরআন হেফজ করাবার প্রতিও সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের মনেও কোরআনে পাক হেফজ করার প্রতিযোগিতামূলক উৎসাহ ছিল। ফলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বর্ণ-যুগেই শত শত সাহাবী হাফেজে কোরআন হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

শুধু যে পুরুষ সাহাবীদের অন্তরে কোরআন পাক হেফজ করার আকাংক্ষা ছিল তাই নয়, বরং বহু মহিলা সাহাবীদের মনেও এ আকাংক্ষা এত অধিক ছিল যে, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের নিকট কোরআনে পাকের শিক্ষা লাভ করা ব্যতীত অন্য কোন মহর দাবী করেননি। হযরত আমর বিন সালামা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে একজন অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তাঁদের বাড়ী ছিল একটি ঝর্ণার পাশে। যেখানে পথিক বা মুসাফিরগণ বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতো এবং অন্যান্য লোকজন ঐ ঝর্ণা থেকে পানি তুলে নিত। হযরত আমরের বয়স ছিল তখন মাত্র সাত বছর। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, অথচ ঐ বয়সে ঐ ঝর্ণার পাশে আগত মুসাফির ও পথিকদের মুখে কোরআনে পাকের আয়াত ও সূরা শ্রবণ করে তিনি কোরআনে পাকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হেফজ করে ফেলেছিলেন।

এ ঘটনা দ্বারাই অনুমান করা যায়, সে যুগে কোরআনে পাকের হেফজ করার আগ্রহ মুসলমানদের অন্তরে কত অধিক ছিল।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোরআনে পাক লেখার প্রথম পদক্ষেপ

কোরআনে পাকের হেফাজতের প্রকৃত পন্থা যদিও কণ্ঠস্ত করা ছিল, তবুও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমেও এর হেফাজতের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বলেনঃ "আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। তাঁর উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তিনি দেহে খুব তাপ অনুভব করতেন এবং তাতে তাঁর দেহ মোবারকে মুক্তার ন্যায় ঘামের ফোটা পরিলক্ষিত হতো। অতঃপর এ অবস্থা শেষ হলে আমি হাড় বা অন্য কোন বস্তুর অংশের উপর তা লিপিবদ্ধ করতাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতে থাকতেন আমি লিখতে থাকতাম। লেখা শেষ হলে তিনি বলতেন, পাঠ কর, আমি পাঠ করতাম। যদি আমার লেখায় কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হতো তবে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন"।

ওহী লিপিবদ্ধ হবার কাজ শুধুমাত্র হযরত যায়েদ (রাঃ)-ই করতেন না, এ মহান দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রয়েছেনঃ

১. হযরত আবুবকর (রাঃ),

২. হযরত ওমর (রাঃ),

৩. হযরত ওসমান (রাঃ),

৪. হযরত আলী (রাঃ),

৫. হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ),

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সারাহ (রাঃ),

৭. হযরত যোবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ),

৮. হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রাঃ),

৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাঃ),

১০. হযরত খালেদ বিন অলীদ (রাঃ),

১১. হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ),

১২. হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) এবং আরো অনেকে।

কোরআনে পাকের তরতীব

বর্তমানে কোরআনে পাকের সূরা ও আয়াতের যে তরতীব রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই তা সম্পাদন করেন। যেমন, হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, কোরআনে পাকের তরতীবের ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধান ছিল এই, কোন আয়াত নাযিল হলে লেখকদেরকে ডেকে বলতেন, এ আয়াত অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর লেখ। অতঃপর তাই হতো।

এ বিন্যাস প্রণালীর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেই এবং তাঁরই আদেশে কোরআনে পাকে বর্তমান ধারা প্রণালীর পূর্ণতা সাধন হয়েছিল, যদিও তখন তা প্রস্তর খন্ডে, হাড়ে অথবা চামড়ার পৃষ্ঠে লিপিবদ্ধ ছিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যুগে পবিত্র কোরআন সংকলন

মানব জাতির মহামুক্তির জন্যে প্রেরিত আল কোরআন যা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ তেইশ বছরে আল্লাহর ওহী দ্বারা লাভ করেছিলেন, তাঁর এন্তেকালের সময় তিনি সেই কোরআন হাজার হাজার সাহাবীদের

পূতঃ পবিত্র অন্তরে ও কিছু চামড়া খন্ড, গাছের পাতা, হাড় ও প্রস্তর খন্ডে লিপিবদ্ধ আকারে মাহফুজ রেখে যান। উল্লেখ্য, এ দু'টি স্থানের মধ্যে প্রথম স্থানটি অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু মানুষ যেহেতু মরণশীল, তাই সাহাবাগণ কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে আবার অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে শাহাদত বরণ করতে লাগলেন। আর তাঁদের মধ্যে বহু হাফেজে কোরআনও ছিলেন। এ অবস্থা দেখে উর্ধ্বতন সাহাবীগণ আশঙ্কা বোধ করলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের হাফেজ সাহাবীগণ জীবিত থাকা কালে গ্রন্থাকারে পূর্ণ কোরআনের সংকলন সমাপ্ত না করা হলে পরে কোন আয়াত বা সূরা বাদ পড়তে পারে। তাই তাঁরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালেই এ সম্পর্কে সচেষ্ট হলেন।

এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বলেন, "ইয়ামামার যুদ্ধের পর পরই হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার আমাকে ডেকে পাঠালেন; আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি, সেখানে হযরত ওমর (রাঃ)-ও আছেন"। হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেনঃ "ওমর (রাঃ) এসে আমাকে বললো যে, ইয়ামামার যুদ্ধে হাফেজগণের একটি বিরাট দল শহীদ হয়েছেন, অন্যান্য যুদ্ধেওতো হাফেজগণ শহীদ হচ্ছেন, এতে আমার এ আশঙ্কা হচ্ছে, পরে কোরআনে পাকের কোন অংশ থেকে না বঞ্চিত হয়ে যাই, তাই আপনি খলীফাতুল মুসলেমীন হিসেবে সরকারী উদ্যোগে কোরআনে পাকের বিক্ষিপ্ত পান্ডুলিপিগুলো একত্রিত করুন, এ আমার বিশেষ অনুরোধ"।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ "আমি বললামঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করেননি সে কাজ আমি কিভাবে করি"?

এর জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ"।

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেনঃ "আমি চিন্তা করে দেখলাম সত্যিই এটি উত্তম ও প্রয়োজনীয়ও বটে। তুমি বুদ্ধিমান উদ্যমী যুবক, তোমার সম্পর্কে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল। তুমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ওহী লিপিবদ্ধ করেছ, তাই তুমি কোরআনে পাকের সমস্ত খন্ডগুলো একত্রিত কর"।

হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) প্রথমতঃ সাহসী হলেন না, পরে এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর কোরআনে পাকের আয়াত সমূহের অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঐ সময় কোরআনে পাক লিপিবদ্ধ ছিল খেজুরের ডালে, প্রস্তর খন্ডে ও চামড়ার পৃষ্ঠে।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ)-কেও এ কাজে নিয়োজিত করা হলো। দু' সদস্যের এ কমিশন কাজ শুরুর পূর্বে এক সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে

নির্দেশ জারী করা হলো, "কোরআনে পাকের যে অংশ যার নিকট রয়েছে সে তা অনতিবিলম্বে এ কমিশনের নিকট উপস্থিত করবে"।

হযরত যায়েদের (রাঃ) এ কমিশন তাঁদের নিকট পৌঁছে দেয়া শত শত খন্ডে বিভক্ত পান্ডুলিপিগুলো একত্রিত করে এক জায়গায় নিরিবিলিতে বসে একটি গ্রন্থে সংকলন করতে পারতেন অথবা কিছু সংখ্যক হাফেজকে একত্রিত করে তাদের কণ্ঠস্ত কোরআন শ্রবণ করেও একটি গ্রন্থের রূপ দিতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহর এ মহান কালাম যার হেফাজতের পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন, এজন্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) পবিত্র কোরআন সংকলনের জন্যে এমন একটি পন্থা অনুসরণ করলেন যা সম্পূর্ণ নির্ভুল, নিখুঁত ও সর্বোত্তম।

আল্লাহর রসূলের সাহাবীগণ সকলেই শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আল্লাহর দ্বীন ও কোরআনের ব্যাপারে তাঁরা এমনকি পার্থিব ব্যাপারেও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, এমনটি চিন্তা করাও অপরাধ। এতদসত্ত্বেও কোন সাহাবী তাঁর নিকট লিপিবদ্ধ সংরক্ষিত কোরআনে পাকের কোন আয়াত, সূরা বা অংশ হযরত যায়েদের সামনে উপস্থিত করলে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন সাহাবী লিখিত ভাবে ও মুখে এমনি সাক্ষ্য প্রদান না করতেন যে, এ আয়াতগুলো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁরই অনুমতিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর তিরোধানের পূর্বে তাঁর সম্মুখে এ আয়াতগুলো উপস্থিত করলে তিনি সঠিক বলে তা মঞ্জুর করেছেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উভয়েই কোরআনে পাকের হাফেজ ছিলেন, ঐভাবে যাচাই করার পর তাঁরা নিজেদের মুখস্ত করা আয়াতের সঙ্গেও যাচাই করতেন, এরপর তা গ্রহণ করে নিজেদের সংকলনে সংযোজন করতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এমনি নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে কোরআনে করীমের সরকারী উদ্যোগে গৃহীত প্রথম সংকলন তৈরী করে হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকট পেশ করলেন। এখানে এ-ও উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক সাহাবী এর পূর্বেই কোরআনে পাকের এমনি সংকলন প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কোরআন হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর জীবদ্দশায় তাঁর হাতেই ছিল। অতঃপর তাঁর এন্তেকালের পর হযরত ওমর (রঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে। এরপর তিনি এন্তেকাল করার পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছার (রাঃ) নিকট তা হস্তান্তর করেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগে পবিত্র কোরআন সংকলন

হযরত ওসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর রোম ও ইরান পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হয়। প্রতিটি নূতন এলাকার মুসলমানগণ সে সব লোকদের থেকেই কোরআনে পাকের শিক্ষা লাভ করতেন যাদের নিকট থেকে তারা ইসলাম লাভ করেছিলেন, তাঁরা হলেন মুজাহিদ অথবা ব্যবসায়ী।

উল্লেখ্য, তদানীন্তন আরবের সাতটি বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায় তেলাওয়াতের সুবিধার্থে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছিল। সাহাবাদের মধ্যেও এ সাত আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের প্রচলন ছিল। বলতে গেলে এই সাত আঞ্চলিক ভাষা-ভাষীরা নিজ নিজ ভাষাতেই কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন। তাই তারা কোথাও গেলে অথবা যদি কাউকে কোরআন শিক্ষা দান করতেন, তখন দু'জন সাহাবীর দু'জন নও-মুসলিম ছাত্র একত্রিত হয়ে যখন একই আয়াত পরস্পর তেলাওয়াত করতেন তখন ঐ প্রকারভেদ প্রকাশ হয়ে পড়লে একে অপরকে কোরআনে পাক ভুল পড়ার অপবাদ দিত এবং এরই সূত্র ধরে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাটি এমনকি, একে অপরকে কাফের পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করতো না। তাঁদের মতানৈক্যের মূল কারণ ছিল কোরআনে পাকের সাত আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাদের এ অজ্ঞতা দু'টি মারাত্মক অপরাধের দিকে তাদেরকে ধাবিত করলো, একদিক হলো কোরআনে পাক যে সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হয়েছে তার বৈধতা অস্বীকার, দ্বিতীয় হলো একে কেন্দ্র করে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হওয়া। হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামানের বর্ণনায় এসব ঘটনার বাস্তবতা পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ আমরা আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে মশগুল থাকাকালীন শ্রবণ করলাম, নও-মুসলিমগণ কোরআনে পাকের তেলাওয়াত সম্পর্কে মতভেদ শুরু করে দিয়েছে। কেউ বলে এরূপ হবে, কেউ বলে সেরূপ! এরপর যুদ্ধ শেষে মদীনা মোনাওয়্যারায় ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গেই আমি হযরত ওসমান (রাঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলামঃ "হে আমিরুল মো'মেনীন! এই উম্মত তাদের কিতাব সম্পর্কে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় ভেদাভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আপনি তাদের এ মতভেদ দূর করার পন্থা অবলম্বন করুন"।

হযরত ওসমান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ব্যাপার কি? তাই বল"।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বললেনঃ আমরা আরমেনিয়ার যুদ্ধে থাকাকালীন দেখলাম সিরিয়ার লোকেরা উবাই বিন কা'বের অনুসরণে কোরআনে পাক তেলাওয়াত করছে যা ইরাকের লোকেরা কখনো শোনেনি, আবার ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদের অনুকরণে তেলাওয়াত করছে যা সিরিয়ার লোকেরা জানেনা; এরই সূত্র ধরে দু'পক্ষ মুখোমুখি বিবাদে একে অপরকে কাফের বলেছে।

মদীনা মোনাওয়্যারায় এমনি মতভেদ হচ্ছে বলে পূর্বেই হযরত ওসমান (রাঃ) কিছুটা খবর পেয়েছিলেন, উপরন্তু হযরত হোযায়ফার (রাঃ) এ ঘটনা প্রকাশের পর তিনি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেনঃ আপনার ইচ্ছা কি? তখন তিনি বললেন, এখন থেকে সকল আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে একটি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন সংকলন করে তার বহুল প্রচারের মাধ্যমে প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি এলাকায় তা প্রেরণ করা হলে, এসব বিতর্ক ও মতভেদের নিরসন হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সকলেই হযরত ওসমানের (রাঃ) এ অভিমত সমর্থন করলেন।

এরপর হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদে নববীতে মুসলমানদেরকে একত্রিত করে বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরে বললেনঃ তোমরা মদীনা মোনাওয়্যারায় যখন কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের প্রকারভেদ নিয়ে বিতর্ক করছো তাহলে দূর-দূরান্তে যারা রয়েছেন, তারা অধিক পরিমাণেই কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে, তাই এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সমস্ত মুসলমানদের জন্যে অভিন্ন পাঠ-রীতিতে কোরআনের সংকলন করে প্রকাশ করা এবং সকলে তারই তেলাওয়াত করা। উপস্থিত মুসলমানগণ এ অভিমত সমর্থন করলেন।

এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুগের সংকলিত কোরআনে পাক হযরত হাফছা (রাঃ) থেকে আনা হলো। একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ গঠন করে তাঁদেরকে কোরআনে পাকের সংকলন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ পরিষদের মধ্যে ছিলেন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ), হযরত আবুদল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত সাঈদ বিন আলআ'স (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন হারেস (রাঃ)।

উল্লিখিত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন আনসারী, আর অবশিষ্ট তিনজন ছিলেন মোহাজের, মক্কী ও কোরায়শী। এজন্যে হযরত ওসমান (রাঃ) এ পরিষদকে বললেনঃ তোমরা কোরায়েশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে, কারণ কোরআন তোমাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে।

মূলতঃ এ চারজন সাহাবীকেই কোরআন সংকলনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হলো, তবে তাঁদের সহযোগী হিসেবে হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত কাসীর বিন আফলাহ, হযরত মালেক বিন আবি আমের, হযরত আনাস বিন মালেক এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সহ আরও কয়েক জন সাহাবীকেও নিয়োজিত করা হলো।

ইমাম আবু দাউদের বর্ণনা মতে, তাঁদের সংখ্যা ছিল বার। বারজন সাহাবীর এই পরিষদ সাতটি কপি সংকলন করেছিলেন এবং সেগুলো একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়াতে, একটি ইয়ামনে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় এবং একটি কুফা নগরীতে প্রেরণ করা হয় ও সপ্তম সংখ্যাটি মদীনা শরীফেই রেখে দেয়া হয়।

সহজভাবে কোরআনে পাক তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা গ্রহণ

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যুগে কোরআনে পাকের সংকলন আরবী অক্ষরের যে পঠন প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, পরবর্তীতে ভিন্নতর পঠন প্রণালীতে লেখা জায়েয নয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তারই অনুকরণে কোরআনে পাকের সংকলন হয়ে এসেছে আর কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এভাবেই চলবে।

এ পর্যন্ত কোরআনে করীমের অক্ষরগুলো নক্‌তা ও হরকত (যের যবর পেঁশ) বিহীন ছিল। এজন্যে অনারব লোকদের পক্ষে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা মুশকিল ছিল। অনারব দেশগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের দখলে আসার পর যখন এ অসুবিধা আরো প্রকট হয়ে উঠলো তখন তেলাওয়াতের সুবিধার জন্যে প্রথমতঃ নক্‌তা ও পরে হরকত বসানো হলো। এ সম্পর্কে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো তার বিবরণ এমনঃ

নক্‌তা

আরবী ভাষার বর্ণে বর্তমানে যে নক্‌তা প্রচলিত রয়েছে পূর্বে তা ছিলনা। পাঠকবর্গ তাদের জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদর্শিতা দ্বারাই সাদৃশ্য-পূর্ণ বর্ণগুলোর পার্থক্য অনুধাবন করে সহজেই পাঠ করতে পারতেন, কিন্তু বর্ণে নক্‌তা ব্যবহার করাকে তাদের পন্ডিত ব্যক্তিগণ মূর্খতা মনে করতেন। যেমন ঐতিহাসিক মাদায়েনী বলেনঃ

كثرة النقط فى الكلام سوء الظن بالمكتوب اليه

বর্ণে অধিক নক্‌তা ব্যবহারকারী সম্পর্কে অজ্ঞতার ধারণা পোষণ করা হতো। তাই প্রথমতঃ কোরআনে পাকের আরবী বর্ণেও নক্‌তা ব্যবহার করা হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে, এজন্যে অনারব ও স্বল্প শিক্ষিত লোকদের জন্যে তেলাওয়াতে অসুবিধা দেখা দেয়। তাই এ অসুবিধা দূর করতে পরে নক্‌তা দেয়া হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এ নক্‌তা কোরআনে পাকের বর্ণে সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন? এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। আল-বোরহান গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ২৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী সর্বপ্রথম এ মহৎ কাজটি সম্পাদন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমেই এ কাজ সমাধা করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের রায় হলো, কুফার গভর্ণর জিয়াদ বিন আবু সূফিয়ান এ কাজ সম্পাদন করান।

কেউ বলেছেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত হাসান বসরী, ইয়াহয়া বিন ইয়াসূর এবং নসর বিন আসেম দ্বারা এ কাজ সম্পাদন করান।

হরকত

নক্‌তার মত পূর্বে কোরআনে পাকের বর্ণে হরকত বা যের যবর পেশও ছিলনা। এ সম্পর্কে একথা সর্বজন-বিদিত যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত ইয়াহয়া বিন ইয়াসূর, নসর বিন আসেম দ্বারা এ কাজ সম্পাদন করিয়েছেন। অনেকে বলেছেন, এ কাজটিও আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলি করেছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত সকল মতামত একত্রিত করার পর দেখা যায় যে, আবুল আসওয়াদ দূওয়াইলি নক্‌তার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত পন্থায় হরকত বা যের যবর পেশ ব্যবহার করেন যার রূপরেখা ছিল এমনঃ

যবরের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণের উপরে একটি নক্‌তা, যেরের নিদর্শন স্বরূপ নীচে একটি নক্‌তা ও পেশের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণের সম্মুখে একটি নক্‌তা এবং তনবীনের নিদর্শন বোঝাতে দু'টি নক্‌তা ব্যহার করতেন। আর খলিল বিন আহমদ হামজা ও তাশদীদের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইয়াহয়া বিন ইয়াসুর, নসর বিন আসেম ও হাসান বসরীর (রঃ) দ্বারা বর্তমান চিহ্নে কোরআনে পাকের বর্ণে যের যবর পেশ ব্যবহারের কাজ সমাধা করান।

মঞ্জিল

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ সাত দিনে কোরআনে পাক তেলাওয়াত করার আদর্শ গ্রহণ করেন। এ হিসেবে প্রতিদিন তাঁরা যতটুকু তেলাওয়াত করতেন তাকেই এক মঞ্জিল বলা হয় এবং তেলাওয়াতের সুবিধার জন্যে তাঁরা পূর্ণ কোরআনকে সাত মঞ্জিলে বন্টন করেন।

পারা

কোরআনে পাকে ত্রিশটি পারা রয়েছে; এটি ছাত্রদের পড়ার সুবিধার্থে করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত কোরআন ত্রিশ খন্ডে ছিল, পরে তা পারায় পরিণত হয়; কিন্তু একথার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রুকু

কোরআনে পাকে ৫৪০টি রুকু রয়েছে। এ রুকুর নিদর্শন কে এবং কেন প্রর্বতন করেন তারও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ হযরত ওসমান (রাঃ) করেছেন। কেউ কেউ বলেছেনঃ রুকুর চিহ্নটি মূলতঃ একটি বিষয়ের পূর্ণতার নিদর্শন হিসেবেই দেয়া হয়েছে। অনেকে বলেনঃ নামাযে তেলাওয়াতের সুবিধার জন্যে করা হয়।

পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি সূরা, আয়াতের পরম্পরা ও তরতীব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এবং আল্লাহ পাকেরই নির্দেশ মোতাবেক লিপিবদ্ধ; তাতে অগ্র-পশ্চাত অথবা একটি সূরার আয়াতকে অন্য সূরায় স্থানান্তরিত করার অধিকার কারো নেই। সারা বিশ্বে বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে একটি মাত্র বর্ণ পার্থক্য ব্যতিরেকে পঠিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সত্যতা, এর চিরন্তনতা এবং অলৌকিকতা সম্পর্কে এটাও যে একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ–একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে। আজ পর্যন্ত কত লোক পবিত্র কোরআন হেফজ তথা আদ্যোপান্ত মুখস্ত করেছেন এবং বর্তমানেও দুনিয়ার বুকে পবিত্র কোরআনের কত লক্ষ হাফেজ রয়েছেন তার হিসাব পেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ঘটনাক্রমে যদি কাগজে লিপিবদ্ধ কোরআন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবু লক্ষ লক্ষ লোকের বুকের লেখা মুছে ফেলা সম্ভব হবে না। পৃথিবী থেকে পবিত্র কোরআন বিলুপ্ত করার সাধ্য কারো নেই এবং রোজ কেয়ামত পর্যন্ত সে ক্ষমতা কারো হবে না। দুনিয়ার কোন ধর্মগ্রন্থ এমন বৈশিষ্ট্য ও সৌভাগ্য লাভ করতে সমর্থ হয়নি। কেননা, পবিত্র কোরআনের সংরক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। ফলে তা আজ পর্যন্ত অবিকল, অপরিবর্তিতভাবে বিশ্ব মুসলিমের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। কোরআনের মহাশত্রুও তাতে কোন প্রকার হেরফের করতে সমর্থ হয়নি, হবেও না। একমাত্র পবিত্র কোরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেননি।

পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা

বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য পবিত্র কোরআন যে জীবন-বিধান পেশ করেছে তার মর্মকথা হচ্ছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, সেই আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর অবাধ্য হয়োনা। যাঁর অনন্ত অসীম দান অহরহ ভোগ করছো তাঁকে ভুলে থেকো না। তাঁকে স্মরণ কর। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁর দানের অনাদর করো না।

তওহীদ

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করার এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ ও আত্ম-সমর্পণ করার তা'লীম দেয়। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে; আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-তরুলতা, সকাল-সন্ধ্যার আগমন– এসবই আল্লাহ পাকের কুদরতের মহিমা, এক আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ۞

"নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে (আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদের) বহু নিদর্শন রয়েছে"।

শুধু আসমান যমীনেই নয়; বরং মানুষের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এবং তার অনন্ত অসীম কুদরত ও রহমতের উজ্জ্বল নিদর্শন। যারা বুদ্ধিমান, যারা বিবেকবান, যারা সত্য-সন্ধানী, যারা বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা জীবন ও জগতের সবকিছুতেই আল্লাহ পাকের একত্ববাদের জ্বলন্ত-নিদর্শন দেখতে পায়। পবিত্র কোরআন তাই ঘোষণা করেছেঃ

وفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۞

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বহু নিদর্শন, তোমরা তা কেন দেখনা"?

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, (নিখিল-সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ এবং দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর তিনিই দান করেছেন। (কিন্তু এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে"।

এমনিভাবে, পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে মানুষকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে। এ আহবানের মূল কথা হলো এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই। শুধু তাই নয়, বরং এক আল্লাহ ব্যতীত মানুষের আনুগত্য লাভের যোগ্য আর কেউ নাই। এমনিভাবে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন প্রেমাস্পদ নাই। মানুষের আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং আনুগত্য লাভের অধিকারী হলেন একমাত্র প্রেমময়, করুণাময়, অনাদি-অনন্ত, সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন; মানুষকে শুধু তাঁরই সমীপে মাথা নত করতে হয়। বিশ্ব মানবের চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে মানুষ যখন মানবতার কলঙ্ক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতো, যখন তারা তুচ্ছ বৃক্ষ-লতার সম্মুখেও মাথা নত করতো, সেই অন্ধকার যুগে আগমন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল পবিত্র কোরআন; বিশ্ব-মানবের মুক্তির মহাসনদ রূপে। পবিত্র কোরআন গোমরাহীর অন্ধকার থেকে নাজাত লাভের আহবান জানিয়ে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের কথা ঘোষণা করলো।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۝ اَلَّذِىْ الاية

(সূরা বাকারা)

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে, হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন কররে। সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে শয্যারূপে এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ তৈরী করেছেন এবং আসমান থেকে বারি বর্ষণ করে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ রকমারী খাদ্য দ্রব্য, ফল-ফলারী উৎপন্ন করেছেন। অতএব, কোন কিছুকেই আল্লাহ পাকের সাথে অংশী স্থাপন করোনা এবং তোমরা একথার সত্যতা সম্পর্কে অবগত"।

মানবতার চরম অধঃপতন পৌত্তলিকতাকে পরিহার করে তওহীদের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্যে বিশ্ব-মানবের প্রতি আহবান জানিয়েছে পবিত্র কোরআন; আর এ আহবানে সাড়া দেয়ার জন্যে এমন সহজ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যা সকলেরই বোধগম্য হয়। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ

(সূরা ইয়াসীন)

"এবং তোমাদের জন্যে মৃত যমীন একটি বিশেষ নিদর্শন, এ মৃত বা শুষ্ক যমীনকে আমি জীবনী-শক্তি দান করি এবং তা থেকে তোমাদের জন্যে ফলমূলের বীজ বের করি এবং তা থেকে তোমরা আহার কর"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ....مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ۝

(সূরা আবাসা)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তওহীদে বিশ্বাস করার জন্যে এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ দান প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্যে মানুষ যেন তাদের খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, নিশ্চয় আমি বারি বর্ষণ করি, এরপর

যমীনকে বিদীর্ণ করে তা থেকে শষ্য উৎপাদন করি, আংগুর, শাক-সব্জী, জয়তুন, খেজুর এবং নিবিড় বাগান সমূহ ও রকমারী ফল-ফলারীর ব্যবস্থা করি; এসবই তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলোর প্রয়োজন মেটানোর জন্যে।

পবিত্র কোরআন এভাবে আল্লাহ পাকের কুদরত এবং নেয়ামত উপলব্ধি করার ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার লক্ষ্যে জগৎ ও জীবনের বহু বাস্তব নিদর্শন তুলে ধরেছে। এর পাশাপাশি পবিত্র কোরআন একথাও ঘোষণা করেছে যে, তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের কথা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে এ পৃথিবীতে যত নবী রসূল আগমন করেছেন সকলেই বিশ্ববাসীকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করার আহবান জানিয়েছেন। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ রয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ۞

(সূরা মোমেনুন)

"এবং নিশ্চয় আমি নূহকে পয়গম্বর রূপে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি। তিনি বলেছেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই"।

এমনিভাবে হযরত হুদ (আঃ)-এর কথা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছেঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۞

(সূরা আ'রাফ)

আল্লাহর নবী হুদ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তওহীদের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! এক আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন উপাস্য নাই। (আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করতে) তোমরা কি ভয় কর না"?

আর এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۞ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ۞

(সূরা যুমার)

(হে রসূল!) "নিশ্চয় আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যে সব নবী রসূল এসেছেন তাদের নিকটও (একথা চির সত্য), যদি আপনি শেরক করেন তবে আপনার সকল নেক আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। বরং এক আল্লাহর বন্দেগী করুন এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন"।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সহ সমস্ত নবী রসূলগণের উল্লেখ করে তওহীদের শাশ্বত চিরন্তন সত্যকে গ্রহণ করার এবং শেরক বর্জন করার তাগিদ করা হয়েছে। তওহীদের প্রতি ঈমান চিরশান্তি লাভের একমাত্র পথ। পক্ষান্তরে, শেরকের পরিণতি ধ্বংস এবং চিরশাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটিই পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সর্বপ্রথম মক্কাবাসীকে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলেন, তখন পৌত্তলিকরা তাঁর চরম বিরোধিতা করে। তারা তাঁকে তওহীদের প্রচার থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের স্মরণাপন্ন হয় এবং এ প্রস্তাব পেশ করেঃ

আপনার ভ্রাতষ্পুত্র যদি আরবের সর্বশেষ্ঠ ধনী হতে চায়, তবে আমরা এ মুহূর্তে এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

আর যদি তিনি আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, আমরা তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত রয়েছি।

আর যদি তিনি আরবের বাদশাহ হতে ইচ্ছুক হন তবে আমরা অনতিবিলম্বে এর ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত রয়েছি, তবে আমাদের একটি মাত্র কথা রাখতে হবে তা হলো তিনি তওহীদের প্রচার বন্ধ করে দেবেন।

আবু তালেব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বলেনঃ "চাচা! যদি তারা আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অন্য হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আমি তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রচার থেকে বিরত হবনা"।

রেসালত

তওহীদের ন্যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাস করাও পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা। শুধু তাঁকে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, বরং একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। তাঁর পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন রসূলের আগমন

হবেনা। কেননা, রেসালতের যাবতীয় গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর মধ্যে এবং সমস্ত গুণাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর মাধ্যমে। তাই, তাঁর পরে কোন নবী যে আগমন করবেন না শুধু তাই নয়, বরং নতুন কোন নবী আগমনের প্রয়োজনও হবেনা। পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

(সূরা আ'রাফ)

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(সূরা আহযাব)

"মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেরই পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী"।

পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণ, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা কিছু নির্দেশ প্রদান করেন তা পালন কর, আর যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

"যে রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে মূলতঃ আল্লাহর প্রতিই অনুগত হলো"।

আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস

পবিত্র কোরআন যে সব মৌলিক বিষয়ের তা'লিম দেয়, তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মর্মকথা হলোঃ

এ জগৎ ও জীবন ক্ষণস্থায়ী, জীবনের যাবতীয় সম্পদ সামগ্রীও ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে মানুষ প্রবাসী মুসাফির। সমগ্র বিশ্ব একটি বিরাট পান্থশালা বা মহা মুসাফিরখানা। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে বা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হলে যাত্রীকে এগিয়ে যেতে হয় সম্মুখের দিকে, ছেড়ে যেতে হয় এ মুসাফিরখানা, পাড়ি জমাতে হয় পরপারে, যেতে হয় স্থায়ী আবাসস্থলে। এইতো জীবনের খেলা আর এইতো মৃত্যুর

রহস্য। কেননা, এ জীবন যেমন সত্য তেমনি আখেরাত বা পরজীবনও সত্য, মৃত্যু যেমন অনিবার্য, অবধারিত, তেমনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বা পরকালীন জীবনও সুনিশ্চিত। এ জীবনকে যেমন কেউ ধরে রাখতে পারে না, মৃত্যুকে যেমন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তেমনি আখেরাত বা পরকালকে অস্বীকার করে তা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই পবিত্র কোরআন আল্লাহর একত্ববাদ এবং রসূলের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানায়। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে, মানুষ এ জীবনের ন্যায় মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন লাভ করবে। এ জীবনের যাবতীয় কর্মের ফল ভোগ করবে সে পরজীবনে। এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে কিন্তু মৃত্যুই শেষ পরিণতি নয়, বরং মৃত্যু আখেরাত বা পরজীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাই, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মৃত্যু যে চির অবধারিত একথা ঘোষণা করার পর আখেরাত সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন সূরা জুমআয় এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করতে সচেষ্ট রয়েছ তা থেকে রেহাই নেই, এরপর প্রত্যাবর্তন করতে হবে তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে ওয়াকেফহাল। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন"।

এমনিভাবে সূরা নেসায় এরশাদ হয়েছেঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন এবং যে কোন লৌহ নির্মিত দুর্গে অবস্থান কর না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে"।

আর সূরা আনকাবুতে এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ۞

"প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে, এরপর তোমরা আমারই নিকট ফিরে আসবে"।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মৃত্যুর অমোঘ বিধানের কথা ঘোষণা করে মৃত্যুর পর মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বা আখেরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রত্যেকটি মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন এ জীবনের কৃতকর্ম তথা পাপ-পূণ্য এবং তার পরিণতি এক কথায় সবকিছুই মরণকালীন মুমূর্ষুতায় মানুষ দেখতে পায়। আখেরাত বা পরজীবনের প্রাথমিক দৃশ্যগুলো মানুষকে দেখানো হয়।

মৃত্যুর পর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসেনা, আসতে পারেনা, তাই মানুষ কারো কাছ থেকে মৃত্যু-পথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানতে পারেনা। অতএব, এসব বিষয়ে মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বর্ণনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, অদৃশ্য-লোকের সকল সংবাদে ঈমান আনতে হবে। এজন্যে পবিত্র কোরআনের শুরুতেই অদেখা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার শর্তারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের জন্যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হলো পূর্বশর্ত; তাই আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

"এই কিতাব, এতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এই কিতাব সেসব ধর্মভীরু লোকদের জন্যে পথ প্রদর্শক যারা গায়ব বা অদৃশ্য বস্তু সমূহে বিশ্বাস করে, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আমার দেয়া রিয্ক থেকে ব্যয় করে এবং যারা সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা আপনার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে আর সেই কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে, আর তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে মানুষের এ জীবনকে গড়ে তোলার জন্যে যেভাবে বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছে, ঠিক তেমনি আখেরাত বা পরজীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে এবং আখেরাত সম্পর্কে

বিস্তারিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ আলোচনা কোরআনে ও হাদীসে সন্নিবেশিত হয়েছে যা দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

পবিত্র কোরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণীর মাধ্যমে আখেরাতের যে সব বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি তাহলোঃ

(১) মৃত্যু ও মৃত্যুকালীন সুখ-দুঃখের অবস্থা, (২) মৃত্যুর পর আখেরাত বা শেষ বিচারের পূর্ববর্তী অবস্থা, (৩) শেষ বিচার বা কেয়ামতের জন্যে পুনরুত্থান, (৪) শেষ বিচার ও তার ভয়াবহতা, (৫) শেষ বিচার সম্পন্ন হলে কর্ম ফল হিসাবে বেহেশত বা দোযখ। অন্য কথায় কবর, হাশর, পুলসিরাত, বেহেশত এবং দোযখ, মানুষকে আখেরাতে এ সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ এসব বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, ইসলাম মানুষকে এ সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানায়; অতএব, মুসলমান হতে হলে এসব বিষয়ে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্মের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী; তাই তাকে জবাবদেহী করতে হবে তার সকল কৃতকর্মের জন্যে তথা সৎ কাজের পুরস্কার ও অন্যায় কাজের শাস্তি সকলকেই ভোগ করতে হবে। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার এককথায় এসব কিছু এক হতে পারে না। আল্লাহর দরবারে হবে বিচার বা তারতম্য, আর এজন্যেই প্রয়োজন আখেরাত বা শেষ বিচারের দিনের। আর যে আল্লাহ এই বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং অগণিত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এ বৈচিত্র্যময় জগৎকে শেষ করে দেয়া এবং পুনরায় শেষ বিচারের দিনে সকল মানুষকে হাযির করা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। যারা নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্বে বিশ্বাসী তারা অবশ্যই বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অস্তিত্বেও বিশ্বাসী, আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা অবশ্যই আল্লাহ পাক ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বর্ণিত আখেরাতের যাবতীয় বিষয়ে আস্থাবান হয়ে আখেরাতের তথা পরজীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কেননা, বিপদের সম্ভাবনা থাকতে তার মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর দু'টি দৃশ্য বিশ্ব মানবের সম্মুখে তুলে ধরেছে, আর আখেরাতের প্রতি শুধু বিশ্বাসই নয়, বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছে। এটি করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে,

তিনি মানুষকে তার আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে মানব জাতিকে ওয়াকেফহাল করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; পবিত্র কোরআনের আকর্ষণীয় এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা-শৈলী মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে শুধু বিশ্বাসী হতেই উদ্বুদ্ধ করেনি, বরং মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক, সচেতন এবং সাবধান থাকার তা'লিম দিয়েছে এবং আখেরাতের জিন্দেগীর সাফল্য লাভে সচেষ্ট থাকার তাগিদ করেছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۞

(সূরা আনআ'ম)

"আর দুনিয়ার এ জীবন তো খেলাধূলা ব্যতীত আর কিছুই নয়; আর আখেরাতের জিন্দেগী তাদের জন্যে অবশ্যই উত্তম যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা"?

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۞

"আর তোমরা নামায কায়েম করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং (অবশেষে) তাঁর নিকটই তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا۞

(সূরা কাহফ)

"আর তারা তাদের জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থিত দেখতে পাবে, এবং আপনার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করবেন না"।

পবিত্র কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভাল কাজ কি মন্দ কাজ তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, পরকালে তার পুরস্কার অথবা শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ۞ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ۞

(সূরা জিলজাল)

"অতঃপর যে একটি শস্য পরিমাণও সৎ কাজ করবে তার পুরস্কার সে লাভ করবে, (তেমনি) যে একটি শস্য পরিমাণ অন্যায় কাজ করবে তারও শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে"।

বস্তুতঃ এ কারণে পবিত্র কোরআনে বিভিন্নভাবে সৎ কাজ করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করার আহবান জানানো হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا۞

(সূরা মুজ্জাম্মেল)

"আর তোমরা নিজেদের উপকারার্থে যা কিছু কল্যাণকর কাজ করে পাঠাবে, তা অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের নিকট পাবে, (আর যা পাবে) তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর"।

এমনিভাবে সূরা নমলে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

"যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে সে তার চেয়েও উত্তম বিনিময় লাভ করবে; আর সে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ বিপদ থেকে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। (পক্ষান্তরে) যে ব্যক্তি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তাকে উল্টোমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আর এ পৃথিবীতে যেমন কাজই করবে (ভাল-মন্দ) তার বিনিময়ই তোমরা লাভ করবে"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছেঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ۞

(সূরা হুদ)

"স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে সক্ষম হবেনা, (আর) সেদিন দুনিয়ার মানুষ দু'ভাবে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একদল হবে হতভাগ্য আর একদল হবে ভাগ্যবান"।

বস্তুতঃ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে দুনিয়ার এ জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তথা পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করে তার উপর আমল করে, তারাই হবে ভাগ্যবান।

পক্ষান্তরে, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কয়েক দিনের জীবনকেই "চরম চাওয়া এবং পরম পাওয়া" মনে করে, যারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা আদৌ স্মরণ না করে দুনিয়ার এ জিন্দেগী নিয়েই থাকে ব্যস্ত, মুগ্ধ-মত্ত-মাতোয়ারা, তারাই কাল কেয়ামতের দিন হবে সর্বহারা।

কেয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। দুনিয়াতে যদি কারও কথা বলার সুযোগ না থাকে তবে অন্যের মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু কেয়ামতের কঠিন দিনে সে ব্যবস্থারও অনুমতি হবে না, কেননা সেদিন কেউ কারও সাহায্য করতে সক্ষম হবে না, এমনকি পিতা পুত্রের বা পুত্র পিতারও কোন উপকারে আসবে না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۝

(সূরা বাকারা)

"আর ভয় কর সেদিনকে, যেদিন একজন অন্যজন থেকে একটুও উপকৃত হবে না এবং সেদিন কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবেনা, এবং অন্য লোক থেকে কোন বিনিময় গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা কোনরূপ সাহায্যও লাভ করবে না"।

এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ۝

(সূরা লোকমান)

"হে মানব জাতি! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, আর ভয় কর সেদিনকে যেদিন পিতা পুত্র দ্বারা উপকৃত হবে না, আর পুত্রও পিতা দ্বারা উপকৃত হবে না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য। অতএব, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে, আর আল্লাহ পাক থেকে তোমাদেরকে যেন ধোকাবাজ শয়তান ধোকায় না ফেলে"।

কেয়ামতের দিনে শুধু যে পিতা পুত্র দ্বারা উপকৃত হবে না তাই নয়, বরং সেই কঠিন দিনে পিতা পুত্রকে দেখে পলায়নপর হবে, ভাই ভাইকে দেখে পালিয়ে যাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন, এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ۞ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ۞ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ۞ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ۞

(সূরা আবাসা)

"সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন মানুষ তার (আপন) ভাইকে দেখেও পলায়ন করবে, এমনকি স্বীয় মাতা পিতাকে দেখেও এবং স্বীয় পত্নী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও পলায়ন করবে"। (অর্থাৎ এত নিকটতম আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারো প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ পাবে না, এর কারণ পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ) "সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা, যা তাকে চরম অস্থির করে রাখবে, অন্যের দিকে তাকাবার অবস্থাই তার থাকবেনা"।

পরবর্তী আয়াতে আরও এরশাদ হয়েছে,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ۞ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ۞ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ۞

"সেদিন অনেক মুখমন্ডল (ঈমানের বরকতে) দীপ্তিমান হবে (আনন্দ উল্লাসে) হাস্যোজ্জ্বল এবং হর্ষোৎফুল্ল হবে। আর অনেক মুখমন্ডলের উপর সেদিন (আল্লাহর নাফরমানীর কারণে) (বিষাদের) মলিনতা সমাচ্ছন্ন হবে"।

পবিত্র কোরআন এ হতভাগ্য লোকদের সম্পর্কে অবশেষে যে মন্তব্য করেছে তা হলোঃ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۞

"এরাই কাফের, এরাই দুস্কৃতকারী লোক"।

এ দুস্কৃতকারী লোকদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের শাস্তির আদেশ জারি হওয়ার পর আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করবেনঃ

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

"আজকের দিনের সাক্ষাতকে (কেয়ামতের দিন) তোমরা ভুলে গিয়েছিলে (অর্থাৎ আখেরাতকে অবিশ্বাস করেছিলে) অতএব তার শাস্তি ভোগ কর। আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, আর তোমরা চিরশাস্তি ভোগ করতে থাক তোমাদের কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ"।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন যে, পরকালীন জিন্দেগীতে ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে যারা ভাগ্যবান হবে, আর এ দু'টি জিনিষের অভাবে যারা হতভাগা হবে তাদের মধ্যে কখনো আলাপ-আলোচনা হবে। পবিত্র কোরআন সে আলাপ-আলোচনার বিবরণ তুলে ধরেছে বিশ্ব মানবের সম্মুখে। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা যারা উপলব্ধি করেন তারা এ আলোচনার ভাষা পাঠ করে যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হন, তেমনি পরকালীন জিন্দেগীর প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগও করেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ۞ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ۞ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ۞ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ۞ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ۞ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ۞ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ۞

"বেহেশতবাসীগণ দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, কি কারণে তোমরা জাহান্নামে পতিত হলে?" তারা জবাবে বলবে, "আমরা দুনিয়াতে নামায আদায় করতাম না, গরীব-দুঃখীকে খাবার দিতাম না, আর আমরা (সত্য ধর্ম সম্পর্কে) তর্ককারীদের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠতাম, (শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই) আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলো। অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না"।

দোযখবাসীদের সেদিন এ সুযোগ দেয়া হবে যে, তারা ইচ্ছা করলে বেহেশতবাসী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, তাদের মনের ব্যথা প্রকাশ করতে পারবে। পবিত্র কোরআন এমনি একটি সংলাপ তুলে ধরেছে বিশ্ব মানবের সম্মুখে এবং কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে সতর্ক করে দিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۞

"এবং দোযখবাসীরা জান্নাতবাসীগণকে ডাক দিয়ে বলবে যে, আমাদের জন্যে সামান্য পানি অথবা যে খাদ্য আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দান করেছেন তার কিছু উচ্ছিষ্ট আমাদের দান করুন। (যেভাবে এ পৃথিবীতে ভাগ্যবান লোকেরা আহার করে পরিতৃপ্তি লাভের পর উচ্ছিষ্ট ফেলে দিলে ভাগ্যাহত লোকেরা তা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে খেতে চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি জান্নাতবাসী ভাগ্যবানদের নিকট তাদের নিক্ষিপ্ত

উচ্ছিষ্ট দান করার জন্যে দোযখবাসীরা সবিনয়ে নিবেদন করবে) (তখন) জান্নাতবাসীগণ জবাব দিয়ে বলবে, আল্লাহ পাক দোযখবাসীদের জন্যে দানা পানি হারাম করে দিয়েছেন"।

আর অন্য আয়াতে দোযখবাসীদের খাদ্য-দ্রব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۞ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۞ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ۞ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ۞ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۞ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۞

"নিশ্চয় জাক্কুম বৃক্ষই গুরুতর অপরাধী লোকদের (কাফের) খাদ্য হবে যা তেলের গাদের ন্যায় কুৎসিৎ হবে, যা উদরের মধ্যে ফুটতে থাকবে; যেভাবে উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে, (তখন ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম হবে) তাকে ধর, এরপর দোযখের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও। এরপর তার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢালতে থাক (তখন তাকে বিদ্রুপ করে বলা হবে) এবারে আস্বাদন কর, কারণ তুমিতো পৃথিবীতে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী ও বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলে। আর নিশ্চয় এটি সে শাস্তি যে সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে সন্দেহ পোষণ করতে"।

পবিত্র কোরআন শুধু পরকালীন জিন্দেগীর শাস্তির কথাই ঘোষণা করেনি; বরং যারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং অনুসরণ করবে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তাদের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে তার খোশখবরীও স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করে, তারা সেদিন থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান সমূহ এবং নহর সমূহের মাঝে। তারা সেদিন পরিধান করবে মসৃণ ও পুরু রেশমের পোশাক এবং তারা উপবিষ্ট হবে একে অন্যের সম্মুখীন হয়ে আর তা এভাবেই হবে। আর আমি তাদের বিয়ে করিয়ে দেব বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরীদের সঙ্গে, সেখানে নিঃশঙ্ক মনে, শান্ত চিত্তে তারা রকমারী ফল-ফলারী চেয়ে নেবে। আর সেখানে তারা সেই মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল আর কোন মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করবে না। (অর্থাৎ তারা চিরঞ্জীব হবে, লাভ করবে অমরত্ব) আর আল্লাহ পাক তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (হে রসূল!) এসবই আপনার প্রতিপালকের বিশেষ দান স্বরূপ। এটিই হলো মহান সাফল্য"।

এভাবে পবিত্র কোরআনের এক হাজার আয়াতে নেককার লোকদের জন্যে তথা–পরিণামদর্শী এবং আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণকারীদের জন্যে বেহেশতের খোশখবরী রয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা অপরিণামদর্শী, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি বিশ্বাস করেনা, যারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না, আর পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে লোভ ও মোহে অন্ধ হয়ে থাকে, এক কথায় গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাদের ভয়াবহ পরিমাণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের এক হাজার আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের পাঠক মাত্রকেই এ বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তিত এবং শঙ্কিত করে তোলে। এমনকি স্বয়ং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি কখনো কখনো হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলতেনঃ "আবদুল্লাহ! কোরআন তেলাওয়াত কর, আমি শ্রবণ করি"। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বিনীত ভাবে আরজ করতেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কোরআন তো আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আর আমি তা তেলাওয়াত করবো"? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে পুনরায় কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) যখন তেলাওয়াত শুরু করতেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো।

এ অবস্থা বহুবার হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন তার পাঠকের মনের উপর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সষ্টি করে, এ প্রতিক্রিয়া মানুষকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। কেননা,

আখেরাতের জিন্দেগী অবশ্যম্ভাবী এবং চিরস্থায়ী আর দুনিয়ার এ জিন্দেগী অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

الذنيا مدبرة والاخرة مقبلة

"দুনিয়া বিদায় গ্রহণকারী আর আখেরাত আগমনকারী"।

পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ, আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

"আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে আখেরাত সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ۞

"মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে হিসাব বিমুখ নীতি গ্রহণ করেছে"।

বস্তুতঃ আমরা প্রতিদিনই আখেরাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আসছি, যেভাবে জীবনের বিগত দিনগুলো আমরা পেছনে রেখে এসেছি, এ দিনগুলো ফিরে আসবে না আর কোনদিন, ঠিক তেমনি আমরা এ দুনিয়াকে পেছনে ফেলে আসছি, প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছি সম্মুখের দিকে-তথা আখেরাতের দিকে। বিগত দিনগুলো যেমন আমাদের সম্মুখে আসে না আর কোনদিন আসবেও না, ঠিক তেমনি এমন একদিন আসবে যখন এ পৃথিবীতে আমরা থাকব না, এ নীলাভ আকাশ, এ সবুজ ঘাষ আর কোন দিন দেখব না; এখানকার মলয় সমীরণ, হিমেল হাওয়া, বসন্তের দিনগুলো, দুনিয়ার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর তার প্রাচুর্য আমাদের মনকে আর আন্দোলিত করবে না; আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব যাদের ব্যতীত আমরা চলি না, চলতে পারি না, তারা কেউ আমাদের সাথী হবে না, আমরা হবো এক নতুন জগতের অধিবাসী। এখানকার আর কিছু নয়, শুধু সৎ কাজই হবে আমাদের একমাত্র সাথী, একমাত্র সম্বল, একমাত্র আশার স্থল।

نه قسمت ساته جائيگى نه دولت ساته جائيگى
نه عظمت ساته جائيگى نه صولت ساته جائيگى
جو كچه پوچه جائنگے محشر مين وه نيك افعال هين تيرے
جو كچه كام ائنگے وه نيك اعمال هين تيرے

বস্তুতঃ পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সমাগত, আর দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী দিবা-রাত্রির নামে বিদায়রত। পৃথিবীর এ মহা পান্থশালায় আমরা সামান্য কয়েক দিনের জন্যে অবস্থানরত। যে মুসাফির তার মঞ্জিল সম্পর্কে থাকে গাফেল, যে মুসাফির পথিমধ্যে পাওয়া দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে হয় ব্যস্ত, তার সফর অবশ্যই শেষ হবে কিন্তু মঞ্জিলের নেয়ামত থেকে হবে সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেননা এখানে পাওয়ার জন্যে তার নিকট কিছুই নেই সঞ্চিত, অতএব তার মত হতভাগা আর কেউ নেই।

ঠিক এমনিভাবে যারা আখেরাতের এ মহা সফর সম্পর্কে থাকে উদাসীন, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আরাম-আয়েশের জন্যে থাকে ব্যস্ত-মুগ্ধ, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

"অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে, আর এ গাফলত অব্যাহত থাকে তোমাদের সমাধিস্থ হওয়া পর্যন্ত"।

সত্যিকার ভাগ্যবান তারাই যারা গাফলতের এ অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হয়েছে, যারা আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) এমনি একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্র প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন আল্লাহর ওলী। যাঁর সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, ক্ষমতা পরিচালনা করার সময়ে তিনি প্রতি রাত্রে বাড়ীতে আসতেন এবং নামাযে রত হতেন আর সেজদা অবস্থায় ক্রন্দণ রত থাকতেন।

একবার তাঁর নিকট ইয়ামন থেকে সরকারী তহবিলের অর্থ সম্পদ হাযির করা হলো। এর সঙ্গে ছিল কিছু কস্তুরী, হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) ঐ কস্তুরী দেখা মাত্রই নাকে কাপড় দিয়ে রাখলেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলোঃ আপনি কস্তুরী দেখে নাক বন্ধ করলেন কেন? তিনি বললেনঃ কস্তুরী থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থা হলো তার সুগন্ধি গ্রহণ করা। সরকারী তহবিলের এ কস্তুরীর সুগন্ধ গ্রহণ করা আমার জন্যে বৈধ নয় বলেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করলাম, অন্যথায় আমাকে কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এজন্যে জবাবদিহী করতে হবে।

যাঁরা আল্লাহ ওয়ালা, তাঁরা এভাবেই আখেরাতের জিন্দেগীর প্রস্তুতি নিয়েছেন। যেমন, একবার খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রিকালে দফতরে বসে কাজ করছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যক্তিগত কথা বলবেন? নাকি জাতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন?

হযরত আলী বললেন, আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। হযরত ওমর (রাঃ) তখন জ্বলন্ত প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এমনটি কেন করলেন? হযরত ওমর (রাঃ) জবাব দিলেন, ব্যক্তিগত কাজের জন্যে সরকারী প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা যায় না।

বস্তুতঃ এটিই ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতি। কেননা, তাঁরা আখেরাতের জিন্দেগীতে সুখ-শান্তি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। তাই প্রতিটি কাজের আগেই এ চিন্তা করতেন যে, এ কাজটি আখেরাতের জিন্দেগীর জন্যে উপকারী? না অপকারী, তাঁরা অপকারী কাজ থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। যাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা করেছেন, যাঁরা পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন; এটিই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য।

একবার হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) একটি জানাজার পেছনে চলছিলেন, যখন কবরস্থান নিকটবর্তী হলো তখন তিনি একটি কবরের পার্শ্বে দন্ডায়মান হলেন। অনেকক্ষণ বিলম্ব করে জানাজার নিকট উপস্থিত হলে একজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার একান্ত আপন জনের জানাজা, অথচ আপনি অনুপস্থিত।

তখন হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) জবাব দিলেনঃ আমি বিলম্ব করতে চাইনি, কিন্তু আমার পেছন থেকে একটি কবর আমাকে ডাক দিয়ে বললোঃ তুমি কি তোমার হারানো বন্ধুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে না? আমি তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছি? তখন আমি বললামঃ কি করেছ তাদের সঙ্গে? কবর বললোঃ আমি তদের কাফন ছিড়ে ফেলেছি, তাদের দেহকে চিবিয়ে ফেলেছি, রক্ত চুষে ফেলেছি এবং গোশ্‌ত হজম করেছি।

এরপর কবর আমাকে জিজ্ঞাসা করলোঃ আমি তাদের দেহের জোড়াগুলো কি করেছি জিজ্ঞাসা করলে না? আমি বললামঃ কি করেছ? কবর বললোঃ আমি তাদের হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গের জোড়াগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। এ পর্যন্ত কথা বলে হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) ক্রন্দণ করতে লাগলেন এবং বললেনঃ "সত্যিই দুনিয়ার এ জীবনের সময় অত্যন্ত সীমিত এবং সামান্য। আর দুনিয়ার অন্বেষণকারীর অপমান অবধারিত, এখানকার আমীর অবশেষে হয় ফকীর, যুবক অবশেষে হয় বৃদ্ধ, আর এখানে জীবিতকে হতে হয় মৃত্যুমুখে পতিত"।

অতএব, এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য, এ জীবন এবং জীবনের আনন্দ যেন কাউকে প্রতারিত না করে, কেননা অবশেষে প্রত্যেককে পাড়ি জমাতে হবে পরপারে, সমবেত হতে হবে হাশরের ময়দানে, জবাবদেহী করতে হবে জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর এবং জীবনের সৎ কর্ম সমূহের জন্যে পুরস্কার আর অন্যায় কার্যাবলীর

জন্যে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। জীবনের এ মমার্থ উপলব্ধি করেই মুক্তি পিয়াসী, কল্যাণকামী তথা আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের বক্তব্য ছিল এইঃ

یہ سرائے دھر مسافر وبخدا کسی کا مکان نہین
جو کل اس مین تھے مقیم کھین آج انکا نشاں نہین

"হে মুসাফিরের দল! আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি এ পৃথিবী কারো স্থায়ী আবাস স্থল নয়। যে গতকালও ছিল এ পৃথিবীর অধিবাসী, আজ তার স্মৃতি চিহ্নটুকুও নেই"।

জীবনের এ নির্মম বাস্তবতাকে যারা উপলব্ধি করে না, বা উপলব্ধি করেও স্বীকার করে না এবং পরকালীন জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাস করে না, বা বিশ্বাস করেও তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে না তাদেরকে আর যাই বলা যাক পরিণামদর্শী বলা যাবে না, তারা পবিত্র কোরআনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। এমনকি, এসব লোককে পবিত্র কোরআন বিবেকবান লোক বলেও স্বীকার করে না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

"যে মিল্লাতে ইব্রাহীম থেকে বিমুখ হয়েছে, সে নির্বোধ বা বোকা ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

যে নির্বোধ বা বোকা, শয়তান শুধু তাকেই কাবু করতে সক্ষম হয়। আর যখন মানুষ শয়তানের হাতে কাবু হয়ে যায় তখন এ পৃথিবীর সব কিছুই তার কাছে স্থায়ী মনে হয় এবং পরকালের কথা সে ভুলে যায়। আদৌ সে একথা স্মরণ করে না যে, তাকে একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে, বিদায় গ্রহণ করতে হবে এখান থেকে চিরতরে, তখন সে আত্মবিস্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করে। এ অবস্থাটা মানুষের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেননা সাধারণতঃ তার আত্মবিস্মৃতি কাটে না, ফলে আত্মোপলব্ধি আসে না, পরিণাম স্বরূপ আত্মসংশোধন ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ সে পায় না। এ অবস্থায় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে চিরদুঃখী হওয়া ব্যতীত আর কোন গতিও থাকে না।

পবিত্র কোরআন এ অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই দুস্কৃতকারী"।

এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা মধ্য-পন্থা অবলম্বনের তাগিদ করেছেন, যেমন একজন বুজর্গ বলেছেনঃ

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

"দুনিয়াতে বাস করি তবে দুনিয়ার লোভী নই আমি, এ বাজারের পথ অতিক্রম করি তবে এর ক্রেতা নই আমি"।

একবার খলীফা হারুন-অর-রশীদ সে যুগের বুজুর্গ হযরত বাহলুল দানা (রঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরজী পেশ করলেনঃ হুজুর আমাকে কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেনঃ

يا نفس لا تغرر بتنعم + فالعمر ينفد والنعم يزول
اذا حملت جنازه الى قبر + فاعلم انك بعدها محمول

"দুনিয়ার আনন্দ–উল্লাসে, আরাম–আয়াশে প্রতারিত হয়োনা, কেননা এ জীবনের অবসান ঘটবে এবং আনন্দ-সামগ্রীও নিঃশেষ হবে। যখন কোন জানাজা বহন করে কবরস্থানের দিকে গমন কর তখন একথা মনে রেখ যে, এরপর এভাবে তোমার জানাজাও বহন করা হবে"।

বস্তুতঃ একথা যদি কেউ স্মরণ রাখে তবে তার এ জীবন গড়ে উঠতে পারে সঠিকভাবে আর পরজীবনের জন্যে সে প্রস্তুতি নিতে পারে।

আজকের সমাজ জীবনে যে নৈতিক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, যেভাবে অশান্তি, অকল্যাণ, উপদ্রব, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, হিংস্রতা, উচ্ছৃংখলতা এবং জুলুম-অত্যাচার বিদ্যমান রয়েছে, অনতিবিলম্বে এ অবস্থার অবসান না ঘটলে এ পৃথিবী আর মানুষের বাসোপযোগী থাকবে না। অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। মানব জাতির ইতিহাস বদলে যাচ্ছে। বিষাক্ত হিংস্র জন্তুও আজ এত হিংস্র নয়, যতখানি হিংস্র হয়েছে মানুষের জন্যে স্বয়ং মানুষ। এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে যদি মানুষের মনে আখেরাত বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিন্তা প্রবেশ করে।

এর জন্যে প্রয়োজন পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার ব্যাপক প্রচার, প্রসার এবং বাস্তবায়নের।

দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ মাত্রকেই এ মহা সত্য উপলব্ধি করতে হবে এবং বিশ্ব সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা পবিত্র কোরআনের হেদায়েত ব্যতীত যে আদৌ সম্ভব নয়, একথা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত,

আর এ সত্য সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত। অতএব, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা শুধু আমাদের প্রধানতম কর্তব্যই নয়; বরং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত করণীয় কাজ। কবি বলেছেনঃ

اے کہ می نازی بقران عظیم + تا کجا در حجرہ باشی مقیم
در جہان اسرار دین رافاش کن + نکتہ شرع مبین رافاش کن

"তোমরা যারা গৌরবান্বিত মহান কোরআন নিয়ে,
আর কতকাল হুজরায় থাকবে বসে অলস হয়ে।
সারা জাহানে ইসলামের দামামা বাজিয়ে দাও,
দিকে দিকে কোরআনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও"।

অতএব, পবিত্র কোরআনের মূল কথা হলো, আল্লাহর প্রেরিত রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস কর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ নিষ্ঠা ভরে অনুসরণ কর, সকল মানুষের সাথে সুবিচার ও উপকারের সম্পর্ক গড়ে তোল। জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার পরিহার কর। কলহ-দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও স্বার্থপরতা বর্জন কর, ধৈর্য, সহনশীলতা, উদারতা, মহানুভবতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, একতা, মমতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির নীতি অবলম্বন কর, মানুষের উপকার কর, আল্লাহর বন্দেগী কর, ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির সকল প্রচেষ্টার সাথে সাথে সমাজ ও জাতীয় জীবনের যাবতীয় কর্তব্য পালন কর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন কর, অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করোনা, কার্পণ্য ও অপব্যয় উভয় পথই অন্যায়; তাই মিতব্যয়ী হও। মিথ্যা, ধোঁকা মানবতা বিরোধী কাজ, তাই এসব পরিত্যাগ কর। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, এ জীবনের পর আসবে আরও একটি জীবন, সে জীবনে মানুষ লাভ করবে তার কর্মফল। অতএব, পরজীবনের চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভের জন্যে কোরআনের বিধি-নিষেধ পালন কর। বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, সমাজ ও জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তন এনেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর।

সমাজ জীবনে পবিত্র কোরআন

পবিত্র কোরআনের বৈপ্লবিক শিক্ষার কারণে মানব জীবনের অন্যান্য স্তরের ন্যায় সমাজ জীবনেও যে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দেয় তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। যে সমাজে কলহ-দ্বন্দ্ব, ফ্যাসাদ, এমনকি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ইতিহাস সাক্ষী! আরবের আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যে যুদ্ধের

সূত্রপাত হয়েছিল, তা প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যে সমাজ অধঃপতনের এমনি নিম্নস্তরে পতিত ছিল তাকে পবিত্র কোরআন সম্বোধন করে বললোঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

(সূরা আলে-এমরান)

"এবং তোমরা একত্রিত হয়ে সুদৃঢ় ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর আর কোন অবস্থাতেই দলাদলি করোনা"।

এমনিভাবে ইসলামী সমাজে পরস্পরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۞

(সূরা হুজুরাত)

"মোমেনগণ পরস্পরের ভাই ভাই-ই, অতএব তোমরা ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর। হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে"।

পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষার যে প্রতিক্রিয়া তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয় তা হচ্ছে এই যে, একজন আরেক জনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে হয়ে পড়ে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। আত্মত্যাগ, কোরবাণী, সুবিচার ও পরোপকারের মহান আদর্শে সকলেই হয় উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত।

যে সমাজ মানবতার চরম অধঃপতনের নিদর্শন, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিল, যারা জড় পদার্থ, বৃক্ষ, তরুলতা এমনকি নিজের হাতে গড়া বস্তুর সম্মুখে মাথা নত করতে অভ্যস্ত ছিল, যারা নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, মানবতার কণ্ঠরোধ করতে, মানুষের চরম অবমাননা ও শোচনীয় অধঃপতনেরও যাদের মনে এতটুকু দাগ কাটেনি, এমনি একটি পথভ্রষ্ট সমাজের নিকট পবিত্র কোরআন তওহীদের বাণী প্রচার করলো।

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করলোঃ হে মানুষ! আত্মবিস্মৃত হয়োনা, তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবাধ্য হয়োনা, তোমাদের স্রষ্টা এক আল্লাহ তাআলা, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, সমস্ত প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য। অতএব, তাঁকে ভিন্ন আর কারো বন্দেগী করোনা।

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার পর পৌত্তলিক সমাজে এলো এক নতুন বিপ্লব, সকলেই এক আল্লাহর বন্দেগী করতে আরম্ভ করলো, মানুষের এ জীবন এবং জীবনের যাবতীয় কাজ এমনকি, মরণ পর্যন্ত এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, এ বিশ্বাস সকলের মধ্যে বদ্ধমূল হলো। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুনঃ নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার সকল এবাদত, আমার জীবন ও মরণ এক কথায় সব কিছুই এক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে"।

নারী অধিকার সংরক্ষণে

একদিন যে সমাজে নারীর কোন স্থান ছিল না, নারীকে মনে করা হতো সকল পাপের মূল উৎস, দুর্ভাগ্যের মূল কারণ, এমনি অবস্থায় পবিত্র কোরআন অসহায় নারীর প্রকৃত মর্যাদার কথা ঘোষণা করলোঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"নারী হলো তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা হলে তাদের ভূষণ"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ জীবনে নারী পেলো তার যোগ্য স্থান, পেলো নির্দিষ্ট উচ্চ মর্যাদা।

মানবীয় সমতা ও মর্যাদা রক্ষায়

যে সমাজে অসাম্য, অসমতা, অকল্যাণ ছিল সর্বত্র বিরাজমান, মানুষের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা এমনকি, প্রাণের পর্যন্ত যে সমাজে কোন মর্যাদা বা মূল্য ছিল না; বর্ণ, বংশ, গোত্র এবং এমনি ধরণের অন্যান্য কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং বৈষম্য ছিল যে সমাজের বৈশিষ্ট্য, সে সমাজকেই পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত করলো। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করলোঃ দুনিয়ার সকল মানুষ এক আদম সন্তান অতএব, সকলেই এদিক থেকে সমান মর্যাদার অধিকারী।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন এ ঘোষণার মাধ্যমে মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে সাম্য-মৈত্রী, দিয়েছে সত্যিকার মর্যাদার অনুভূতি। সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুবিচার ও পরোপকারের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব-মানবের চেহারা থেকে সকল কলঙ্ক মুছে দিয়েছে। ঘুমন্ত তন্দ্রাহত মানুষকে জাগ্রত করেছে। মরণোন্মুখ মানুষকে নব জীবন দান করেছে। পবিত্র কোরআনের বৈপ্লবিক শিক্ষায় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে একটা সুখী

সমৃদ্ধশালী মানব গোষ্ঠী; একটা নতুন জাতি যারা পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিয়েছে, যারা কায়েম করেছে বিশ্ব-শান্তি।

বস্তুতঃ বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের এ প্রাণশক্তি আজও রয়েছে বিদ্যমান, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা শাশ্বত, সক্রিয়, চিরন্তন, চিরনির্ভুল এবং চিরসত্য।

পবিত্র কোরআন আজও বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম।

তাই সকল যুগে, সকল দেশ ও পরিবেশে, সকল ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ ও তফসীর করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন চর্চার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো পবিত্র কোরআন পাঠ করা, এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলা।

ফাজায়েলে কোরআন

পবিত্র কোরআনের ফজিলত বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত, তাই এ পর্যায়ে কয়েকখানি হাদীস পেশ করা হচ্ছে যা পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকেও তা শিক্ষা দেয়। (বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী এবং এবনে মাজা শরীফ)

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো এই, যে ব্যক্তি কোরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ আমার জিকর করা এবং আমার সমীপে দোয়া করার অবসর পায় না তাকে ঐসব লোকদের চেয়ে অধিক কিছু দান করে থাকি যারা দোয়া করে থাকে"। আর অন্যান্য সকলের কথার (বা গ্রন্থের) তুলনায় আল্লাহ পাকের কালামের (কোরআনের) মর্যাদা হলো সেরূপ যেমন সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহ পাকের মর্যাদা। (তিরমিজী শরীফ)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাদের চাওয়ার প্রয়োজন হয়না, আল্লাহ পাকই তাদের প্রয়োজনের আয়োজন করেন। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তারাই আল্লাহর দানে ধন্য হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক এ কিতাবের দ্বারা অনেক জাতিকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করেছেন। পক্ষান্তরে, এ কিতাবের কারণে অনেককে অধঃপতিতও করেছেন। (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ ও বরণ করেছে, তারা উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে গাফলত করেছে, তারা অপমানিত এমনকি, অধঃপতিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাক্ষাত লাভের আশা রাখে সে যেন আল্লাহর 'আহল'কে সম্মান করে। তখন আরজ করা হলো–ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাকের কি কোন 'আহল' আছে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ! আরজ করা হলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আহলুল্লাহ কারা? তিনি এরশাদ করলেনঃ দুনিয়ায় আল্লাহর আহল হলো তারা, যারা কোরআন পাক পাঠ করে থাকে। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি তাদের সম্মান করবে আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে আল্লাহ পাক তাকে লাঞ্ছিত করবেন এবং দোযখে নিক্ষেপ করবেন। হে আবু হোরায়রা! কোরআন ধারণকারীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আল্লাহ পাকের দরবারে আর কেউই নাই। জেনে রাখ কেবল মাত্র নবীগণ ব্যতীত আল্লাহর কাছে কোরআনকে ধারণকারী ব্যক্তি সকলের চেয়ে উত্তম।

বস্তুতঃ এই হাদীসের উপর আমল করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম। প্রসঙ্গতঃ এখানে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)–এর একখানি চিঠির উদ্ধৃতি দেয়া যায়, তিনি তাঁর নিযুক্ত সেনাপতিদের নামে লিখেছিলেনঃ

"কোরআনে পাকের হাফেজগণের নামের তালিকা আমার নিকট প্রেরণ করুন, যেন তাদের বৃত্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা যায়-তারা মানুষকে কোরআন শিক্ষা দান করবে"।

তখন হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) লিখলেন, "আমার নিকট হাফেজের সংখ্যা তিন শ'য়ের কিছু বেশী হবে"।

হযরত ওমর (রাঃ) সেই হাফেজগণের উদ্দেশ্যে লিখলেনঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বন্দা ওমর (রাঃ)-এর তরফ থেকে আবদুল্লাহ বিন কায়স এবং তার সঙ্গী যারা কোরআনের হাফেজ রয়েছেন তাদের প্রতি এই চিঠি। আসসালামু আলায়কুম। অতঃপর কথা এই যে, কোরআন পাকের দরুণ আপনাদের পুরস্কার রয়েছে, এটা আপনাদের মর্যাদা এবং সম্পদের ভান্ডার হবে। আপনারা এর অনুসরণ করুন কিন্তু কোরআন যেন আপনাদেরকে অনুসরণ না করে, কারণ কোরআন যখন কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করেছে কোরআ ন তখন তাকে প্রচন্ড আঘাত হেনেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোরআনকে

অনুসরণ করবে কোরআন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে পৌঁছে দেবে। অতএব, এমনভাবে চলুন যেন (কেয়ামতের দিন) কোরআন আপনাদের জন্যে সুপারিশ করে। যার জন্যে কোরআন সুপারিশ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কোরআন যার বিরুদ্ধে নালিশ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আপনাদের একথা জানা দরকার যে, কোরআন হেদায়েতের ঝর্ণা-ধারা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর। এর দ্বারা আল্লাহ পাক অন্ধ চোখে জ্যোতি ফুটিয়ে তোলেন, বধির কানে শ্রবণ শক্তি প্রদান করে থাকেন এবং অন্তর সমূহে পড়ে থাকা পর্দা পরিস্কার করে থাকেন। আর আপনাদের একথাও জানা দরকার যে, বন্দা যখন রাত্রিকালে গাত্রোত্থান করে এবং মেসওয়াকসহ অজু করে, অতঃপর আল্লাহু আকবর বলে এবং কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন ফেরেশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রেখে দেয় এবং বলতে থাকে– "তেলাওয়াত কর, তেলাওয়াত কর, তুমি কত ভাল, -সুতরাং যা কিছু মঙ্গল তোমার জন্যে রয়েছে"। আর যদি মেসওয়াক না করে শুধু অজু করে তবে ঐরূপ করে না; শুধু হেফাযত করতে থাকে। জেনে রাখুন, নামাজের মধ্যে কোরআন পাঠ করা এক রক্ষিত সম্পদ এবং মঙ্গলময় বস্তু। যত বেশী সম্ভব হয় এ কাজটি করতে থাকুন। কারণ এই নামাজ হলো 'নূর' এবং যাকাত হলো 'দলিল'। আর সবর হলো আলো এবং রোযা ঢাল। কোরআন হয় আপনাদের উপকারের জন্যে বিতর্কে লিপ্ত হবে না হয় আপনাদের ক্ষতির জন্যে 'হুজ্জত' করবে। সুতরাং আপনারা কোরআনে পাকের তা'যীম করুন এবং কখনো এর অমর্যাদাকারী হবেন না, কারণ যে ব্যক্তি কোরআনে পাকের তা'যীম করে থাকে, আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করে থাকেন এবং যে ব্যক্তি কোরআনে পাকের অমর্যাদা করে থাকে আল্লাহ পাক তাকে লাঞ্ছনা দিয়ে থাকেন। আপনাদের একথা জানা দরকার যে, যে ব্যক্তি এই কিতাব তেলাওয়াত করবে, হেফয করবে, এর কথার উপর আমল করবে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনুসরণ করে চলবে সে ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে দুনিয়াতেই তা অতি সত্বর দিয়ে দেন আর না হয় আখেরাতে তা সঞ্চিত ভান্ডার রূপে থেকে যায়। আর আপনাদের জানা উচিৎ যে, আল্লাহ পাকের কাছে যা কিছু জমা রয়েছে তা উত্তম বস্তু এবং সেগুলো তাদের জন্যে অবশিষ্ট থাকবে যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ (কেয়ামতের দিন) কোরআন পাক ধারণকারীকে বলা হবে, "কোরআন পাঠ করতে থাক এবং বেহেশতের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপরের দিকে আরোহণ করতে থাক, আর বিরতি দিয়ে পাঠ করতে থাক, যেরূপ দুনিয়াতে বিরতি দিয়ে দিয়ে পাঠ করতে, কারণ তোমার তেলাওয়াত যে

আয়াতে গিয়ে শেষ হবে সেখানেই হবে তোমার মঞ্জিল"। (আহমদ, তিরমিজী, আবুদাউদ, নাসায়ী এবং এবনে মাজা শরীফ)

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বেহেশতে উচ্চ মর্তবা পাওয়ার মাধ্যম হলো পবিত্র কোরআন।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পড়বে তার জন্যে সে একটি নেকী পাবে আর সেই নেকীটি হবে দশটি নেকীর সমান। আমি বলছি না 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। (তিরমিজী শরীফ)

পবিত্র কোরআন পাঠ করলে যে নেকী পাওয়া যায়

এই হাদীসের আলোকে আমরা যদি পবিত্র কোরআনের অক্ষর সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখব– পবিত্র কোরআনের অক্ষর সংখ্যা তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত তেত্রিশ (৩,৩৬,২৩৩), সমগ্র কোরআনে বিসমিল্লাহ'র অক্ষর দু' হাজার তিনশত তিয়াত্তর (২,২৭৩), যেহেতু প্রত্যেক অক্ষরের তেলাওয়াতে দশ নেকী পাওয়া যায় তাই একবার পবিত্র কোরআন পাঠ করলে তেত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার ষাট (৩৩,৮৬,০৬০) নেকী পাওয়া যায়।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন এরশাদ করলেনঃ কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে হবে, তোমরা কি জানতে চাও? সকলে জবাব দিলেন, নিশ্চয় ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তখন তিনি এরশাদ করলেন, যারা কোরআনে পাক পাঠ করে থাকে, যখন কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ "হে জিব্রাঈল! হাশরের মাঠে এই বলে আহবান কর, "যারা কোরআন পাঠ করেছ তারা উঠে পড়"। এরপর এভাবে দু' তিন বার আহবান করা হবে। সবাই উঠে কাতারে কাতারে আল্লাহ পাকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। কেউ কথা বলবে না। এমন সময় আল্লাহর এক নবী দাউদ (আঃ) দাঁড়াবেন। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, "তোমরা সবাই পবিত্র কোরআন পাঠ কর এবং তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ কর"। তখন প্রত্যেকেই আল্লাহর কালাম থেকে ঐসব আয়াত পড়তে শুরু করবে, যা আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে এলকা করবেন। আর প্রত্যেকে যত পড়তে থাকবে, পড়ার সুন্দর আওয়াজ, মধুর ভঙ্গি, শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়, ধ্যান এবং চিন্তার গভীরতা অনুপাতে বেহেশতে তাদের স্তর উন্নততর হতে থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, "হে আমার আহলগণ! দুনিয়ার জীবনে তোমাদের অধিক উপকারী কাউকে চিনতে পার কি"? তখন তারা বলবে, "হ্যাঁ, হে

আমাদের রব"। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ "যাও, হাশরের মাঠে (ছড়িয়ে পড় এবং) যাকে যাকে এহসানকারী হিসেবে চিনতে পার, প্রত্যেকেই তোমাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

হযরত মাআয জুহনী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি কোরআনে করীম পাঠ করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে, কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন একটি মুকুট পরানো হবে যার কিরণ সূর্য গৃহে প্রবেশ করলে যেমন আলোকময় দেখা যায় তার চেয়ে অধিক কিরণযুক্ত হবে। এখন তাদের সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছো যারা এই কোরআনের উপর আমল করে থাকে?

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করেছে এবং হেফয করে নিয়েছে, এরপর সে অনুযায়ী হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করতে দেবেন যাদের জন্যে দোযখ নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি অন্তরে কোরআন পাকের সামান্যতম অংশও নাই সে ব্যক্তিটি যেন একটি বিরাণ বাড়ী।

হযরত আবু যর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি একবার আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে কিছু নছিহত করুন। তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি দৃঢ়ভাবে তাকওয়া অবলম্বন কর; কারণ তা হলো সব কিছুর মূল"। আমি বললাম-"আরও কিছু নির্দেশ করুন"। তিনি এরশাদ করলেন, "কোরআন পাকের তেলাওয়াত কর, কারণ এটি দুনিয়াতে তোমার নূর এবং পরকালে তোমার সম্পদ"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাকের গৃহ সমূহের মধ্যে যেখানে লোকজন জমায়েত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর তারা পাঠ বিনিময় করে, সেসব ঘরের লোকজনের উপর সাকীনা বা শান্তি নাযিল হয়ে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে, ফেরেশতা সকল তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখে এবং আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ঐসব ফেরেশতাদের কাছে আলোচনা করে থাকেন যারা তাঁর নিকটে আছে।

হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর নৈকট্য

লাভের জন্যে তোমরা সে বস্তুর চেয়ে অধিক উপযোগী আর কোন বস্তু পেতে পার না, যা তাঁর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন পাক।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

মূলতঃ সকল এবাদতের মধ্যে কোরআন শরীফের তেলাওয়াতই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ নামাজের সময় দন্ডায়মান হয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ করা আরও উত্তম। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমার উম্মতের এবাদত সমূহের মধ্যে কোরআন শরীফ পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম এবাদত"। তিনি আরও বলেছেন, "খোদা তাআলা যাকে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের তওফিক দান করেছেন সে ব্যক্তি যদি বিবেচনা করে, অপরকে তার চাইতে উৎকৃষ্ট নেয়ামত দেয়া হয়েছে তবে সে ব্যক্তি খোদা তাআলার প্রিয় বস্তুকে হেয় জ্ঞান করলো"। অন্য এক সময় তিনি বলেছেন, "মানুষের হৃদয়ে লোহার মরিচার ন্যায় মরিচা ধরে"। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তা কিভাবে দূরীভূত হয়"? তদুত্তরে তিনি এরশাদ করেছেনঃ "কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ও মৃত্যুর স্মরণ, এ দু'টি উপায়ে সে মরিচা দূর হয়"।

তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ আমি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবো বটে, কিন্তু তোমাদের নিকট দু'জন উপদেশক রেখে যাচ্ছি, তারা তোমাদেরকে সর্বদা উপদেশ ও নীতি শিক্ষা দিতে থাকবে। সে উপদেশ দু'টির মধ্যে একটি হলো সরব, অন্যটি নীরব। "সরব" অর্থাৎ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, আর "নীরব" অর্থাৎ মৃত্যু চিন্তা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, কোরআন শরীফ পড়, কেননা এর প্রত্যেক হরফের পরিবর্তে দশ দশটি পূণ্য লাভ হয়ে থাকে।

তৌরাত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খোদা তাআলা বলেন, "হে আমার বন্দা! তোমার কি লজ্জা হয় না? যে সময়ে তুমি পথে চল এমন সময় যদি তোমার কোন ভ্রাতার নিকট থেকে একখানি পত্র তুমি প্রাপ্ত হও, তবে নিশ্চয় তুমি পথ চলায় ক্ষান্ত হয়ে পথ প্রান্তে নিবিষ্ট মনে পত্রখানির প্রত্যেক অক্ষর ও প্রত্যেক শব্দ পড়বে এবং তার অর্থ বিশেষভাবে প্রণিধান করে হৃদয়ঙ্গম করবে। কিন্তু দেখ আমার এ গ্রন্থ আমার একখানি হুকুম নামা সদৃশ তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা প্রণিধান করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু তোমরা অস্বীকার কর আর সে অনুযায়ী কাজ কর না"।

হাদীস শরীফে আছে, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ার সময় দেখে যে, তার বাড়ীর জানোয়ার লাফ দিচ্ছে, তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেনঃ একখানা মেঘখন্ড। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে

জানালে তিনি এরশাদ করলেনঃ তা ছাকীনা (অপূর্ব শান্তি) যা কোরআন তেলাওয়াতের সময় নাযিল হয়েছে।

এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি সূরা এখলাসকে অত্যন্ত ভালবাসি"। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এ সূরার মহব্বত তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে"।

একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে রাত্রিকালে এক তৃতীয়াংশ কোরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম?"

সাহাবাগণ আরজ করলেন, "কিভাবে এক ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ কোরআন পড়তে পারে"? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সূরা এখলাস পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি অন্তর আছে, কোরআনের অন্তর হলো সূরা ইয়াসিন; যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তাঁর সুমহান প্রতিদান স্বরূপ দশবার কোরআন খতমের সওয়াব দেবেন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিনকে দিনের প্রথম ভাগে পড়বে, আল্লাহ পাক তাঁর সকল প্রয়োজনের আয়োজন করবেন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসিনকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পড়ে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তোমরা মুর্দাদের নিকট তা তেলাওয়াত কর।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ পবিত্র কোরআনে ত্রিশ আয়াতের সমান একটি সূরা আছে যা পাঠকের জন্যে সুপারিশ করবে এবং তার গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর তা হলো সূরা মুলক। নামাজের মধ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করা অপেক্ষা শ্রেয়। নামাজের বাইরে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত তছবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠ করা অপেক্ষা ভাল। তছবীহ, তকবীর পাঠ, দান খয়রাত অপেক্ষা ভাল, দান খয়রাত নফল রোজা অপেক্ষা ভাল এবং রোজা দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবার ঢাল।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে সূরা এখলাস পড়তে শুনে এরশাদ করলেন, "তুমি ওয়াজিব করলে"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বস্তু ওয়াজিব করলাম"? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "বেহেশত"।

একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ (রাঃ)–কে বললেন, তুমি সূরা এখলাস, ফালাক এবং নাস সকালে ও সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি সূরা যদি

তিনবার করে পড় তবে তোমার জন্যে সকল প্রকার আপদ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে যথেষ্ট হবে। প্রত্যেক বস্তুর এক একটা সৌন্দর্য আছে এবং কোরআনের সৌন্দর্যটি সূরা আর-রাহমান।

যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা আল-ওয়াকেয়াহ পড়বে, তার কখনও খাদ্যাভাব আসবে না তথা অভাবগ্রস্ত হবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরছি পাঠ করবে তার বেহেশত প্রবেশে মৃত্যু ব্যতীত আর বাধা থাকেনা। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াত শয়নকালে পাঠ করবে, তার বাড়ী-ঘর ও তার আশ-পাশের বাড়ী-ঘর নিরাপদ থাকবে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার অশেষ ফজিলত ও বরকত রয়েছে বলেই সাহাবায়ে কেরাম কোরআনে করীমের তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করেছিলেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হাফেজের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, শুধু পুরুষ নয়, মহিলাদের মধ্যেও পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত এবং হেফযের উৎসাহ ছিল অনেক বেশী। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৭ দিনে এক খতম করতেন, হাদীস শরীফে তার প্রমাণ রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত তমীমদারি (রাঃ) এক রাকাআতে পবিত্র কোরআন শরীফ খতম করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) এক রাতে কোরআন শরীফ খতম করতেন।

হযরত সা'আদ এবনুল মনযর এবনে আওস তিন দিনে কোরআন শরীফ খতম করতেন।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত কায়েস এবনে সাআসাআকে (রাঃ) এক সপ্তাহে কোরআন শরীফ খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যিনি চল্লিশ বছর যাবত এশার অজু দ্বারা ফজরের নামাজ আদায় করেছেন, তিনি প্রতি রমজানে ৬১ বার কোরআন শরীফ খতম করতেন আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রতি রমজানে ৫৯ বার কোরআন শরীফ খতম করতেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জমানায় কোরআন শরীফের তেলাওয়াত করা ছিল মর্যাদা লাভের উপকরণ। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবায়ে কেরামকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন, দলের সিপাহসালার নির্বাচনের জন্যে তিনি প্রত্যেকের কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ

করলেন। অবশেষে তিনি অল্পবয়স্ক একজন সাহাবীকে সিপাহসালার নির্বাচন করলেন কেননা, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কোরআন শরীফ তাঁরই অধিক পরিমাণে কণ্ঠস্ত ছিল।

হযরত ওসমান এবনে আবিল আস (রাঃ) কোরআন শরীফ সুন্দর তেলাওয়াত করতেন, এজন্যে তাঁকে তায়েফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যিনি কোরআন শরীফ অপেক্ষাকৃত ভাল তেলাওয়াত করতেন তাঁকেই নামাযের ইমাম, দলের নেতা নির্বাচন করা হতো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন কেউ ইসলাম কবুল করতো তখন তিনি তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের নিকট অর্পণ করে বলতেন, তাকে কোরআন শরীফ শেখাও। এভাবে তখন প্রত্যেকটি মুসলমান পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী হতেন। পবিত্র কোরআন হেফয করতেন, নিজে শিখে অন্যকে শেখাতেন; পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে তার উপর আমল করতেন এবং পবিত্র কোরআনের পয়গাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার মহান ব্রত গ্রহণ করতেন।

বস্তুতঃ বিশ্ব-সভায় মুসলিম জাতির অভ্যুত্থানের প্রাণ শক্তিই ছিল পবিত্র কোরআন।

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خار ہوے تارك قران ہو کر

"সে যুগে তারা মুসলমান হিসেবেই ছিলেন সম্মানিত

আর তোমরা পবিত্র কোরআন ভুলে গিয়ে হয়েছ অপমানিত"।

পবিত্র কোরআনের তফসীর প্রসঙ্গে

পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা করার জন্যে আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া পূর্বশর্ত। আরবী ভাষার ব্যাকরণ, ভাষার অলংকার, এ ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং ভাষার বিশেষ ভঙ্গী সম্পর্কে অবগত হওয়া একান্ত জরুরী। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ শুধু আরবী ভাষায় পারদর্শী হলেই পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া সম্ভব নয়, কেননা কোরআনের একটি অংশ আরেকটি অংশের ব্যাখ্যা করে থাকে তথা এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াতের তফসীর হয়।

অতএব, পবিত্র কোরআনের কোন একখানি আয়াতের তফসীর করতে হলে পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে এবং অন্যান্য আয়াত

সমূহের মহান শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। যাতে করে এক আয়াতের এমন ব্যাখ্যা না হয় যা অন্য আয়াতের মর্ম বিরোধী।

তৃতীয়তঃ শুধু পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেই পবিত্র কোরআনের তফসীর করা সম্ভব হয়না; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান হাদীস সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি এই পবিত্র কোরআন বিশ্ব-বাসীর নিকট নিয়ে এসেছেন, তাই তিনি পবিত্র কোরআনের প্রথম তফসীরকার, এ পর্যায়ে তাঁর ব্যাখ্যাই সর্বশেষ কথা। অতএব, তাঁর মহান বাণী তথা হাদীস শরীফ সম্পর্কেও প্রচুর জ্ঞান অর্জন করা পবিত্র কোরআনের তফসীর করার জন্যে একান্ত কতব্য। কেননা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যেন তিনি মানুষের নিকট পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা করেন, যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

"এবং (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি কোরআন মজীদ এজন্যে নাযিল করেছি, যেন আপনি মানুষের সম্মুখে তার ব্যাখ্যা বা তফসীর বর্ণনা করেন যা তাদেরই জন্যে নাযিল করা হয়েছে"।

শুধু তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও এরশাদ হয়েছে যে, তিনি মানব জাতিকে আল্লাহর কিতাব কোরআনে করীমের শিক্ষা দান করবেন; যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

"আল্লাহর রসূল মানুষকে কিতাব এবং হেকমত শিক্ষা দেবেন"।

বস্তুতঃ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী বা হাদীস শরীফ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত পবিত্র কোরআনের তফসীর করা সম্ভব নয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআনের কোন আয়াতের তফসীর করার প্রকৃত অর্থ হলো, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক কি বলতে চেয়েছেন তা প্রকাশ করা। আর আল্লাহ পাক যা বলতে চেয়েছেন তা শুধু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই বলতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"আল্লাহর নবী নিজের ভাবাবেগে কিছুই বলেন না, (তিনি শুধু তাই বলেন) যা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে ওহী রূপে নাযিল হয়"।

নিজস্ব মতানুসারে তফসীর

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের তফসীরে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার কোন সুযোগ নেই; বরং এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

من قال فى القران بغير علم فليتبوا مقعده من النار

"যে ব্যক্তি কোরআনের ব্যাপারে সঠিক এলম ব্যতীত কোন কথা বলে, সে যেন দোযখে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

من تكلم فى القران برايه فاصاب فقد اخطا

"যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে নিজস্ব মতকে প্রকাশ করে সে যদি সঠিক কথাও বলে থাকে, তবুও সে ভুল করেছে"।

অতএব, পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার কোন সুযোগই নেই এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য।

এজতেহাদের অনুমতি

এখানে আরও উলেখ্য, তত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ কোন কোন চরমপন্থী বিদ্বান ব্যক্তি এই হাদীসের আলোকে একথা বলে ফেলেছেন যে, কোরআনে করীমের ব্যাপারে চিন্তামূলক কোন কথা বলাই বৈধ নয়, এমনকি শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেক পবিত্র কোরআন থেকে কোন মর্মবাণী প্রমাণ করাও বৈধ নয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের এ ধারণা আদৌ নির্ভুল নয়, কেননা কোরআনে করীমে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আল্লাহ পাক অনুপ্রাণিত করে এরশাদ করেছেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

(সূরা মোহাম্মদ)

"তবে কি তারা পবিত্র কোরআনে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেনা? নাকি তাদের তাদের অন্তর সমূহ তালাবদ্ধ রয়েছে"?

বস্তুতঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এই হাদীসের এ অর্থ নয় যে, কোরআনে করীমের ব্যাপারে আদৌ চিন্তা ও গবেষণা করা যাবে না, এজতেহাদ করা যাবে না; বরং এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কোরআনে করীমের তফসীরের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের বরখেলাফ করে শুধু নিজের মতের ভিত্তিতে যদি তফসীর

করা হয়, তবে তা অবশ্যই অবৈধ হবে। যদি ঘটনাচক্রে এমন তফসীর সঠিকও হয় তবুও এ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কেননা, সে ভুল পথ অবলম্বন করেছে। এখানে কোরআনে করীমের তফসীরের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যেমনঃ

১. যে ব্যক্তি কোরআনে করীমের তফসীরের যোগ্যতা রাখেনা, অথচ শুধু নিজের মত অনুসারে তফসীর করে।

২. কোন আয়াতের তফসীর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের তরফ থেকে যা পাওয়া যায় তা উপেক্ষা করে নিজের তরফ থেকে কোন অর্থ বর্ণনা করা।

৩. যে সমস্ত আয়াতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীনদের কোন প্রকার তফসীর পাওয়া যায়, তাতে আরবী ভাষার নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না রেখে নিজের তরফ থেকে কোন ব্যাখ্যা পেশ করা।

৪. পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফ থেকে সরাসরি কোন বিধি-নিষেধ প্রমাণ করার জন্যে এমন ব্যক্তির এজতেহাদ করা, যার এজতেহাদ করার যোগ্যতা নেই।

৫. পবিত্র কোরআনের যে সমস্ত আয়াত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই ঘোষণা রয়েছে যে, এ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, সেসব আয়াতের তফসীর নিজের তরফ থেকে পেশ করা।

৬. কোরআনে করীমের এমন তফসীর বর্ণনা করা যা ইসলামের অন্য কোন মৌলিক বিষয় বা আকীদার বিরোধী হয় বা অন্য কোন হুকুমের বরখেলাফ হয়।

৭. পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে যেখানে বিবেক-বিবেচনা ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে, অন্যান্য তফসীরকারদের ব্যাখ্যাকে বাতিল করে সেখানে নিজস্ব মত প্রকাশ করা।

মূলতঃ উপরোল্লিখিত হাদীসে এ সমস্ত পন্থায় তফসীর করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এখানে একথাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, যে পর্যন্ত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা না যায় সে পর্যন্ত কোরআনে করীম থেকে কোন বিষয়ে গবেষণা করে বের করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের মাতৃভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সুদীর্ঘ সময় যাবত পবিত্র কোরআন শিক্ষা করতেন।

আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) লিখেছেনঃ যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়মিতভাবে পবিত্র কোরআন শিক্ষা করেছেন তাঁদের

মধ্যে রয়েছেন হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও অনেকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট দশটি আয়াত শিখতাম, তখন যে পর্যন্ত এ আয়াত সমূহের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত না হতাম সে পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তাও করতাম না।

তিনি বলেছেনঃ

فعلمنا القران العلم والعمل جميعا

"আমরা পবিত্র কোরআন শিখেছি এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি এবং পবিত্র কোরআনের উপর আমল করাও শিখেছি"।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) শুধু সূরা বাকারা শিখতে আট বছর সময় অতিবাহিত করেছেন।

মসনদে আহমদে রয়েছে, তিনি বলেছেনঃ আমাদের মধ্যে যে সূরা বাকারা এবং সূরা আল-এমরান শিখে নিত আমাদের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা উচ্চতর হতো।

লক্ষ্যণীয়, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) যে সুদীর্ঘ আট বছরে সূরা বাকারা শিখেছেন এর কারণ আদৌ এই নয় যে, তাঁর স্মরণশক্তি কম ছিল; বরং এর অর্থ হলো, তিনি এ সুদীর্ঘ সময়ে শুধু পবিত্র কোরআন পাঠই শেখেননি; বরং এর তফসীর বা ব্যাখ্যাও বিস্তারিতভাবে শিখেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম তখন পবিত্র কোরআনের তফসীর হাসিল করার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন। এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের (রাঃ) বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেনঃ "সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন আয়াত নেই, যার সম্পর্কে আমার এই জ্ঞান নাই যে, আয়াতটি কার সম্পর্কে এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতে পারি যে, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আমার চেয়ে কেউ অধিকতর জ্ঞান রাখেন এবং তার নিকট গমন করা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই আমি তার নিকট গমন করবো"।

মূলতঃ এ কারণেই তফসীরের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াত, দ্বিতীয়তঃ হাদীসে রসূল, তৃতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে, কেননা তাঁদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করেছেন, তা তাঁরা শ্রবণ করেছেন। কোন্ ঘটনায়, কোন্ পরিস্থিতিতে, কি অবস্থায়, কেন, কোন

আয়াত কোথায়, কিভাবে নাযিল হয়েছে তা তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন। এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনের তফসীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পবিত্র কোরআনের মহান বাণীকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁরা আজীবন সাধনা করেছেন। অবশ্য এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তফসীরের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কথা তখনই দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে যখন আয়াত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন তফসীর নির্ভরযোগ্য সূত্রে না পাওয়া যায়। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন তফসীর পাওয়া যায়, তবে সাহাবায়ে কেরামের কথা সাহায্যকারী তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অতএব, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তফসীর নির্ভরযোগ্য সূত্রে না পাওয়া যায়, আর সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত তফসীরে কোন মতভেদ না থাকে তবে তাঁদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে, যদি তাঁদের মধ্যে মত-বিরোধ থাকে, তবে বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করতে হবে, যদি তা সম্ভব হয় তবে তার উপরই আমল করতে হবে, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে একজন মুজতাহেদ যে অভিমতকে অধিকতর প্রামাণ্য বলে মনে করবেন তা গ্রহণ করতে পারবেন।

বর্তমান যুগের গোমরাহী

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, বর্তমান যুগে পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে আদৌ প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়না। যারা এ সম্পর্কে পারদর্শী নন এমন লোকদের দেখা যায় পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করতে। এ সম্পর্কে কত কঠোর পরিশ্রম এবং অক্লান্ত সাধনা করতে হয় তা আঁচ করাও হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, আরবী ভাষার কয়েকটি শব্দের অর্থ জানার পরই এ যুগে পবিত্র কোরআনের তফসীর করা সহজ মনে করা হয়। অথচ ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কেউ ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ করেই চিকিৎসক হতে পারেনা বা প্রকৌশল বিষয়ে কোন ভাল বই পাঠ করলেই প্রকৌশলী হওয়া যায় না। এমনিভাবে আইন বিষয়ক কোন গ্রন্থ পাঠ করেও কেউ আইনজ্ঞ হতে পারেনা, বরং এর জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, বছরের পর বছর অক্লান্ত সাধনা, সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট হাযির হয়ে নিয়মিত অধ্যয়ন, বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে সাফল্য অর্জন; এরপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিকট বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ, এসবের পরই কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয় সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে।

এমন অবস্থায় আরবী বা উর্দু ভাষার কয়েকখানি কিতাব পাঠ করেই কি কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে এলমে তফসীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে? মূলতঃ এলমে

তফসীরের জন্যে শুধু আরবী বা উর্দু ভাষায় জ্ঞান অর্জন আদৌ যথেষ্ট নয়; বরং ভাষা-জ্ঞানের পর আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। যে পর্যন্ত সেই পটভূমির জ্ঞান লাভ না করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছে সে পর্যন্ত আয়াতের মর্মকথা উপলব্ধি করা সঠিক ভাবে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়ের উপর কোন আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে, সে বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতে কি বক্তব্য রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণীতে। অতএব প্রত্যেকটি আয়াতের তফসীর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন বাণী বা আমল রয়েছে কি-না, তা অবশ্যই দেখতে হবে।

এতদ্ব্যতীত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁদের সম্মুখে আয়াত নাযিল হয়েছে তারা এ আয়াতের কি অর্থ বুঝেছিলেন, তা-ও দেখতে হবে। আরবী ভাষা একটি অত্যন্ত ব্যাপক ভাষা, এতে একই শব্দের একাধিক অর্থ হয়। একই বস্তুর বহু নাম পাওয়া যায়। তাই কোন্ সময় কোন্ শব্দের কি অর্থ হয় তা বুঝতে হলে ভাষার নিজস্ব ব্যবহার-পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও পারদর্শী হতে হয়।

সবার উপরে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম। আল্লাহ পাকের ভয়-ভীতি যার অন্তরে না থাকবে, আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভে যে সচেষ্ট না হবে, তার জন্যে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান ভান্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

অতএব, পবিত্র কোরআনের তফসীর সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে এসব বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

পবিত্র কোরআনে একই ঘটনাকে বারে বারে উল্লেখ করার কারণ

সাধারণতঃ এমন প্রশ্ন পাঠকের মনকে অনেক সময় ব্যাকুল করে তোলে। যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনাকে পবিত্র কোরআনে ৭২ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কেন হয়? যদি এ ঘটনাকে একই স্থানে উল্লেখ করে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা থাকত হয়তো ভাল হতো।

এ পর্যায়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা একই ঘটনাকে বারে বারে উল্লেখ করার মধ্যে বহু হেকমত রয়েছে।

১. পবিত্র কোরআন হঠাৎ করে একই সঙ্গে নাযিল হয়নি; বরং বারে বারে ক্রমশঃ নাযিল হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন এমন এক সংগ্রামী জাতির পথ-প্রদর্শনের জন্যে

অবতীর্ণ হয়েছে যার প্রাথমিক দিনগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অতীব সংকটময়, প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা। জটিলতর সমস্যা মোকাবেলায় জাতিকে যদি বারংবার সান্ত্বনা না দেয়া হতো তবে সত্য-সাধনা, তথা দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জেহাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন হতো।

তাই পবিত্র কোরআন এমন সব অবস্থায় পূর্ববর্তীকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত বারে বারে পেশ করেছে এবং মুসলমানদেরকে এ সান্ত্বনা দিয়েছে যে, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এবং ঈমানী জিন্দেগীর এ সংগ্রামে তোমরা নতুন নও, বরং ইতোপূর্বেও আম্বিয়ায়ে কেরাম এমনি সংগ্রাম করেছেন। তাঁরাও তাঁদের সংগ্রামী সঙ্গীগণ এমনি কষ্ট করেছেন যার দৃষ্টান্ত বিরল। তবে অবশেষে সাফল্য তাঁদেরই পদ চুম্বন করেছে। মূলতঃ এ কারণেই পবিত্র কোরআনে একাধিক নবীর কথাই বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে এবং যখন যার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. পবিত্র কোরআন মৌলিক বিষয় সমূহ যেমন আকীদা ও বিশ্বাসের সংশোধন, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনা, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহের উপর আমল করার আহবান জানায়, এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সমূহ ইসলামী শরীয়তের অন্যতম দলিল তথা হুজ্জত। কেননা, যদি শরীয়তের আইন প্রণয়নে শুধু পবিত্র কোরআনই হুজ্জত হতো, তবে পবিত্র কোরআনে ঘটনাবলী একাধিকবার উল্লেখ না করে মাসলা-মাসায়েলের বিস্তারিত বিবরণই স্থান পেতো, কিন্তু পবিত্র কোরআনে তা করা হয়নি, বরং বারে বারে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে মৌলিক বিশ্বাস সমূহকে অন্তরে বদ্ধমূল করা হয়েছে এবং শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে আল্লাহর রসূলের পরিপূর্ণ অনুকরণের তাগিদ করেছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো সে বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করলো"।

এমনকি পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় একথাও ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর রসূলের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য না থাকলে প্রকৃত মোমেন হওয়া সম্ভব হয়না, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"অতঃপর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হতে পারবেনা, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে সে সব বিষয়ে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী হিসেবে গ্রহণ না করে। আর আপনার সিদ্ধান্তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে না পারে এবং আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ না করে"।

৩. পবিত্র কোরআনে ঘটনাবলীকে বারে বারে উল্লেখ করার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে কেননা, একই কথা বারে বারে শ্রবণ করলে তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকেনা। কিন্তু পবিত্র কোরআনে বারে বারে উল্লেখিত ঘটনায় প্রত্যেকবারই যেন নবতর স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থা মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য করে যে, পবিত্র কোরআন অবশ্যই আল্লাহ পাকের কালাম, মানুষের কথা এমন হতেই পারে না।

তফসীর সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীরের (রঃ) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

পবিত্র কোরআনের তফসীরের সর্বোত্তম ও সঠিক পন্থা হলো প্রথমতঃ কোরআনে পাক দ্বারাই তফসীর করা কেননা, একই বিষয়ের বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে, আর কোথাও বিস্তারিতভাবে। এরপর পবিত্র কোরআনের তফসীর করা হয় হাদীস শরীফ দ্বারা, আর হাদীস শরীফ হলো পবিত্র কোরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তফসীর। এমনকি, হযরত ইমাম আবু আবদুল্লাহ এবনে মোহাম্মদ ইদ্রিস শাফেয়ী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সকল বিধি-নিষেধের ভিত্তি হলো পবিত্র কোরআন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমি আপনার প্রতি এই কিতাব সত্যের সাথে নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক মানুষের মধ্যে মীমাংসা করেন, খবরদার! আপনি যেন খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী না হন"।

আর অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ "আমি আপনার নিকট এজন্যে কিতাব নাযিল করেছি, যেন তার মাধ্যমে মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করে দেন, এই কিতাব ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ"।

আর এক স্থানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমি পবিত্র কোরআনকে এজন্যে আপনার নিকট নাজিল করেছি, যেন আপনি তা মানুষের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন মানুষ এ বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে পারে"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "আমি পবিত্র কোরআন প্রদত্ত হয়েছি, তার সঙ্গে সঙ্গে তার-ই ন্যায় একটি বস্তুও প্রদত্ত হয়েছি"। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

এখানে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হাদীস শরীফও আল্লাহ পাকের ওহী, যেভাবে পবিত্র কোরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, এভাবে হাদীসে রসূলও আল্লাহ পাকেরই ওহী। তবে পার্থক্য এই যে, পবিত্র কোরআন নামাযে তেলাওয়াত করা হয়, আর হাদীস শরীফ তেলাওয়াত করা হয় না।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) সহ আরও বহু ইমামগণ এ বিষয়টিকে দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন, তবে এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

মূলতঃ বক্তব্য এতটুকুই যে, পবিত্র কোরআনের তফসীর প্রথমতঃ পবিত্র কোরআন দ্বারা, পরে হাদীস শরীফ দ্বারা করা উচিত।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবী হযরত মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিভাবে তুমি আদেশ প্রদান করবে"? তিনি জবাবে আরজ করলেনঃ "আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে"। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "যদি তাতে (তোমার সমস্যার সমাধান) খুঁজে না পাও"? হযরত মাআজ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "তবে সুন্নতে রসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মাধ্যমে আদেশ প্রদান করবো"। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি তাতেও তোমার জবাব না পাও তবে কি করবে"? হযরত মাআজ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "তবে এজতেহাদ করবো"। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ জবাব শ্রবণ করে হযরত মাআজের বক্ষদেশে হাত রেখে বললেনঃ "আল্লাহ পাকের শোকর, যে তিনি স্বীয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতিনিধিকে সে কাজের তওফিক দান করেছেন, যা তাঁর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অতি পছন্দনীয়"।

এই হাদীসখানি মসনদে রয়েছে, সুনানেও স্থান পেয়েছে এবং এর সনদও অত্যন্ত উত্তম, স্ব-স্থানে এর প্রমাণও রয়েছে বিদ্যমান।

এজন্যেই কোন আয়াতের তফসীর যখন কোরআন ও হাদীস কোথাও না পাওয়া যায় তখন সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত কেননা, তাঁরা ছিলেন পবিত্র কোরআনের তফসীরে পারদর্শী, যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে পরিচিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত পূর্ণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং প্রতিভা ও নেক আমলের অধিকারীও ছিলেন তাঁরা, বিশেষভাবে তাঁরা যাঁদের মর্যাদা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও সর্বোচ্চে ছিল,

অর্থাৎ চার খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান জিন্নুরাঈন (রাঃ), শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ)।

হযরত আবদুর রহমান সালমা তাবেয়ী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা যাঁদের নিকট পবিত্র কোরআন শিখেছি তাঁরা বলতেনঃ আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে পবিত্র কোরআন শিখেছি, যে পর্যন্ত প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াতের এলম এবং তার উপর আমল করার পন্থা না শিখতাম সে পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হতাম না। এক কথায়, পবিত্র কোরআনের এলম এবং তার উপর আমল করা শিখেছি।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি ছিলেন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই, তিনি ছিলেন পবিত্র কোরআনের তরজমান বা ভাষ্যকার। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে এই বলে বরকতের দোয়া করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! "তাকে দ্বীন ইসলামের জ্ঞান দান করো, তাকে পবিত্র কোরআনের তফসীরের জ্ঞানও দান করো"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেনঃ পবিত্র কোরআনের সর্বোত্তম ভাষ্যকার হলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের এ মন্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করুন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) তারপরও ৩৬ বছর জীবিত ছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে জ্ঞানার্জনের সাধনায় নিজেকে কতখানি উন্নীত করেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত আলীর (রাঃ) যমানায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর ভাষণে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছিলেন এবং এত সুন্দরভাবে তার তফসীর করেছিলেন যে, যদি তুরষ্ক ও দায়লমের কাফেররাও সেই তফসীর শ্রবণ করতো, তবে অবশ্যই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো।

কোন কোন বর্ণনার রয়েছে যে, তিনি সে ভাষণে সূরা নূরের তফসীর করেছিলেন, এজন্যেই ইসমাঈল এবনে আবদুর রহমান স্বীয় তফসীরে উপরোল্লিখিত দু'জন মহান তফসীরকারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

কিন্তু কোন কোন সময় তাঁরা আহলে কিতাবদের কোন বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকলে, তারাও তার উল্লেখ করেছেন।

মূলতঃ বণী ইসরাঈলের কোন বর্ণনা গ্রহণ করা অবৈধ নয়। বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমার তরফ থেকে (সত্য-বাণী) পৌঁছে দিতে থাক, যদিও এক আয়াত হোক, বনী ইসরাঈলের কোন বর্ণনা গ্রহণেও কোন ক্ষতি নেই, তবে ইচ্ছা করে আমার পক্ষ থেকে যে মিথ্যা কথা বলবে সে নিশ্চয় দোযখী"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কিছু গ্রন্থ পেয়েছিলেন, হাদীস শরীফ মোতাবেক হলে তা থেকেও তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে থাকতেন। কিন্তু এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, কোন বিষয়কে প্রমাণ করার জন্যে বনী ইসরাঈলের বিবরণ গ্রহণযোগ্য নয়, তবে প্রমাণিত বিষয়ের সাহায্যার্থে তাদের বিবরণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

বণী ইসরাঈলীদের বিবরণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রথমতঃ সে সব বিবরণ যার সত্যতা আমাদের পবিত্র কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এ সমস্ত বিবরণীর সত্যতায় কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়তঃ যে সব বিবরণের সত্যতা পবিত্র কোরআন বা হাদীস শরীফে অস্বীকার করা হয়েছে, সেগুলোর ভুল হবার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ সে সব বিবরণ যা সত্য বা অসত্য বলে কোন প্রমাণ পবিত্র কোরআনে বা হাদীস শরীফে আমরা পাই না। এমনি বিবরণ সমূহ সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচিন নয়। তবে এমনি বিবরণের উদ্ধৃতি দান করা অবৈধ নয়। আর এসব বিবরণ দ্বারা আমাদের দ্বীন ইসলামের কোন উপকার হয় না।

অথচ আহলে কিতাবদের মধ্যেও এসব বিষয়ে রয়েছে বহু মতভেদ, আর এজন্যেই যে সমস্ত তফসীরকার এমন সব বনী ইসরাঈলী বিবরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে মতবিরোধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আসহাবে কাহফের নাম, তাঁদের কুকুরের বর্ণ, তাদের সংখ্যা, হযরত মূসা (আঃ)–এর ছড়ি কোন্ বৃক্ষের ছিল? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে পাখীগুলোকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, পরে সেগুলো আল্লাহ পাকের হুকুমে জীবিত হয়েছিল সেগুলো কি পাখী ছিল? হযরত মূসা (আঃ)–এর যমানায় একজন নিহত ব্যক্তিকে জবেহ করা একটি গরুর গোশ্তের টুকরা দ্বারা স্পর্শ করার পর আল্লাহ পাক তাকে জীবিত করেছিলেন, সেটি কোন্ টুকরা ছিল? এবং গরুর দেহের কোন্ স্থানের টুকরা ছিল? সে বৃক্ষ কোন্টি যাতে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নূর দেখেছিলেন এবং আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছিলেন? এসব এমন বিষয় যার উপর আল্লাহ পাক অজানার অবগুণ্ঠন ফেলে রেখেছেন, আর এসব বিষয় জানলে অথবা না জানলে আমাদের কোন লাভ-ক্ষতি হয় না। এসবের নির্দিষ্ট করণেও দ্বীন দুনিয়ার কোন কল্যাণ নেই। তবে একথা সত্য যে, এসব বিষয়ের

মতবিরোধ সম্পর্কে বর্ণনা করা অবৈধ নয়। যেমন স্বয়ং পবিত্র কোরআন আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে যে মতবিরোধ রয়েছে তার উল্লেখ করেছে, এরশাদ হয়েছেঃ

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ..... وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا

(সূরা কাহফঃ আয়াত-২২)

"অদূর ভবিষ্যতে এরা বলবে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা ছিল তিন, তাদের চতুর্থটি ছিল কুকুর আর একথাও বলবে তাদের সংখ্যা ছিল ৫ আর ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর, এসব হলো কল্পনা-প্রসূত কথাবার্তা, আর একথাও বলবে যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা ছিল ৭ আর অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর; (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তাদের সংখ্যা আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকই খুব ভালভাবে জানেন, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সংবাদ কেউ জানেনা অতএব, সাধারণ আলোচনা ব্যতীত (হে রসূল!) আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না, আর তাদের মধ্যে কারো নিকট আসহাবে কাহফের সঠিক অবস্থা জানতে চাইবেন না"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তিনটি মতের কথা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে দু'টিকে সত্যতার মানদন্ডে দুর্বল বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তৃতীয় মত সম্পর্কে তখন ঘোষণা করেননি, ফলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এ মতই সঠিক কেননা, এটিও বাতিল হতো, যদি এতদ্ব্যতীত দু'টি মতের ন্যায় এটিকেও প্রত্যাখ্যান করা হতো।

এই সঙ্গে এ-ও এরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহফের সঠিক সংখ্যার জ্ঞান তোমাদের কোন উপকারে আসবেনা। তাই এর অনুসন্ধানে তোমরা কেন বিব্রত হবে? তোমরা কেন একথা বল না যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যার সঠিক জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, খুব কম সংখ্যক লোককেই আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে অবগত করেছেন। যখন একথা জানা গেল, তারপর এ ব্যাপারে কল্পনা-প্রসূত ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলা এবং এ সম্পর্কে অযথা অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

এভাবে এ আয়াত দ্বারা একথাও জানা যায় যে, এমন কোন বিষয় যাতে মতবিরোধ রয়েছে তার উল্লেখ করার সঠিক পন্থা হলো সকল অভিমত ব্যক্ত করা, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বা সঠিক ও বাতিল মতের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং এ মত বিরোধের উপকারিতা বর্ণনা করা, যাতে করে কোন লোক অযথা কাজে মশগুল হয়ে জরুরী কাজ থেকে বিরত না থাকে।

যদি কেউ বিবদমান কোন বিষয় সম্পর্কে সকল অভিমতের উদ্ধৃতি না দেয় তবে তা সে ব্যক্তিরই কসুর কেননা, হতে পারে যে অভিমতটি সে সযত্নে বাদ দিয়েছে আর তাই ছিল সঠিক অভিমত, এভাবে যে মতবিরোধের বিস্তারিত আলোচনা করেও কোন মীমাংসা বা সঠিক সিদ্ধান্ত না দিয়েই ছেড়ে দেয়, সে-ও ভুল করে। আর যে জেনে শুনে অশুদ্ধকে শুদ্ধ ও অসত্যকে সত্য বলে দেয়, সে তো মিথ্যাবাদী। আর যে মূর্খতার কারণে তথা-না জানার কারণে যা ঠিক নয় তাকে সঠিক বলে দেয়, সে নিঃসন্দেহে গুনাহগার।

এভাবে যে এমন কোন সূক্ষ্ম বিষয়ে (যাতে বিশেষ কোন কল্যাণ নেই) বহু অভিমতের উদ্ধৃতি দেয়, অথবা এমন মতবিরোধের উল্লেখ করতে থাকে যার মধ্যে বিরোধিতা শুধুই শাব্দিক ও মৌখিক বাস্তবিক নয়, সে-ও তার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে, কোন মহৎ কাজ করেনি, এর দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেন কোন লোক দুটি ছোট ছোট বস্ত্র পরিধান করলো, বস্তুতঃ সরল–সঠিক পথ এবং কল্যাণের পথ একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে।

যখন কোন আয়াতের তফসীর কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এবং সাহাবায়ে কেরামের আলোচনায় না পাওয়া যায়, তবে এমন অবস্থায় দ্বীন ইসলামের তত্বজ্ঞানীগণ তাবেয়ীনদের কৃত তফসীর গ্রহণ করা সমীচিন মনে করেছেন। যেমন মুজাহেদ এবনে যোবায়ের (রঃ) যিনি তফসীর শাস্ত্রে আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিস্ময়কর প্রতীক ছিলেন, তিনি নিজেই বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)–এর নিকট তিনবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করেছি এবং এর মর্মবাণী উপলব্ধি করেছি, একেক আয়াতকে জিজ্ঞাসা করে এবং বুঝে বুঝে পাঠ করেছি।

এবনে উবাই মালিকা (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত মুজাহেদ (রঃ)–কে দেখেছি, কিতাব, কলম, দোয়াত নিয়ে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হাযির হতেন এবং পবিত্র কোরআনের তফসীর জিজ্ঞাসা করে করে তাতে লিপিবদ্ধ করতেন। সমস্ত কোরআনের তফসীর এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)–এর তো কথাই ছিল এই যে, যদি মুজাহেদ (রঃ) কোন আয়াতের তফসীর করেন, তবে এরপর ঐ আয়াতের তফসীরের আরও অধিক প্রচেষ্টা নিরর্থক। ঐ আয়াতের তফসীরের জন্যে তা–ই যথেষ্ট, তথা হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর বাক্যই তফসীরের ব্যাপারে শেষ কথা।

হযরত মুজাহেদ (রঃ)-এর ন্যায় হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), হযরত একরামা (রঃ) যিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)–এর শিষ্য ছিলেন এবং হযরত আতা এবনে রোবাহ (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত মসরুক এবনে

আজদা (রঃ), হযরত সাঈদ এবনে মুসাইয়াব (রঃ), হযরত আবুল আলিয়াহ (রঃ), হযরত রুবাই এবনে আনাস (রঃ), হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত যাহ্যাক এবনে মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীনগণের এবং তাঁদের পরবর্তী মনীষীগণের তফসীর গ্রহণযোগ্য হবে।

কখনো এমন অবস্থাও হয় যে, কোন আয়াতের তফসীরে উপরোক্ত মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, তাতে তাদের ভাষার বিভিন্নতার কারণে আপাতঃ দৃষ্টিতে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, ফলে যাদের জ্ঞানের দৈন্য রয়েছে তারা মন্তব্য করে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এমন নয়, বরং একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা একজন একভাবে করেছেন, অন্যজন তাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, আর একজন অন্যভাবে আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন, এই সমস্ত অবস্থায় যদিও তাদের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু ভাব এক, সেই ভাবকে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধারায় ও পন্থায় প্রকাশ করা হয়েছে।

অতএব, বুদ্ধিজীবি মহলকে এ পর্যায়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষায় যত্নবান হতে হবে। মূলতঃ আল্লাহ পাকই সরল-সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

শো'বা এবনে হাজ্জাজ বর্ণনা করেনঃ তাবেয়ীনদের কথা যখন আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহে দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়না, তখন পবিত্র কোরআনের তফসীরে তা কিভাবে দলিল হিসেবে গৃহীত হবে?

শো'বা (রঃ)-এর একথা সত্য যে, যখন তাবেয়ীনদের মধ্যে মতবিরোধ হয় তখন তাঁদের কথা বস্তুতঃ দলিল নয়, কিন্তু যা তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত, তার দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। শুধু মতবিরোধ হলে, তাঁদের কথা একে অন্যের ব্যাপারে, বা কারো ব্যাপারেই দলিলরূপে গ্রহণযোগ্য হয়না। এমন অবস্থায় পবিত্র কোরআনের অভিধান, হাদীস শরীফ, আরবী ভাষার সাধারণ অভিধান এবং সাহাবায়ে কেরামের কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, শুধু নিজের অভিমতের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের তফসীর করা অবৈধ।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে নিজস্ব অভিমতকে স্থান দিয়েছে অথবা মূর্খতার কারণে কোন মন্তব্য করেছে, সে নিজের স্থান দোযখে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এবনে জরীর, তিরমিজী এবং আবু দাউদ শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিজী (রঃ) এই হাদীসকে "হাসান" বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এমন কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জুন্দব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের তফসীরে নিজের তরফ থেকে কিছু বলেছে সে নিতান্ত ভুল করেছে (তথা পাপ কার্যে লিপ্ত হয়েছে)। (এবনে জরীর)

আবু দাউদ, তিরমিজী এবং নেসায়ী শরীফেও এই হাদীস রয়েছে; এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজীর মন্তব্য হলো, এই হাদীসখানি "গরীব"। এর অন্যতম বর্ণনাকারী সুহাইল সম্পর্কে কোন কোন মনীষীর কিছু বক্তব্য আছে। এই হাদীসের এ ভাষাও বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় নিজের তরফ থেকে কোন ঠিক কথাও বলেছে, সেও অন্যায়কারী"; কেননা, সে এমন কাজ করেছে যার জ্ঞান তার ছিলনা এবং এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যার অধিকার তার ছিলনা। এজন্যেই সে ঠিক কথা বললেও অন্যায়কারী। তার কারণ হলো, যে কাজ যেভাবে হওয়া দরকার সেভাবে সে করেনি।

এর দৃষ্টান্ত হলো এরকম, যেমন কোন মূর্খ লোক বিচার করতে তথা দু'জনের জন্যে মীমাংসা করতে বসে পড়ে, তাকে দোযখী বলা হয়েছে। যদিও এমন লোকের সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হয়তো অনুপাতে স্বল্প কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, কিন্তু তবুও সে অন্যায়কারী। আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞ।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করে তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন না করলে, অপবাদকারীকে পবিত্র কোরআন মিথ্যবাদী বলে ঘোষণা করেছে, যদিও সে সত্যবাদীই হোক না কেন এবং যার প্রতি সে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে সে সত্যিই ব্যভিচারীই হোক না কেন।

কিন্তু এই সংবাদকে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত প্রচার করা অনুচিত হয়েছে, আর যেহেতু সে এভাবেই প্রচার করেছে তাই সে মিথ্যাবাদী হয়েছে, আর আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞাত।

এজন্যেই আমাদের পূর্ব পুরুষদের এক বিরাট জামাআত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত পবিত্র কোরআনের তফসীর করতে ভয় পেতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেছেনঃ "আমাকে কোন্ যমীন বহন করবে আর কোন্ আসমান ছায়া দেবে! যদি আমি পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে এমন কথা বলি যা আমি জানিনা"।

তাঁকে একবার পবিত্র কোরআনের এই বাক্য وَفَاكِهَةً وَّاَبًّا এর তফসীর জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি এ মন্তব্য করেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হয়ে এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, এরপর বলেনঃ فَاكِهَةً কি? তা-তো আমরা জানি, কিন্তু এই اَبٌّ কি বস্তু? এরপর নিজেই বলেনঃ "হে ওমর! কেন এ কষ্টদায়ক কাজে আত্মনিয়োগ করছো"?

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাঁর পরিধেয় জামার পশ্চাতে ছিল চারটি তালি, তিনি এ আয়াতের তেলাওয়াত করে বলেছেনঃ এই اَبّ। শব্দটির তাৎপর্য কি? এরপর তিনি বলেনঃ এ ব্যাপারে কষ্ট করার তোমার কি প্রয়োজন? এর অর্থ না জানায় ক্ষতি কি? অর্থাৎ 'অব্ব' শব্দের অর্থ তো হলো যমীনে উৎপন্ন বস্তু, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

এবনে জরীরে সঠিক সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) নিকট একখানি আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তিনি কিছুই বর্ণনা করেননি। অথচ অবস্থা এই যে, তোমাদের কারো নিকট যদি তা জিজ্ঞাসা করা হতো, তবে তোমরা অনতিবিলম্বে জবাব দিতে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, কোরআনে করীমে যে একদিনকে হাজার বছরের বরাবর বলা হয়েছে, এর তাৎপর্য কি? তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ আর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে এক দিনকে, এর তাৎপর্য কি? লোকটি বললোঃ আমি তো এ সম্পর্কে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এ দু' দিনের উল্লেখ করেছেন স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে যা আমি জানিনা।

লক্ষণীয়, এত বড় এবং এত বিজ্ঞ, বিখ্যাত ও দক্ষ তফসীরকার হওয়া সত্ত্বেও তফসীর সম্পর্কে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন; যে বিষয় তিনি জানতেন না, সে সম্পর্কে কিছু বলতে পরিস্কার ভাষায় তিনি অস্বীকার করেছেন।

তফসীরে এবনে জরীরে রয়েছে, একবার হযরত জুন্দব এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট তল্‌ক এবনে হাবীব (রঃ) একখানি আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি এর জবাবে বলেনঃ "যদি তুমি মুসলমান হও তবে তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি এখান থেকে চলে না যাও", অথবা তিনি বলেছেনঃ "যদি তুমি এখানে উপবিষ্ট থাক"।

হযরত সাঈদ এবনে মুসাইয়্যাব (রঃ)-কে পবিত্র কোরআনের তফসীর জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তিনি জবাব দিতেন, আমি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কিছু বলি না। তাঁর অভ্যাস ছিল এই, যতটুকু জানতেন ততটুকুই পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে তফসীর সম্পর্কীয় প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট পবিত্র কোরআনের তফসীর জিজ্ঞাসা করোনা, পবিত্র

কোরআনের তফসীর এমন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে বলে, পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত আমার অজানা নয়।

ইয়াজীদ এবনে আবু ইউরীদ বর্ণনা করেনঃ আমরা হযরত সাঈদ এবনে মুসাইয়্যাবের (রঃ) নিকট হালাল-হারামের মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতাম, এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। কিন্তু যখন আমরা কোরআনে করীমের কোন আয়াতের তফসীর তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম, তখন তিনি এমনভাবে নির্বাক হয়ে থাকতেন, যেন কোন কিছুই শ্রবণ করেননি।

হযরত ওবায়দুল্লাহ এবনে ওমর (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি মদীনা শরীফের বড় বড় আলেমকে (যাঁরা ফেকাহ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন) দেখেছি যে, পবিত্র কোরআনের তফসীর করার সময় বড়ই ভীত-সন্ত্রস্ত হতেন। যেমন সালেম এবনে আবদুল্লাহ, কাসেম এবনে মোহাম্মদ, সাঈদ এবনে মুসাইয়্যাব, নাফে (রঃ)।

হযরত হেশাম (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি আমার পিতা ওরওয়াহ (রঃ)-কে কোন আয়াতের তফসীর করতে দেখিনি।

ওবায়দুল্লাহ সলমানী (রঃ)-এর নিকট একখানি আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেনঃ যাঁরা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে জানতেন যে, কোন্ আয়াত কি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তাঁরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অতএব, তোমরা সরল–সঠিক পথে থাক।

হযরত মুসলিম এবনে ইয়াসার বর্ণনা করেনঃ যখন আল্লাহর কিতাবের তফসীর সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাও তখন আগে পরে দেখে নিও কেননা, এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কথা বলতে হয়।

হযরত ইব্রাহীম (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমাদের সাথীরা পবিত্র কোরআনের তফসীর করাকে অত্যন্ত বড় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করতেন, আর এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

ইমাম শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ যদিও আমি কোরআনে করীমের একেক আয়াতের জ্ঞান অর্জন করেছি, তবু এ বিষয় কিছু বলতে ভীত-সন্ত্রস্ত হই কেননা, এ বিষয়ে কথা বলতে হলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কথা বলতে হয়।

হযরত মসরুক (রঃ) বলেনঃ পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর কেননা, এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বর্ণনা করতে হয়।

এসব কথার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমস্ত মনীষীগণ সঠিক জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহ পাকের কালামের ব্যাখ্যা তথা পবিত্র কোরআনের তফসীর ব্যাপারে কোন কথা বলতেন না।

তবে আভিধাণিক দিক থেকে বা শরীয়তের দিক থেকে পবিত্র কোরআনের তফসীরে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই, এজন্যেই পবিত্র কোরআনের তফসীর সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মনীষীদেরও অনেক কথা বর্ণিত আছে।

এখানে এমন প্রশ্ন অবান্তর যে, যখন এ মনীষীগণ পবিত্র কোরআনের তফসীরের ব্যাপারে এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং তফসীর বর্ণনা করতে প্রস্তুত হতেন না, তখন তাঁদের তরফ থেকে তফসীর কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

বলাবাহুল্য, মনীষীগণ পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে সে স্থলেই কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতেন যে সম্পর্কে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকতো না, পক্ষান্তরে যে বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান থাকতো তা প্রকাশ করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করতেন না। প্রত্যেকের জন্যেই এ দুটি কাজ একান্ত করণীয়। অর্থাৎ জ্ঞান থাকলে তা প্রকাশ করা, আর জ্ঞান না থাকলে নীরব থাকা।

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ "তোমরা পবিত্র কোরআনকে মানুষের নিকট প্রকাশ করতে থাক, তা গোপন করোনা"।

হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছেঃ যাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন রাখে তবে কেয়ামতের দিন তাকে একটি অগ্নির লেগাম পরিধান করানো হবে।

এবনে জরীরে একখানি হাদীস রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সে সব আয়াতেরই তফসীর করতেন যেগুলোর ব্যাখ্যা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর নিকট বর্ণনা করতেন।

কিন্তু এই হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে, কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী হলো জাফর যে মোহাম্মদ এবনে খালেদ এবনে যোবায়ের এবনে আওয়াম কোরাশীর পুত্র, যার সম্পর্কে হযরত ইমাম বোখারী (রঃ)-এর মন্তব্য হলো, তার বর্ণিত হাদীস অনুসরণীয় নয়।

হাফেজ আবুল ফাতহ আজবী (রঃ)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

এমনকি এই হাদীস শুদ্ধ হলেও এর সঠিক অর্থ হচ্ছে এই যে, এই হাদীসে সে সব আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোর অর্থ স্বয়ং আল্লাহ পাক এরশাদ না করলে জানা যায় না। এমন সব আয়াতের অর্থ ও মর্ম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানানো হতো।

ইমাম আবু জাফর (রঃ) এই হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার মূল কথাও এটিই, এ অর্থই সঠিক হতে পারে। কেননা, কোরআনে হাকীমে এমন সব আয়াতও রয়েছে যার অর্থ শুধু আল্লাহ পাকই জানেন, আর এমন আয়াতও রয়েছে, যার মর্মবাণী জানেন তত্ত্বজ্ঞানীগণ, আর এমন আয়াতও রয়েছে, যার মর্মার্থ আরবরা তাদের অভিধানের সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, আর এমন আয়াতও রয়েছে যার অর্থ এত সুস্পষ্ট যে, তা বুঝতে কারোই কোন ওজর-আপত্তি বা অসুবিধা থাকে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, তফসীর চার প্রকার, প্রথমতঃ আরবী ভাষার মাধ্যমেই যা জানা যায়, দ্বিতীয়তঃ যে সব আয়াত সম্পর্কে অজানার জন্যে কেউ মা'জুর নয়, তথা সেগুলোর অর্থ এত সুস্পষ্ট যে, তা না জানার পক্ষে কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ সে সব আয়াত যার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম জানেন। চতুর্থতঃ ঐসব আয়াত যেগুলোর মর্মার্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।

এ পর্যায়ে আর একখানি হাদীস এ মর্মেই বর্ণিত আছে, যদিও এই হাদীসের সনদেও কথা আছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পবিত্র কোরআন চার প্রকার বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছেঃ হালাল-হারামের আয়াত সমূহ, এ আয়াতগুলো থেকে কেউ অজ্ঞ থাকলে কেয়ামতের দিন তার কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। সে আয়াত সমূহ যেগুলোর অর্থ আরববাসী তাদের ভাষার কারণেই জানতে পারে। আর সে আয়াত সমূহ যেগুলোর ব্যাখা শুধু তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীগণই জানতে পারে। আর মোতাশাবেহ আয়াত সমূহ যেগুলোর সত্যিকার মর্মার্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউই জানেনা। যারা এসব আয়াতের অর্থ জানে বলে দাবী করে তারা মিথ্যাবাদী।

এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন মোহাম্মদ এবনে সায়েবুল কালবী রয়েছেন, যার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। হয়তো তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস মনে করেছেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা, মঞ্জিল ও আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীরের (রঃ) বক্তব্য

হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেনঃ সূরা বাকারা, সূরা আলে এমরান, সূরা নেছা, সূরা মায়েদাহ, সূরা বারায়াত, সূরা রা'দ, সূরা নাহল, সূরা হজ্জ, সূরা নূর, সূরা আহযাব, সূরা মোহাম্মদ, সূরা ফাত্হ, সূরা রহমান, সূরা হাদীদ, সূরা মুজাদেলাহ, সূরা হাশর, সূরা মোমতাহেনাহ, সূরা সফ, সূরা জুমআহ, সূরা মুনাফেকুন, সূরা তাগাবুন, সূরা তালাক, সূরা তাহরীম, সূরা জিলজাল এবং সূরা নসর মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, সমস্ত সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে।

হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ তার যুগে কারী, হাফেজ এবং লেখকদেরকে একত্রিত করে পবিত্র কোরআনের অক্ষরের সংখ্যা জানাবার নির্দেশ দিয়েছিল। তখন সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করে পবিত্র কোরআনের অক্ষর গণনা করে জবাব দিয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৭শ' ৪০।

এরপর হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ জিজ্ঞাসা করেছে, অক্ষরের হিসেবে পবিত্র কোরআনের অর্ধেক হয় কোন্ স্থানে? হিসাব করে দেখা গেছে সূরা কাহফের وَلْيَتَلَطَّفْ শব্দের ف অক্ষরে কোরআন শরীফের অর্ধেক হয়। আর সূরা বারায়াতের ১০০ আয়াত পর্যন্ত অক্ষর শুমারীর দিক থেকে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ শেষ হয়, আর সূরা শোয়ারার ১০০ আয়াত বা ১০১ আয়াত শেষ হলে, দু' তৃতীয়াংশ শেষ হয়। এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত, শেষ তৃতীয়াংশ হয়।

আর যদি মঞ্জিলের হিসাব করা হয় তথা সমগ্র পবিত্র কোরআনকে ৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়, তবে প্রথম মঞ্জিল صَدَّ শব্দের د এর উপর শেষ হয় যা, এ আয়াতে রয়েছে فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ আর দ্বিতীয় মঞ্জিল সূরা আ'রাফের اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ বাক্যের ت অক্ষরের উপর শেষ হয়। তৃতীয় মঞ্জিল সূরা রা'দ এর اُكُلُهَا শব্দের الف এর উপর শেষ হয়। চতুর্থ মঞ্জিল সূরা হজ্জের আয়াত جَعَلْنَا مَنْسَكًا এর جعلنا শব্দের الف এর উপর শেষ হয়। পঞ্চম মঞ্জিল সূরা আহযাবের আয়াত وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ এর مؤمنة শব্দের ছোট ة এর উপর শেষ হয়। আর ৬ষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ফাতহের আয়াত الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ এর السوء শব্দের و এর উপর শেষ হয়। আর সপ্তম মঞ্জিল পবিত্র কোরআনের সমাপ্তির উপর শেষ হয়।

আবু মোহাম্মদ হামানী বর্ণনা করেন, আমরা সুদীর্ঘ চার মাস যাবত অক্লান্ত সাধনা করে এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করি এবং হাজ্জাজকে তা সরবরাহ করি। হাজ্জাজ প্রতি রাত্রে পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ তেলাওয়াত করতো। এদিক থেকে পবিত্র কোরআনের এক চতুর্থাংশ সূরা আনআ'মের সমাপ্তির উপর। আর অর্ধেক হয় সূরা কাহফের وَلْيَتَلَطَّفْ এর উপর। আর পৌনে হয় সূরা যুমারের সমাপ্তির উপর।

শেখ আবু ওমর দানী স্বীয় গ্রন্থ "আল বয়ানে" এসব বিষয়েও কিছু মতবিরোধের উল্লেখ করেছেন।

একখানি হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের ৭ মঞ্জিলে পবিত্র কোরআন পাঠ করার উল্লেখ রয়েছে। মসনদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ এবং এবনে মাজায় রয়েছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কিভাবে পবিত্র কোরআনের ওজিফা করেন, তথা তেলাওয়াত করেন? তখন তারা বলেনঃ প্রথম তিন সূরার এক মঞ্জিল, এর পরবর্তী ৫টি সূরার দ্বিতীয় মঞ্জিল, এর পরবর্তী ৭টি সূরার তৃতীয় মঞ্জিল, এর পরবর্তী ৯টি সূরার চতুর্থ মঞ্জিল, এর পরবর্তী ১১টি সূরার পঞ্চম মঞ্জিল, এর পরবর্তী ১৩টি সূরার ৬ষ্ঠ মঞ্জিল, আর সূরা কাফ থেকে শেষ পর্যন্ত সপ্তম মঞ্জিল।

সূরা শব্দের তাৎপর্য

সূরা শব্দের অর্থ পার্থক্য করা, ফারাক করা তথা ভিন্ন করা, আলগ করা। উচ্চতার অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আরবী কবি নাবেগার কবিতায় এ অর্থে "সূরা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধাণিক অর্থের দিক থেকে বিচার করলে, পবিত্র কোরআনের সূরার তাৎপর্য হবে পবিত্র কোরআনের পাঠক এক মঞ্জিল থেকে অন্য মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হয়। এতদ্ব্যতীত, এ শব্দটির অর্থ শরাফত ও বুজর্গী এবং উচ্চতাও বর্ণিত হয়েছে, এজন্যেই শহরতলীকে আরবীতে "সূরা" বলা হয়।

কারো কারো মতে, বর্তনের যে স্থানটি ফাঁকা থাকে তাকে আরবীতে "এসরাহ" বলা হয়। "সূরাহ" শব্দটি এ "এসরাহ" থেকে নেয়া হয়েছে। যেহেতু সূরাহ কোরআনে করীমের অংশ, হামজাহকে বদল করা হয়েছে ওয়াও এর দ্বারা। আর একটি অভিমত হলো সূরার অর্থ পরিপূর্ণতা। এতদ্ব্যতীত, অন্য একটি বক্তব্য হলো আরবীতে "সূরা" দুর্গকেও বলা হয়, যেহেতু একটি দুর্গে কয়েকটি মহল ও ঘর একত্রিত অবস্থায় থাকে, তেমনি একটি সূরা কয়েকটি আয়াতকে একত্রিত করে, এজন্যেই কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিকে সূরা বলা হয়। সূরাতুন এর বহুবচন হলো "সূওয়ারুন" আর কখনও "সূরাতুন" এবং "সূওয়ারাতুন"ও ব্যবহৃত হয়।

আয়াত

আয়াতকে "আয়াত" বলা হয় এজন্যে যে, এর আভিধাণিক অর্থ হলো আলামত, চিহ্ন, নিশান, যেহেতু আয়াতের উপর কালাম শেষ হয়, আর আয়াতের মাধ্যমেই শুরু এবং শেষের মধ্যে একটা ফারাক বা পার্থক্য প্রকাশিত হয়, তাই তাকে বলা হয় আয়াত। পবিত্র কোরআনের আয়াত শব্দটি আলামত, নিশানি ও চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ। (অর্থাৎ তার বাদশাহ হবার আলামত) এমনিভাবে নাবেগার কবিতায়ও এ অর্থেই "আয়াত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, আয়াত শব্দটি জামায়াত ও সমষ্টি অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আরবী কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু অক্ষরের একটি জামায়াত বা সমষ্টির নামই আয়াত, তাই একে আয়াত বলা হয়।

আয়াত শব্দটি আশ্চর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, কেননা পবিত্র কোরআনের আয়াত মাত্রই আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর; কারণ প্রতি-উত্তর দিতে, এর মোকাবেলা করতে এবং অনুরূপ আয়াত রচনা করতে সমগ্র বিশ্ববাসী অক্ষম, অপারগ, তাই তাকে বলা হয় আয়াত।

আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইমাম সিবাওয়াই এর মতে, আয়াত শব্দটি আসলে আয়াতাতুন ছিল যেমন "আকামাতুন সাজারাতুন", আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী ইয়া

অক্ষরটি আলিফে রূপান্তরিত হয়েছে। আর ইমাম কেসায়ীর মতে, আয়াত শব্দটি আসলে ছিল "আয়েয়াতুন" যেমন "আমেনাতুন", ইয়া আলিফ হয়েছে এবং ভাষার নিয়মানুযায়ী তা অপসারিত হয়েছে। অন্য একজন আরবী ভাষাবিদ ফর্য়ার মতে, আয়াত শব্দটি "আয়্যাতুন" ছিল, ইয়া শব্দটি আলিফে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই আয়াতুন রয়ে গেছে। আয়াতের বহুবচন হয় আয়াহউন এবং আয়াতুন। কলেমাহ বলা হয় একটি শব্দকে। কখনও দু' অক্ষর দ্বারাও এক শব্দ হয়, যেমন لا ما আর কখনও এর চেয়ে বেশী সংখ্যক অক্ষর দ্বারাও শব্দ তৈরী হয়। সর্বাধিক দশ অক্ষরের দ্বারা একটি শব্দ হয় যেমনঃ

وَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ اَنْلُزِمُكُمُوْهَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

কখনও একটি কলেমা দ্বারা একটি আয়াত হয়, যেমন وَالْعَصْرِ، وَالْفَجْرِ، حم عسق এবং حم এভাবে والضُّحٰى، طٰهٰ، الم، يٰسٓ কুফাবাসী ইমামগণের মতে তাদের মতে এগুলো দুটি শব্দ। তবে অন্যদের মতে এগুলো আয়াত নয়, বরং সূরা সমূহের আরম্ভ মাত্র।

আবু ওমর দানী বর্ণনা করেনঃ কোরআনে করীমে এক কলেমার আয়াত مُدْهَامَّتَانِ ব্যতীত আর কোনটি নেই, এ আয়াত সূরা আর রহমানে রয়েছে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) বর্ণনা করেন, আরবী ভাষা ব্যতীত পবিত্র কোরআনে অনারব কিছুই নেই, তবে আজমী তথা অনারব কিছু নাম এতে স্থান পেয়েছে যেমন ইব্রাহীম, নূহ, লুত। এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এতদ্ব্যতীতও কিছু অনারব শব্দ কি পবিত্র কোরআনে রয়েছে? বাকেলানী এবং তেররানীর মতে নেই। তাঁদের মতে, যে শব্দগুলো অনারবের মত মনে হয়, সেগুলো আসলে আরবীই।[১]

কিভাবে ওহী নাযিল হতো

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যত আহকাম আসতো তা দু' ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের ওহীতে আল্লাহ পাকের নিজস্ব শব্দ থাকতো এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো, যে সকল ওহীতে আল্লাহ পাকের নিজস্ব শব্দ থাকতো না বটে, কিন্তু বিষয়বস্তু আল্লাহ পাকের হতো এবং জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নিজস্ব শব্দের দ্বারা তা ব্যক্ত করতেন। প্রথম প্রকারকে 'কোরআন' বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো 'সুন্নতে রসূল'। অবশ্য দু' প্রকার ওহীই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যে সকল ওহী আসতো তা' ছয় ভাবে আসতোঃ

১. প্রথমে ঘন্টার শব্দ আসতে থাকতো; এমন সময় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে পড়তো, তীব্র শীতের দিনেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ অবস্থাটি যখন হতো তখন তাঁর হাত মোবারক যদি আমার উরুতে স্থাপন করা থাকতো তাহলে মনে হতো, উরু ফেটে যাবে; তিনি আরোহী অবস্থায় থাকলে শক্তিশালী উষ্ট্রও ওহীর ভার বহন না করতে পেরে বসে পড়তো। আলেমগণ লিখে থাকেন যে, এ অবস্থাটি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বড় কষ্টকর ছিল। সাধারণতঃ যখন আযাব, ধমক এবং ক্রোধপূর্ণ আয়াত নাযিল হতো তখন এ অবস্থাটি ঘটতো।

২. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অন্তরে কথা রেখে দিতেন।

৩. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম মানুষের বেশে তশরীফ আনতেন এবং আল্লাহর হুকুম বলে যেতেন। এটি ছিল সহজ পদ্ধতি। অধিকাংশ সময় হযরত দাহিয়া কালবী (রাঃ)-এর আকৃতিতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তশরীফ আনতেন।

৪. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিদ্রিত থাকা অবস্থায় আসতেন এবং আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছে দিয়ে চলে যেতেন, যেমন সূরা কাওছার।

৫. আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত সরাসরি কথা বলতেন, যেমন শবে মে'রাজে সূরা বাকারার শেষ আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে الْكٰفِرِيْنَ الْقَوْمِ عَلَى পর্যন্ত। আর এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির যে শোচনীয় পরিণাম হবে তার ঘোষণাও করা হয়েছে এভাবে।

৬. নিদ্রিত অবস্থায় আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করেছেন। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, কোরআনে পাকে এ ধরণের কোন ওহী নেই। অবশ্য হাদীস শরীফে এমন ওহীর উদাহরণ রয়েছে।

বিস্তারিত জানতে https://drive.google.com/file/d/1YBWCND-ndIepdm1jC3-wXC_v2kn-2A67/view?usp=drivesdk

সূরা, আয়াত ও বাক্যের সংখ্যা

পবিত্র কোরআনে ১১৪টি সূরা, ৫৪০টি রুকু, ৬,৬৬৬ আয়াত এবং ৩,২২,৬৭১ অক্ষর রয়েছে। এতে ৭৬,৪৩০ খানি বাক্য রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে "আল্লাহ" শব্দটি ২,৫৮৪ বার এসেছে।

হরকতের হিসাব

পবিত্র কোরআনের যবরের সংখ্যা হলো ৪,৫৩,১৪৩টি যেরের সংখ্যা ৩,৯৫,৮২ আর পেশের সংখ্যা হলো ৮,৮০৪টি, তশদীদ ১,২৭৪টি, মাদ্ ১,৭,৭১টি, নকতা ১০,৫,৬৮৪টি।

অক্ষরের হিসাব

। আলিফ-৪৮৮৭৬, ب বা-১১৪২৮, ت তা-১১০৯৫ ث ছা-১২৭৬, ج জিম-৩২৭৩, ح হা-৩৭৯, خ খা-২৪১৬, د দাল-৫৬০২, ذ যাল-৪৬৭৭, ر রা-১১৭৯৩, ز ঝা-১৫৯০, س সিন-৫৮৯১, ش শিন-২২৫৩, ص সোয়াদ-২০১২ ض দোয়াদ-১২০৭ ط তোয়া-১২৭৭, ظ যোয়া-৮৪২, ع আইন-৯২২০, غ গাইন-২২০৮, ف ফা-৮৪৯৯, ق ক্বাফ-৬৮১৩, ك কাফ-৯৫০০, ل লাম-৩০৪৩২, م মিম-৩৬৫৬০, ن নুন-৪৫১৯০, و ওয়াও-২৫৫২৬, ه হা-১৯০৭০, এবং ى ইয়া-৪৫৯১৯ বার।

পবিত্র কোরআনের ১০০০ আয়াতে আদেশ রয়েছে, আরও ১০০০ আয়াতে নিষেধ রয়েছে। যারা এ আদেশ ও নিষেধ পালন করে জীবন যাপন করবে তাদের জন্যে খোশখবরী রয়েছে ১০০০ আয়াতে, যারা এতদসত্ত্বেও পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে তাদের জন্যে সতর্কবাণী রয়েছে ১০০০ আয়াতে, হালাল–হারামের বিবরণ রয়েছে ৫০০ আয়াতে, পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ৫০০ আয়াতে, নামায ও যাকাতের তাগিদ রয়েছে ১৫০ আয়াতে, সকাল সন্ধ্যার তসবীহর বর্ণনা রয়েছে ১২০ আয়াতে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) যাঁদের নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ

পবিত্র কোরআনে পূর্বের যে আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম উল্লেখ হয়েছে তাঁরা হলেন হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত লুত (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত শোয়ায়েব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত আইউব (আঃ), হযরত জুলকিফল (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত আলইয়াসা (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)।

পবিত্র কোরআনে যে সমস্ত ফেরেশতার নাম উল্লিখিত হয়েছে

জীব্রাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ), হারুত, মারুত, রাআ'দ, মালাকুল মওত।

যে সাহাবীর নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে

তিনি হলেন হযরত যায়েদ এবনে হারেসা (রাঃ)।

এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্ত কাফেরদের নাম উল্লেখিত হয়েছেঃ

ইবলিস, ফেরাউন, কারুন, হামান, আজর, সামেরী, আবু লাহাব।

পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

১. পবিত্র কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে আমি আল্লাহ্ পাকের কালাম, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

২. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে এসেছেন যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সর্বাধিক সম্মানিত, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র এবং সকলের নিকট সুস্পষ্ট, যাঁর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

৩. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিশ্বমানবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ইনকিলাব এনেছে, মূর্খতার বদলে জ্ঞান এবং জুলুম অত্যাচারের স্থলে সুবিচার কায়েম করার মহান শিক্ষা পেশ করেছে।

৪. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা সকল সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং যাবতীয় মন্দ কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

৫. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে বিশ্ববাসীকে তার মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছে, কিন্তু কোরআনের একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবেলা করতেও বিশ্ববাসী সক্ষম হয়নি।

৬. পবিত্র কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা ভাষার অলংকারে, ভাবের উচ্ছাসে, শব্দ চয়নে এককথায় সব ব্যাপারেই অনন্য-সাধারণ, অদ্বিতীয়, যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যায় না।

৭. পবিত্র কোরআনই একমাত্র কিতাব, যা বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, যুগের আবর্তন-বিবর্তন তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনি এমনকি, একটি যের যবরেরও পরিবর্তন হয়নি।

৮. পবিত্র কোরআন এমনি এক গ্রন্থ, যার পূর্ণ ইতিহাস সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

৯. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা সর্বদা এবং সর্বত্র পাঠ করা হয়, সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক লোক পাঠ করে থাকে।

১০. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষ সকল যুগে মুখস্ত করে রাখে, এতদ্ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ এভাবে হেফয করা হয় না।

১১. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ যার অনুবাদ, ব্যাখ্যা বা তফসীর পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত ভাষায় করা হয়েছে।

১২. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা বারে বারে পাঠ করলেও কোনদিন পুরনো মনে হয় না।

১৩. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার তফসীরে সকল যুগের ওলামায়ে কেরাম আজীবন সাধনা করেছেন।

১৪. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মধ্যে গবেষণা করে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লক্ষ লক্ষ মাসআলা প্রমাণ করেছেন। শুধু আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) পবিত্র কোরআন থেকে ১৩ লক্ষ মাসআলা বের করেছেন।[১]

একবার ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর শিষ্য ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মেহমান ছিলেন, তাঁর শয়নকক্ষে তাহাজ্জদের নামাযের অজুর জন্যে পানি রাখা হয়েছিল, ফজরের নামাযের সময় দেখা গেল যথাস্থানে অজুর পানি রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়েন না, একথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) তাঁর ওস্তাদের মেজাজ পুরসী করে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর রাতে কি আপনার শরীর খারাপ হয়েছিল"? তিনি বললেন, "না, তবে শয়নকালে পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত মনে হয়েছিল, তা বারবার পাঠ করছিলাম এবং আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা করেছিলাম। এরই মধ্যে ফজরের আযান শ্রবণ করলাম, অবশ্য এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক ১০১টি মাসআলা প্রমাণ করার তওফিক দান করেছেন"।

মূলতঃ এটি শুধু আল্লাহ পাকের কালামেরই বৈশিষ্ট্য।

১৫. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বিধি-নিষেধের উপর সর্বদা সর্বত্র আমল করা হয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত আমল করা হবে।

১৬. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

১৭. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার মহান শিক্ষা মানুষের স্বভাব মোতাবেক এবং যুক্তিপূর্ণ, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় শতবার পরীক্ষিত।

১৮. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা দ্বারা একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ মানুষ উভয়ই উপকৃত হতে পারেন।

১৯. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যাতে রয়েছে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন তথা অর্থনৈতিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান, সমাজ জীবনের দায়িত্ব ও অধিকার, এবাদত–বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, আকিদা-বিশ্বাস এক কথায় মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কোরআনে রয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল নিয়ম-কানুন এককথায় মানব জীবনের চরম সাফল্য এবং চিরশান্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে পবিত্র কোরআন।

১। তারীখে কোরআন, পৃষ্ঠা-১৫৪

২০. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা নারী সমাজের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছে।

২১. পবিত্র কোরআনই সে গ্রন্থ, যা ক্রীতদাসের মুক্তি লাভের পথ-নির্দেশ করেছে।

২২. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার প্রশংসায় অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেরাও পঞ্চমুখ।

২৩. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরস্পরের পরামর্শের বিধান কায়েম করেছে।

২৪. পবিত্র কোরআন এমনি একটি গ্রন্থ, যার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এমনকি কল্পনাতীত, এর সবই অলৌকিক, সবই বিস্ময়কর, সবই অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

পবিত্র কোরআন মানব মনে যে বিপ্লব সৃষ্টি করে

একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, পবিত্র কোরআনের ভাষায় রয়েছে উচ্ছ্বাস, আর ভাবে রয়েছে অপূর্ব তরঙ্গ, যা মানব-মনকে করে তরঙ্গায়িত এবং আন্দোলিত, শুধু তাই নয়, বরং ব্যাকরণের বাঁধনে রয়েছে তার এক বিস্ময়কর দৃঢ়তা। এর শব্দ-বিন্যাস্যের অলংকার এত আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর, যা পাঠক মাত্রকেই আকৃষ্ট করে। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনই পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বক্তব্যের লক্ষ্য। তাই এ গ্রন্থ তার পাঠক মাত্রকে আকৃষ্ট করে। মানুষের মনোজগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মসূচী, চিন্তাধারা এক কথায় সব কিছু পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। মানব মনে এমনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা পবিত্র কোরআন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার ফলশ্রুতি স্বরূপ মানব মনে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান সুদৃঢ় হয়। আর সেই ঈমানের কারণে মাটির মানুষ স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে হাযির হয়। সে আল্লাহ পাকের এমন সান্নিধ্য এবং নৈকট্য লাভ করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুকে সে ভয় করেনা। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে সে কোন প্রকার আশা করেনা। দুনিয়ার লোভনীয়-মোহনীয় কোন কিছুই তাকে আকৃষ্ট করেনা, করতে পারেনা। এমনকি জুলুম-অত্যাচার, উৎপীড়ন-নির্যাতনও তাকে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য থেকে ক্ষণিকের জন্যেও বঞ্চিত করতে পারেনা। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মানব মনে এমনি ইনকিলাব এনে দেয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান তখন প্রাণের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় মানুষ ঈমান রক্ষার্থে প্রাণ দিয়ে দেয়, আর অকুণ্ঠ চিত্তে ঈমানের মহান সম্পদ নিয়ে এ পৃথিবী থেকে হাসিমুখে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে, এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) যখন বন্দী হলেন

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন তার অধিনায়ক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ)। ঘটনাক্রমে তাঁরা সকলেই দুশমনের হাতে বন্দী হলেন। যখন এ পবিত্র মুজাহেদ্বীনের দলটিকে রোমক সম্রাটের সম্মুখে আনা হলো তখন সে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ)-কে এ লোভনীয় প্রস্তাব দেয়ঃ "যদি তুমি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান হও তবে আমি আমার রাজত্বে তোমাকে অংশীদার করবো"। বেচারা সম্রাট ভেবেছিল অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্যের লোভ মরুভূমির এই অধিবাসীকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু সে জানতো না যে, যিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাঁর নিকট উপরোল্লিখিত লোভনীয় বস্তু সমূহের কোন আবেদনই নেই। হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) তাই সম্রাটের প্রস্তাব সরাসরি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এরপর তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে রোমক সম্রাট নির্দেশ দিল তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও এবং তাঁর প্রতি বর্ষা নিক্ষেপ করে তাঁকে ধ্বংস কর। নির্দেশ মোতাবেক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে আনা হলো, তীর দ্বারা তাঁর দেহকে ক্ষতবিক্ষত এবং ছিন্ন-বিছিন্ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলো, তখন মৃত্যু যেন তাঁর সম্মুখে নৃত্য করছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! রোমক সম্রাটের বিস্ময়ের কোন সীমা রইল না, যখন সে দেখে যে, আল্লাহর এই পেয়ারা বন্দার মুখমন্ডলে এতটুকু ভয়-ভীতি বা অস্থিরতা, ব্যাকুলতা এবং দুশ্চিন্তার সামান্যতম চিহ্নটুকুও নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হতে জীবনে সে কাউকে দেখেনি। আর দেখেনি হাসি মুখে বরণ করে নিতে। বস্তুতঃ এ দৃশ্য ছিল রোমক সম্রাটের জন্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, এ ব্যক্তিকে মৃত্যুর এ সহজ শাস্তি দেয়া অনুচিত হবে, বরং তাকে এমন পন্থায় শাস্তি দিতে হবে যাতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে বাধ্য হয়। তাই সে নির্দেশ দেয়, "ফাঁসির মঞ্চ থেকে তাকে সরিয়ে দাও এবং একটি বড় পাত্রে পানি রেখে খুব গরম কর"।

পানি যখন খুব উত্তপ্ত হলো তখন সম্রাটের নির্দেশে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফার (রাঃ) একজন সঙ্গীকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেই ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তাঁর দেহের হাড় থেকে গোশ্তগুলো খসে পড়েছে। তখন রোমক সম্রাট হযরত হোজাফা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললো, "যদি তুমি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না কর তবে তোমাকেও এ শাস্তি ভোগ করতে হবে"। কিন্তু এ ভয়াবহ দৃশ্যও হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) দৃঢ়

সংকল্পে এতটুকু পরিবর্তন আনতে পারেনি। তাঁর জবাব ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্টঃ "আমি ফুটন্ত পানিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলে-পুড়ে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়"।

এদিকে সৈন্যরা তাঁকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় ফুটন্ত পানির পাত্রের কাছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে আরেক বিস্ময়কর দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো, হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) ফাঁসিকাষ্ঠে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসেছিলেন, তাঁর চক্ষু ঐ মুহূর্তে অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। রোমক সম্রাট ভাবলো এটি আমার বিজয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে তার কাছে হাজির করার হুকুম দিল এবং ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলো?

তিনি বললেন, "অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমার মাত্র একটি প্রাণ, যদি আমার একশ'টি প্রাণ থাকতো, তাহলে আমি প্রত্যেকটি প্রাণ এভাবে আল্লাহ পাকের পথে বিলীন করে দিতাম"।

এ আশ্চর্যজনক জবাব শ্রবণ করে রোমক সম্রাট বিস্ময়াভিভূত হলো। সে ভাবল, এমন ব্যক্তির শাস্তি মৃত্যু মোটেই নয়; বরং তাকে জীবিত রাখাই কর্তব্য।

রোমক সম্রাট বললো, "উত্তম, তুমি আমার মস্তক চুম্বন করো, তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) বললেন, "শুধু আমাকে নয়, যদি আমার সকল সাথীকে মুক্তি দাও, তাহলে তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে"।

রোমক সম্রাট বললো, "তাই হবে, আমি সকলকে মুক্তি দেব"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফা (রাঃ) অগ্রসর হয়ে তার মস্তক চুম্বন করলেন এবং সমস্ত সাথীদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এলেন।

কিছুদিন পর যখন এ পবিত্র কাফেলা মদীনা মোনাওয়্যারায় হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো, হযরত ওমর (রাঃ) এই সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং দন্ডায়মান হয়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে হোজাফার (রাঃ) মস্তক চুম্বন করলেন। কেননা, তিনি যে অপূর্ব ঈমানী প্রেরণা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং অলৌকিকভাবে মুজাহেদদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চিরস্মরণীয়।

হযরত জাফর তায়্যার (রঃ) একবার মেহমান নিয়ে খেতে বসেছিলেন। তখন তাঁর গোলাম গরম গোশ্তের পাত্র হাতে রাখতে না পেরে হাত থেকে ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উত্তপ্ত গোশ্তের পাত্রটি তাঁর মাথার উপরেই পড়ে। তখন ক্রোধে তার মুখমন্ডল লাল হয়ে যায়, গোলাম তাঁর ক্রোধ দেখে এ আয়াত খানি পাঠ করতে শুরু করেঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ

অর্থাৎ "যারা ক্রোধকে প্রশমিত করে"।

তখনই তাঁর মুখমন্ডলের রং বদলে যায় এবং ক্রোধ কমে যায় আর যখন সে পাঠ করলোঃ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

অর্থাৎ "যারা মানুষকে ক্ষমা করে",

তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেনঃ "আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম"।

এরপর যখন সে পাঠ করলোঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ পাক নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন"। তখন তিনি বললেনঃ "আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম"।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত জোরারাহ এবনে আওফা (রাঃ) নামাজে রত ছিলেন। ইমাম ছাহেব যখন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ

"অবশেষে যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে"।

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে কেয়ামতের ময়দানে হাযির হওয়ার জন্যে যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে?

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র হযরত জোরারাহ এবনে আওফা (রাঃ) পড়ে গেলেন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। এ আয়াতের এমন প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তরে হয়েছিল যা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোৎবায় এ আয়াতখানি পাঠ করলেন,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ

তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো, এ আয়াতের অর্থ হলোঃ প্রত্যেকটি মানুষ জানতে পারবে সে কি আমল নিয়ে হাযির হয়েছে।

আবদুল্লাহ এবনে ঈসা বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন ক্রন্দন করতেন। কখনো অধিক পরিমাণে ক্রন্দনের কারণে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার এমনি প্রতিক্রিয়া হতো তাঁর অন্তরে।

একবার খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করছিলেন, পথ চলতে চলতে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। লোকের

তাঁকে ঐ অবস্থায় বাড়ী পৌঁছালো, অনেকক্ষণ পরে যখন তাঁর হুশ ফিরে এল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হঠাৎ সঙ্গাহীন হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, মসজিদে গমন কালে একটি বাড়ী থেকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করছিলাম, ঐ আয়াতের মধ্যে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ ছিল, যা শ্রবণ করে আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি।

আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ৪০ বছর যাবত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন; কেননা তিনি রাত্রিকালে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম করতেন না। নামাযে দন্ডায়মান অবস্থায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কোন কোন রাত্রে নামাজে রত অবস্থায় পবিত্র কোরআন খতম করতেন।

কিন্তু এক রাত্রে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটল। তিনি সারা রাত শুধু এ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকলেনঃ

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

(সূরা ইয়াসীন)

"হে পাপিষ্ঠরা, আজকের দিনে তোমরা পৃথক হয়ে যাও"।

সকালে তাঁর খাদেম বিনীতভাবে আরজ করলেনঃ "হুজুর, আজ শুধু একখানি আয়াত পাঠ করেই সারা রাত্রি অতিবাহিত করলেন, এর কারণ জানতে পারি কি"?

তিনি বললেনঃ "এ আয়াতের মর্মবাণীর প্রতি লক্ষ্য কর, তাহলে তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন পাপীষ্ঠ ও বদকার লোকদের প্রতি নির্দেশ হবেঃ তোমরা নেককার লোকদের সাথে থাকতে পারবে না, তোমরা তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তি বলেনঃ "তখন আমার ভয় হয়েছে, হায়! আমার কি অবস্থা হবে? সেই কঠিন দিনে আল্লাহ পাক আমাকে বদকার লোকদের মধ্যে রাখবেন, না নেক লোকদের মধ্যে? এ প্রশ্ন আমাকে বিব্রত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে। তাই আমি এ আয়াতখানি সারা রাত তেলাওয়াত করতে থাকি"।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এভাবে যুগে যুগে মানুষের মনোজগতে বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকে। শুধু মানুষ নয়, জ্বীন জাতিকেও পবিত্র কোরআন প্রভাবান্বিত করে; যেমন সাহাবী হযরত খালিদ (রাঃ) একবার মসজিদে এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রাণী মাত্রকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই ভোগ করতে হবে"।

তিনি বারংবার এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর মসজিদের এক কোণ থেকে এ আওয়াজ শ্রুত হলোঃ "তুমি আর কতবার এ আয়াতখানি পাঠ করবে, অথচ এ আয়াতের কারণে ৪ জন জ্বীন মৃত্যুবরণ করেছে"।

এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, তিনি একখানি আয়াত পাঠ করে সারারাত অতিবাহিত করেছেন। আয়াতখানি এইঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَكُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(সূরা মায়েদাহ)

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যদি তুমি তোমার বন্দাদেরকে শাস্তি দাও, দিতে পার কেননা, তারা তোমার বন্দা, আর যদি তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর তাতেও কেউ তোমাকে বাঁধা দিতে পারে না কেননা, তুমি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে উম্মতের জন্যে যে অসাধারণ মায়া-মমতা এবং তাদের পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে যে চিন্তা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এ ঘটনায়। আর এ-ও লক্ষ্যনীয়, পবিত্র কোরআন কিভাবে মানব মনে প্রভাব বিস্তার করে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী কিভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং মুগ্ধ করে তা-ও এর দ্বারা অতি সহজে অনুমেয়।

হযরত বেলাল (রাঃ) উমাইয়া এবনে খালফের গোলাম ছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তথা কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কথা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু হয়। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে অতি উত্তপ্ত বালুকার উপর হযরত বেলাল (রাঃ)-কে শয়ন করিয়ে তাঁর বক্ষের উপর বিরাট পাথর চাপিয়ে রাখা হতো, উপরে সূর্যের তাপ নীচে তপ্ত বালুকা, এমনিভাবে তাঁকে যেন অগ্নি দগ্ধ করা হতো। তাঁর প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত হতো আর সে সময়ও তাঁর কণ্ঠ থেকে তওহীদের বাণী উচ্চারিত হতো, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের শপথ শ্রুত হতো। তিনি দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছটফট করতেন এবং "আহাদ" "আহাদ" বলতেন, তথা আল্লাহ পাক এক বলে ঘোষণা করতেন। হযরত বেলাল (রাঃ)-কে রাত্রে বেত্রাঘাত করা হতো, কোন কোন সময় তাঁর গলায় রজ্জু বেঁধে মক্কা শরীফের রাজপথে টানা হতো, কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে প্রেমের যে শপথ করেছিলেন তা বিস্মৃত হননি; বরং সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কোরবানীর বিনিময়ে তিনি সেই শপথকে স্মরণ রেখেছেন এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব হলে মানুষের সামগ্রিক জীবনে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা এক কথায় সব কিছুতেই একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঈমান লাভের পর এ জীবনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পায়। নব বলে বলীয়ান হয়, নতুন প্রেরণায় সে উদ্বুদ্ধ হয়। যে আল্লাহর প্রতি সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সেই প্রেমময়ের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সে তার সর্বস্ব বিলীন করে দিতে সদা প্রস্তুত থাকে। এ অবস্থা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষারই ফলশ্রুতি।

বিখ্যাত সাধক বুজর্গ হযরত ফোজায়েল এবনে ইয়াজের ঘটনাও এখানে উল্লেখ্য। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ ডাকাত। একদিন লুণ্ঠনের জন্যে একটি কাফেলার প্রতি সদলবলে আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন কাফেলায় এক ব্যক্তি এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِاللّٰهِ

(সূরা হাদীদ)

অর্থাৎ–যারা মোমেন, তাদের কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কম্পমান হবে আল্লাহ পাককে স্মরণ করার জন্যে।

দস্যু ফোজায়েলের মনোজগতে এ আয়াত সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব সৃষ্টি করলো, ডাকাতি চিরতরে বর্জন করলেন তিনি, প্রকৃত তওবা করে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হলেন। পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত বুজুর্গদের অন্তর্ভুক্ত হন।

বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত الرياض والنفرة গ্রন্থে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার হেম্মাস প্রদেশের কতিপয় ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের বক্তব্য শ্রবণের পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের গভর্ণর কেমন কাজ করছেন? তারা বললো, তিনি একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেছেন।

পরে হযরত ওমর (রাঃ) হেম্মাসে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাঁকে এ আদেশ দিলেনঃ তুমি তথায় পৌঁছে গভর্ণরের নব নির্মিত বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে তা ভস্মীভূত করবে, আর গভর্ণরকে মদীনায় হাযির করবে।

হযরত ওমরের (রাঃ) আদেশ যথারীতি পালন করা হয়েছিল। যখন এই গভর্ণর হযরত ওমরের (রাঃ) দরবারে হাযির হলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ জনসাধারণের চেয়ে ভাল অবস্থায়, উন্নত ধরণের বাসস্থানে বাস করতে তোমার লজ্জা করেনি? কেননা, দেশের সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন যাপন করতে হবে জননায়ক এবং রাষ্ট্র পরিচালককে–এটিই পবিত্র কোরআনের শাশ্বতঃ বিধান। সাম্যের এমনি

মহান আদর্শই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল যুগে, আর তা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সিরিয়া বিজয়ের সময় মুসলিম সিপাহসালার হযরত আবু ওবায়দাহ এবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে তাঁর সৈন্যবাহিনী সহ দাওয়াত করলো একজন অমুসলিম আমীর। যথা সময়ে মেহমানদের সামনে রকমারী সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হলো। প্রধান অতিথি হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) মেজবানকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এ ধরণের খাদ্য-দ্রব্য কি আমাদের সকল সঙ্গীর জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে? তাঁকে জানান হলো যে, প্রধান অতিথির জন্যে একটু বিশেষ ধরণের খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সে সব খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেনঃ সকলের জন্যে যে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি শুধু তাই গ্রহণ করবো।

পবিত্র কোরআনের আলোকে ইসলামের দৃষ্টিতে এ অসাম্য নীতি নিতান্ত অপছন্দনীয়।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) কখনো মদীনা মোনাওয়্যারার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বাগানে দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করতেন। একবার তাঁর এক শত্রু তাঁকে প্রাণে বধ করার হীন উদ্দেশ্যে পূর্বেই সে বাগানে উপস্থিত হলো এবং একটি বৃক্ষে আরোহন করে সুযোগের অপেক্ষায় রইল। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রাঃ) বাগানে পৌঁছলেন এবং তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে নিদ্রা-মগ্ন হলেন। তিনি কোন দিন কোন প্রহরার ব্যবস্থা রাখতেন না। দুশমন মনে করলোঃ এ হলো সুযোগ; সে বৃক্ষ থেকে অবতরণ করলো। তার বদ মতলব হাসিলের জন্যে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু কয়েক গজ এগিয়েই সে থমকে দাড়ালো। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই কাঁপছে থরথর করে। এবার তার পা আর উঠছে না। এমনকি চোখ খুলে কিছু দেখতেও সে সাহস করছে না। সে দেখলো একটি বিরাট ব্যাঘ্র ঘুমন্ত খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রহরায় রত। মাঝে মধ্যে পদতলে চুম্বন করতঃ তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ করছে। আল্লাহ পাক এভাবেও পবিত্র কোরআনের অনুসারী মোমেন বন্দাদেরকে সাহায্য করেন, যা সাধারণতঃ মানুষের জন্যে হয় কল্পনাতীত।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের শিক্ষায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে এমন শক্তি নিহিত রয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলে, যা মানুষের সকল প্রয়োজনের আয়োজনকে সহজতর করে দেয়। মানুষকে জীবন-সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে পথ-নির্দেশ করে, এমন অবস্থায় সাফল্য তাদের পদ চুম্বন করে। ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম হয়। সবার উপরে পবিত্র কোরআন আদর্শচ্যুত মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। স্রষ্টা ও

পালনকর্তা আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষকে তাঁর সাথে গভীর ও ঘনিষ্টতর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। এ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশই হয় মানুষের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে।

অতএব, মুসলমান মাত্রকে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হতে হবে। এজন্যে পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যায় যুগে যুগে বহু মনীষী আজীবন সাধনা করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন যুগের তফসীরকারগণের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

প্রথম যুগের তফসীরকারগণ

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই কোরআনে পাকের তফসীর সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে চারজন এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)

কোরআনে করীমের তফসীরকারদের তালিকায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম শীর্ষস্থানীয়। এমনকি সাহাবাদের মধ্যেও তাঁকে এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করা হতো। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে এই দোয়া করেছিলেনঃ

اللهم فقهه فى الدين

"হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনি এলমে পারদর্শী করো এবং কোরআনে করীমের তফসীরের বিশেষ জ্ঞান তাকে দান করো"।

আরেকবার দোয়া করেছিলেনঃ

اللهم بارك فيه وانشر منه

"হে আল্লাহ! তার প্রতি বরকত নাযিল করো এবং তার দ্বারা ব্যাপক ভাবে এলমে দ্বীন প্রচার করো"।

একবার একথাও এরশাদ করেছিলেনঃ

نعم ترجمان القران انت

"তুমি কোরআনে পাকের অতি উত্তম মুখপাত্র"।

তাই সাহাবায়ে কেরামও হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে "কোরআনের মুখপাত্র", "বিখ্যাত আলেম" এবং "জ্ঞানের সমুদ্র" এমনি বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করতেন।

কোন তফসীরকার তফসীর সংক্রান্ত তথ্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি দিলে তা সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী হয়।

বস্তুতঃ কোরআনে পাকের তফসীর সম্পর্কে এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার জন্যে তিনি নিজেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি নিজেই বলেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর আমি একজন আনসারী সাহাবীর নিকট গমন করে বললাম যে, এখনও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বহু সাহাবী জীবিত রয়েছেন, তাঁদের নিকট থেকে আমাদের কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করা উচিত। ঐ আনসারী সাহাবী আমার প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ প্রকাশ না করায় আমি নিজেই এ কাজ শুরু করলাম এবং সাহাবাগণের নিকট হাযির হয়ে তাঁদের দ্বারে অপেক্ষা করে বসে থাকতাম, যখন তিনি স্বেচ্ছায় বাইরে আসতেন তখন আমাকে দেখতে পেয়ে আবেগে বলে উঠতেন, "আপনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই, আপনি এত কষ্ট করলেন কেন? আমাকে সংবাদ দিলে আমি নিজেই আপনার দরবারে হাযির হতাম"।

তিনি জবাব দিতেন, "আমি যখন এলম শিক্ষা লাভের প্রত্যাশী তখন আমাকেই আপনার নিকট আসতে হবে"।

এভাবে তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট হাযির হয়ে কোরআন হাদীসের বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ২,৬৬০ খানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ)

কোরআনে করীমের তফসীর বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর স্থানও শীর্ষে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিও তফসীরকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি অধিক সময় কোরআনে করীমের তফসীর সম্পর্কীয় এলমের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি তফসীর সম্পর্কে জ্ঞানের সমুদ্রে পরিণত হয়েছিলেন।

আবু তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর খোৎবা প্রদানের সময় শুনেছি তিনি বলেছিলেন; কোরআনে করীমের এমন কোন আয়াত নেই যার সম্পর্কে আমি অবগত নই যে, তা রাত্রে নাযিল হয়েছে? পাহাড়ে নাযিল হয়েছে না মাঠে নাযিল হয়েছে?

হযরত আলী (রাঃ) জীবনের শেষ দিনগুলো যেহেতু কুফায় অতিবাহিত করেন, তাই তাঁর এলম কুফা ও তার উপকণ্ঠে অধিক পরিমাণে প্রচলিত হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধাণের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন প্রথম খলীফারূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে কোন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে দেখা যেত না, তিনি স্বগৃহেই অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। তখন কোন কোন ব্যক্তি এমন ধারণা করতে লাগলেন যে, হয়তো ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচিত না হওয়ার কারণে তিনি মর্মাহত। এ মর্মবেদনাই রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে তাঁর অনুপস্থিতির একমাত্র কারণ। মানুষের এসব অমূলক ধারণা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) অবগত হয়ে একদিন মসজিদে নববীতে সমবেত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে আমার অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা মনে কর। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর আমি পবিত্র কোরআনের তফসীর সম্পর্কে জ্ঞান সাধনায় রত রয়েছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কীয় যে এলম আমাকে দান করেছেন, তা সংকলনের চেষ্টা করছি। আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি- যিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু সূরা ফাতেহা সম্পর্কে যে এলম আমাকে দান করেছেন তা যদি আমি লিপিবদ্ধ করি তবে সে কাগজগুলো সাতশত উটের বোঝা হয়ে যাবে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর এ মন্তব্য তাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে অমর বাণীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তা হলো,

انا مدينة العلم وعلى بابها

অর্থাৎ "আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী হলো এই শহরের তোরণ"।

হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮৬।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৯।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-ও একজন শীর্ষস্থানীয় তফসীরকার। তফসীর সম্পর্কীয় হাদীস তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমনকি এ সম্পর্কীয় হাদীস হযরত আলী (রাঃ) থেকে অধিক তিনি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা এবনে জরীর হযরত এবনে মাসউদের (রাঃ) এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ

"আমি সেই সত্ত্বার শপথ করে বলছি- যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই যে, কোরআনে পাকের সমস্ত আয়াত সম্পর্কেই আমি অবগত রয়েছি যে, তা কার সম্পর্কে

এবং কোথায় নাযিল হয়েছে। যদি আমি এমন ব্যক্তির সন্ধান লাভ করতাম, যে কোরআন সম্পর্কে আমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী, তবে অবশ্যই তাঁর দরবারে হাযির হয়ে সে জ্ঞান আহরণ করতাম"।

বিখ্যাত তাবেয়ী আল্লামা মসরুক (রঃ) বলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদের সম্মুখে কোরআনে পাকের একটি সূরা পাঠ করে দিনের অধিকাংশ সময় তার তফসীর ও সে সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করতেন।

তিনি আরও বলেন যে, আমি বহু সাহাবী থেকে শিক্ষা লাভ করেছি কিন্তু অনেক বিবেচনার পর বুঝতে পারলাম, এলমে দ্বীন ছয় জনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছেঃ

১. হযরত ওমর (রাঃ),

২. হযরত আলী (রাঃ),

৩. হযরত আবদুল্লাহ এবনে মসউদ (রাঃ),

৪. হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ),

৫. হযরত আবু দারদা (রাঃ)-ও

৬. হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)।

আল্লামা মসরুক (রঃ) আরও বলেনঃ অতঃপর আমি আরও গবেষণা করে দেখলাম, এ ছয় জনের জ্ঞান দু'জনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত– হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)।

হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)

হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একজন প্রখ্যাত তফসীরকার ও সর্বোত্তম ক্বারী ছিলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اقرؤهم ابى بن كعب رض

"সাহাবাদের মধ্যে উবাই বিন কা'ব সর্বোত্তম ক্বারী"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ন্যায় ইমামুল মোফাচ্ছেরীনও তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন।

অন্য একজন তাবেয়ী মা'মার বলেনঃ হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর অধিকাংশ এলম অর্জন করেছেন তিনজন সাহাবী–হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে।

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রথম মোফাচ্ছের, যাঁর তফসীরই সর্ব প্রথম গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়।

দ্বিতীয় যুগের তফসীরকারগণ

সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন স্থানে তফসীরের দরস শুরু করার পর তাবেয়ীনদের মধ্যে একটি বিরাট দল তফসীর সম্পর্কীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা কোরআনে পাকের যে মহান খেদমত করেছেন তা অবিস্মরণীয়।

হযরত মুজাহেদ (রঃ)

তাঁর পূর্ণ নাম আবুল হাজ্জাজ মুজাহেদ, একুশ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ও ১০৩ হিজরীতে এন্তেকাল করেন। হযরত মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এমন একজন বিশিষ্ট ছাত্র, যাঁর সঙ্গে তিনি তিন বার কোরআনে পাকের দাওর করেন এবং মুজাহেদ (রঃ) তিন বারই তাঁর নিকট তফসীরের শিক্ষা লাভ করেছেন।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদা (রঃ) বলেন, "তফসীরে পারদর্শী আলেমদের মধ্যে হযরত মুজাহেদই (রঃ) অবশিষ্ট রয়েছেন"।

তাবেয়ীনগণ আরও বলেছেন, "মুজাহেদ (রঃ) তফসীরের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম"।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) যদিও তাবেয়ী ছিলেন কিন্তু সাহাবাগণও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি বলেন, "আমি হযরত এবনে ওমরের (রাঃ) দরবারে উপস্থিত থাকাকালে আমি তাঁর খেদমত করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু তিনিই আমার খেদমত করতেন"।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) একবার তাঁর সম্মুখে আক্ষেপ করে বলেন, "আহ! আমার পুত্র সালেম ও গোলাম নাফে যদি তোমার ন্যায় মেধাশক্তি সম্পন্ন হতো"।

'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, সেজদা অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়।

হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)

তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী। অত্যন্ত এবাদত-বন্দেগী করতেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মোগাফফাল (রাঃ) এবং হযরত আবু মসউদ বদরী (রাঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরামের নিকট শিক্ষা লাভ করেছেন।

হযরত সাঈদ (রঃ)-এর এবাদত-বন্দেগীর কথা সর্বজন বিদিত ছিল। রাত্রে নামাযে অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করতেন; অধিক ক্রন্দনের কারণে তাঁর দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। ৯৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে।

হযরত সাঈদ খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের অনুরোধে একখানি তফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খলীফা তা সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। কিছুদিন পর ঐ তফসীর হযরত আতা বিন দিনারের হস্তগত হলে তিনি তা থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত একরামা (রঃ)

হযরত একরামা (রঃ) ছিলেন হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম। হোসাইন আবিল হার নামক এক ব্যক্তি তাঁকে এ গোলামটি উপহার দিয়েছিলেন। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত মমতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে শিক্ষা দান করেন। একরামা (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত হযরত আলী (রাঃ), হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ আরো অনেক সাহাবায়ে কেরামের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

দ্বিতীয় যুগে এবং তারও পরে আরও যাঁরা পবিত্র কোরআনের তফসীরের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, তাঁদের নাম সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তর

মোরাহ হামদানী, মৃত্যুঃ হিজরী ৭৫/৭৬, আবুল আলিয়া রোবাহী, হিঃ ৯০, যাহ্যাক এবনে মোজাহেম, হিঃ ১০৫, তাসউ এবনে কাইসার, হিঃ ১০৬, হাসান বসরী (রঃ), হিঃ ১১০, আতিয়া এবনে সাদ আওফী, হিঃ ১১১, আতা এবনে আবি রোবাহ, হিঃ ১১২, কাতাদাহ্ এবনে দায়ামাহ, হিঃ ১১৭, মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী, হিঃ ১২০, আতা এবনে আবি মুসলিম খোরাসানী, হিঃ ১৩৫, রবী এবনে আনাস, হিঃ ১৪০, আবু মালেক আলকামা, আসওয়াদ এবনে ইয়াজীদ, সুফিয়ান সওরী, হিঃ ১৬১।

তৃতীয় স্তর

সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ, হিঃ ১৯৮, ওযাকী এবনুল জাব্যাহ, হিঃ ১৯৭, শোবা এবনুল হাজ্জাজ, হিঃ ১৬০, ইয়াজীদ এবনে হারুন, হিঃ ৫০৬, আবদুর রাজ্জাক এবনে হিশাম, হিঃ ২১১, আদম এবনে আবি ইয়াস, হিঃ ২২০, এসহাক বাহবিয়াহ, হিঃ ২৩৮, রুহ এবনে এবাদাহ, হিঃ ২০৫, আবদ এবনে হোমায়েদ, হিঃ ২৪৯, সোফাইদ এবনে দাউদ, হিঃ ২২০, আবু বকর এবনে আবি শায়বাহ, হিঃ ২২০, এবনে জরীহ, হিঃ ১৫০-১৬০, ইসমাঈল এবনে আবদুর রহমান সাদী, হিঃ ১২৭, মোকাতেল এবনে সোলায়মান, হিঃ ১৫০, মোহাম্মদ এবনে সায়েব কালবী কুফী, হিঃ ১৪৬, এবনে কোতাইবিয়াহ আবু মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ এবনে মুসলিম দিনুরী, হিঃ ২৭৬, মোহাম্মদ এবনে সাওর, হিঃ ১৯০, ইমাম বোখারী, হিঃ ২৫৬, আবু হানিফা দিনুরী, হিঃ ২০৯।

চতুর্থ স্তর

আবু জাফর এবনে জরীর তবরী, হিঃ ৩১০, আবুল কাসেম ইব্রাহীম নোমাতী, হিঃ ৩০৩, আবদুর রহমান এবনে আবি হাতেম, হিঃ ৩০৫, এবনে মাজাহ, হিঃ ২৭৩, মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ, আল হাকেম, হিঃ ৪০৫, এবনে হাব্বান, হিঃ ৩৫৪, এবনে মরদবিয়াহ, হিঃ ৪১০, আবুশ্ শ্যায়খ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে মোহাম্মদ, হিঃ ৩৬৯, এবনুল মানজার, হিঃ ৩১৮।

পঞ্চম স্তর

আবু আবদুর রহমান মোহাম্মদ এবনে হোসাইন সলমী নিশাপুরী, মৃত্যুঃ হিঃ ৪১২, আবু ইসহাক আহমদ সানাবী, হিঃ ৪২৭, আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জুনী, হিঃ ৪৩৮, আবুল কাসেম আবদুল করিম কোশাইরী, হিঃ ৪৬৫, আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী নিশাপুরী, হিঃ ৪৬৮, আবুল হাসান আলী এবনে ইব্রাহীম, হিঃ ৪৩০, এবনে ফোরাক, হিঃ ৪০৬।

ষষ্ঠ স্তর

আবুল কাসেম ইসমাঈল এবনে মোহাম্মদ ইসফাহানী, মৃত্যুঃ হিঃ ৫৩৫, আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব ইসফাহানী, হিঃ ৫০৩, ইমাম গাজ্জালী, হিঃ ৫২৫, আবু মোহাম্মদ হোসাইন এবনে মাহমুদ, এবনে বরজান আবুল হাকাম আবদুস সালাম এবনে আবদুর রহমান, হিঃ ৫৩৬, আবুল হাসান আলী এবনে এরাক খাওয়ারজেসী, হিঃ ৫৩৯, আবুল কাসেম মোহাম্মদ এবনে জমখশরী, হিঃ ৫৩৮, এবনুল আরবী, হিঃ ৫৪৩, আবদুর রহমান এবনে আলী যওজী, বুরহানুদ্দীন ফনবী, হিঃ ৫০১, আলী মোহাম্মদ এবনে আবদুস সামাদ সাখাবী, হিঃ ৫৫৮, আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে হাসান এবনে আলী তুসী, হিঃ ৫৬১।

সপ্তম স্তর

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী, মৃত্যুঃ ৬০৬, মোহাম্মদ এবনে আবি বকর রাজী, হিঃ ৬০৬, নাজেমুদ্দিন জাহেদী, হিঃ ৬৫৮, আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এবনে আহমদ আলী আনসারী, হিঃ ৬৭৪, মোয়াফ্যেকুদ্দিন আহমদ ইউসুফ সুসেলী, হিঃ ৬৮১, কাজী নাসিরুদ্দিন বয়যাবী, হিঃ ৬৮৫, মুহিউদ্দিন এবনে আরবী, হিঃ ৬৩৮, আবু মোহাম্মদ রোজভান শিরাজী হিঃ ৬০৬।

অষ্টম স্তর

আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ এবনে আহমদ নসফী, মৃত্যুঃ হিঃ ৭১০, শরফুদ্দীন এবনে আবদুর রহীম, হিঃ ৭১০, আবুল ফেদা এমাদুদ্দিন এবনে ইসমাইল এবনে আমর এবনে কাসীর, হিঃ ৭৭৪, শরফুদ্দিন আবদুল ওয়াহেদ এবনুল মুনীর, হিঃ ৭৩৩, কুতুবুদ্দিন মাহমুদ এবনে মাসউদ শিরাজী, হিঃ ৭১০, শারফুদ্দিন হাসান

তাইয়েবী, হিঃ ৭৪৩, সুদুদ্দিন তাফতাজানী, হিঃ ৭৯২, শেখ আলাউদ্দিন খাজেন, হিঃ ৭২৫, কুতুব উদ্দিন রাজী, হিঃ ৭৬৬, বদরুদ্দিন জরকুশী, হিঃ ৭৯৪, হাফেজ এবনে কাইয়েম, হিঃ ৭৫০, সিরাজ উদ্দিন আমর এবনে আসালান বলকীনি, হিঃ ৮০৫।

নবম স্তর

জালালুদ্দীন মহল্লী, হিঃ ৮৬৪, আলী এবনে আহমদ মোহায়েমী, হিঃ ৮৩৫, মালেকুল ওলামা শেহাবুদ্দীন, হিঃ ৮৩৫, মোল্লা হোসাইন ওয়ায়েজ কাশেফী, হিঃ ৯১০, আবদুর রহমান এবনে ওমর জালাল উদ্দীন বলকীনি, হিঃ ৮১৮, এমাদুদ্দীন ইব্রাহীম এসফারায়েনী, হিঃ ৯৪৩, জালাল উদ্দীন সয়ুতী হিঃ ৯১১, আবু তাহের ফিরুজাবাদী, হিঃ ৮১৭, শেখ নুরুদ্দীন গাজরুয়ী, হিঃ ৯৭৫, ওলিউদ্দীন এরাকী, হিঃ ৮২১।

দশম স্তর

কাযী শওকানী, মৃত্যু, হিঃ ১২৫৫, কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি, হিঃ ১২২০, শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ), হিঃ ১১৯৭, শাহ আবদুল কাদের দেহলভী, হিঃ ১২৩০ হিঃ, শাহ আবদুল আজিজ (রঃ), হিঃ ১২২৭, আল্লামা মাহমুদ আলুসী বোগদাদী, হিঃ ১৩০৪, নবাব সিদ্দিক হাসান খান, হিঃ ১৩০৭, সোলায়মান জামাল, হিঃ ১২০০, নবাব কুতুব উদ্দিন খান, হিঃ ১০১০, শেহাবুদ্দীন খেফাজী, হিঃ ১০৬৯, মোল্লা জিউন, হিঃ ১১৩০।

একাদশ স্তর

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান, মৃত্যু-হিঃ ১৩৩৯, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, ১৯০০ খ্রীঃ, আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী, মৃত্যু হিঃ ১৩৫৪, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্দী।

এরপরও পবিত্র কোরআনের তফসীরে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তন্মধ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ), হযরত মওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) এবং হযরত মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী (রঃ), মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ), মওলানা মুফতী শফী সাহেব (রঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপমহাদেশে পবিত্র কোরআন

একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে আরবে, সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা হয়েছে মিশরে আর তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে উপমহাদেশে"।

উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তফসীরের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে কয়েকজন স্বনামধন্য

মনীষীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। এখানে এমনি আরও কয়েকজন সাধক ও তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা জরুরী, যাঁরা পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্যের অনুসন্ধানে আজীবন সাধনা করেছেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের জন্যে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে সাধনা করতে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

১. তফসীরে মোহাম্মদী, শেখ হাসান মোহাম্মদঃ গুজরাট, মৃত্যু ৯৮২ হিঃ,

২. সাওয়াতিউল এলহাম, ফয়েজীঃ ১০০৪ হিঃ,

৩. বায়ানুল কোরআন (আরবীঃ ১০ খন্ড), কাজী আবদুশ শহীদ.

৪. তফসীরে নেজামী, শেখ নিজামউদ্দিনঃ ১০২৪ হিঃ,

৫. তফসীরে আহমদী, মোল্লা জিউন (রঃ)ঃ ১১৩০ হিঃ,

৬. তফসীরে ফাতহুল খাইর, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ), ১১৭৬ হিঃ,

৭. জামেউত তাফসীর, নবাব কুতুব উদ্দীন খানঃ ১২৬৫ হিঃ,

৮. ফাতহুল বয়ান, নবাব সিদ্দীক হাসান খানঃ ১৩০৭ হিঃ,

৯. ফাতহুল মান্নান, মওলানা আবদুল হক হক্কানীঃ ১৯০০ খ্রীঃ,

বাংলা ভাষায় যাঁরা পবিত্র কোরআনের তফসীর বা তরজমা করেছেন তাঁরা হলেনঃ

১. জনাব গোলাম আকবর আলী খান,

২. জনাব আব্বাস আলী খান,

৩. জনাব আবদুল হাকীম ও আলী আহসান,

৪. জনাব আবদুর রহমান খান,

৫. জনাব মাওলানা আকরাম খান,

৬. জনাব মাওলানা আবু তাহের সাহেব,

৭. জনাব মাওলানা শামসুল হক সাহেব (রঃ),

৮. পন্ডিত গিরিশ চন্দ্র বাবু,

৯. এই অধমের বঙ্গানুবাদ প্রথম ছয় পারা ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত হয়েছে।

উর্দু ভাষা থেকে যে সব বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা হলোঃ

(১) তফসীরে আশরাফী, (২) মাআরেফুল কোরআন, (৩) তাফহীমুল কোরআন।

পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গ

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম। এর শব্দ, অর্থ, সব কিছু আল্লাহ পাকের নিজস্ব। তাই এর বর্ণনা-শৈলীতে রয়েছে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র। মানুষের কথায় কখনো এমনি সৌন্দর্য এবং মাধুর্য পাওয়া যায় না, পাওয়া যেতে পারে না। যে পবিত্র কালাম সর্বকালের সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত। আমরা এখানে দেখতে চেষ্টা করবো পবিত্র কোরআনে এ পবিত্র কালামের প্রসঙ্গ কিভাবে আলোচিত হয়েছে এবং পবিত্র কোরআন কিভাবে নিজেকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে।

এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হলো সমগ্র বিশ্ববাসী তথা–জ্বীন ও মানব জাতি একত্রিত হয়েও পবিত্র কোরআনের অনুরূপ কালাম উপস্থাপন করতে পারবেনা। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সমগ্র বিশ্ববাসীর সম্মুখে রয়েছে। যারা পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে এবং অবশেষে স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করে তারা একথা বলতে বাধ্য হয়েছেঃ

ليس هذا من كلام البشر

অর্থাৎ 'এটি নয় মানুষের কথা'।

অবশ্য এ অক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বেই পবিত্র কোরআন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলঃ

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

"কিন্তু যদি তোমরা সক্ষম না হও এবং কখনও সক্ষম হবে না, তবে সেই দোযখকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে"।

অন্য আয়াতে এভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছেঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি সমগ্র মানব এবং জ্বীন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কোরআনে করীমের অনুরূপ একটি কোরআন আনয়নের চেষ্টা করে তবে তা আনয়ন করতে কোন দিন সক্ষম হবে না। যদিও তারা এ ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্যকারী হয়"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

"যদি এই কোরআন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে প্রেরিত হতো, তবে তাতে তারা অনেক মতভেদ লক্ষ্য করতো"।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"আর এই কোরআন এমন বস্তু নয় যা আল্লাহ পাকের ওহী ব্যতীত রচনা করা যায়"।

পবিত্র কোরআন একথাও ঘোষণা করেছে যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, যারা সংযম চর্চা করবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করে জীবন-যাপন করবে তারাই পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভে সক্ষম হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

আর যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর বিধি–নিষেধ মেনে নিতে রাজী হয়, তারাই সত্যিকার মোমেন। তাদের জন্যে এই পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের রহমত লাভের কারণ হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"নিশ্চয় এই কোরআন মোমেনদের হেদায়েত এবং রহমতের জন্যে"।

প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কোরআন শুধু মোমেনদের জন্যে রহমত ও হেদায়েত? সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই?

পবিত্র কোরআন স্বয়ং এর জবাব দিচ্ছেঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আর কোরআন তো শুধু নসিহত সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে রয়েছে পবিত্র কোরআনে হেদায়েত, তবে যে ভাগ্যবান সে ব্যক্তিই পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

"আর আমার নিকট এই কোরআন এজন্যে অবতীর্ণ হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এই কোরআন পৌঁছে তাদের সকলকে সতর্ক করি"।

তবু প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যাদের নিকট কোরআন পৌঁছে সকলেই কি এর দ্বারা হেদায়েত লাভ করে? এ প্রশ্নের জবাব পবিত্র কোরআন নিজেই দিয়েছে যে, যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে বিশ্বাস করে, শুধু তারাই এর দ্বারা উপকৃত হতে সক্ষম হয়।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

"এবং যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, তারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করে আর তারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে"।

তবু প্রশ্ন হতে পারে যে, মক্কার কোরায়েশ সহ পৃথিবীর অনেক লোক পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝেও কেন তার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হলো?

পবিত্র কোরআন এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেঃ

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۞ وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল)

"(হে রসূল!) যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের মাঝে এবং আপনার মাঝে একটি পর্দা আড়াল স্বরূপ রেখে দেই। আর তাদের অন্তরে এমন গেলাফ চড়িয়ে দেই, যে কারণে তারা কিছুই বুঝতে পারেনা এবং তাদের কর্ণকুহরে ছিপি রেখে দেই (যে কারণে তারা শ্রবণও করতে পারে না)। এভাবে তারা পবিত্র কোরআনের হেদায়েত থেকে মাহরুম হয়"। আর তাদের এ বঞ্চনার কারণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا..... اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

"এবং আমি দোযখের জন্যে জ্বীন ও মানব জাতি থেকে অনেককে নির্দিষ্ট করে রেখেছি (তাদের অবস্থা এই যে) তাদের অন্তর আছে কিন্তু তারা সেই অন্তর দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করতে চায় না, তাদের কর্ণ সমূহ রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা (আল্লাহর কথা) তারা শ্রবণ করেনা এবং তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তদ্বারা তারা দেখেনা (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের যথেষ্ট উপকরণ তাদের নিকট রয়েছে কিন্তু তারা সে উপকরণের সদ্ব্যবহার করেনা। পরিণামে পবি

কোরআনের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়"।) এজন্যেই পবিত্র কোরআন তাদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে যে, তারা হলো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধিকতর পথভ্রষ্ট, আর তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত।

বস্তুতঃ মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে গাফলত যত বেশী দায়ী হয়, অন্য কোন চরিত্রকে এত বেশী দায়ী করা সম্ভব হয় না। এ গাফলতই মানুষকে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে পৌঁছে দেয় এবং আল্লাহর কোরআনের হেদায়েত থেকে করে বঞ্চিত। এজন্যে পবিত্র কোরআন গাফলত থেকে আত্মরক্ষা করার তা'লিম দেয়।

তাহলে, পুনরায় প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, কিভাবে আল্লাহর কোরআনের হেদায়েত লাভ করবো?

এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"আর যারা আমার পথে সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার পথের হেদায়েত প্রদান করি"।

পুনরায় প্রশ্ন হলো; এ পর্যায়ে আরও কোন শর্ত আছে কি?

পবিত্র কোরআন জবাবে ঘোষণা করেছেঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ

(সূরা ক্বাফ)

"নিশ্চয় এই কোরআনে অবশ্যই নসিহত রয়েছে তবে সে ব্যক্তির জন্যে যার অন্তর রয়েছে, যে বিবেকবান, যে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে"।

অতএব, বিবেকবান হওয়া, মনযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করা, সত্যকে গ্রহণের জন্য যত্ন সহকারে অক্লান্ত সাধনায় রত থাকা, আল্লাহর কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের পূর্বশর্ত। যারা এভাবে সাধনায় রত হয়, পবিত্র কোরআন থেকে তারাই হেদায়েত লাভে সক্ষম হয়। আর যারা পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভে সক্ষম হয়, তারা আল্লাহর নূরের মধ্যে নিমজ্জমান থাকে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

"আল্লাহ পাক ইসলামকে বুঝবার জন্যে যার মনের কপাট খুলে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে রয়েছে"।

দুনিয়াতে যে আল্লাহর নূরের মধ্যে থাকে, নুরানী হেদায়েত লাভে সক্ষম হয়, পরকালে সে নূরের তৈরী বেহেশতের অধিবাসী হবে, এটিই স্বাভাবিক। তাই পবিত্র

কোরআন সমগ্র বিশ্ব-মানবের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا

"অতএব, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি, তথা–পবিত্র কোরআনের প্রতি"।

আর শুধু বিশ্বাস করাও যথেষ্ট নয়, বরং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন করতে হবে জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে।

তাই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ

"(হে মানব জাতি!) যা কিছু তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে মেনে চলো, আর আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করোনা"।

এখন কথা হতে পারে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম, তাঁর নিজস্ব কথা কিন্তু প্রশ্ন হলো, কিভাবে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন? তিনি কি সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলেছেন? কিভাবে মানুষ আল্লাহর এ কালাম লাভ করলো?

এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ

"মানুষের এমন সাধ্য নেই যে, আল্লাহ পাক তার সঙ্গে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, সে আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী বাণী পৌঁছিয়ে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবার উপরে, তিনি মহাজ্ঞানী"।

অতএব, আল্লাহর কালাম নাযিল হওয়ার তিনটি পন্থা রয়েছে-

(১) সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, যেমন মে'রাজের রাত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ পাক প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেছেন। এতদ্ব্যতীত, এমনিভাবে কথা বলার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যেহেতু তিনি আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, শ্রেষ্ঠতম পথিকৃত, সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তাই এ বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁরই; তিনি ভিন্ন আর কেউ এই সুযোগ লাভ করেননি।

(২) সরাসরি কথা হয়েছে কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে শ্রবণ করা হয়েছে, যেমন তূর পর্বতে হযরত মূসা (আঃ) এভাবে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছেন।

(৩) দূত বা ফেরেশতার মাধ্যমে। ফেরেশতা সশরীরে আসুন বা কোন মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হোন।

যেমন পবিত্র কোরআন একথাও ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, এই পবিত্র কালামকে জিব্রাইল আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে নাযিল করেছে, যাতে করে বিশ্বাসী লোকদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করে দেয়"।

আর অবিশ্বাসী লোকদের সকল অমূলক ভিত্তিহীন কথাবার্তার প্রতিবাদ করে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ۞ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۞

(সূরা আল হা-ক্বাহ)

"আর যা কিছু তোমরা দেখ, আর যা কিছু তোমরা দেখনা, এসব কিছুর শপথ করে আমি বলছি, নিশ্চয় এই কোরআন একজন অতি সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী আর অবশ্যই কোন কবির কাব্য নয়, তোমরা খুব কমই বিশ্বাস কর। আর এটি কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা খুব সামান্যই নসিহত হাসিল কর, আর এটি বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কালাম"।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনা বর্ণনা করেনঃ একবার আমি মসজিদুল হারামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পশ্চাতে দন্ডায়মান ছিলাম, তিনি সূরা আল হা-ক্কাহ তেলাওয়াত করছিলেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী এবং ভাষার অলংকার লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছিলাম। তখন আমার অন্তরে একথা আসলো, কোরায়েশরা ঠিকই বলে, এ ব্যক্তি সত্যিই বড় কবি।

ঠিক সে মুহূর্তে তিনি এ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেনঃ

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ

"(পবিত্র কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী) এটি কবির কথা নয়"।

আমি চিন্তা করলাম ইনি কোন গণক হবেন, তখনই তিনি তেলাওয়াত করলেনঃ

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

"এটি কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা সামান্যই নসিহত হাসিল কর"।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ তখন থেকে আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করতে শুরু করে।

এ আলোচনা দ্বারা একথা জানা গেল কিভাবে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে পবিত্র কোরআন সর্ব প্রথম কখন নাযিল হয়? এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

"মাহে রমজানই সে মাস- যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে"।

কোন্ তারিখে?

পবিত্র কোরআনের ঘোষণাঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"আমি লাইলাতুল কদরে কোরআন নাযিল করেছি"।

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবো? পবিত্র কোরআন জবাব দিচ্ছে কয়েকটি আদব রক্ষা করতে হবে।

প্রথমতঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

যখন তোমরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত কর, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ কর। অর্থাৎ বিসমিল্লাহর পূর্বে আউজুবিল্লাহ পাঠ করে নিও।

দ্বিতীয়তঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

"আর কোরআনকে ধীরে ধীরে পাঠ কর"।

এখন প্রশ্ন হলো, যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন শ্রোতাদের দায়িত্ব কি?

পবিত্র কোরআনের জবাবঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"আর যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর আর নীরব থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে"।

আরও একটি প্রশ্ন তবু উত্থিত হয়, পবিত্র কোরআনের হেফাজতের কি ব্যবস্থা?

পবিত্র কোরআন জবাব দিচ্ছে, এ সম্পর্কে কোন মানুষের আদৌ চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই, কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক স্বয়ং এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

"নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় আমিই এর হেফাজতকারী"।

বস্তুতঃ এভাবে পবিত্র কোরআনে পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

পবিত্র কোরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রসঙ্গ

পবিত্র কোরআন মহানবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনের আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষতঃ পবিত্র কোরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ কিভাবে পেশ করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের তফসীর পাঠকের জন্যে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এ পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-সঙ্গিনী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে, তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আখলাক ছিল পবিত্র কোরআন, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতই হলো কোরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা।

এজন্যেই যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়নি এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দেখার সুযোগ লাভ করেনি, তারা তাঁকে দেখতে পারে পবিত্র কোরআনের আলোকে। পবিত্র কোরআনে যেমন তাঁর গুণাবলী, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর মর্তবা এবং বিশ্ব মানবের মাঝে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তেমনি পবিত্র কোরআনের যাবতীয় আমর ও নেহী বা আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নও হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে। শুধু তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা, তা স্বয়ং আল্লাহরই কথা। কেননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের ওহী বা ঐশী বাণী ব্যতীত কিছুই বলতেন না। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না, তিনি শুধু তাই বলেন যা তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে আসে"।

অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের কথা, আর তাঁর প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মূলতঃ মাটির মানুষের জন্যে এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা আর বিশ্ব নিখিলের বুকে এ মর্যাদা লাভ করেছেন শুধু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটি কথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুনিয়ার বুকে বহু নবী রসূল এবং মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত মানুষকে সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, দুনিয়ার মানুষ তাঁদের আদর্শ সম্মুখে রেখে তাঁদের মহান বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এমন কোন মহাপুরুষ বা মনীষী নেই যাঁর প্রতিটি বাণী সংরক্ষিত, যাঁর প্রতিটি বাক্য লিপিবদ্ধ। এ বৈশিষ্ট্য শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই; যাঁর প্রতিটি কথা, কার্যবিবরণ এবং প্রতিটি অনুমোদনের বিবরণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষিত রয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং যুগে যুগে একদল লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী সংরক্ষণ এবং প্রচার-প্রসারে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই আজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি দিক দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। এর কারণ এই, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই আল্লাহ পাক একমাত্র আদর্শরূপে পেশ করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, এককথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই হলেন একমাত্র আদর্শ। কোরআনে হাকীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনে রয়েছে মহান আদর্শ আর এ আদর্শকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার বাস্তব ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। বর্ণনা করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁর পদমর্যাদার কথা।

উপরোক্ত আয়াতে اسوة حسنة শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উত্তম নমুনা–মহান আদর্শ; সমগ্র কোরআনে বহু নবী রসূলের উল্লেখই রয়েছে,

এমনকি তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ থাকলেও সকল পয়গম্বরগণের জীবনকে সর্বকালের মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ আদর্শরূপে ঘোষণা করা হয়নি। মূলতঃ "উসওয়াতুন হাসানাহ" শব্দটি শুধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেই বলা হয়েছে। 'উসওয়াতুন হাসানা', উত্তম নমুনা বা মহান আদর্শ, সমগ্র কোরআনে এ শব্দটি মাত্র তিনটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, সূরা মুমতাহেনার দু' স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে এবং সূরা আহযাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের জন্যে দোয়া করেছেন যা সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে, আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি আমার পিতামহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল (স্বরূপ)"।

যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই শেষ নবী; নবুওয়্যত ও রেসালতের যাবতীয় গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে। তাই তাঁর যমানা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই একমাত্র আদর্শ, আর এ আদর্শের বিস্তারিত বিবরণই রয়েছে পবিত্র কোরআনে। তাই পবিত্র কোরআনের মূল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পাঠ করতে হয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত, আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত বা আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে পাঠ করতে হয় পবিত্র কোরআন। মূলতঃ একটিকে বাদ দিলে আরেকটি বোঝা যায় না। এ কারণেই পবিত্র কোরআনের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনালেখ্য তথা হাদীস শরীফ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ কতখানি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, তা সূরা ইব্রাহীমের প্রথম আয়াতখানি দ্বারাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়, এতে আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

"(হে রসূল!) এই পবিত্র কোরআনে হাকীম আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি, যাতে করে আপনি এর সাহায্যে দুনিয়ার মানুষকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। অবশ্য তা শুধু আল্লাহ পাকের অনুমতি-ক্রমেই সম্ভব"।

কয়েকটি কথা এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, প্রথমতঃ এই কিতাব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছে, যিনি এর ধারক ও বাহক।

দ্বিতীয়তঃ এই কিতাবের সাহায্যে দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর।

তৃতীয়তঃ এ দায়িত্ব পালন করতে হবে পবিত্র কোরআনের আলোকে। তাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যতীত হেদায়েত লাভ যেমন অসম্ভব, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ ব্যতীতও হেদায়েতের আশা সুদূর পরাহত। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক একথাই ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভালবাস, তাঁর সাথে ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছা কর তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান"।

জীবন-সাধনার সাফল্যের একমাত্র পথ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ

মূলতঃ জীবন-সংগ্রামে সাফল্যের তথা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের একটি মাত্র পন্থা সুগম রয়েছে, আর তা হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ। কোরআনে হাকীমের ভাষায়, এটিই হলো মানব জীবনের চরম ও পরম সাফল্যের একমাত্র পন্থা এবং মানব জাতির চির মুক্তির সনদ। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এক মহান দান। তাঁকে প্রেরণ করে আল্লাহ পাক বিশ্ব মানবতার বিরাট উপকার সাধন করেছেন। কেননা তিনিই মানব জাতির একমাত্র আলোক-দিশারী, পথ-প্রদর্শক, আখেরাতের কঠিন দিনে তিনিই তাদের আশার স্থল। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধন করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য হতেই তাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং তাদের সংশোধন করেন আর তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করেন, অথচ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতায় পতিত ছিল"।

রহমতুল্লিল আলামীন

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন শান্তিদূত রূপে, সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির জন্যে রহমত রূপে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(সূরা আম্বিয়া)

"(হে রসূল!) আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্যে রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি"।

পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একথাও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(সূরা ইয়াসীন)

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনিই সরল সঠিক পথে রয়েছেন"।

একথাটি অন্যভাবেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(সূরা যুমার)

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনিই বিশ্ববাসীকে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন"।

অতএব, সরল সঠিক পথ তথা মানবতার কল্যাণের পথ পেতে হলে, চির শান্তি ও চির নাজাত পেতে হলে অবশ্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

পবিত্র কোরআন যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রহমতুল্লিল আলামীন বলে আখ্যা দিয়েছে, তেমনি তাঁকে খাতেমুন নবীয়্যিন বলেও আখ্যা

দিয়েছে। অর্থাৎ তিনি শুধু নবী বা রসূল নন, বরং তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বকালের মানুষের জন্যে একমাত্র আদর্শ, এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

(সূরা আহযাব)

(অর্থাৎ) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষেরই পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী", তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না।

খাতেমুন নবীয়্যিন

খাতেমুন নবীয়্যিন শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

'খতম' শব্দের অর্থ কোন জিনিষকে শেষ করা, তার যবনিকাপাত করা। অতএব, খাতেমুন নবীয়্যিন অর্থ হলো নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি করা। কোন জিনিষের পরিসমাপ্তির অর্থ হলো তাকে তার সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে দেয়া, যেন এরপর আর তার কোন স্তর অবশিষ্ট না থাকে। অতএব, খতমে নবুওয়্যতের অর্থ এই যে, নবুওয়্যত তার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে, এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট রয়নি। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাতেমুন নবীয়্যিন, তাই দুনিয়ার সকল নবীর সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি একা, আর কেয়ামত পর্যন্ত এ পর্যায়ে যত গুণের প্রয়োজন হবে সেগুলোর বিপুল সমাবেশও হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে। এজন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়ত বা জীবন-বিধান পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, গতিশীল, এতে রয়েছে সকল যুগের সকল জিজ্ঞাসার জবাব আর এজন্যেই সর্বশেষে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হবেনা। একটি নিয়ম রয়েছে এই যে, যদি কোন গুণ কারো মধ্যে শেষ হয় তবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই তার নিকট থেকেই সে গুণটি আরম্ভও হয়। যেমন হযরত আদম (আঃ) সর্বশেষ পিতা বা খাতেমুল আবা অর্থাৎ তাঁর পর আর কোন পিতা নেই, পিতৃত্ব তাঁর নিকট শেষ হয়েছে। তেমনি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, পিতৃত্ব শুধু যে শেষ হয়েছে হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট তাই নয়, বরং পিতৃত্ব শুরুও হয়েছে হযরত আদম (আঃ) থেকেই। ঠিক তেমনি আমরা সূর্যের দৃষ্টান্তের প্রতিও লক্ষ্য করতে পারি। সূর্যের মধ্যে আলো বিতরণের গুণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ সূর্যের জৌলুস তার নিজস্ব। তাই সূর্যের মধ্যে আলো দানের আরম্ভও হয়েছে। কেননা চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের আলো সূর্যের কাছ থেকে ধার করা। একইভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

মধ্যে নবুওয়্যত যেমন পূর্ণতা লাভ করেছে তেমনি এর পরিসমাপ্তিও ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁর পর আর কোন নবীর প্রয়োজনও নেই এবং কোন নবীর আবির্ভাবও হবে না। কেননা, নবুওয়্যতের সকল গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর মধ্যে হয়েছে, তিনি এর সকল স্তর সমাপ্ত করেছেন তথা তাঁর মাঝে নবুওয়্যতের সকল স্তর সমাপ্ত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে নবুওয়্যতের শুরুও হয়েছে তাঁর মাধ্যমে, তাই তিনি এরশাদ করেছেনঃ

كنت نبيا وادم بين الماء والطين

"আমি নবী ছিলাম যখন আদম রুহ এবং দেহের মধ্যে ছিলেন", অর্থাৎ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিও হয়নি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

جعلنى فاطحا وخاتما

"আল্লাহ পাক আমাকে প্রথম ও শেষ নবী করেছেন"।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কথাটি স্ববিরোধী মনে হয় কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্য একখানি হাদীসে এর ব্যাখ্যাও রয়েছেঃ

كنت اول النبيين فى الخلق واٰخرهم فى البعث

"সৃষ্টির ব্যাপারে নবীদের মধ্যে আমি সর্ব প্রথম, আর আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি সবার শেষে"।

এতে একথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সর্ব প্রথম এবং সর্বশেষ নবী, তাঁর নবুওয়্যতের বদৌলতেই অন্য নবীগণ নবুওয়্যত লাভ করেছেন। কেননা, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لولا ك لما خلقت الافلاك

"হে নবী! যদি আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকত, তবে বিশ্ব-সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করতো না"।

মূলতঃ সমস্ত নবীগণের মধ্যে যত গুণ ছিল, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা একা দান করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং নবুওয়্যতের সকল গুণাবলীর মূল উৎসই ছিলেন তিনি। সূর্য যেমন আলোর মূল উৎস, তেমনি নূরে নবুওয়্যতের মূল উৎসও ছিলেন মহানবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এজন্যেই আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোরআনে হাকীমে নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য বলেও আখ্যায়িত করেছেন।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহবায়ক ও দীপ্তিময় সূর্য হিসেবে"।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে আল্লাহর রহমতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর কঠিন শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেছেন, যেমন কোরআনে হাকীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

"(হে রসূল!) আপনি আমার প্রিয় বন্দাদেরকে অবগত করুন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়াময় এবং নিশ্চয় আমার শাস্তি যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক"।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদেশে তাঁরই বন্দেগীর জন্যে বিশ্ববাসীকে আহবান জানিয়েছেন, যখন সারা বিশ্ব গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম, অনাচার-ব্যাভিচার তথা যাবতীয় কুকর্মই ছিল মানুষের দৈনন্দিন কাজ। তারা তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের পথ থেকে শুধু যে সরে এসেছিল তাই নয়; বরং তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিল। তখনই আবির্ভাব হলো মহানবী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তিনি বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করতে আহবান জানালেন। তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনই দ্বীনের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। এমনকি তাঁকে আরবের সবচেয়ে বড় ধনী বা বাদশাহ হবার অথবা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণের প্রলোভন দেখানো হলো। কিন্তু এমনি পার্থিব লোভনীয় বস্তুর কোন আবেদনই তাঁর নিকট ছিল না। তাই তিনি তাদের সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রাখলেন। আরববাসী তাঁর উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করলো। সুদীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সামাজিক বয়কট করা হলো। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর গোত্রের অন্যান্য লোক সহ 'শোয়াবে আবু তালিব' নামক স্থানে পাহাড়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে হয়। এমনকি মক্কাবাসী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা শরীফ ত্যাগ করে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করতে হয়।

মদীনা শরীফে পৌঁছার পরও মক্কাবাসী তাঁকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের তবলীগের সুযোগ দেয়নি। তারা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় পৌনে তিনশত মাইল দূরে অবস্থিত মদীনা শরীফে হামলা করেছে কয়েকবারই। কিন্তু তবুও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম داعيا الى الله বা আল্লাহর দিকে আহবায়ক রূপে তাঁর ইসলামী সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দূর্বার গতি নিয়ে পরিচালিত হয় এ সংগ্রাম। অবশেষে এ সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হয়, সার্থক হয় তাঁর জীবন-সাধনা। বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক মুসলিম নর-নারী সমবেত হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে, ঐতিহাসিক আরাফাতের প্রশস্ত মরু প্রান্তরে। এভাবে আল্লাহর বাণীঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

(নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি।)

বাস্তবায়িত হয়েছে সেদিন, যেদিন আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে সমগ্র আরবের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছিল। তখনই ৬ষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ এ আয়াতের মর্মবাণী সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দ্বীনের দাওয়াতের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করেছিলেন তার সাক্ষ্যও প্রদান করেছিলেন সকলে সমবেত কণ্ঠে।

সিরাজাম মুনীরা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'সিরাজাম-মুনীরা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। سراج শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। উভয় অর্থই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, শুধু তাই নয়, বরং এখানে সমভাবে প্রযোজ্য (১) সিরাজ অর্থ প্রদীপ। অতএব, সিরাজাম মুনীরা হলো উজ্জ্বল প্রদীপ। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উজ্জ্বল প্রদীপ বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আমরা দেখি একটি প্রদীপ থেকে আরও অগণিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরও একটি চন্দ্র তৈরী হওয়া অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, অসম্ভব। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের যে আলো বহন করে এনেছেন এবং বিতরণ করেছেন, তা এত ব্যাপক যে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতের এই আলো বিতরণ করা হবে এবং অগণিত আলোর সন্ধানী এই প্রদীপ থেকে আলো আহরণ করবে।

বস্তুতঃ বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত এই বিশ্বের বুকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে সাধনা অব্যাহত রয়েছে, তার অধিকাংশই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে। তিনি নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

اوتيت علم الاولين والاٰخرين

"আদি ও অন্তের জ্ঞান আমিই প্রাপ্ত হয়েছি"।

তাঁরই নামের বরকতে, তাঁরই মহান বাণীর শিক্ষা এবং অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের প্রচার করা হচ্ছে যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহেদ্বীন, বুজুর্গানে দ্বীন, সুফিয়ায়ে কেরাম এবং বিভিন্ন ভাষার পন্ডিত ও চিন্তানায়কগণকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের ওয়ারিশ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা এ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন সহকারে আজও পালন করে যাচ্ছেন। এজন্যে শুধু তাঁদেরকে কঠোর পরিশ্রমই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানীও পেশ করতে হচ্ছে। আর এসব শুধু এজন্যেই করা হচ্ছে যেন সিরাজাম মুনীরা'র আলো সর্বত্র সর্বকালে দেদীপ্যমান থাকে। সত্যি কথা বলতে গেলে একথাই বলতে হয় যে, আল্লাহ পাকই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূরে হেদায়েতের এ বিকীরণের যাবতীয় ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। তিনিই ইমাম হুসাইনকে (রাঃ) কারবালার রণাঙ্গনে উপস্থিত করেছিলেন। তিনিই ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)-কে মনসুরের কারাগারের নির্যাতন সইবার শক্তি দিয়েছিলেন। তিনিই ইমাম আহমদ (রঃ)-কে সুদীর্ঘ ২৮ মাস যাবত কারাগারে আবদ্ধ থাকার এবং প্রতিদিন ভোরে দশটি করে বেত্রাঘাত সইবার শক্তি দিয়েছিলেন। তিনিই হযরত গওসুল আযম (রঃ)-কে সাধনা করার এবং ইমাম বোখারী (রাঃ)-কে কঠোর পরিশ্রম করার তওফিক দিয়েছিলেন। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিরলস সাধনা করার এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে (রঃ) এবং ইসমাঈল শহীদ (রঃ)-কে ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে শাহাদত বরণ করার তওফিক দিয়েছিলেন।

তিনি হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কীকে (রঃ) প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করার, হযরত মাওলানা কাশেম নানুতবীকে (রঃ) দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় বিশ্ব-বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার তওফিক দিয়েছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ)-কে মাল্টা দ্বীপে বন্দী থাকার, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)-কে ইসলামের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করার এবং হযরত মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী (রঃ)-কে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করার তওফিক দিয়েছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের এই সংগ্রাম এই সাধনা আজও রয়েছে অব্যাহত এবং অনাগত ভবিষ্যতেও আল্লাহর অগণিত পেয়ারা বন্দাগণ এ পর্যায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব এমনি ভাবে পালন করে যাবেন। এ সংগ্রাম ও সাধনার স্থান-কাল-পাত্র, ক্ষেত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতি বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য অভিন্ন। আর তা হচ্ছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কলেমায়ে

তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ'র যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তা যেন চিরদিন সমুন্নত থাকে। তাঁর চির সত্য আদর্শের প্রচার যেন সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান থাকে। আর এটিই হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'সিরাজাম মুনীরা' বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য।

বিষয়টিকে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। সূর্য আমাদের জাগতিক জীবনকে যেমন আলাকিত করে, সূর্যের আলো ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নেই, তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আলো বা হেদায়েত লাভ হয় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের আলোকে। আর মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে তাঁর হেদায়েত অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এতদ্ব্যতীত কোন বিকল্প পথ নেই। এ সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সূর্য রূপে পেশ করার তাৎপর্য অনুভব করতে হলে সূর্যের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, কেন সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে তা সর্ব প্রথম উপলব্ধি করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, সূর্য মানুষের কত প্রয়োজনের আয়োজন করে তা-ও জানতে হবে।

পবিত্র কোরআনে سراج শব্দটি অপর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো সূর্য। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন নবুওয়্যতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য। অন্যান্য নবীগণ হলেন তাঁর চারিপার্শ্বে তারকারাজির ন্যায়। আর তিনি হলেন অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে সূর্য সদৃশ।

বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ পাক এ জগতকে আলোকিত করার জন্যে যেমন সূর্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন নবুওয়্যত ও রেসালতের সূর্য। পবিত্র কোরআনে উভয় সূর্যের জন্যেই سراج শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সমগ্র পবিত্র কোরআনে চারটি স্থানে سراج শব্দটি এ দু' অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে, সূরা ফোরকানে এরশাদ হয়েছেঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ অত্যন্ত বরকতময় সেই আল্লাহ পাক, যিনি আকাশে বহু কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন। আর তাতে প্রদীপ (সূর্য) এবং একটি আলোয় ঝলমল চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতে প্রদীপ অর্থ হলো সূর্য। যেমন সূরা নূহের একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

"এবং আল্লাহ পাক সূর্যকে প্রদীপ রূপে তৈরী করেছেন"।

আর সূরা নাবায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই প্রদীপটি অত্যন্ত দীপ্তিময়।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

"আর আমি এ প্রদীপটিকে অত্যন্ত দীপ্তিময় ও আলোকময় করেছি"।

আর সূর্য সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম হেকমত রয়েছে সে সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে। এরপরই আমরা বিষয়টির সত্যিকার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত থেকে পারব।

সূর্যের আলো

সূর্যকে প্রদীপ এজন্যে বলা হয়েছে যে, তার উষ্ণতা ও আলো নিজস্ব। চাঁদের জ্যোতির ন্যায় ধার করা নয়। এজন্যেই কোরআনে হাকীমের কোথাও চাঁদকে প্রদীপ বলা হয়নি। সম্ভবতঃ এজন্যেই কোরআনে করীমে সূর্যকে অন্যত্র সুস্পষ্ট ভাষায় 'যিয়া' (আলো) বলা হয়েছে, আর চাঁদকে বলা হয়েছে নূর বা জ্যোতিঃ।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا

"তিনিই আল্লাহ, যিনি সূর্যকে অত্যন্ত উজ্জল আর চাঁদকে জোতির্ময় করেছেন"।

এখানে 'যিয়া' শব্দটি বৈয়াকরণ রীতিতে ক্রিয়ার ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যা কর্তৃপদের অর্থ তথা ক্রিয়া গুণের আধিক্য প্রকাশ করছে। অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতিকে আরবীতে 'যো' এবং 'যিয়া' বলা হয়। আর সাধারণ জ্যোতি সেই রূপক অবস্থাহীন ঔজ্জ্বল্য যা নিজস্বভাবে প্রকাশ পায়, আর অন্য বস্তুকেও প্রকাশ করে দেয়। 'নূর' শব্দের প্রয়োগ আরবী ভাষায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং প্রখর দৃষ্টির ব্যাপকতার অর্থেও হয়ে থাকে। কারো কারো মত 'যিয়া' কোন বস্তুর নিজস্ব ও স্বকীয় আলোকে, আর 'নূর' অন্যের কাছ থেকে ধার করা জ্যোতিঃকে বলা হয়। মোটকথা, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের আলো ও জ্যোতিঃ অর্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এটাই বোঝনো হয়েছে যে, এ দু'য়ের পরিমাণ, অবস্থা এক রূপ নয়।

সূর্যের উত্তাপ

বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে, সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতার পরিমাণ ছ' হাজার ডিগ্রী, আর তার অন্তর্ভাগের উষ্ণতা দেড় থেকে দু' কোটি ডিগ্রী। এজন্যেই তা কোটি কোটি মাইল দূর থেকেও ভূ-মন্ডলকে তপ্ত ও উজ্জ্বল রাখে। অনুমান করা হয়েছে যে, বিষুব-রেখা বরাবর ভূ-ভাগের এক একর ভূমির উপর সূর্য থেকে দিনের বেলা যতটুকু উত্তাপ পৌঁছে তা চার টন কয়লা পুড়িয়ে যতটুকু উত্তাপ সৃষ্টি করা যায়, ততটুকুর সমান।

কোরআনে হাকীমে সূর্যকে শুধু প্রদীপই বলা হয়নি; বরং وهاج-ও (অত্যন্ত-উত্তাপময়) বলা হয়েছে। বস্তুতঃ আধুনিকতম আবিস্কার সমূহ পবিত্র কোরআনের ঘোষণারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূর্ত-প্রতীক। লক্ষ্য করার বিষয় বটে যে, চৌদ্দশ' বছর পূর্বের অক্ষর জ্ঞানহীন এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে অনুন্নত সমাজের লোকদের বোঝাতে অতঃপর এর চাইতে উত্তম আর কোন্ শব্দ ব্যবহার হতে পারতো, আধুনিক উন্নত যুগেও যার ভাব ও ভাষা অবিকৃত থাকতো!

সূর্যের কার্যকারীতা

যদি কেউ এ বর্ণগন্ধময় বিশ্বের বুকে গতিশীল নানা প্রকার জীবন প্রবাহের গভীরে অনুসন্ধান করে, তাহলে সে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি জীবন-স্পন্দনের পেছনে এই সূর্য ও তার উত্তাপ, উষ্ণতা এবং তার তেজময় আলোক বিকীরণের অব্যাহত কার্যকারিতা লক্ষ্য করবে। যদি সূর্যের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে আমাদের এ পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকতো, আর সমগ্র দুনিয়ার সকল বৈজ্ঞানিক সমবেতভাবে তাদের সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ একত্রিত করেও এই পৃথিবীর সামান্যতম অংশকেও সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকোজ্জ্বল করতে সক্ষম হতো না। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

"(হে রসূল!) এদেরকে বলুন! যদি আল্লাহ তোমাদের জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত রাতকে দীর্ঘস্থায়ী ও অব্যাহত করে দেন, তাহলে বলতো আল্লাহ ছাড়া কে আর এমন মা'বুদ রয়েছে যে তোমাদের জন্যে দিনের আলোর বিকাশ ঘটাতে পারেন? তোমরা কি শ্রবণ কর না"?

ফলে, সে অব্যাহত অন্ধকার জগতে কোন তৃণলতা উৎপন্ন হতে পারতো না। আর জীব-জন্তু তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারতো না।

মহিমময়ের মহিমা

বস্তুতঃ এ হচ্ছে খোদাই মহিমার একটি মাত্র বাল্ব-যা সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় কৃত্রিম বাল্বরাজির উপর স্বকীয় পরিমন্ডলে বিরাজমান। এ সূর্যই সমগ্র মানবকূলকে বিনা কপর্দকে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে আলো ও উত্তাপ সরবরাহ করে যাচ্ছে। বিশ্ব প্রকৃতিকে জীবন-রসে সঞ্জীবিত করে রাখছে। যদি সূর্যে শক্তি নিরূপক কোন মিটার তথা-পরিমাপ যন্ত্র সংস্থাপন করা যেত যেমন, আমাদের বাসভবন ও শিল্প ভবনে

বিদ্যুৎ শক্তি খরচের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে লাগানো হয়, তাহলে সমগ্র মানবকূলের এক বছর বা এক মাস নয়, মাত্র একদিনের শক্তি খরচের বিল চুকাতে সারা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত এবং পুরো বিলই বাকী থেকে যেত।

সূর্যের নিয়ম শৃংখলা

আলো জগতের পরিপূর্ণ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থাধীনে সূর্য তার আলো বিকীরণ, উত্তাপ বিতরণ এক চরম ও অনিন্দ্য-সুন্দর নিয়ম-শৃংখলার সাথে করে চলেছে। যাতে কখনও কোন বেশ-কম বা তারতম্য ঘটেনি, কখনও তা অসুস্থ হয়ে পড়ে না, কোন সংস্কার বা মেরামতের প্রয়োজনও তাতে কোন দিন দেখা দেয়না। আপনি আপনার দৈনন্দিন কার্যাবলী, আর সূর্যের সময়-বিধি লক্ষ্য করুন, দেখবেন আপনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু না কিছু তরতম্য, কোন-না কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তদস্থলে সূর্যের গতিবিধি ও উদয়-অস্তের নিয়ম-রীতিতে এক মিনিট, এক সেকেন্ডেরও তারতম্য ঘটছেনা। এমনকি, যদি সূর্যের বাৎসরিক সময়-বিধি আপনার স্মরণ থাকে, তাহলে আপনি বছরের যে কোন ঋতু ও যে কোন দিনের জন্যে সূর্যের উদয়-অস্তের ভিত্তিতে আপনার হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির গতি ঠিক করে নিতে পারবেন।

যেমন পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

"তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই সুনির্ধারিত সময়ানুসারে গতিশীল রয়েছে"।

পানির কার্য পরিক্রমা

আলো ও উত্তাপের পর পানির প্রশ্নে আসুন। এখানে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রাণী জগতে পানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। পানি মহিমময় আল্লাহর এমন এক বিপুল, বিশাল ও মূল্যবান নেয়ামত-যা ব্যতিরেকে না আমাদের পিপাসা নিবৃত্তির কোন উপায় আছে, আর না আমাদের খাদ্য সামগ্রী লাভের কোন ব্যবস্থা হতে পারে। কেননা, যাবতীয় রকমের তৃণলতা ও গাছ-পালা এ পানির কল্যাণেই বিসিক্ত ও উৎপন্ন হয়ে থাকে। যার ফলে, আমাদের জন্যে খাদ্য-শষ্য, ফল-ফলারি, শাক-পাতা, তরি-তরকারী, নানা রং ও নানা গুণের মসল্লা– এমনকি জ্বালানী কাঠ, সৌধ নির্মাণের উপযোগী কাঠ, তৈজষপত্র তৈরীর উপকরণাদি, ঔষধপত্র, সুতা, রাবার, রশি, চাটাই, টাট, তাগা, কাগজ ও বই-পত্র প্রভৃতিসহ অগণিত প্রকারের ভোগ্য-সামগ্রী ও তৈজষ-সম্পদ লাভ করে থাকি। যেন পানিই আল্লাহর একমাত্র এমন প্রাকৃতিক দান যে, প্রাণী জগতের সামগ্রিক প্রাণ-চাঞ্চল্য নির্ভর করে উদ্ভিদ জগতের সজীবতার উপর, আর উদ্ভিদ জগতের সচল প্রাণ-প্রসার ও উৎপাদনজনিত শ্রীবৃদ্ধি

যেমন পানিরই কল্যাণে অব্যাহত রয়েছে, পানি-না হলে এসব কিছুই সজীব ও উৎপাদনশীল থাকতে পারেনা, ঠিক তেমনি আমাদের স্বাভাবিক শারীরিক সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে, খাদ্যাদি পাকানো, এবাদত-বন্দেগীতে পবিত্রতা বিধানের জন্যে অজু গোসল সম্পাদন, শীত-গ্রীষ্মের প্রচন্ড প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার্থে ঘর-বাড়ী, ইমারতাদি নির্মাণেও পানি এমন এক অপরিহার্য মৌলিক উপকরণ, যা না হলে এই জীব-জগতের প্রাণ-চাঞ্চল্য একদিনও গতিশীল ও প্রাণবন্ত থাকতে পারেনা। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ.....مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ

(সূরা আবাসা)

"অতএব, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি কি চমৎকারভাবে পানি বর্ষণ করেছি। আর আমি মাটিকেও উত্তমরূপে বিদীর্ণ করেছি। আমি তাতে উৎপন্ন করি শষ্যাদি এবং আঙ্গুর ও তরি-তরকারী, যয়তুন ও খেজুর আর বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান এবং ফল ও গবাদি পশুর খাদ্য (ঘাষ-পাতা)। তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের জীব-জন্তুর জন্যে"।

মোদ্দা কথা, এত সব যাবতীয় জীবনোপকরণ ও প্রাণ-চঞ্চল জৈবিক ক্রিয়া কান্ডের উন্মেষ ও বিকাশ পানিরই কল্যাণে অবারিত, অব্যাহত রূপে সদা সংঘটিত হচ্ছে। এ সূর্যেরই কল্যাণে অসীম-অকূল রূপ প্রাকৃতিক পরিমন্ডল ব্যাপী পানির অফুরন্ত ও অগণিত কণা ও বিন্দু-রাশি সদা সঞ্চারিত হচ্ছে। যেহেতু এ নিঃসীম বিশাল বিশ্বের নিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন পানি সরবরাহের এমন এক আশ্চর্য, অভিনব, অকল্পনীয় এবং অবাক বিস্ময়ে অভিভূতকারী ব্যবস্থা ও নিয়ম-শৃংখলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার কল্যাণে জীব-জগতে জৈবিক গতি ও প্রাণ-চাঞ্চল্য, আর উদ্ভিদ জগতের সজীবতা ও প্রাণবন্ততা চির-অব্যাহত রয়েছে। অন্যথায় এ বিশ্ব-চরাচর ও সৌরজগতের অস্তিত্ব দান করার মত কোন কিছুরই উন্মেষ এখানে ঘটত কি-না সন্দেহ।

আপনি কি জানেন কূপ, তালাব ও নদী-নালায় পানি কোত্থেকে আসে? আপনি হয়তো এতটুকুই বলবেন যে, বারি-ধারা হলে পানি সঞ্চিত হয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, বারি ধারার সঞ্চার হয় কোত্থেকে? আপনি হয়তো তৎক্ষণাৎ বলবেন, মেঘমালা থেকে। তাহলে আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন যে, এ মেঘমালা কোত্থেকে কিরূপে অস্তিত্ব লাভ করে? তার একটাই মাত্র উত্তর যে, এই মেঘমালা আসলে বিপুল বিশাল পরিমাণ পানিতে ভরপুর প্রাকৃতিক মশকরাজি যার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে অকূল অথৈ সমুদ্র-মহাসমুদ্র।

এখন লক্ষ্য করুন! আপনি একটি পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আগুনে অথবা সূর্য তাপে গরম করতে থাকুন। অল্পক্ষণ পর দেখতে পাবেন যে, পাত্র শূণ্য ও পানি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন পানি গেল কোথায়? কাজেই, আসল কথা হলো উত্তাপের দরুণ পানি ধোয়া ও বাষ্পাকারে উপরের দিকে উর্দ্ধস্থিত শুণ্যমার্গে পৌঁছে যায়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এমনি এক অকল্পনীয় নিয়ম-বিধি অনুসারে সূর্যের উত্তাপ ও প্রখর কিরণ বিকীরণে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি টন পানি সমুদ্র, মহাসমুদ্র থেকে বাষ্পাকারে উর্ধ্বলোকে সদা উত্থিত হতে থাকে আর তার এক নির্ধারিত পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছে মেঘমালার রূপ ধারণ করে, আর সেই মেঘমালা শূণ্যলোকে ভাসমান অবস্থায় বিচরণ করতে থাকে, তা বায়ুতাড়িত হয়ে দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে আল্লাহরই ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে সিক্ত-বিসিক্ত ও আদ্র করে দেয়, ফলে ভূ-পৃষ্ঠ উর্বর, সজীব ও উৎপাদনক্ষম হয়ে ওঠে।

বিশ্ব-স্রষ্টা, জগৎ প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বিজ্ঞানময় সৃষ্টি ধারার এক অতুলনীয় দুর্লভ নিদর্শন যে, তিনি সৃষ্টির প্রতিপালক হেতু পানি সরবরাহের জন্যে সূর্যকে ক্রীতদাস করে রেখেছেন, যা শুধু আমাদেরকে আলো আর উত্তাপই সরবরাহ করছে না; বরং আমাদের জন্যে সাগর-মহাসাগর থেকে পানিও রফতানী করছে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সূর্য আমাদের এই দুনিয়ার বাগানের এক বিরাট বপু-মালী, উদ্যান-রচক এবং বন-শিল্প প্রকৌশলী বটে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দীপ্তিমান সূর্যের অবদান অগণিত। সমগ্র পৃথিবীকে শষ্য-শ্যামলিমায় ভরপুর করে তথা পৃথিবীকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে রাখার ব্যাপারে সূর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক এমনিভাবে বিশ্ব-সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবদানও অপরিসীম। কেননা, আল্লাহ পাক স্বয়ং হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেনঃ "যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার অভিপ্রায় না হতো তবে আমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না"।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

মূলতঃ যেভাবে সূর্য ভূবন উজ্জ্বলকারী এবং সারা বিশ্বে আলো বিকীরণের দায়িত্ব তার প্রতি অর্পিত, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট হেদায়েতের আলো পৌঁছানোর

দায়িত্বও তাঁর প্রতি অর্পিত। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

"(হে রসূল!) এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে সুখবরদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি"।

পবিত্র কোরআনে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে বিশ্ববাসী! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূল"।

আর যেভাবে সূর্য সারা পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তার আলোকরশ্মি বিকীরণ করে, ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

যেমন কঙ্কর সমূহ তাঁর হস্ত মুবারকে তসবীহ পাঠ করতো। যে খেজুর গাছটির উপর হেলান দিয়ে তিনি মসজিদে নববীতে খোৎবা পেশ করতেন, মিম্বর তৈরী হবার পর যখন তিনি মিম্বরে আরোহন করলেন তখন সেই মৃত খেজুর গাছটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরহে মানুষের মত কাঁদতে লাগলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শোকাহত গাছটির গায়ে হাত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে দুনিয়াতে ফলে ফুলে পল্লবিত হতে চায়, না বেহেশতে যেতে চায়। সে দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে এর নিশ্চয়তা বিধান করলেন, তখন তার কান্না বন্ধ হলো।

এমনিভাবে পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আসসালামু আলাইকুম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! বলে সালাম পেশ করতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে পশু পাখী পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে রত হয়।

এমনিভাবে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের আলোকে নিজেকে আলোকিত করে। তাই আল্লাহ পাক তাঁকে 'সিরাজাম মুনীরা' খেতাবে ভুষিত করেছেন। আর যেহেতু সূর্যের আলো বিকীরণের কারণে আলোকিত হয় যমীনের প্রতিটি অংশ, তেমনি নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নূর বা জ্যোতিঃ বিকীরণের কারণে সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহ পাক আল্লাহর এবাদতের যোগ্য স্থান বলে ঘোষণা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

"আমার জন্যে সারা পৃথিবীকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে"।

অর্থাৎ যমীনের যে কোন অংশে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করার অনুমতি দান করা হয়েছে। ইতিপূর্বে অন্যান্য নবীগণের উম্মতদের এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে হাযির হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। যে কোন স্থানে পবিত্র মাটির উপর নামায আদায়ের অনুমতি শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যেই লাভ হয়।

দ্বিতীয়তঃ অজুর পানি না থাকিলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে তাঁর বরকতেই দান করা হয়েছে। ইতোপূর্বেকার উম্মতদের জন্যে এ ব্যবস্থা ছিলনা।

অতএব, সারা বিশ্বের সমস্ত স্থান এবং বিশ্বের সকল প্রকার অধিবাসী সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে হেদায়েত, পবিত্রতা তথা আলো লাভ করেছে।

এ-ও লক্ষ্যনীয়, শুধু স্থান ও তার অধিবাসীই নয়; বরং যুগ ও কালের উপরও সূর্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বরং সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমেই কালের সৃষ্টি হতে থাকে। কালের পূর্ণ সময় হলো এক সপ্তাহ। ঘুরে ফিরে সেই একটি সপ্তাহই পুনরায় ফিরে আসে, আর সময় যত সুদীর্ঘই হোক না কেন, ঐ সপ্তাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তার পরিচয়। অতএব, সূর্যের পরিভ্রমণের কারণে যেমন ৭টি দিন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য প্রিযনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনালেখ্যও ৭দিনে নিহিত। যেদিন তিনি এ পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়ছেন তাকে আমরা 'ইয়াওমুল বেলাদত' বা জন্মের দিন বলবো। আর যে দিন তিনি নবুওয়্যত লাভ করেছেন, সেদিনকে 'ইয়াওমুল বে'সাত' বা নবুওয়্যত লাভের দিন বলবো। তৃতীয় দিন হলো 'ইয়াওমুদ্যাওয়াত' অর্থাৎ যেদিন তিনি সর্ব প্রথম মানুষকে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন, ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তিনি মক্কাবাসীর নিকট উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু সে আহবানে সাড়া দেয়া তো দূরের কথা, তাঁর প্রতি এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তারা অমানুষিক জুলুম অত্যাচার করে। তারা তাঁর পৃষ্ঠ মুবারকে উষ্ট্রের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত রেখে দেয়, তাঁর পথে গর্ত খনন করে কাঁটা পুঁতে রাখে, তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, এমনকি তাঁর প্রাণনাশের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তখন তিনি আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন। এদিনটিকে আমরা 'ইয়াওমুল হিজরত' বা হিজরতের দিন বলব। আর এটি হলো চতুর্থ দিন।

মক্কার বুকে নির্যাতিত-উৎপীড়িত অবস্থায় সুদীর্ঘ ১৩টি কঠিন বছর অতিবাহিত করে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরতের পর একটি বছরও তিনি শান্তিতে থাকতে পারলেন না। মানবতার দুশমন পৌত্তলিকরা প্রাণের মদীনা আক্রমণের পায়তারা করতে লাগলো। মুসলমানরা ধীরে ধীরে শক্তি অর্জন করছে দেখে তারা সহ্য করতে পারলনা। অবশেষে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

এই সময় সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হানাদার দুশমনের মোকাবেলা করার, হামলাকারী দুশমনের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার তথা শক্তির জবাব শক্তি দ্বারা দেয়ার অনুমতি দিলেন। এ দিনটিকে তাই আমরা 'ইয়াওমুল কুওয়াত' বলবো। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ
اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ

(সূরা হজ্জ)

"যারা দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাদেরকে দুশমনের মোকাবেলা করার অনুমতি দেয়া হলো। কেননা, তারা অত্যাচারিত, আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক এই মজলুম মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে, শুধু এ অপরাধে যে, তারা বলেছে আমাদের প্রভু এক আল্লাহ পাক"।

আর এ শক্তি ব্যবহারের মাত্র সাত বছরের মধ্যে আল্লাহ পাক মক্কা বিজয় তথা সমগ্র আরব বিজয়ের তওফিক দান করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। ইসলামের চন্দ্র-তারকা খচিত পতাকা উড্ডীন হয় সর্বত্র। ১০ হাজার মুজাহেদ্বীনের এক পবিত্র দল নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করেন এবং কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করেন। তখন তিনি কোরআনে করীমের এ আয়াত পাঠ করেছিলেনঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"এবং (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ার যোগ্য"।

মক্কা বিজয়ের গৌরবোজ্জ্বল দিনকে আমরা 'ইয়াওমুশ্যাওকাত' বা গৌরবের দিন বলবো। আর এটি হলো ষষ্ঠ দিন।

অতঃপর নবুওয়্যতের আকাশের এ মহান সূর্য তাঁর আবির্ভাবের মিশন সাফল্যমন্ডিত করলে, ইসলামী বিধান পরিপূর্ণভাবে কায়েম ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলে,

বিদায় হজ্জের অবিস্মরণীয় দিনে আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে 'সিরাজাম মুনীরার' পরিভ্রমণের সম্পূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে। তাই আমরা এ দিনকে 'ইয়াওমুল একমাল' বা পরিপূর্ণতার দিন বলবো। আর এটি হলো এ পর্যায়ের সপ্তম দিন।

এতে একথাই প্রমণিত হচ্ছে যে, জাগতিক সূর্য যেমন তার পরিভ্রমণের মাধ্যমে শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র এই সাতটি দিন তৈরী করে, ঠিক এমনিভাবে আধ্যাত্মিক সূর্যও (১) ইয়াওমুল বেলাদাত, (২) ইয়াওমুল বে'সাত (৩) ইয়াওমুদ্যাওয়াত (৪) ইয়াওমুল হিজরাত (৫) ইয়াওমুল কুওয়াত, (৬) ইয়াওমুশ্যাওকাত (৭) ইয়াওমুল একমাল এই সাতটি দিন তৈরী করে। এ কারণেও উভয় সূর্যকে 'সিরাজাম মুনীরা' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, এখানে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যেভাবে চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাতের আঁধার সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়না, সামান্য আলোর ব্যবস্থা হয় মাত্র। কিন্তু দীপ্তিময় সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত বিদায় হয়ে যায়। সারা পৃথিবীতে রাতের সন্ধান কোথাও পাওয়া যায় না। ঠিক এমনিভাবে আধ্যাত্মিক জগতের যিনি সূর্যরূপে আগমন করেছেন, তাঁর পূর্বে যত নবী রসূলের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের তবলীগ ও হেদায়েতের কারণে সাময়িকভাবে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে, পৃথিবী পুনরায় জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।

কিন্তু নবুওয়্যতের আকাশের মহান সূর্য প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গোমরাহীর অন্ধকার কেটে গেছে, হেদায়েতের দিন শুরু হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"তিনিই সেই আল্লাহ! যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্য-ধর্ম দিয়ে, যাতে করে তিনি দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের উপর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করেন"।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের বুকে প্রভাব বিস্তার করেছেন, ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছে তাঁরই মহান নেতৃত্বে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে আরবের মরুভূমিতে, তিনিই এ বিপ্লবের মহানায়ক। সারা পৃথিবীতে আসমানী গ্রন্থ রূপে একমাত্র পবিত্র কোরআনই রয়েছে, আর সবই বিদায় নিয়েছে।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্ব-বাসীকে যে আহবান জানিয়েছিলেন, সে আহবানে সাড়া দিয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, যে আলোক রশ্মি তিনি বিকীরণ করেছেন, তা দ্বারা আজ বিশ্বের বহু এলাকা আলোকিত। তাঁর জ্ঞান দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধ। তাই বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর মহান দান অনস্বীকার্য। আর এজন্যেই তিনি 'সিরাজাম মুনীরা' খেতাবে ভূষিত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত।

এখানে একথাও উল্লেখ্য, সূর্যের আলো যখন সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে, সর্বত্র তাপ পৌঁছায় তখন প্রকাশ্য দৃষ্টিতে সর্বত্র আলো পরিদৃষ্ট হয়, তাপ অনুভূত হয় কিন্তু মূলতঃ আলো ও তাপ সূর্যেরই থাকে, যাবতীয় বস্তু যতক্ষণ সূর্যের সাথে সম্পর্ক রাখে, ততক্ষণই শুধু তা আলোকিত থাকে। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে, যেমন একটি দেয়ালে আলোক রশ্মি নিক্ষিপ্ত হলে মনে হয়, দেয়ালটিতে আলো রয়েছে, কিন্তু সূর্য যখন পশ্চিম গগনে অস্তমিত হয়, তার আলো যখন সে ছিনিয়ে নেয় তখন দেয়ালে আর সেই আলোর সন্ধান যাওয়া যায় না। কেননা, সূর্যের সাথে দেয়ালের সম্পর্ক আপাততঃ বিনষ্ট।

ঠিক এমনিভাবে নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য তথা আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর সারা বিশ্বে যাঁরা ঈমানের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা আলোয় ঝলমল হয়ে আছেন, কিন্তু এ আলো তাঁদের নিজস্ব নয়, নিজস্ব আলো একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই। তিনিই সত্যিকার মোমেন, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বলেই এবং তাঁর নূরের আলোকে আলোকিত হবার কারণেই আমরা মোমেন হতে পারি। অতএব, আমাদের কাজ হলো তাঁর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় রাখা, তাঁর কাছ থেকে আলোকধারা লাভে সচেষ্ট হওয়া, তথা তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

পবিত্র কোরআনে এজন্যে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভালবাস, তবে শুধু আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ পাকও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে স্বীয় সম্পর্ক সর্বদা সুদৃঢ় রাখতে চেষ্টা করা। যদি তাঁর সাথে কারো সম্পর্ক না থাকে তথা তাঁর অনুসরণ না করা হয়, তবে তাঁর আলো থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। আর এ অবস্থায় মোমেন থাকা সম্ভব নয়।

যেহেতু জাগতিক সূর্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে এক অভিন্ন দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তাই পবিত্র কোরআনে উভয়ের জন্যে "সিরাজাম মুনীরা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যেভাবে সূর্য উদিত হবার পর কোন নক্ষত্রের কাছ থেকে আলো লাভ করা যায় না, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আর কারো নিকট থেকে হেদায়েতও পাওয়া যেতে পারে না। হেদায়েতের মূল উৎস তিনি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত আছে এবং চিরদিন থাকবে। তাই তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের বাস্তবায়নই এ জীবনে সাফল্য লাভ করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কামিয়াবীর পূর্বশর্ত।

পক্ষান্তরে, তাঁর সাথে সম্পর্কে শিথিল হলে অথবা কোন কাজে তাঁর অনুসরণ না করা হলে, তা আল্লাহ পাকের দরবারে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান অবলম্বন করবে, তা গ্রহণযোগ্য হবেনা, সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

অতএব, নাজাতের একমাত্র পথ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

আর যেভাবে জাগতিক সূর্য অস্তমিত হবার পর সমগ্র বিশ্বকে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়না; বরং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ এবং চন্দ্র পৃথিবীতে কিছু পরিমাণ আলো বিকীরণের দায়িত্ব পালন করে, ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তাঁর খলীফাগণ হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দান করেছেন, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। আর এজন্যেই তিনি পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

'আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা এদের মধ্য থেকে যারই অনুসরণ করবে, হেদায়েত লাভে সক্ষম হবে'।

আর সাহাবায়ে কেরামের পরও নিরাশ হবার কিছু নেই এজন্যে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিষ ছেড়ে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা এ দুটি জিনিষের অনুসরণ করবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি জিনিষ হলো (১) আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআন (২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

বস্তুতঃ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ বিশ্ব-গ্রন্থ পবিত্র কোরআন আজও আমাদের মাঝে রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর মহান বাণী বা সুন্নতে রসূল। তাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবনের পরম সাফল্য। আর এটিই 'সিরাজাম মুনীরা'র, তাৎপর্য যা সংক্ষিপ্তভাবে এখানে বর্ণিত হলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের তওফিক দান করুন।

যাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ রয়েছে

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এ নির্দেশের পূর্বে এরশাদ করেছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করেন। পবিত্র কোরআনের কোন্ আদেশের পূর্বে এমন কথা বলা হয়নি যে, এ কাজ আল্লাহ পাকও করেন অতএব, তোমরাও কর।

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আল্লাহ পাকের কালাম লক্ষ্য করুনঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্যে রহমতের দোয়া করে, হে মোমেনগণ! তোমরাও নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بما تحب وترضى بعده ما تحب وترضى

প্রিয়নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)প্রতি আদব

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষা করার নিমিত্তে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উচ্চস্বরে কথা না বলা হয়, এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"হে মোমেনগণ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলোনা"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

যাঁর আদেশ পালন একান্ত কর্তব্য

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে যে আদেশ প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, আর যে কাজ থেকে বিরত রাখেন, তা থেকে বিরত থাক"।

যাঁর অনুকরণে রয়েছে হেদায়েত

এমনিভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

অর্থাৎ যদি তোমরা রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর তবে সঠিক পথ পাবে।

মকামে মাহমুদ যাঁর জন্যে নির্দিষ্ট

কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করা হবে তার খোশখবরী রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং সেই উচ্চতর মর্যাদার নামকরণ করা হয়েছে "মকামে মাহমুদ", এরশাদ হয়েছেঃ

عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

"আশা করা যায় যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে মকামে মাহমুদে স্থান প্রদান করবেন"।

যাঁর আগমনের খোশখবরী দিয়েছেন হযরত ঈসা (আঃ)

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর্বিভাবের খোশ খবরী দিয়েছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) এবং তিনি একথাও বলেছিলেন, তাঁর নাম হবে আহমদ, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ খোশ খবরীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন

এভাবেঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

"এবং আমি এমন একজন রসূলের খোশখবরী দানকারী, যিনি আমার পর আগমন করবেন, যাঁর নাম হবে আহমদ"।

রউফ ও রহীম

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক নিজের গুণাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, নিজের জন্যে যে খেতাব পছন্দ করেছেন সেই একই শব্দ বা একই খেতাব প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেও ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক 'রউফুর রহীম' বলে দুটি গুণবাচক শব্দ নিজের জন্যে ব্যবহার করেছেন।

অথচ পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এ শব্দ দুটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেতাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্যে থেকে, তোমাদের জন্যে যা ক্ষতিকর, তা তাঁর নিকট অসহনীয়, আর তোমাদের উপকার সাধনের জন্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী, বিশেষতঃ মোমেনদের সাথে তিনি অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান"।

বস্তুতঃ এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য, তাঁর মাহাত্ম, এ পৃথিবীর কোন মানুষ তথা কোন নবী রসূলও এ মর্যাদা লাভ করেননি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজকে আল্লাহ পাকের কাজ বলে ঘোষণা করা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথাকে যেমন নিজের কথা বলে ঘোষণা করেছেনঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজকেও নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। হিজরতের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হানাদার দুশমনের প্রতি স্বহস্তে বালু নিক্ষেপ করেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সে ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"(হে রসূল!) আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, মূলতঃ আমিই মাটি নিক্ষেপ করেছি"।

এমনিভাবে যারা ৬ষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে জেহাদের বয়আত করেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন, মূলতঃ তারা আমারই হাতে বয়আত করেছেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

(সূরা ফাত্হ)

"নিশ্চয় (হে রসূল!) যারা আপনার হাতে হাত দিয়ে বয়আত করেছে মূলতঃ তারা আল্লাহ পাকের দরবারেই বয়আত করেছে, তাদের হাতের উপরে ছিল স্বয়ং আল্লাহ পাকের হাত"।

পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কিভাবে পেশ করেছে তার সঠিক ধারণা পেতে হলে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে। কেননা, পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিই এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যেন তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তা'যীম

পবিত্র কোরআনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষভাবে ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করার আদেশ প্রদত্ত হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তা'যীম, ভক্তি শ্রদ্ধা এবং সম্মানবোধের মাধ্যমেই তাঁর নিকট থেকে ফয়েজ ও হেদায়েত পাওয়া সহজ ও সম্ভব হবে, এজন্যেই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ

"যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁর তা'যীম কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর"।

অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন কর্তব্য, তেমনি তাঁর প্রতি আন্তরিক তা'যীম-তাকরীম তথা ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করা ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করাও একান্ত জরুরী।

এমনকি পবিত্র কোরআন একথাও ঘোষণা করেছে, যদি তাঁর প্রতি আদব-তা'যীম রক্ষার যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাতে কোন প্রকার কসুর হয়, তবে জীবনের যাবতীয় সৎ কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তথা বাতিল বলে গণ্য হবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রসূলকে এভাবে ডাক দিও না, যেভাবে একে অন্যকে ডাক দিয়ে থাক, এতে তোমাদের যাবতীয় সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা কিছুই জানতে পারবেনা।

এভাবে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান, উচ্চ মর্যাদা, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তাঁর মর্তবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে। এমনকি একথাও পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রসূলকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন মক্কার পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করে যে, চুক্তির শিরোনামে "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ" শব্দ থাকতে পারবে না, বরং "মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ" থাকতে হবে।

বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক, "রসূলুল্লাহ" শব্দটি হযরত আলী (রাঃ) লিখেছেন, এখন শর্ত মোতাবেক কেটে ফেলতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শান্তির

বৃহত্তর প্রয়োজনে তাদের শর্ত মেনে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ওহী নাযিল হলো, "(হে রসূল!) এ কাফেররা আপনাকে আল্লাহর রসূল মানেনা, তাতে কিছুই যায় আসেনা, কিন্তু আমি সারা বিশ্বে সর্বকালের মানুষের জন্যে ঘোষণা করছি, আপনি "আল্লাহর রসূল", পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

চিরন্তন ঘোষণা

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল, আর যারা তাঁর সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, আর নিজেদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত দয়াবান"।

পবিত্র কোরআনে এভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা, মাহাত্ম এবং তাঁর শান সম্পর্কে বহু আয়াতে ঘোষণা রয়েছে। পবিত্র কোরআনের মহান বাণী উপলব্ধি করতে হলে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আর তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে পবিত্র কোরআনের মর্মকথা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। মূলতঃ শুধু এ কারণেই পবিত্র কোরআনের আলোকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কোরআনে পাকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গ মোবারকের উল্লেখ

আল্লামা আবদুর রউফ মুনাদী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো, কোরআনে পাকে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন মুখমন্ডলের উল্লেখ রয়েছে সূরা বাকারার মধ্য ভাগে, এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

চক্ষু মোবারক সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

জবান মোবারক সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে,

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

হস্ত মোবারক সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ

বক্ষ ও পৃষ্ঠ মোবারক সম্পর্কে সূরা ইনশিরায় এরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ

এবং কলব্ মোবারক সর্ম্পকে এরশাদ হয়েছেঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ۝ عَلٰى قَلْبِكَ

মক্কী মদনী সূরা

নবুওয়্যত লাভের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে ১২ বছর ৫ মাস ২ দিন ছিলেন, এরপর তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন এবং ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন মদীনা শরীফে অতিবাহিত করার পর ১১ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন।

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে পবিত্র কোরআনের যে সমস্ত সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলোকে "মক্কী" সূরা বলা হয়। আর যে সব সূরা মদীনা শরীফে অবস্থানকালে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে "মদনী" সূরা বলা হয়।

আমরা কথাটিকে এভাবেও বলতে পারি যে, হিজরতের পূর্বে যে সব সূরা নাযিল হয়েছে, সে সূরা সমূহকে মক্কী সূরা বলা হয়। আর হিজরতের পর অবতীর্ণ সূরা সমূহকে মদনী সূরা বলা হয়। নিম্নে মক্কী মদনী সূরা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	কোথায় অবতীর্ণ
১।	সূরা আলাক	১৯	মক্কা শরীফ
২।	সূরা মুদ্দাস্‌সির	৩৫	,,
৩।	সূরা মুজ্জাম্মিল	৩০	,,
৪।	সূরা দোহা	১১	,,
৫।	সূরা ইনশিরাহ	৮	,,
৬।	সূরা ফালাক	৫	,,
৭।	সূরা নাস	৬	,,
৮।	সূরা ফাতেহা	৭	,,
৯।	সূরা কাফেরুন	৬	,,
১০।	সূরা এখলাস	৪	,,

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	কোথায় অবতীর্ণ
১১।	সূরা লাহাব	৫	,,
১২।	সূরা কাওসার	৩	,,
১৩।	সূরা হুমাজাহ্	৯	,,
১৪।	সূরা মাউন	৭	,,
১৫।	সূরা তাকাসুর	৮	,,
১৬।	সূরা লাইল	২১	,,
১৭।	সূরা কলম	৫২	,,
১৮।	সূরা বালাদ	২০	,,
১৯।	সূরা ফীল	৫	,,
২০।	সূরা কোরায়েশ	৪	,,
২১।	সূরা কদর	৫	,,
২২।	সূরা আত্ তারেক	১৭	,,
২৩।	সূরা আশ্ শামছ	১৫	,,
২৪।	সূরা আবাসা	৪২	,,
২৫।	সূরা আ'লা	১৯	,,
২৬।	সূরা আত্ তীন	৮	,,
২৭।	সূরা আসর	৩	,,
২৮।	সূরা বুরুজ	২২	,,
২৯।	সূরা ক্বারিয়া	১১	,,
৩০।	সূরা যিলযাল	৮	,,
৩১।	সূরা ইনফিতার	১৯	,,
৩২।	সূরা তাকভীর	২৯	,,
৩৩।	সূরা ইনশেকাক	২৫	,,
৩৪।	সূরা আদীয়াত	১১	,,
৩৫।	সূরা নাজিয়াত	২৪	,,
৩৬।	সূরা মুরসালাত	৫০	,,
৩৭।	সূরা নাবা	৪০	,,
৩৮।	সূরা গাশিয়াহ্	২৩	,,
৩৯।	সূরা ফাজর	৩০	,,
৪০।	সূরা কিয়ামাহ্	৪০	,,

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	কোথায় অবতীর্ণ
৪১।	সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন	৩৬	,,
৪২।	সূরা আল- হা-ক্কাহ	৫২	,,
৪৩।	সূরা জারিয়াত	৬০	,,
৪৪।	সূরা তুর	৪৯	,,
৪৫।	সূরা ওয়াকিয়াহ	৯৬	,,
৪৬।	সূরা নজম	৬২	,,
৪৭।	সূরা মাআ'রিজ	৪৪	,,
৪৮।	সূরা আর রাহমান	৭৮	,,
৪৯।	সূরা কমর	৫৫	,,
৫০।	সূরা সাফ্‌ফা-ত	১৮২	,,
৫১।	সূরা নূহ	২৮	,,
৫২।	সূরা দাহর	৩১	,,
৫৩।	সূরা দোখান	৫৯	,,
৫৪।	সূরা ক্বাফ	৪৫	,,
৫৫।	সূরা তোয়াহা	১৩৫	,,
৫৬।	সূরা শোয়ারা	২২৭	,,
৫৭।	সূরা হিজর	৯৯	,,
৫৮।	সূরা মরয়ম	৯৮	,,
৫৯।	সূরা ছোয়াদ	৮৮	,,
৬০।	সূরা ইয়াসীন	৮৯	,,
৬১।	সূরা যুখরফ	৮৯	,,
৬২।	সূরা জ্বীন	১৮	,,
৬৩।	সূরা মুলক	৩০	,,
৬৪।	সূরা মোমেনুন	১১৮	,,
৬৫।	সূরা আম্বিয়া	১১৩	,,
৬৬।	সূরা ফোরকান	৭৭	,,
৬৭।	সূরা বনী ইসরাঈল	১১১	,,
৬৮।	সূরা নমল	৯৩	,,
৬৯।	সূরা কাহফ	১১০	মদীনা শরীফ
৭০।	সূরা সেজদা	৫৪	,,

ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত সংখ্যা	কোথায় অবতীর্ণ
৭১।	সূরা হামীম আস সেজদা	৫৪	,,
৭২।	সূরা জাসিয়াহ	৩৭	,,
৭৩।	সূরা নাহল	১২৮	,,
৭৪।	সূরা রুম	৬০	,,
৭৫।	সূরা হুদ	১২৩	,,
৭৬।	সূরা ইব্রাহীম	৫২	,,
৭৭।	সূরা ইউসুফ	১১১	,,
৭৮।	সূরা মোমেন	৮৫	,,
৭৯।	সূরা কাসাস	৮৮	,,
৮০।	সূরা যুমার	৭৫	,,
৮১।	সূরা আনকাবুত	৬৯	,,
৮২।	সূরা লোকমান	৩৪	,,
৮৩।	সূরা শুরা	৫৩	,,
৮৪।	সূরা ইউনুস	১০৯	,,
৮৫।	সূরা সাবা	৫৪	,,
৮৬।	সূরা ফাতের	৪৫	,,
৮৭।	সূরা আ'রাফ	২০৬	,,
৮৮।	সূরা আহকাফ	৩৫	,,
৮৯।	সূরা আনআ'ম	১৬৬	,,
৯০।	সূরা রা'দ	৪৩	,,
৯১।	সূরা বাকারাহ	২৮৬	,,
৯২।	সূরা বায়্যেনাহ	৮	,,
৯৩।	সূরা তাগাবুন	১৮	,,
৯৪।	সূরা জুমআ	১১	,,
৯৫।	সূরা আনফাল	৭৫	,,
৯৬।	সূরা মোহাম্মদ	৩৮	,,
৯৭।	সূরা আলে-এমরান	২০০	,,
৯৮।	সূরা সফ্	১৪	,,
৯৯।	সূরা হাদীদ	২৯	,,
১০০।	সূরা নেছা	১৭৭	,,

১০১।	সূরা তালাক	১২	,,
১০২।	সূরা হাশর	২৪	,,
১০৩।	সূরা আহযাব	৭৩	,,
১০৪।	সূরা মুনাফিকুন	১১	,,
১০৫।	সূরা নূর	৬৪	,,
১০৬।	সূরা মুজাদেলা	২২	,,
১০৭।	সূরা হজ্ব	৭৮	,,
১০৮।	সূরা ফাত্হ	২৯	,,
১০৯।	সূরা তাহরীম	১২	,,
১১০।	সূরা মুমতাহেনা	১৩	,,
১১১।	সূরা নাছর	৩	,,
১১২।	সূরা হুজুরাত	১৮	,,
১১৩।	সূরা তওবা	১২৯	,,
১১৪।	সূরা মায়েদা	১২০	,,

সকল জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কোরআন

جميع العلم فى القران- لكن تقاصر عنه افهام الرجال

"সকল জ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কোরআন
তবে নাহি পারে লভিতে তা আদম সন্তান"।

কবির এ কথাটি মহাসত্য। যুগ যুগ ধরে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সত্য উপলব্ধি করেছেন এবং এ সত্যকে বিশ্ব-মানবের সম্মুখে তুলে ধরেছেন যে, মানুষের সকল জ্ঞানের মূল উৎসই হলো পবিত্র কোরআন। এমনকি, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির যুগেও একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত। পবিত্র কোরআনের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ কয়েকখানি আয়াত একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সূরা আলাকে এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۞ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ۞ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۞ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۞

'পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি মানুষকে এক বিন্দু রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, পাঠ কর, জ্ঞান অর্জন কর, তোমার প্রভু পরম দয়ালু, যিনি মানুষকে কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষ যা জানত না, তা তাদেরকে তিনি শিখিয়েছেন"।

এ আয়াতে সর্ব প্রথম জ্ঞান অন্বেষণের ও বিদ্যা অর্জনের তা'লিম রয়েছে। এরপর স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সমগ্র জগতের স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে তোমাদের মূর্খতা দূরীভূত করা এবং জ্ঞানের আলোকে তোমাদের অন্তরকে আলোকিত করা আদৌ কঠিন নয়। অতএব, মানুষ যা কিছু জানতো না তার জ্ঞান লাভ করেছে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আর সেই জ্ঞানের মাধ্যম হলো কলম।

এ সংক্ষিপ্ত আয়াত সমূহে মানব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত, আল্লাহ পাকের পরিচিতি, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি জগতে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান, এ জগতে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের পন্থা, এক কথায় এসব কিছুর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

মূলতঃ এ কয়েকটি কথাই দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। মানুষ সপ্ত সাগর মন্থন করে হাজার হাজার পৃষ্ঠা রচনা করে, বছরের পর বছর চিন্তা চর্চা ও গবেষণা করে যে জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তার সন্ধান রয়েছে পবিত্র কোরআনের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ কয়েকখানি সংক্ষিপ্ত আয়াতে।

এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের সূরা আর রাহমানের প্রথম দু' আয়াতও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, এরশাদ হয়েছেঃ

اَلرَّحْمٰنُ ۞ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۞ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞

"পরম দয়ালু আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন"।

সর্বাগ্রে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এরপরই তাকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে। সে জ্ঞান লাভ করছে পবিত্র কোরআনের। কিন্তু এ আয়াতে দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার প্রথম প্রতীক হলো পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, এরপর মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হতে পারে কেননা, মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে পবিত্র কোরআন। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত। জ্ঞানের বিষয় সমূহ অগণিত। কিন্তু এর প্রত্যেকটির মূল উপকরণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআনের আবেদন বিশ্বজনীন। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে পবিত্র কোরআনের অপূর্ব সুর লহরী মানব মনকে ঝংকৃত করে তুলেছে।

পবিত্র কোরআন উপহার দিয়েছে বিশ্ব মানবকে এক সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নতুন সমাজ ব্যবস্থা এবং নব জীবন পদ্ধতি, পবিত্র কোরআন দিয়েছে মানব জাতিকে আরেক নব জীবনের সন্ধান। এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সমূহ কল্যাণ। সকল উন্নতি-অগ্রগতি এবং প্রগতির মূর্ত প্রতীক পবিত্র কোরআন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন

কোন দিক রয়েছে যা পবিত্র কোরআনে নেই? মানুষের কল্যাণের এমন কোন পন্থা রয়েছে যার নির্দেশ পবিত্র কোরআন দেয়নি? মানব মনের এমন কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা রয়েছে যার জবাব পবিত্র কোরআনে নেই? মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা রয়েছে যার সমাধান পবিত্র কোরআনে নেই? কাজী আবুবকর মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ এবনে আরবী (রঃ) (মৃত্যু ৫৪২ হিঃ) লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআনে ৭০ হাজার এলম রয়েছে। বিগত ১৪শ' বছর ধরে ওলামায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার ব্যাপারে যে অক্লান্ত সাধনা করছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

যুগ-শ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে যে জ্ঞান-ভান্ডার রয়েছে তাকে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এ জ্ঞান সমূহের ভিত্তিতে সাধনায় রত হলে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হতে পারে।

(১) এলমুল আহকামঃ এতে যাবতীয় বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন স্থান পেয়েছে, হালাল হারাম বা বৈধ অবৈধ বিষয় সমূহের উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের ৫০০ আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

(২) এলমুল মুনাযিরাহঃ অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্র, যেহেতু বনী ইসরাঈল তথা-ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক এবং মুনাফেকদের ভ্রান্ত পথ ও মতের মোকাবেলায় পবিত্র কোরআনে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে, তাই পবিত্র কোরআনে রয়েছে তর্কশাস্ত্রের অশেষ জ্ঞান।

(৩) এলম বে আলাইল্লাহঃ মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম। তাই নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া।

(৪) অতীত ইতিহাসের এলমঃ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হক্ব ও বাতিলের সংঘাত অব্যাহত থাকবে, তাই স্বাভাবিক। তবে ইতিপূর্বে যে সব জাতি পথভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হয়ে তাদের নাফরমানী দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলেছে এবং অবশেষে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ৫০০ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

(৫) মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে তার এলমঃ মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে, কিন্তু এরপর কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনই দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে।

এমনিভাবে হযরত মাওলানা আবদুল হক্ব হক্কানী এলমে নাহু, এলমে ছরফ, এলমে তাজবীদ, এলমে মাআনী, এলমে বালাগাত, এলমে ফেকাহ, এলমে ফারায়েজ, এলমে তাসাওউফ সহ আরও বহু এলমের উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআন জ্ঞানের মহাসমুদ্র, যেভাবে সমুদ্রের অফুরন্ত ভান্ডার সারা জীবন আহরণ করেও শেষ করা যায় না, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনের মহাসমুদ্র থেকে জ্ঞান আহরণ করা হচ্ছে এবং আহরণ করা হতে থাকবে, এ জ্ঞান ভান্ডার কখনো নিঃশ্বেষ হবে না। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এই পবিত্র কোরআন। শাশ্বত, চিরন্তন, মহান, অনন্ত অসীম, অফুরন্ত তার জ্ঞান। সকল জ্ঞানের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরআন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর ও তরজমা

আরবীঃ

পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম, বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ এ মহাগ্রন্থে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ, সকল সমস্যার সমাধান। এজন্যে যুগে যুগে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বা তফসীর করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করার এ সাধনা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমরা এ পর্যায়ে কয়েকখানি বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ ও কয়েকজন তফসীরকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করবো।

১. জামেউল বয়ান বা তফসীরে তবরী

এ সুদীর্ঘ তফসীরখানি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও তথ্যপূর্ণ। এ তফসীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি আয়াতের তফসীর বা ব্যাখ্যায় সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তফসীরখানিতে আভিধাণিক, ব্যাকরণিক ও সাহিত্য সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইমাম এবনে জরীর তবরী (মৃত্যুঃ ৩১০ হিঃ) এ তফসীর লিখেছেন।

২. তফসীরে কাশ্‌শাফ

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ও পান্ডিত্যের অধিকারী আল্লামা জারুল্লাহ মাহমুদ বিন ওমর জমখশরীর লিখিত এ তফসীরখানি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ বলে সকলের নিকটই সমাদৃত। লেখক আকীদার দিক থেকে মোতাজেলী ছিলেন। ৮১৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. মাফাতিহুল গাইব বা তফসীরে কবীর

এ তফসীরখানি তফসীরের জগতে সব দিক থেকে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। লেখক হলেন ইমাম ফখরুদ্দীন ওমর রাযি। ইসলামী দর্শন সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্য নজীরবিহীন। মনীষীরা তাঁকে ইসলামী দর্শনের সম্রাট বলে স্মরণ করেন। তফসীরখানির ভাষা খুবই প্রাঞ্জল, প্রামাণ্য হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি এতে প্রচুর, ফেকাহ্ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে এতে। তফসীরখানিতে ইসলামী দর্শন সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। লেখকের সর্বাধিক কৃতিত্ব হলো সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানকে কোরআনে পাকের অধীন করে দিয়েছেন। ইমাম রাযি ৬০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৪. তফসীরে কুরতবী

তফসীর জগতে এটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইমাম আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতবীর এ মহামূল্যবান তফসীরখানি পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। মিশরের একটি প্রকাশনা সংস্থা কয়েকটি খন্ডে গ্রন্থটির অর্ধেক প্রকাশ করেছে, তা-ও দুঃস্প্রাপ্য।

৫. তফসীরে মা'আলিমুত্যানজিল

শাফেয়ী মাজহাবের বিজ্ঞ আলেম হোসাইন বিন মাসউদ (রঃ) কর্তৃক প্রণীত, হাদীস শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। মিশরে আট খন্ডে তফসীর খানি প্রকাশিত হয়।

৬. তফসীরে এবনে কাসীর

দামেস্কের অধিবাসী হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল বিন কাসীর-এর প্রণীত তফসীরখানি বর্তমানে চার খন্ডে প্রকাশিত। তফসীরখানিতে প্রামাণ্য হাদীসের অংশই বেশী।

৭. মাদারেকুত্যানজীল তফসীরে মাদারেক

এ তফসীরের প্রণেতা হাফেজুদ্দীন মাহমুদ, ইসলামী আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ইসলামী আকীদা সম্পর্কীয় তাঁর রচিত গ্রন্থ "আকায়েদে নসফী" মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

৮. আনওয়ারুত্যানযীল বা তফসীরে বায়যাভী

আবদুল্লাহ বিন ওমর বায়যাভী কর্তৃক রচিত তফসীরখানির অংশ বিশেষ মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৯. আল বাহরুল মুহীত

তফসীরকারের নাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ, ৬৫৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মোহাদ্দেস ও আরবী সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

১০. তফসীরে আবিস্যাউদ

আবু সউদ এমাদী কর্তৃক প্রণীত তফসীরখানি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত সমাদৃত, মিশর থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. তফসীরে রুহুল মাআনী

আবুল ফজল শাহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী (রঃ) (মৃত্যু ১২৭০ হিঃ)। এ তফসীর গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে সমভাবে সমাদৃত হয়েছে।

১২. তফসীরে আনওয়ারুল ফজর

কৃতঃ কাযী আবুবকর এবনুল আরাবী, মৃত্যু ৫৪৩ হিঃ। এ তফসীর গ্রন্থখানি ৮০. খন্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

উর্দুঃ

উর্দু ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর ও তরজমা অনেক হয়েছে। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান মোতাবেক উর্দু ভাষায় এ পর্যন্ত ৯২টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যায়ে যুগ-শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) এবং তাঁর বংশধরদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১৩. ১১৫০ হিজরীতে শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) ফার্সী ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

১৪. তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ রফিউদ্দিন (রঃ) ১২৪৯ হিজরীতে

১৫. এবং তাঁর ভ্রাতা শাহ আবদুল কাদের (রঃ) ১২৪২ হিজরীতে পবিত্র কোরআনের উর্দু ভাষায় সর্ব প্রথম অনুবাদ করেন।

১৬. হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রঃ) এবং হযরত মওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) যে অনুবাদ ও টীকা লিপিবদ্ধ করেন, তা সর্ব মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

১৭. বয়ানুল কোরআন

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) প্রণীত, এ তফসীর গ্রন্থখানি উপমহাদেশে সর্বত্র সর্বাধিক সমাদৃত এবং নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।

১৮. তফসীরে মাজেদী

মওলানা আবদুল মাজেদ (রঃ) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থে এ যুগের বহু প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। এতে তৌরাত এবং ইঞ্জিলের অনেক উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে, সংক্ষিপ্ত অথচ অতি মূল্যবান এ গ্রন্থখানি করাচি থেকে প্রকাশিত।

১৯. খোলাসাতুত্যাফাসীর

মাওলানা ফতেহ মোহাম্মদ সাহেব তফসীরখানি লিখেছেন। তফসীরকার যদিও উপমহাদেশে তত প্রসিদ্ধ নন, তবু বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর তফসীর গুরুত্বপূর্ণ।

২০. তফসীরে মাজহারী

উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) রচিত এ তফসীরখানি উর্দুতে অনুবাদ করেছেন মওলানা সৈয়দ আবদুদ্যায়েম আল-জালালী।

২১. মাআরিফুল কোরআন

সাম্প্রতিক সময়ে উর্দু ভাষায় রচিত সর্বোত্তম তফসীর গ্রন্থ। যুগ-শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেব (রঃ) কর্তৃক প্রণীত তফসীরখানিতে ইসলামী ফেকাহ সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২২. তরজমানুল কোরআন

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক প্রণীত। ডঃ সাইয়্যেদ আবদুল লতীফ হায়দরাবাদী এ তফসীরখানির ইংরেজী অনুবাদ করেন।

২৩. তফসীরে কাশফুর রহমান

আল্লামা আহমদ সাঈদ সাহেবের সুদীর্ঘ বিশ বছরের গভীর সাধনায় এ তফসীর খানি আত্মপ্রকাশ করে।

২৪. তফসীরে হাক্কানী

উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবদুল হক দেহলবী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত, এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে আয়াত সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শানে নুযুল।

ইংরেজীঃ

২৫. ইংরেজী ভাষায় পবিত্র কোরআনের সর্ব প্রথম অনুবাদ হয় ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদটি মূলতঃ ল্যাটিন অনুবাদের তরজমা।

২৬. অতপর মিঃ সেল ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অনুবাদ লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে পামার, পিকথল প্রমুখ অনেকেই ইরেজী ভাষায় পবিত্র কোরআনের তরজমা প্রকাশ করেন।

২৭. জনাব আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী সাহেবও ইংরেজী ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ ভাষা এবং বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ২৬ খানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়।

২৮. ফার্সীঃ যদিও ফার্সী ভাষায় পবিত্র কোরআনের বহু তফসীর ও তরজমা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে বিখ্যাত সাধক কবি হযরত শেখ সাদী (রঃ)-এর (৬৯১হিঃ) তফসীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। এটিকে ফার্সী ভাষার প্রথম তফসীরও মনে করা হয়।

২৯. হযরত শাহ আবদুল আজীজ কর্তৃক রচিত তফসীরও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। আমাদের জানা মতে, এ পর্যন্ত ফার্সী ভাষায় পবিত্র কোরআনের ৫২টি তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।

৩০. জার্মানঃ যদিও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি অনুবাদ, তবে জার্মানীর সুবিখ্যাত সংস্কারক, প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, মার্টিন লুথারই জার্মান ভাষায় সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনের তরজমা করেন।

৩১. ফ্রেঞ্চঃ ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে এম এড্রি ফ্রেঞ্চ ভাষায় পবিত্র কোরআনের সর্ব প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর আরও অনেক লেখক বিভিন্ন সময়ে পবিত্র কোরআনের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ প্রকাশ করেন।

৩২. ল্যাটিনঃ ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্রখ্যাত ধর্মযাজক পাদ্রী পিটার্স ল্যাটিন ভাষায় পবিত্র কোরআনের সর্ব প্রথম অনুবাদ করেন, যা কয়েক শতাব্দী পর ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিল এবং সুইজারল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তা ডাচ, জার্মান ভাষায়ও প্রকাশিত হয়।

৩৩. রুশঃ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকেই ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে রুশ ভাষায় কোরআন শরীফের সর্ব প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত রুশ ভাষায় ৩টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩৪. ইটালীঃ ইটালীয়ান ভাষায়ও কোরআন শরীফের অনুবাদ হয়েছে, সর্ব প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিস থেকে।

৩৫. চীনাঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর আরও অনুবাদ হয়েছে।

৩৬. হিন্দীঃ হিন্দী ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ১৮টি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায় সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয় ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে।

প্রথম তফসীর গ্রন্থ

পবিত্র কোরআনের তফসীর বিষয়ক সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)। মোস্তাদরাক নামক গ্রন্থে এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ছিল।

সর্বাধিক বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ সমূহ

"আল এস্তেগনা ফি উলুমিল কোরআন", রচনাঃ আল্লামা মোহাম্মদ এবনে আলী এবনে আহমদ আলী মক্করী আল হানাফী (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী)। এ তফসীর গ্রন্থখানি ১২০ খন্ডে রয়েছে। আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এ গ্রন্থখানি দেখেছেন। এতদ্ব্যতীত, এমনি আরও কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) কিতাবুত্যাহরীর ওয়াত্যাযয়ীজ; এ গ্রন্থখানি ৫০ খন্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(২) তফসীরে এবনুল যওজী; ২৭ খন্ডে সমাপ্ত।

(৩) তফসীরুল আওফাবী; ১২০ খন্ডে লিখেছেন রুমের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আওফাবী।

(৪) তফসীরুল ইসবেহানী; ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ তফসীরে কবীরের বহু স্থানে এ গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেছেন।

(৫) তফসীর সাবত ইবনুল জওজী; ৩০ খন্ডে রয়েছে।

(৬) কিতাবুল জামে ফিত্যাফসীর; ৩০ খন্ডে রয়েছে।

(৭) তফসীরুল কাজবিনী; ৩০০ খন্ডে সমাপ্ত।

(৮) তফসীরে হাদায়েকে যাতে বাহ্যাহ্; ৫০০ খন্ডে সমাপ্ত।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অমুসলিম পন্ডিতদের অভিমত

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই, বর্তমান অশান্ত বিশ্বের মানুষ গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পর পবিত্র কোরআনের মহান ও চিরন্তন সত্যের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই পৃথিবীর বহু দেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-চর্চা শুরু করেছেন। এ পর্যায়ে কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তির মতামত এখানে পেশ করছি।

অধ্যাপক পামার তার বিখ্যাত "Introduction to the Quran" নামক গ্রন্থে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলেছেন, "that the best of the Arab writers has never succeeded in producing anything equal in merit to the Quran".

অর্থাৎ "আজ পর্যন্ত আরবের কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকও কোরআনের সমকক্ষ সৌন্দর্য্যময় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সমর্থ হননি"।

কার্লাইল পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলেছেনঃ কোরআন শরীফে সাহিত্যের গুণ ছাড়া অন্য ধরণের গুণও আছে। কোরআনের ভাষা এবং বর্ণনা-ভঙ্গীর নিকট সমস্ত শিল্পকলা এবং সাহিত্যের কলা-কৌশল নিষ্প্রভ, আজ পর্যন্ত দেড় হাজার বছর ধরে কেউ কোরআনের ভাষার মত আরবী ভাষাকে এমন সার্থক ভাবে ব্যবহার করতে

পারেননি। কোরআন শক্তি সাহস ও ভাবের অভিব্যক্তিতে যে আরবী ভাষা ব্যবহার করেছে, তার অন্য কোন দ্বিতীয় নজির নেই।

প্রখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক গীবন তার "Decline and fall of the Roman Empire" নামক গ্রন্থে বলেনঃ "Quran is a glorious testmoney of the unity of God."

অর্থাৎ "পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ তাআলার অদ্বিতীয়তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন"।

পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এমন বহু অমুসলিম চিন্তাবিদ ও মনীষীদের উল্লেখ করা যায় এবং তাদের উদ্ধৃতিও দেয়া যায়।

স্যার উইলিয়ান মুইর বলেনঃ পবিত্র কোরআন স্বভাব, প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের দ্বারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ সত্ত্বা হিসেবে সপ্রমাণ করেছে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

অধ্যাপক এডওয়ার্ড জি ব্রাউন বলেনঃ আমি যতই কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করি, এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করি, ততই আমার মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বর্ধিত হয়।

মিঃ এমানুয়েল ডি এনশ বলেনঃ সমগ্র ইউরোপ যখন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন সেখানে কোরআনের আলোক রশ্মি প্রবেশ করে এবং তা গ্রীসের মৃত জ্ঞান ও বুদ্ধি সত্ত্বাকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে।

ডঃ জনসন বলেনঃ কোরআনের বক্তব্য এত সময়োপযোগী এবং সহজযোগ্য যে, মানব জাতি তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরকে দেখে দেখে সারা দুনিয়া কোরআনকে উপেক্ষা করছে।

অধ্যাপক আর, এ নিকলসন বলেনঃ কোরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা সমগ্র মুসলিম জাহানের মহিমান্বিত ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কোরআনই কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার ন্যায় জঘন্য রীতির চির অবসান ঘটিয়েছে।

মিঃ এইচ, এস, লিভার বলেনঃ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা থেকেই দর্শন ও বিজ্ঞান উৎসারিত হচ্ছে এবং এতে উন্নতির এমন স্বর্ণযুগের সূচনা করেছে যে, সমসাময়িক ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও ম্লান করে দিয়েছে।

মি. এ. ডি. মাবিল বলেনঃ ইসলামের শক্তি কোরআনেই নিহিত, কোরআন হচ্ছে আইনের উৎস এবং মানবাধিকারের শাশ্বত সনদ।

মিঃ ষ্টেনলি লেনপুল বলেনঃ একটি বিশ্ব জনীন ধর্মে যে সব উপাদান থাকা প্রয়োজন তা কোরআনে রয়েছে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্ত্বায় তা সমুজ্জ্বল।

এইচ, জি, ওয়েলস বলেনঃ কোরআন মুসলমানদেরকে এমন গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে যা বর্ণ, বংশ ও ভাষার সীমারেখা স্বীকার করেনা।

পাদ্রী ভলা বসান ডিডি বলেনঃ কোরআন আনীত ধর্ম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম।

গড ক্লিহেংস বলেনঃ কোরআন দরিদ্রের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু এবং ধনীদের অবিচারের কঠোর সমালোচক।

ডিন ষ্টোলী বলেনঃ কোরআনের আইন বাইবেলের আইনের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু যে সত্য এখানে বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য তা হলো, শুধু প্রশংসা কোন প্রকার উপকারী বা কার্যকরী হয় না যদি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ ও প্রকৃত ঈমান না থাকে।

এ জীবন ও পরজীবন তথা ইহজীবন ও পরকালীন জিন্দেগীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ঈমান হলো পূর্ব শর্ত, ঈমানই মানুষের রক্ষাকবচ। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদই হলো ঈমান। এটিই পবিত্র কোরআনের প্রথম আহবান এবং কোরআনের আলোকে এটিই মানবতার মূল ভিত্তি।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে পবিত্র কোরআনের আহবানে সাড়া দিতে হবে এবং মানবতার এ ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তথা বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। কেননা, এই ঈমানের মাধ্যমেই সৃষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। বন্দা তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়, আর এটিই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হলেই জীবন সংগ্রাম সার্থক সুন্দর ও সফলকাম হয়।

জর্জ বাণার্ড শ' বলেছিলেন, "বিশ্ববাসী, যদি তোমরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর জীবন ব্যবস্থা কামনা কর তবে সংসারের নিয়ন্ত্রণ ভার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে ছেড়ে দাও"।

সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও কবি 'গ্যাটে' তাঁর West oest licher Divan' নামক গ্রন্থে পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে মন্তব্য করতঃ বলেন, "However often we turu to it (Quran) at first disgusting us each time afresh, it soon attracts astounds and in the end enforces our reverence, its style, in accordance with its contents and aim is stern, grand, terrible-ever and truly sublime. Thus this book will go on Exercising through all ages a most potent influence".

"কোরআন প্রথমতঃ আমাদের মনে এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা সঞ্চার করে। কিন্তু অতঃপর অতি শীঘ্রই আমাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে নেয়। আমাদের হৃদয় মনে আলোক সম্প্রসারণ করতঃ অবশেষে তাকে সম্মান করতে আমাদেরকে বাধ্য করে"।

"মত এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী এর রচনাবলী অত্যন্ত জোরালো, উচ্চ এবং প্রভাবশীল। আমরা তা যতই পড়ি তার প্রতি ততই আকৃষ্ট হই এবং আমাদের অন্তরে তার প্রভাব অনুভব করি"।

বিখ্যাত আরবী ও ইংরেজী অভিধাণ প্রণেতা ডঃ ষ্টঙ্গাছ বলেন, "আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, দুনিয়ার মধ্যে কোরআন শরীফের সমকক্ষ কোন গ্রন্থই প্রণীত হয়নি"।

কারলাইল বলেন, "সর্বোতভাবে কোরআনের নিঃস্বার্থপরতা আমাকে তার গুণমুগ্ধ করে"।

পবিত্র কোরআনের শক্তি সম্বন্ধে ইম্যানয়েল ডাস বলেন, একটি পুস্তক যার সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডার অপেক্ষা রোম অপেক্ষা পৃথিবীর বৃহত্তর ভূভাগ জয় করতে সমর্থ হয়েছিল; রোমের যত শতক বছর লেগেছিল তার জয় সম্পূর্ণ করতে, আরবের লেগেছিল তত দশক, এরই সাহায্যে সমস্ত সেমিটিক জাতির মধ্যে কেবল আরবরাই এসেছিল ইউরোপের রাজা রূপে, যেখানে ফিনিশিয়রা এসেছিল বণিক রূপে আর ইহুদীরা এসেছিল পলাতক কিংবা বন্দী রূপে।

পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র কোরআনে মানব জাতির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এক কথায় সবই বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে যারা এ জগতের বুকে এসেছে তাদের ইতিবৃত্ত, উপদেশমূলক ঘটনাবলী, বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধান এবং ভবিষ্যত পরিস্থিতি এবং সে সম্পর্কে যথা কর্তব্য এতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের খাতিরে পবিত্র কোরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে, যা মানুষের অজানা, অদৃশ্য এবং নাগালের বাইরে, মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিসরের অনেক উর্দ্ধে, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যুগে যুগে একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, আজ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। যেমন, সূরা রুমের শুরুতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কোরআনের ভাষায়ঃ

الٓمٓ ۞ غُلِبَتِ الرُّوْمُ.....وَلٰكِنَّ اَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(সূরা রুমঃ ১-৬)

এ আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআন এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, আর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই পবিত্র কোরআনের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ, প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কোরআনে হাকীম যখন নাযিল হয় তখন পারশ্য এবং রোমে দু'টি বৃহৎ শক্তি ক্ষমতাসীন ছিল। রোমে ছিল খৃষ্টানদের রাজত্ব, আর পারশ্য ছিল অগ্নি পূজকদের নিয়ন্ত্রণে। ৬০২ থেকে ৬১৪ খৃষ্টাব্দের পরও এ দু' রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় এবং ৪০ বছরে অর্থাৎ ৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নবুওয়্যত লাভ করেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার বুকে ইসলাম প্রচার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসী তাঁর শত্রু হয়ে পড়লো। যেহেতু পারশ্যবাসী অগ্নিপূজক ছিল, তাই মক্কাবাসী তাদেরকে স্বগোত্রীয় মনে করতো। আর যেহেতু রোমবাসী খৃষ্টান বা আহলে কিতাব ছিল, তাই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু বিবেচনা করা হতো। ৬১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ নবুওয়্যতের পঞ্চম বছরে পারশ্য-রাজার নিকট রোমের রাজা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পারশ্যের সৈন্যরা রুমীদেরকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। রোমের রাজাকে তার রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করতে হয়। এ সংবাদে মক্কাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং তারা দম্ভ ভরে বলে, এমনিভাবে আমরা কোরআনের অনুসারী মুসলমানদেরকেও পরাজিত করবো। কয়েকজন কোরায়েশ হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলে, যেভাবে ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী রুমীদেরকে পারশ্যবাসী আজ পরাজিত করেছে ঠিক তেমনি আমরাও তোমাদেরকে পরাজিত করবো। এ সময় সূরা রুমের কয়েকখানি আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়ঃ যদিও আজ রুমীরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে (তিন থেকে নয় বছর) পারশ্যবাসীদেরকে রুমীদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হবে। কেননা, জয়-পরাজয় একমাত্র আল্লাহ পাকেরই ইচ্ছায় হয়। সেদিন মুসলমানগণ প্রাণ ভরে আনন্দ প্রকাশ করবে। অবশ্য তা আল্লাহ পাকের সাহায্য ক্রমেই সম্ভব হবে। আর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই সাহায্য করবেন এবং তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াময়। এটি হলো আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার। আর আল্লাহ পাক কোনদিন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অনেকেই তা জানে না।

পবিত্র কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণীর ঠিক ৯ বছর পর, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে একদিকে বদরের ঐতিহাসিক ময়দানে মুসলমানগণ হামলাকারী মক্কার কাফেরদেরকে পরাজিত করে, সত্য ও অসত্যের প্রথম মোকাবেলায় সত্যের জয় হয়, অসত্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে,

অন্যদিকে রোমের রাজা পারশ্য রাজাকে পরাজিত করে, এভাবে পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, যাঁর হাতে মানুষের ভবিষ্যত, যিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, তাঁর নিজস্ব কালাম হলো পবিত্র কোরআন, অতএব মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে ঘোষণা করার বা ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার একমাত্র অধিকারও তাঁরই। তাই পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী, এমনিভাবে রয়েছে অতীত কালের সঠিক এবং সত্য ইতিহাস।

হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণ ও তাঁদের সম্প্রদায়ের উপদেশমূলক ঘটনাবলীর বিবরণ পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا

"(হে রসূল!) এ সমস্ত গায়বী সংবাদ যা আপনার নিকট ওহী রূপে পাঠিয়ে থাকি, আপনি ইতিপূর্বে এ বিষয় কিছুই জানতেন না, আপনার সম্প্রদায় ছিল এ সম্পর্কে অজ্ঞ"।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যুগে যুগে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সূরা আল-ফাতেহা

সূরা আল-ফাতেহা

(মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৭, বাক্য ২৫, অক্ষর ১২৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহ পাকের নামে (আরম্ভ করছি)।

বিসমিল্লাহ'র ফজিলত

ফাজায়েলুল কোরআন

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত ওসমান (রাঃ) হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে 'বিসমিল্লাহ' সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এটি আল্লাহ পাকের নাম সমূহের অন্যতম। আর 'বিসমিল্লাহ'র সাথে এসমে আজমের এত নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে, যেমন চোখের সাদা এবং কালো অংশের সম্পর্ক। এ বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে এবনে হাতেমের তফসীরে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত উনিশ জন ফেরেশতা থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় সে যেন 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করে। এর প্রত্যেকটি অক্ষর এক একজন ফেরেশতা থেকে ঢাল স্বরূপ।

অন্য একখানি হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে আবু হোরায়রা! অজু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নেবে কেননা, অজু শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্যে নেকী লিখতে থাকবে। (আল-হাদীস)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ কর। যখন কোন যানবাহনের উপর আরোহণ কর তখনও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও আলহামদুলিল্লাহ পাঠ কর। ভ্রমণকালে তোমার প্রত্যেক পদক্ষেপে সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। তিনি আরও এরশাদ করেছেনঃ যে দোয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম থাকে, সে দোয়া ফেরত দেয়া হয়না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে,

তার জন্যে আল্লাহ পাক এর প্রত্যেকটি অক্ষরের বিনিময়ে ৪ হাজার নেকী দান করেন, ৪ হাজার গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার জন্যে ৪ হাজার মর্তবা বুলন্দ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ পাক একটি মহল তৈরী করেছেন, তার নাম হলো দারুন নূর। সে মহলের প্রত্যেকটি জিনিষই আল্লাহ পাক নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সে মহলটি উন্মুক্ত আকাশে অবস্থিত, তাতে প্রবেশের কোনও পথ নেই। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কিভাবে তাতে আরোহণ করা হবে? তিনি এরশাদ করেনঃ তখন বলা হবে, "তোমরা সকলে পড়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম", এরপর সকলে উড়ে যাবে সে মহলে।

তফসীরুল কোরআন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহ বাক্যটির 'বা' বর্ণটি একটি বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এজন্যেই তফসীরকারগণ লিখেছেন, সমস্ত আসমানী কিতাবে যা কিছু রয়েছে তা সম্পূর্ণ স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে, আর পবিত্র কোরআনে যা কিছু রয়েছে তা সংরক্ষিত রয়েছে সূরাতুল ফাতেহায়, আর এ সূরায় যা কিছু রয়েছে তা সন্নিবেশিত হয়েছে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমে। আর বিসমিল্লায় যা কিছু রয়েছে তা স্থান পেয়েছে, বিসমিল্লাহ'র "বা" বর্ণে। "বা" বর্ণের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এতদ্বারা একটি বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআন দ্বারা আল্লাহ পাকের সাথে তাঁর বন্দার সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়, আর বিসমিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে মোমেন মাত্রকে এ সম্পর্কের কথা প্রমাণ ও প্রকাশ করতে হয়।

"এসম" অর্থ নাম। "আল্লাহ" শব্দটি আল্লাহ পাকের ৯৯টি পবিত্র নামের মধ্যে সর্বাধিক মহান এবং সুপরিচিত, অর্থের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্ধারিত। এই শব্দটির বহুবচন নেই। কেননা, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়।

একবার আরবী ভাষার ব্যাকরণবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হলো যে, পৃথিবীতে সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন, সুপরিচিত, সুনির্দিষ্ট শব্দ কোন্‌টি? এতে কেউ মত প্রকাশ করলেন জান্নাত, জাহান্নাম, কেউ বললেন আসমান, আদম, প্রভৃতি। কিন্তু বিখ্যাত ভাষাবিদ আরবী ভাষার ব্যাকরণের ইমাম সিবাওয়াই মন্তব্য করলেন, পৃথিবীতে সকল যুগে, সকল, দেশ ও পরিবেশে সর্বাধিক সুপরিচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্ধারিত শব্দ হলো 'আল্লাহ'। তখন সকলেই তাঁর সাথে ঐক্যমত পোষণ করলেন।

কিছুদিন পর ইমাম সিবাওয়াইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর এক শিষ্য তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন? তিনি জবাবে বললেনঃ আমাকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হলে তিনি ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, তাকে বেহেশতের অনন্ত অসীম সুখ শান্তিতে রাখ। কেননা, আমি তাকে সেদিনই মাফ করে দিয়েছি যেদিন সে আমার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

রহমান-রাহীম শব্দ দুটিই আরবী ভাষায় "মোবালেগা" বা আধিক্য বাচক শব্দ। দুটি শব্দই "রহম" থেকে নিস্পন্ন, যার অর্থ দয়া। তবে "রহমান" শব্দটিতে মর্মের আধিক্য এবং ব্যাপকতা অনেক বেশী।

মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য

প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করার তাগিদ রয়েছে হাদীস শরীফে। এতে মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা, যে মুসলমান সে বিসমিল্লাহ পাঠের মাধ্যমে এক আল্লাহ পাকের প্রতি স্বীয় বিশ্বাস, ভরসা এবং ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের কথা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ পাকই তার শুরু আর আল্লাহ পাকের নিকটই তাকে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ ও মাতোয়ারা হয়ে, নিজেকে তাঁর বন্দেগীতে বিলীন করে দেয়ার মধ্যেই মোমেনের জিন্দেগীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য। মোমেন মহান দাতা আল্লাহ পাককে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তার ওঠা-বসায়, চলা-ফেরায়, পানাহারে, কথা-বার্তায় এক কথায় সকল অবস্থায় বিসমিল্লাহ বলে এক আল্লাহকে স্মরণ করে। পক্ষান্তরে, অমুসলিম দাতাকে ভুলে গিয়ে তাঁর দান নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

তাই কবি বলেছেনঃ

کافر کی یہ پہچان کہ افاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں اس میں افاق

মাসায়েলুল কোরআন

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা মোস্তাহাব। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরেও এ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক কাজ, যেমন গ্রন্থ রচনা শুরু করার সময় বা অজু করার সময় ও পানাহারকালে এবং জন্তু জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার বিধান রয়েছে। বিসমিল্লাহ সূরা নামলের একখানি আয়াত, তবে সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বরকতের জন্যে লিপিবদ্ধ হয়।

বিসমিল্লাহ যে সূরা ফাতেহার অংশ নয়, তার প্রমাণ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস, যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

হরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, তাঁরা বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পাঠ করেননি।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আউজুবিল্লাহ পাঠ করা, ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

অর্থাৎ "যখন তুমি কোরআনে করীম পাঠ কর তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা কর"।

প্রখ্যাত তফসীরকার আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বর্ণনা করেন, এভাবে মানুষের রসনা মন্দ কথার প্রতিক্রিয়া থেকে পবিত্রতা লাভ করে, শয়তান দূরে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহ পাকের আশ্রয় লাভ করে।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে "আউজু" পাঠ করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

পক্ষান্তরে, আতা এবনে আবি রোবাহ বলেন, পবিত্র কোরআন পাঠের সময় "আউজুবিল্লাহ" পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরে এ অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা এবনে সিরীন বলেন, সারা জীবনে একবার পাঠ করলে ওয়াজিব আদায় হয়।

ইমাম মালেক (রঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে যে, ফরজ নামাজে আউজু পাঠ করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর অভিমত হলো, "আউজু" উচ্চ স্বরে পাঠ করবে তবে নীরবে পাঠ করলেও ক্ষতি নেই।

আর ইমাম আহমদ এবনে হাম্বলের (রঃ) অভিমত হলো, সরবে বা নীরবে পাঠ করা পাঠকের ইচ্ছাধীন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে সরবে এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে নীরবে পাঠ করার নীতি বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, নামাজে "আউজু" পাঠ করা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট তেলাওয়াতের জন্যে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু ইউসুফের

মতে তা নামাজের জন্যে, এজন্যে তাঁর মতে মুক্তাদীকেও "আউজু" পাঠ করতে হবে।[১]

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোন মুসলমান যদি কাফেরদের দ্বারা নিহত হয় তবে সে শহীদ হয়, অমরত্ব লাভ করে। পক্ষান্তরে, এই অশরীরি শক্তি শয়তানের হাতে যে মৃত্যু বরণ করে, সে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িত হয়। তাই শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করার তা'লিম দেয়া হয়েছে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দু' ব্যক্তি কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। তন্মধ্যে একজন অত্যন্ত বেশী রাগান্বিত হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যদি সে "আউজুবিল্লাহি মিনাশ্যাইতানির রাজিম" পাঠ করে, তবে ক্রোধ দূরীভূত হবে।

মসনদে আহমদ, আবু দাউদ এবং তিরমিজীতে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে।

আ'মালুল কোরআন

(১) যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ৬শ' বার লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখবে, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের উপর সে ব্যক্তির প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, কেউ তার ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবে না। (শামসুল মাআরেফ)।

(২) যে ব্যক্তি কোন নেক মকসুদ হাসিলের জন্যে বিসমিল্লাহকে ১২ হাজার বার এভাবে পাঠ করবে যে, প্রত্যেক ১ হাজার বার পাঠ করার পর দু' রাকাআত নামাজ আদায় করে দোয়া করবে। এভাবে ১২ হাজার বার পাঠ করে দোয়া করলে, আল্লাহ পাকের রহমতে মকসুদ পূর্ণ হয় (দোরারু-ত্যানজীম)।

(৩) একবার রোমক সম্রাট খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে তার মাথা ব্যথার কথা জানিয়ে প্রতিকারের জন্যে আবেদন করেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তদুত্তরে টুপী তৈরী করে প্রেরণ করেছিলেন; যতক্ষণ এ টুপী মাথায় থাকতো ততক্ষণ মাথা ব্যথা হতো না। কিন্তু যখনই মাথা থেকে টুপি সরানো হতো, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা শুরু হতো, এ ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হয়। অবশেষে টুপি খুলে এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে তাতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১। এবনে কাসীর

(৪) জ্বরে আক্রান্ত লোকের গলায় অথবা বাহুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম লিখে দিলে আল্লাহ পাকের রহমতে জ্বর চলে যায়।

(৫) বুজুর্গানে দ্বীন একথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে ফজরের সুন্নত এবং ফরজের মধ্যে ১৯ বার বিসিমিল্লাহ পাঠ করতে হবে।

(৬) যে মহিলার সন্তান জীবিত থাকেনা সে যদি ৬১ বার বিসমিল্লাহ লিখে তাবীজ হিসেবে সঙ্গে রাখে, ইনশাআল্লাহ এর বরকতে আল্লাহ পাক সন্তান জীবিত রাখবেন। (দায়রবী)

(৭) ১০০ বার বিসমিল্লাহ লিখে ক্ষেতে-খামারে দাফন করে রাখলে আল্লাহ পাক সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে ফসলের হেফাজত করেন, ফসল বৃদ্ধি করে দেন।

(দায়রবী)

সূরা আল-ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

তরজমা

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

(২) যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(৩) যিনি শেষ বিচার দিনের মালিক।

(৪) আমরা তোমারই বন্দেগী করছি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।

(৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর।

(৬) তাঁদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ,

(৭) তাদের পথ নয়, যাদেরকে তুমি তিরস্কৃত করেছ বা যারা পথভ্রষ্ট।

সূরা ফাতেহার ফজিলত

তিরমিজী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি সেই আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি যাঁর কুদরতী হস্তে আমার প্রাণ রয়েছে, সূরা ফাতেহার ন্যায় কোন সূরা তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিলে নেই। এমনকি, পবিত্র কোরআনেও এমনি কোন সূরা নেই।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সূরা ফাতেহা পবিত্র কোরআনের দু' তৃতীয়াংশের সমান।[২]

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সূরা ফাতেহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মসনদে আহমদে হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাক দরবারে হাযির হই, তিনি তখন এস্তেঞ্জা সেরে আসছিলেন, আমি তখন তাঁকে তিনবার সালাম করি কিন্তু তিনি সালামের জবাব দানে বিরত থাকেন। এরপর তিনি তাঁর বাসভবনে গমন করেন, আর আমি চিন্তিত ও ব্যথিত অবস্থায় মসজিদে গমন করি।

একটু পর তিনি অজু করে মসজিদে তশরীফ আনয়ন করেন এবং তিনবার আমার সালামের জবাব দান করেন, অতঃপর এরশাদ করেনঃ হে আবদুল্লাহ এবনে যাবের! শ্রবণ করো, সমগ্র কোরআনের সর্বোত্তম সূরা হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

নামকরণ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ এ সূরার নাম সূরা ফাতেহা। "ফাতেহা" বলা হয় শুরু করাকে। যেহেতু পবিত্র কোরআনে সর্ব প্রথম এ সূরাই লিপিবদ্ধ হয়েছে বা এ সূরা দ্বারাই যেহেতু পবিত্র কোরআন শুরু করা হয়েছে এজন্যে এ সূরাকে "সূরা ফাতেহা" বলা হয়। এতদ্ব্যতীত, নামাজে সর্ব প্রথম এ সূরাটিই পাঠ করতে হয়, এজন্যেও এর নাম সূরা ফাতেহা বলে বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরার আরেকটি নাম হলো "উম্মুল কিতাব", অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ অভিমতই পোষণ করেছেন।

১। তফসীরে মাজহারী।
২। এতকান

তিরমিজী শরীফে বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে এরশাদ করেছেন, এ সূরাই উম্মুল কোরআন এবং উম্মুল কিতাব আর এ সূরার আরেকটি নাম হলো "সাবয়ে মাসানি"। এমনিভাবে এ সূরাকে সূরা আলহাম্‌দ এবং সূরাতুস্যালাতও বলা হয়। এ সূরার অন্য একটি নাম হলো "সূরাতুর রুকিয়্যাহ," অর্থাৎ ফুঁক দেয়ার সূরা। আর হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ সূরাকে "আসাসুল কোরআন" বলতেন, অর্থাৎ কোরআনের ভিত্তি বা বুনিয়াদ।

হযরত সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বর্ণনা করেনঃ এ সূরার আরও একটি নাম হলো "ওয়াফিয়াহ"।

আর ইয়াহয়া এবনে কাসীর বলেনঃ এ সূরার অপর নাম হলো "কাফিয়াহ", অর্থাৎ এ সূরাটিই যথেষ্ট।

আর এ সূরার অপর নাম হলো "সূরাতুল কানজ"।

বস্তুতঃ প্রত্যেকটি নামই তাৎপর্যবহ এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।

তফসীরুল কোরআন

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এ বাক্যটির দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

এ বাক্যটির জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আমার বন্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে "আলহামদুলিল্লাহ"র ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এ বাক্যটিকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। এ বাক্যটি আল্লাহ পাকের অতীব পছন্দনীয়।

এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। আকাশে-পাতালে, যমীনে-আসমানে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, সবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। অতএব, আল্লাহ পাকের এ অগণিত নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

এ কর্তব্য পালনের অতি সুন্দর তা'লিম ও তাগিদ রয়েছে এ বাক্যে, আল্লাহ পাক স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, তিনিই সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, আর তিনিই লালন-পালন করেন সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অনন্ত অসীম দয়াময় (এর ব্যাখ্যা 'বিসমিল্লাহ'র তফসীরে বর্ণিত হয়েছে)।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

বিচার দিনের মালিক, বিশেষ করে ঐ দিনের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, ঐ দিনের তুলনায় কোন দিন যেন দিনই নয়, কেননা ঐ দিন দুনিয়ার সকল মানুষের সারা জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। আর এ দিনই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে কে চিরসুখী, কে চিরদুঃখী।

সেই একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ঐ দিন আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জন কেউ কারো কোন প্রকার উপকার করতে সক্ষম হবে না। এমনকি, ঐ দিন নিকটতম আত্মীয় একে অন্যকে দেখে পলায়নপর হবে।

ঐ দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন নবীর পক্ষেও আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরযী পেশ করা সম্ভব হবেনা।

অতএব, সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে তজ্জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যদি আমার কোন উম্মতকে কোন নেয়ামত প্রদান করেন আর সে তজ্জন্যে "আলহামদুলিল্লাহ" পাঠ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে এ বাক্যটি সারা দুনিয়া থেকে উত্তম।

বিখ্যাত তফসীরকার কুরতবী বর্ণনা করেন, একথার তাৎপর্য হচ্ছে এই, সারা দুনিয়া লাভ করা এত বড় নেয়ামত নয়, যত বড় নেয়ামত "আলহামদুলিল্লাহ" বলার তওফিক পাওয়া। এক ব্যক্তি একবার এভাবে আল্লাহর হাম্‌দ প্রকাশ করলো,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! এর কি সওয়াব লিখবো? এরশাদ হলোঃ লেখ, আমার সাথে মোলাকাতের সময় তার বিনিময় আমি দান করবো। (তফসীরে এবনে কাসীর)

رب রবুবিয়ত থেকে নিস্পন্ন। এর আভিধাণিক অর্থ প্রতিপালন করা।

অতএব, রব হলেন প্রতিপালক বা পালনকর্তা।

العٰلمين। "আলম" শব্দের বহুবচন আলামীন অর্থাৎ জগৎ।

বস্তুতঃ সৃষ্টি মাত্রই এক একটি জগৎ, যেমন জীব-জগৎ, জড়-জগৎ, জ্বীন-জগৎ প্রভৃতি। অতএব رَبُّ العٰلمين-এর অর্থ হলো সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির পালনকর্তা। এতে একথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ

"হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমার বন্দেগী করি"।

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

"এবং তোমারি নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি"।

তফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেনঃ সমগ্র কোরআনের রহস্য সূরা ফাতেহায় রয়েছে, আর সূরা ফাতেহার রহস্য রয়েছে এ দুটি বাক্যে। প্রথম বাক্যে শেরক বা অংশীবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যটিতে নিজের শক্তিহীনতা প্রকাশ করা হয়েছে এ মর্মে যে, হে আল্লাহ! তোমার বন্দেগীর হক্ব আদায়ের শক্তি আমাদের নেই, তোমার তওফিক ব্যতীত তা সম্ভবও নয়। অতএব, তোমারি সাহায্য প্রার্থনা করি, এ সাহায্য প্রার্থনার প্রথম পর্বে আল্লাহ পাকের নিকট (তাঁরই শেখানো) দরখাস্ত হলো,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

হে আল্লাহ! জীবন-সংগ্রামে আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। কেননা, আল্লাহ পাকের হেদায়েত ব্যতীত সরল সঠিক পথ লাভ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ বন্দার এ দরখাস্তের কারণেই আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী গ্রন্থ সমূহ। এখন প্রশ্ন হলোঃ সিরাতুল মুস্তাকীম কোন্‌টি? জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যাঁরা তোমার নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে। তাঁদের পথ-যাঁরা আল্লাহ পাকের কৃপা-ধন্য হয়েছেন, তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ, সালেহ (পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এই চার দল লোকের উল্লেখ রয়েছে)।

সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ আরও অধিকভাবে চিহ্নিত হয়েছে এ আয়াতেঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়েছে, যারা হয়েছে পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়। তারা হলো অভিশপ্ত ইহুদী জাতি এবং বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট খৃষ্টান জাতি। এ দু' জাতি সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর "আমীন" বলা মুস্তাহাব। এর অর্থ হলো "কবুল কর"। হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর "আমীন" বলেছেন।

আল্লামা এবনুল যওজী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ শরহুল কুলুবে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে বললেন, হে রসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিচ্ছেন এবং এরশাদ করেছেন, যে কোন বন্দা যখন

নামাজের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হয়ে "আল্লাহু আকবর" বলে তখন আমার এবং ঐ বন্দার মধ্যকার পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়। যখন বন্দা বলে, اَلْحَمْدُ অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা" তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "কার জন্যে প্রশংসা"? তখন সেই নামাজী ব্যক্তি বলে, لِلّٰه অর্থাৎ "আল্লাহর জন্যে"। তখন আল্লাহ পাক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ কে? তাঁর পরিচয় কি?" তখন নামাজী ব্যক্তি বলে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক। তখন আল্লাহ পাক পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "বিশ্ব প্রতিপালক কে"? তখন বন্দা আরজ করে, الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। অর্থাৎ পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময়। তখন আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেন, "কে অনন্ত অসীম দয়াময়"? নামাজী ব্যক্তি বলে, مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ বিচার দিনের মালিক। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ হে আমার বন্দা! আমি বিচার দিনের মালিক। তখন বন্দা আরজ করে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। অর্থাৎ শুধু তোমারই বন্দেগী করি, আর শুধু তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "হে আমার বন্দা! তুমি আমারই বন্দেগী কর আর আমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর"। তখন বন্দা বলে, اِهْدِنَا। অর্থাৎ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন কর। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "সরল সঠিক পথ, কোন্ পথ তুমি চাও"? তখন বন্দা বলে, তাঁদের পথ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি আমার বন্দাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছি, যাদেরকে আমি পুরস্কৃত করেছি" তথা নবীগণ এবং শহীদগণ ও নেককারগণ। তখন বন্দা বলে, তাদের পথ নয় যাদেরকে তুমি তিরস্কৃত করেছ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে পুরস্কৃত বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছি আর কোপগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিনি"। তখন বন্দা বলে "আমীন', অতঃপর ফেরেশতাগণও বলে "আমীন"।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনকে শুরু করেছেন হাম্‌দ দ্বারা। তাই এরশাদ হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এরপরই তিনি الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। সংযোজন করেছেন। কেননা, আল্লাহ পাকের শানে হাম্‌দ পেশ করার মহান দায়িত্ব পালনের আহবানে বন্দাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং নিজেদেরকে এ দায়িত্ব পালনের অযোগ্য মনে করবে।

মানুষের মনের এ ভয়-ভীতি দূর হয় রহমানির রাহীম শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে এবং তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে।

মাসায়েলুল কোরআন

ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, মুক্তাদীর জন্যে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়।

পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব। ইমাম হোক কি মুক্তাদী সকলের জন্যেই এ নির্দেশ। এমনকি, যে একাকী নামাজ আদায় করে তার জন্যেও। তবে মসবুকের জন্যে ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ যে মুসল্লী ইমামকে এমন অবস্থায় পায় যে তখন সূরা পাঠ করার কোন সুযোগ না থাকে।

আর ইমামে আজম আবু হানিফার (রঃ) মতে, নামাজে পবিত্র কোরআন পাঠ করা ফরজ। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন থেকে যা সহজ হয়, তা পাঠ কর।

আর যেহেতু হাদীস শরীফে রয়েছে, যে সূরা ফাতেহা পাঠ করেনা, তার নামাজ হয় না।

এজন্যে সূরা ফাতেহা পাঠ না করায় সেজদায়ে সহু অবশ্য কর্তব্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), ইসহাক, সুফিয়ান সওরী (রঃ), এবনে শেহাব জুহরী (রঃ), ইব্রাহিম নখয়ী (রঃ), আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীন এবং অনেক সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মতে, মুক্তাদী আলহামদুলিল্লাহ পড়বেনা।

"আমীন" সম্পর্কে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এটি পবিত্র কোরআনের অংশ নয়। তবে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর "আমীন" বলা সুন্নত।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), সুফিয়ান সওরী (রঃ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, "আমীন" নিম্নস্বরে উচ্চারণ করা উত্তম।

আ'মালুল কোরআন

১. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতেহা ৪০ বার পাঠ করে পানির উপর দম করে কোন জ্বরে আক্রান্ত লোকের মুখমন্ডলে ছিটিয়ে দিলে, আল্লাহ পাক এ সূরার বরকতে জ্বর দূরীভূত করে দেন।

২. ফজরের নামাজের সুন্নত ও ফরজের মধ্যে ৪১ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে ফুঁক দিলে চোখের ব্যথা দূর হয়। অন্যান্য রোগের জন্যেও এ আমল উপকারী হয়।

৩. রাতের শেষ প্রহরে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করলে আল্লাহ পাক রিয্ক বৃদ্ধি করে দেন।

৪. গোলাপ, জাফরান এবং কস্তুরী দিয়ে চিনির রেকাবীতে এ সূরা লিপিবদ্ধ করে তার ধোয়া পানি ৪০ দিন পর্যন্ত রুগ্ন ব্যক্তিকে পান করালে রোগ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

৫. দাঁতের ব্যথা, পেটের ব্যথা, মাথা ব্যথার জন্যে ৭ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে দম করলে আল্লাহ পাক ব্যথা দূর করে দেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সূরা বাকারাহ

(মদীনা মোনাওয়্যারায় অবতীর্ণ, আয়াত-২৮৬, রুকু-৪০)

শানে নুযুল

এ সূরার শানে নুযুল হলো, মালিক এবনে সাইক নামক জনৈক ইহুদী পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার করতো যে, এই কোরআন সেই পবিত্র গ্রন্থ নয়, যার অবতীর্ণ হওয়ার সুসংবাদ ইতিপূর্বে বিভিন্ন আসমানী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ দূরীভূত করার জন্যে এ আয়াত নাযিল হয়, এতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, এই কিতাবে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এ ঘোষণার পরই মুসলমানদের প্রশংসা এবং শুভ-পরিণতির কথা স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা অবিশ্বাসী বা মুনাফেক, তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ফাজায়েলুল কোরআন

সূরা বাকারার ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে, ইমাম বায়হাকী এই হাদীস সংকলন করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ পাঠ করবে, তাকে বেহেশতে মুকুট পরানো হবে।

হযরত সাহল এবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক জিনিষের উচ্চতা রয়েছে, আর কোরআন শরীফের উচ্চতা হলো সূরা বাকারাহ। কোন বাড়ীতে যদি কোন দিন এ সূরা পাঠ করা হয়, তবে তিন রাত পর্যন্ত সে বাড়ীতে শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেনা।

এ দুটি (সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারা) সূরাই অত্যন্ত উজ্বল। কেয়ামতের দিন এর পাঠকদেরকে আবরের আকৃতি ধরে ছায়া দান করবে এ দুটি সূরা।

সূরা বাকারাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓمّٓ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى

لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ

اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٤

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥

তরজমা

(১) আলিফ, লাম, মীম।

(২) এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক সেসব খোদা ভীরু লোকদের জন্যে।

(৩) যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে আর তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।

(৪) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে সেই কিতাবের প্রতি যা, আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর সেই কিতাবের প্রতিও যা, আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা সুনিশ্চিত বিষয় বলে বিশ্বাস করে।

(৫) তারাই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের হেদায়েতের উপর আর তারাই হবে সফলকাম।

সূরা ফাতেহার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক

সূরা ফাহেতার সাথে সূরা বাকারার সম্পর্ক এই, সূরা ফাতেহাতে বন্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের জন্যে আরযী পেশ করেছে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। তাই সূরা বাকারার শুরুতেই এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শক খোদা-ভীরু লোকদের জন্যে"।

অতএব, সূরা ফাতেহায় হেদায়েতের যে দরখাস্ত করা হয়েছে তা মঞ্জুর হওয়ার খোশখবরী রয়েছে সূরা বাকারার প্রারম্ভে।

তফসীরুল কোরআন

الٓمّٓ ۝

আলীফ লাম মীম।

এ অক্ষর গুলোকে "মোকাত্তায়াত" বলা হয়। পবিত্র কোরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

কেউ কেউ বলেছেনঃ "আলীফ" আল্লাহ শব্দ থেকে, "লাম" জিব্রাঈল শব্দ থেকে আর "মীম" মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটিই এ অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ, একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

এ অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে। পবিত্র কোরআনের গোপন বিষয় হলো "মোকাত্তায়াত", যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে।

আর হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে, পবিত্র কোরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষর সমূহ।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এই কিতাব, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহ নাই।

কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে তা দু' কারণে হয়।

প্রথমতঃ যে বিষয়ে সন্দেহ হলো সে বিষয়ে সন্দেহের কোন উপকরণ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ সন্দেহকারীর বুদ্ধির অভাবে তথা বোঝার ভুলের কারণেও সন্দেহ হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে সন্দেহের প্রথম কারণ যে নেই, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম, এর প্রত্যেকটি বিবরণ ধ্রুব সত্য এবং সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কোন অবিশ্বাসী ব্যক্তি পবিত্র কোরআনে ব্যাপারে সন্দেহ করে, তবে তা সেই সন্দেহকারীর দোষে, পবিত্র কোরআনের কোন বিষয়ের জন্যে নয়।

এ সন্দেহকারীদের জবাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

"(অর্থাৎ) আমার বন্দার প্রতি যে পাক কালাম নাযিল করেছি, তার ব্যাপারে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর, তবে তার অনুরূপ কোন সূরা তোমরা উপস্থাপন কর"।

পবিত্র কোরআন যেহেতু আল্লাহ পাকের নিজস্ব জিনিষ, তাঁর পাক কালাম, তাই এতে সন্দেহের প্রশ্ন অবান্তর, একথা ঘোষণা করার পরই এরশাদ হয়েছে, অর্থাৎ এ পবিত্র গ্রন্থ হলো–

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۝

অর্থাৎ খোদা-ভীরু লোকদের জন্যে পথ-প্রদর্শক।

মূলতঃ হেদায়েত তো সকলের জন্যেই কিন্তু পরহেযগার ব্যতীত কেউ পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত এমন, সুখাদ্য সকলেরই প্রিয় কিন্তু যে রুগ্ন তার পক্ষে সুখাদ্য দ্বারা সুস্বাস্থ্য লাভ করা সম্ভব হয় না।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআন সকলের জন্যেই হেদায়েতকারী কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে স্বচেষ্ট হয়, শুধু তারাই পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সত্যিকার ধর্ম ভীরু কারা? যাদেরকে পবিত্র কোরআন মুত্তাকী আখ্যা দিয়েছে তাদের গুণাবলী কি? এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা জরুরী।

পবিত্র কোরআনের আলোকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ভয় পোষণ করা এমনি একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জিন্দেগীর পরম সাফল্য এনে দেয়।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়েত লাভ করা এবং পরকালীন জিন্দেগীর চিরমুক্তি অর্জন করা তাকওয়া বা পরহেযগারী অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় তখন সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হয়, আল্লাহর হুকুম পালনে, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশে মশগুল হয়।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তাকওয়ার" তাৎপর্য কি?

তিনি বলেছিলেন, আপনি কি কখনো কাঁটাবনের উপর দিয়ে চলাফেরা করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ কিভাবে কাঁটাবনের উপর দিয়ে হেঁটেছেন? তিনি বললেনঃ পায়ের পাতাকে সোজা করে আঙ্গুলের উপর ভর করে কোন প্রকারে কাঁটা থেকে আত্মরক্ষা করেছি।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বললেনঃ ঠিক এভাবে যদি গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার সাধনা করা হয় এবং সংযম চর্চা করা হয়, তারই নাম তাকওয়া বা পরহেযগারী। আর এমন সব লোকদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

(সূরা আলে এমরান)

"হ্যা, যারা স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক খোদা-ভীরু লোকদের পছন্দ করেন"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

"এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুত্তাকী বা পরহেযগার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন"।

আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনে ঈমান বা বিশ্বাস অর্জনের পরই তাকওয়ার গুণ অর্জনের তাগিদ করা হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অর্থাৎ যখন ঈমানের সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়েছ তখন তাকওয়া বা পরহেযগারীর গুণও অর্জন কর। কেননা, ঈমানের বহিঃপ্রকাশ হয় তাকওয়া-পরহেযগারীর মাধ্যমে, আর ঈমান লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিই হলো তাকওয়া-পরহেযগারী, এজন্যেই পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের জন্যে তাকওয়া অবলম্বনের শর্তারোপ করা হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

এই কিতাব পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকী বা পরহেযগারী অবলম্বনকারীদের জন্যে, সমাজের এই প্রকার লোকদের পরিণামই শুভ এবং তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কামিয়াবী। পবিত্র কোরআনে একথাটিকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"আর শুভ-পরিণতি তো শুধু পরহেযগার লোকদের জন্যেই"।

আল্লাহকে ভয় করার মর্মে পবিত্র কোরআন "তাকওয়া" ব্যতীত আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেছে তা হলো "খাশিয়্যত", এ শব্দটিও আল্লাহর ভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

"নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে না দেখা অবস্থায়, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং বিরাট বিনিময়"।

শুধু তাই নয়, বরং জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভের জন্যেও আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণকে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

"নিশ্চয় সে মোমেনগণই সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়েছে"।

অতএব, হেদায়েত লাভ বা জীবনের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য অর্জনের জন্যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় করা কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

আ'মালুল কোরআন

الٓمّٓ। থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দিন সকালে পাক প্লেটে লিপিবদ্ধ করে কূপের পানি দ্বারা ধৌত করে পান করতে হয়, এ দিন আর কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করবে না, রাত্রে পুনরায় এই পানি পান করবে এবং দিনে রোজা রাখবে, এভাবে তিন দিন কি পাঁচ দিন আমল করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেছেন, সূরা বাকারার আরও একটি পরীক্ষিত আমল রয়েছে তাহলোঃ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিলে সকাল বেলা

শিশুদেরকে সম্মুখে রেখে, এ সূরাটি অত্যন্ত ভালভাবে কেরাতের সঙ্গে পাঠ করতে হবে, নিজের উপর এবং শিশুদের উপর দম করতে হবে, আল্লাহর ফজলে এক বছর বসন্ত রোগ থেকে এ সূরার বরকতে আল্লাহ পাক রক্ষা করবেন। তবে শর্ত হলো আড়াই পোয়া চাউলের মিষ্টি পাক করে মিসকীনদের মধ্যে তখনই বিতরণ করতে হবে এবং কমপক্ষে দু'জন মিসকীনকে নিজের সম্মুখে রেখে খাওয়াতে হবে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"(মুত্তাকী বা পরহেযগার লোক তারা) যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে"।

يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করে অদৃশ্য বিষয় সমূহের উপর। যেমন শেষ বিচারের দিনের কথা, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা প্রভৃতি অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। এ পর্যায়ে ঈমানের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ঈমান হলো আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা স্বীকার করা।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ ও রসূলের বিধান মোতাবেক আমল করার নামই ঈমান।

রুবাই-এবনে-আনাস বর্ণনা করেনঃ এ আয়াতে ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা।

বিখ্যাত তফসীরকার এবনে জরীর বর্ণনা করেনঃ তিনটি কথাকে একত্রিত করার মাধ্যমেই ঈমানের ব্যাখ্যা করা যায়। আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মনে প্রাণে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এ বিশ্বাসের কথা মুখে স্বীকার করা এবং স্বীয় কার্যাবলীর মাধ্যমে এই ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপিত করা। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা।

অতএব, বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি এক, অদ্বিতীয়, সকল ত্রুটি বিবর্জিত, তিনি সর্ব গুণাকর। তিনি সর্বশ্রোতা, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনিই বিশ্ব সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্ব-জগতের লালন-পালন করেন, তিনি সর্ব শক্তিমান, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন তাঁর বন্দেগীর জন্যে। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন প্রেমাস্পদ নেই। আনুগত্য লাভের যোগ্য হলেন একমাত্র অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ রব্বুল

আলামীন। তিনি প্রেমময়, তিনি করুণাময়। তিনি অনাদী-অনন্ত, চির সুন্দর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন। আশা করতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে, আর ভরসা রাখতে হবে শুধু তাঁরই প্রতি, তিনি সর্বজ্ঞাত, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানুষকে তিনিই আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অনেক সৃষ্টিকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। মানুষকে অবশেষে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে এবং তার সারা জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে। সৎ কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের হেদায়েতের জন্যেই আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি ও মহব্বত রাখা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর মহান আদর্শের অনুসরণ করা ঈমানের প্রমাণ। মানুষের হেদায়েতের জন্যেই আল্লাহ পাক চারখানি আসমানী কিতাব এবং শতাধিক সহীফা নাযিল করেছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষার বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা, আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা, জান্নাত ও দোযখের প্রতি বিশ্বাস করা– এসবই ঈমান বিল গায়বের অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের এ মানদন্ডে বিচার করলে পৃথিবীর সকল যুগের সকল মানুষকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক দল যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়, ঈমানের শর্ত সমূহ পালন করে, তাঁরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, রেজামন্দি, নৈকট্য এবং সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। ফলে চিরস্থায়ী শান্তির কেন্দ্র জান্নাতে স্থান পায় এবং চিরসুখী হয়। আর দ্বিতীয় দল যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না; বরং আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করে। আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের সত্যতা অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি চির অবধারিত. পরিণাম শোচনীয়।

অতএব, মানব জীবনে আল্লাহর প্রতি ঈমান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ চিরসুখী হবে কি চিরদুঃখী হবে, এর সিদ্ধান্ত হয় ঈমানের কারণে। বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ বলেই পবিত্র কোরআনের প্রারম্ভে আল্লাহ পাক এর উল্লেখ করেছেন এবং পবিত্র কোরআনের হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে ঈমানকে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মুখে ঈমানের দাবীদার হওয়া যথেষ্ট নয়, যদি কর্মের মাধ্যমে সে ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন না করা হয়। এজন্যে পবিত্র কোরআনে এর পরবর্তী বাক্যে নামাজ কায়েম করার তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

"আর যারা নামাজ কায়েম করে"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন তাদের জন্যে পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেই বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ যথারীতি নামাজ কায়েম করে তথা নামাজের যাবতীয় শর্ত সমূহ পালন করে। যথাঃ রুকু, সেজদা, তেলাওয়াত এবং মনের একাগ্রতা, নামাজের যাবতীয় আরকান-আহকাম কায়েম করা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, নামাজের সময়ের খেয়াল রাখা, খুব ভালভাবে অজু করা, রুকু-সেজদার আদব রক্ষা করা– এসবই হলো একামতে সালাতের তাৎপর্য।

ঈমানের পর মুসলমানের সর্ব প্রধান কর্তব্য হলো যথা নিয়মে যথা সময়ে নামাজ আদায় করা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর মাধ্যমে। কেননা, ঈমানের পরই নামাজের উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়, এর দ্বারা ফেরেশতাদের ভালবাসা লাভ হয়, এটি আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত, আর এই নামাজ দ্বারা মা'রেফাতের নূর হাসিল হয়, ঈমানের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া মঞ্জুর হয় এবং আমল কবুল হয়।

এমনিভাবে নামাজের মাধ্যমে রিয্‌কে বরকত হয়, আর দুশমনের বিরুদ্ধে নামাজ হলো হাতিয়ার এবং নামাজ শয়তানের অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আর নামাজী ব্যক্তি ও যমদূত হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর মধ্যে নামাজ হয় সুপারিশকারী। আর নামাজীর অন্তরে নূর পয়দা হয় এই নামাজের মাধ্যমে। নামাজ মুনকের নকীরের প্রশ্নের জবাবকে সহজ করে দেয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই নামাজ সেই ব্যক্তির জন্যে তার কবরের সাথী এবং সাক্ষাত হয়। যখন কেয়ামত কায়েম হবে তখন নামাজ তার উপর ছায়া দান করবে এবং তার মাথার মুকুট হবে, আর ভূষণ হবে তার দেহের এবং নূর হবে যা তার সম্মুখে থাকবে, আর নামাজী ব্যক্তির মধ্যে ও দোযখের মধ্যে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দরবারে মোমেনদের জন্যে দলিল হবে এবং নেক আমলের পাল্লাকে ভারী করবে এবং পুলসেরাত পার হওয়া সহজ করবে। আর জান্নাতের জন্যে চাবি হিসেবে পরিগণিত হবে।

আল্লাহ পাকের সাথে তাঁর বন্দার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম হলো নামাজ। মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার সমীপে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হয় নামাজের সময়। তাঁর স্মরণে বিভোর ও তন্ময় হয়ে থাকে নামাজে রত হয়ে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ

আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শপথ গ্রহণ করে তাঁর মহান দরবারে চরম ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে নামাজের মাধ্যমে। অন্তরের সকল ভক্তি-শ্রদ্ধা, আল্লাহর প্রতি প্রেমের গভীরতা ও তন্ময়তা ও মনের সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে মানুষ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হয় তখন সে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়, তার হৃদয় মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, সে তাঁর সমীপে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। নামাজের এমনি মাহাত্ম রয়েছে বলেই পবিত্র কোরআনে এর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

(সূরা বাকারাহ্)

"এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক স্বীয় বন্দাদের উপর যে সমস্ত কর্তব্য আরোপ করেছেন, তন্মধ্যে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হলো নামাজ।

বস্তুতঃ এ নামাজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ জীবনে শান্তি এবং পরকালীন জিন্দেগীর চির মুক্তি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ যে নামাজে মন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির না হয়, সে নামাজের দিকে আল্লাহ্ পাক দৃষ্টিপাতও করেন না।

বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ সুফীয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, নামাজের সময় যার মনে ভয়-ভীতি, বিনয় ও মিনতিপূর্ণ ভাবের উদ্রেক না হয় তার নামাজই শুদ্ধ নয়।

আর প্রখ্যাত সাধক বুজুর্গ হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ যে নামাজে মন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির না হয়, সে নামাজ শাস্তির নিকটবর্তী।

এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

"সে সব মোমেনগণ অবশ্যই সফলকাম, যারা তাদের নামাজে সন্ত্রস্ত ও তন্ময় থাকে"।

অতএব, জীবন-সংগ্রামের সাফল্যের জন্যে নামাজে দন্ডায়মান হওয়া এবং তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকা পূর্বশর্ত। কেননা, করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অধিকতর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ হয় নামাজেরই মাধ্যমে, বিশেষতঃ নামাজের সেজদা অবস্থায় সর্বাধিক নৈকট্য লাভ হয়।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা যখন সেজদারত থাকে, তখনই সে তার প্রতিপালকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। অতএব, সেজদারত অবস্থায় তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া কর।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

قرة عينى فى الصلوة

অর্থাৎ আমার নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হলো নামাজ।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত আল্লাহ পাকের দরবারে নামাজে দন্ডায়মান থাকতেন। আর এভাবে দীর্ঘ সময় দন্ডায়মান থাকার কারণে তাঁর কদম মোবারক ফুলে উঠতো।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

"আর আমার প্রদত্ত উপজীবিকা থেকে যারা ব্যয় করে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ যারা নিয়মিত যাকাত আদায় করে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মতে, এ বাক্যে মানুষ তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্যে যে ব্যয় করে তার উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, এ বাক্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ধন-সম্পদ মানুষের কাছে আল্লাহর আমানত, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব, নিজের জীবদ্দশায় এ সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় কর।

এবনে জরীর বর্ণনা করেন, এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যাকাতের কথা, পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয়ের কথা এবং যাদেরকে দান করা জরুরী তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদ করার তাগিদ করা হয়েছে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তার পূর্ণ বিনিময় দান করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

"তোমরা যা কিছু আল্লাহর রাহে জেহাদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, তার পূর্ণ বিনিময় দান করা হবে তোমাদেরকে, তাতে এতটুকুও জুলুম করা হবে না"।

পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াতও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে মানুষকে আল্লাহ্ পাকের রাহে দান করার এবং দুঃস্থ-বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ-الاية

"এবং আমি যে রিয্ক তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে তোমরা আল্লাহর রাহে দান কর, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার পূর্বে"। তখন সে নিতান্ত আক্ষেপ ও পরিতাপের সুরে বলবেঃ "ওগো পরওয়ারদেগার! যদি আমাকে একটি নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অবসর দিতে, তবে আমি তোমার রাহে দান খয়রাত করে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম"।

যারা সময় ও সুযোগ থাকতে আল্লাহ্ পাকের রাহে দান করেনি তারা জীবন-সায়াহ্নে এসে এজন্যে আক্ষেপ করবে, অথচ সে মুহূর্তে আক্ষেপ আদৌ উপকারী হবেনা। পবিত্র কোরআন এভাবে সমাজের দুঃস্থ-বিপদগ্রস্তদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করেছে প্রতিটি মানুষকে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে দান করা ওয়াজিব"। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজী পেশ করলেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি কারো নিকট এমন কিছু না থাকে, যা সে দান করবে"? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "সে যেন নিজের হাতে উপার্জন করে, এরপর নিজেকেও লাভবান করে এবং অন্যকেও দান করে"।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো, প্রকৃত মোমেন সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, মনের আত্মসমর্পণ অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে, দেহের আত্মসমর্পণ নামাজের মাধ্যমে এবং অর্থ সম্পদের আত্মসমর্পণ আল্লাহ্ পাকের রাহে দানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যে এভাবে আল্লাহ্ পাকের সমীপে দৈহিক, আর্থিক এবং আন্তরিকভাবে বন্দেগী পেশ করে সে প্রকৃত মোমেন এবং সে-ই মোত্তাকী বা পরহেযগার এবং এরাই পবিত্র কোরআনের হেদায়েত লাভে ধন্য হয়।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

"আর যারা বিশ্বাস করে সেই কিতাবের প্রতি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে, আর যারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

স্থাপন করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে আর তারাই সফলকাম"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, যা কিছু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা কিছু ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে, সব কিছুর প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আসমানী কিতাব সমূহের ব্যাপারে তারা কোন প্রকার পার্থক্য না করে। যারা আহলে কিতাব তারা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সমূহে যেমন বিশ্বাস করেছে এবং ইতিপূর্বে আগমনকারী নবী-রসূলগণের প্রতি যেমন বিশ্বাস করেছে, তেমনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার প্রতিও তারা পূর্ণ বিশ্বাস করে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন দল লোককে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে (১) যে আহলে কিতাব নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর আমার প্রতিও ঈমান স্থাপন করেছে। (২) সে গোলাম, যে আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করে এবং স্বীয় মনিবের তরফ থেকে অর্পিত কর্তব্যও পালন করে। (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় বাঁদীকে উত্তম তমীজ শিক্ষা দেবে, এরপর আজাদ করে তাকে বিয়ে করবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব লোকদের আলোচনা ছিল যারা পূর্বে মুশরেক ছিল, পরে ঈমান এনেছে, আর এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাসারাদের কথা রয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর সর্বশেষ রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

মাসায়েলুল কোরআন

অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করার তাৎপর্য হলো, এই কিতাব সমূহকে সত্য-জ্ঞান করা। অর্থাৎ ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক যত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন, সেসব আসমানী কিতাবকে সত্য-জ্ঞান করা ফরজ এবং ঈমানের শর্ত। তবে আমল শুধু পবিত্র কোরআনের উপরই করতে হবে। কেননা, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে গেছে। সেই কিতাব সমূহের উপর আমল করা বৈধ নয়।

পবিত্র কোরআন যেসব মৌলিক বিষয়ের তা'লিম দেয়, তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস।[১]

১। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের প্রারম্ভে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"(পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হলো,) সেই ঈমানদারগণ ইহকালে সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং পরকালে সাফল্য মন্ডিত"।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, যারা অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস করে তথা জান্নাত, দোযখ, কেয়ামত, ফেরেশতা প্রভৃতি অদৃশ্য বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস করে, যথা নিয়মে নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহর রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, এরাই সে সব লোক যারা হেদায়েত-প্রাপ্ত, দুনিয়ার এ জীবনে তাদের জন্যে সাফল্য সুনিশ্চিত, আখেরাতের নাজাত ও মাগফেরাত তাদের জন্যে সুনির্ধারিত।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হেদায়েতের তফসীর করেছেন নূর এবং সংকল্পের দৃঢ়তা দ্বারা, আর 'ফালাহ' শব্দের তফসীর করেছেন এভাবে, সকল চাওয়া-পাওয়াকে এবং মন্দ থেকে আত্মরক্ষার সাফল্যকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'ফালাহ' বলা হয়েছে। অতএব, ইতিপূর্বে যাদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তারা আল্লাহ পাকের নূরের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সার্বিক এবং চির সাফল্য সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি ঈমান থেকে মাহরূম হবে, নেক আমলের সাধনা থেকে বঞ্চিত হবে এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের এ দুনিয়ার জিন্দেগী হবে দুর্বিষহ, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তারা হবে কোপগ্রস্ত (পরবর্তী আয়াতে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

(৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে (হে রসূল!) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন, আর না-ই করুন (উভয় অবস্থা সমান), তারা ঈমান আনবে না।

(৭) আল্লাহ পাক তাদের মন এবং কর্ণকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা, আর তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

"কুফর" শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো গোপন করা। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাঁর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের কথা স্বীকার করেনা, তাঁর অনন্ত অসীম দান অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে গোপন করে। তাই তাদেরকে বলা হয় কাফের। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য, তার কোন একটিকে অস্বীকার করার নামই কুফর।

এ আয়াতে একদিকে অবিশ্বাসী কাফেরদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, এ কাফেরদের জন্যে আক্ষেপ করে লাভ হবে না, তারা ঈমানের সম্পদ লাভ করতে সক্ষম হবে না। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার পৌত্তলিকদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন, অথচ ইসলাম কবুল করার তওফিক আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত সম্ভব হয় না। যে কাফেরদের সম্পর্কে এ আয়াতে ঘোষণা রয়েছে, তারা যে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, একথা আল্লাহ পাকের এলমে ছিল।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই ছিল, যেন দুনিয়ার

১। এবনে কাসীর

সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এ আয়াত দ্বারা ঘোষণা করলেন, ঈমান আনা সকলের নসীব হবে না।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তারা মানবতার অবমাননা করে, তাদের নিকট মানবতা লাঞ্ছিত হয়, মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের সকল প্রয়াস ব্যাহত হয়, তারা মানবতার কলংক, তাই তারা অভিশপ্ত। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা, জীবন-ধারা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে করে কল্যাণকামী, মুক্তি পিয়াসী মানুষ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়, সরল সঠিক পথ লাভে সফলকাম হয়, এ অভিশপ্ত লোকদের পথ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"এবং যারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে, আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তারা দোযখবাসী, তারা চিরদিন দোযখে থাকবে"।

কেননা, সৃষ্টি হয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে সেই মহান দাতাকে অবিশ্বাস করা, তাঁর দান ব্যবহারের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি পদ্ধতি মেনে চলতে অস্বীকার করা মানুষের অবনতি-অধঃপতন এমনকি, সমূহ ধ্বংসের কারণ হয়। আর এ ধ্বংসকেই পবিত্র কোরআনের পরবর্তী আয়াতে-

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি" বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আর কোথাও এরশাদ হয়েছেঃ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

আর কোথাও এ শাস্তির বিবরণ এভাবেও প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করবে, আমি তাদেরকে অচিরেই দোযখে প্রবেশ করাবো। যখন তাদের চর্ম গলে যাবে, তৎক্ষণাত আমি অন্য চর্ম পরিবর্তন করে দেব, যেন তারা আযাবের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাপরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়"।

আল্লাহর নাফরমানীর শোচনীয় পরিণতি

এ পৃথিবীতে যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম দানে ধন্য হয়েও তাঁকে অবিশ্বাস করে, অমান্য করে তাঁর বিধি-নিষেধ, তাঁর প্রতি অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের পরিণাম যে শোচনীয় হবে এবং তারা যে কঠিন ও কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এ আয়াতে তাদের শাস্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, নরকানলের শাস্তি তাদের অবধারিত। আর এ শাস্তি হবে চিরকালীন, এমনকি যখন অগ্নি-দগ্ধ হয়ে তাদের চর্ম বিগলিত হবে তখন তা পরিবর্তন করে দেয়া হবে, যাতে করে তাদের শাস্তির অনুভূতি এতটুকু কম না হয়। তফসীরে এবনে কাসীরে লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ প্রতিটি অবিশ্বাসী কাফেরকে একশত চর্ম প্রদান করা হবে, প্রত্যেক চর্মের উপর বিভিন্ন প্রকার আযাব হতে থাকবে এবং প্রত্যেক দিন ৭০ হাজার বার চর্ম পরিবর্তন করা হবে।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর সম্মুখে যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করা হতো তখন তিনি বলতেন, এ আয়াতকে পুনরায় পাঠ কর। একবার বিখ্যাত সাহাবী হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) বললেনঃ আমি এর তফসীর আপনাকে বলবো? প্রতি ঘন্টায় একশত বার করে দোযখীদের চর্ম পরিবর্তন করা হবে, এরপর হযরত ওমর (রাঃ) মন্তব্য করেনঃ আমিও একথা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি।

যারা স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, তাঁর পৃথিবীতে বাস করে তাঁকেই অস্বীকার করে, তাঁর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে স্বীয় দম্ভ অহমিকা প্রকাশ করে, তারা মানবতার কলঙ্ক বলে নিজেকে প্রমাণ করে। তাদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের আরও বহু আয়াতে এবং যদি এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এ শাস্তি অযৌক্তিক, তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে অস্বীকার করা, তাঁর অবাধ্য হওয়া, তাঁর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা কি যৌক্তিক? অথচ আমরা প্রতিদিন দেখছি পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র তার বিদ্রোহীদেরকে ক্ষমা করে না। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে মৃত্যুদন্ড দিতে বাধা দেয় না। আর যেহেতু মৃত্যুদন্ডের পর মানুষের আর কোন ক্ষমতা থাকে না তাই এ শাস্তির পর আত্মতৃপ্তি লাভ করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ পাক, যিনি সর্বশক্তিমান তাঁর নিকট কোন কিছুই যে অসম্ভব নয়, তাঁর শাস্তির পর মৃত্যু হলে, পুনরায় জীবন দান করা হবে এবং বারংবার শাস্তি ভোগ করানো হবে।

যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে অবিশ্বাস করে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সম্পদ লাভ করে দম্ভ অহমিকা প্রকাশ করে, যারা মানবতার কণ্ঠ রোধ করে, মানুষকে সরল পথ থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়, যারা মানুষ হয়েও অন্যায়ভাবে

মানুষকে হত্যা করে অথবা অগণিত মানুষের হত্যার কারণ হয়, তাদের কঠিন শাস্তি না হলে তা হবে অবিচার, আর আল্লাহ পাক অবিচার করেন না। অতএব, কাফেরদের শাস্তির বিধানই হলো বিচার এবং যুক্তিযুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ এ কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হোক বা না হোক, কোন অবস্থাতেই তারা ঈমান আনবে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কাফেরদের নিকট তবলীগ নিতান্ত ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নয়?

তফসীরকার ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেনঃ এক্ষেত্রে তবলীগ ব্যর্থ প্রচেষ্টা নয়, এজন্যে যে এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান বাণী তাঁর বন্দাদের নিকট পৌঁছানোর সওয়াব বা শুভ-পরিণতি অবশ্যই লাভ করবেন।

আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ পাক যখন এ খবর দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনবে না, আর আল্লাহ পাকের কথা চিরসত্য এবং মহাসত্য। এমন অবস্থায় ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন না করার কোন দায়-দায়িত্ব কাফেরদের থাকল না। আর এজন্যে তাদের কোন প্রকার শাস্তি হওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়।

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত "তফসীরে বয়ানুল কোরআনে" এ প্রশ্নের অতি সুন্দর জবাব দিয়েছেনঃ আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তার মর্মবাণীর দৃষ্টান্ত এমনঃ কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক কোন রুগ্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বললোঃ "এ রুগ্ন ব্যক্তিটি যক্ষা রোগে ভুগছে এবং তার রোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এর আরোগ্য লাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই"।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, চিকিৎসকের এ মন্তব্যের কারণে লোকটি রুগ্ন হয়নি বা তার রোগ কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায়নি; বরং রুগ্ন ব্যক্তি তার গাফলত ও অসতর্কতার কারণেই রোগাক্রান্ত হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে কাফের তাদের অন্যায় আচরণের কারণে, সত্যের বিরোধিতার দরুণ সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করার স্বভাবগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, ফলে তারা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শুধু তাদের প্রকৃত অবস্থার সংবাদ প্রদান করেছেন।

অতএব, আল্লাহ পাকের এ ঘোষণার কারণে যে তারা ঈমান আনতে পারবে না তা নয়, বরং তারা নিজেরাই ঈমান আনয়নের যোগ্যতা বিনষ্ট করে দিয়েছে।

আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ- الاية

শানে নুযুল

এই আয়াত নাযিল হয়েছে ওয়ালিদ এবনে মগীরাহ, ওতবা, শাযবা সহ সে কাফেরদের সম্পর্কে যাদের মৃত্যু কাফের অবস্থায় হওয়া অবধারিত ছিল।

আয়াতের অর্থ আল্লাহ পাক এ কাফেরদের মন ও কর্ণকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখেও রয়েছে পর্দা।

এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় শক্তি রহিত করে তাদেরকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, মানুষকে আল্লাহ পাক ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন, এমনিভাবে দান করেছেন তাকে বিবেক বুদ্ধি। মানুষ যে কোন কাজের ইচ্ছা করে স্বাধীনভাবে সে ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্যে আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ করে। তাই মানুষ সৎ কাজের ইচ্ছা করলে সৎ কাজ করতে পারে পক্ষান্তরে, অন্যায় কাজের ইচ্ছা করলে তাতেও সে সক্ষম হয়। পরিণামে সৎ কাজের জন্যে তাকে পুরস্কৃত করা হয়, আর মন্দ কাজের জন্যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

কাফেররা যেহেতু তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ঈমানের পথ বর্জন করেছে এবং নাফরমানীর পথ গ্রহণ করেছে এবং সত্যকে গ্রহণ করার যাবতীয় উপকরণ সমূহ তারা অকেজো করে রেখেছে, এমনকি চক্ষু-কর্ণ দ্বারা তারা সত্য প্রত্যক্ষ করতে বা শ্রবণ করতে পারতো অথচ তারা তা-ও করেনি; বরং আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত উপকরণকে তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে ব্যবহার করেছে, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তিনি মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন তাদের অন্তর সমূহ।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে এ বিষয়টির অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেনঃ কোন দানবীর ব্যক্তি যদি কোন দারিদ্র্য-পীড়িত লোককে মাসিক একশত টাকা সাহায্য দেয়। আর সে ভাগ্যাহত ব্যক্তিটি ঐ দানের গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করে না, বরং টাকা পাওয়া মাত্রই তা নদী বক্ষে নিক্ষেপ করে। দাতা ব্যক্তি নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাকে বরং সতর্ক করে। কিন্তু তবুও সে দানের অনাদর পরিহার করে না। দাতার সতর্কতা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে যে সে এ অন্যায় থেকে বিরত থাকবে, তারও কোন আলামত দেখা যায় না। তখন দাতা তার দান বন্ধ করে দেয়, কিন্তু তাতেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। তখন দাতা ব্যক্তি বলে, সে যখন আমার দানের অনাদর করলো, আমিও তাকে দান করা বন্ধ করে দিলাম।

ঠিক এমনিভাবে চক্ষু-কর্ণ এবং অন্তর এজন্যে প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ এর দ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহ পাকের মহান দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"এবং আল্লাহ পাকই বের করে এনেছেন তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ-গর্ভ থেকে, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্তর যাতে করে তোমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

বস্তুতঃ এ কাফেররা যখন আল্লাহ পাক প্রদত্ত এ সমস্ত দানের অপব্যবহার করেছে, এর দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে তাঁর প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তিনি মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন তাদের অন্তর ও কর্ণ সমূহ।

এ মোহরাঙ্কিত হওয়ার একটি ধারাবাহিক নিয়ম রয়েছে। তিরমিজী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ যখন কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তখন তার অন্তরে যা একটি দর্পণের ন্যায়, তাতে একটি দাগ পড়ে। যদি সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে ফেলে তখন সে দাগ পরিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু যদি তওবা না করে বরং আরও পাপ কার্য করতে থাকে তখন আরও দাগ পড়তে থাকে, এমন অবস্থায় অন্তর কালো হয়ে যায়, ভাল মন্দের পার্থক্য করার অনুভূতি পর্যন্ত লোপ পায়।

অন্তরের এ অবস্থাকে পবিত্র কোরআন "রাইন" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"অবশ্যই নয়, বরং অবস্থা এই যে, তাদের অন্তর সমূহে তাদের অপকর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে"।

এর তাৎপর্য হলো, তাদের অহংকার, অহমিকা, আল্লাহর অবাধ্যতা এক কথায় তাদের পাপাচার অন্তরকে মরিচাগ্রস্ত করেছে, ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন- যে জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী।

আর এ কারণেই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।

وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ ﴿٨﴾
يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾
اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ
السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى
شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾
اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾

তরজমা

(৮) এবং মানুষের মধ্যে একদল লোক রয়েছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা আদৌ মোমেন নয়।

(৯) তারা আল্লাহ পাককে ধোঁকা দেয় এবং মোমেনদেরকে প্রতারণা করে অথচ অবস্থা এই যে, তারা শুধু নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয় এবং তা তারা বোঝেনা।

(১০) তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের মিথ্যাবাদীতার কারণেই তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১১) এবং যখন তাদের বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা, তারা বলে আমরা যে শুধু সংশোধনকারী।

(১২) সতর্ক হও! মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বোঝেনা।

(১৩) আর যখন তাদের বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর অন্য লোকদের ন্যায় (তথা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়), তখন তারা বলে, আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবো এ নির্বোধ লোকদের ন্যায়? সতর্ক হও! প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারাই আসলে নির্বোধ কিন্তু তারা তা জানেনা।

(১৪) আর যখন তারা মোমেনদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে আমরা তো ঈমান এনেছি। আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে সাক্ষাত করে বলে, আমরা তো একান্তভাবে তোমাদের সাথেই আছি, আমরা তো শুধু উপহাস করি।

(১৫) আল্লাহ পাকও তাদের সাথে উপহাস করছেন এবং তাদেরকে অবসর দিয়ে রেখেছেন, তারা ধর্মদ্রোহীতায় অন্ধভাবে ঘুরছে।

(১৬) তারাই সৎ পথের স্থলে অসৎ পথ গ্রহণ করেছে অতএব, তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সঠিক পথেও ছিলনা।

তফসীরুল কোরআন

যারা প্রকাশ্যে ঈমানের কথা বলে অথচ অন্তরে ঈমান বা বিশ্বাস বলতে কিছুই থাকেনা, বরং বেঈমানীর চক্রান্ত করার জন্যে তারা ঈমানের কথা প্রকাশ করে, তাদের কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকে না, মুখে ঈমান আর অন্তরে বেঈমানী, তারা হলো মুনাফেক, তারা ঈমানদার নয় তবে ঈমানের দাবীদার।

এমন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এ আয়াত সমূহে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পবিত্র কোরআনের শুরুতেই আল্লাহ পাক তিন প্রকার মানুষের পরিচিতি তুলে ধরেছেন যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্কতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা মোমেন তাদের উল্লেখ রয়েছে। এরপর যারা কাফের, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে না তাদের অবস্থা ও শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে।

আর এ আয়াতে সে সব লোকদের কথা রয়েছে, যারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে আর অন্তরে রাখে অবিশ্বাস।

সূরা মুনাফেকুনে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ

"(হে রসূল!) আপনার নিকট মুনাফেকরা এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ পাক জানেন যে আপনি তাঁর সত্য রসূল"।

কিন্তু যেহেতু মুনাফেকদের কথা অসত্য, তাই তার জবাবে সূরা মুনাফেকুনেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ

"এবং আল্লাহ পাক সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"।

অর্থাৎ তারা আদৌ মোমেন নয়, তাদের মূর্খতার কারণে তারা আল্লাহ পাককে ধোঁকা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞানী, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তাই ধোঁকাবাজী-প্রতারণা শুধু সম্পূর্ণ অচলই নয়; বরং ভয়াবহ পরিণামেরও কারণ হয়। যারা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে, মুখে যা বলে অন্তরে তা বিশ্বাস করে না, আর যা অন্তরে থাকে তা মুখে প্রকাশ করেনা, এভাবে প্রতারণা এবং ছলচাতুরীই যাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, তারাই মুনাফেক। এ মুনাফেকরা দু' দলে বিভক্ত, এক দল যারা আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে মুনাফেকী করে, তাদের চিরস্থায়ী আবাস-স্থল হলো জাহান্নাম, আর তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফেকদেরকে দোযখের সর্ব নিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে"।

আর দ্বিতীয় দল তাদের সে সব লোক যারা আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে নয়; বরং আমলের বেলায় মুনাফেকী করে, ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআনের আলোকে এরা জঘন্য অপরাধী, এদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ মুনাফেকদের আলামত তিনটি, যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে, আর যখন তাদের নিকট আমানত করা হয় তখন তাতে খেয়ানত করে।

অতএব, মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আমানতে খেয়ানত করা মুনাফেকীর আলামত। মুনাফেকীর এ অপরাধ বিশেষভাবে দন্ডনীয়। কেননা, এহেন

আত্মঘাতী আচরণ সমাজ ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। জীবনকে কলংকিত ও অপবিত্র করে তোলে।

মানুষের এ ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় চরিত্রের সমালোচনা করে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের মধ্যে তারাই নিকৃষ্টতম যাদের মুখ দু'টি, এক মুখে একজনের সাথে কথা বলে, অন্য মুখে অপর ব্যক্তির সাথে কথা বলে। হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৌত্তলিকদের দ্বারা অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন। তখনই মদীনা শরীফের কিছু লোক মুনাফেকীর এ দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে মক্কা শরীফে ইসলামী আন্দোলনকে বাধা দেয়া হয়েছে প্রকাশ্যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামর ক্ষতি সাধনের জন্যে মুনাফেকীর আশ্রয় নেয়া হয়নি মক্কার জীবনে। মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমনের পর যখন ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো, বিশেষতঃ বদরের ঐতিহাসিক রণাঙ্গনে যখন পৌত্তলিক শক্তি মুসলমানদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো, তখন ইসলামের দুশমনরা উপলব্ধি করলোঃ প্রকাশ্যে ইসলামকে বাধা দেয়ার শক্তি তাদের নেই, তাই তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে মেনে নিল কিন্তু গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এদের দলপতি ছিল আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনা শরীফে আগমনের পূর্বে তাকে মদীনার অধিবাসীরা নেতা নির্বাচিত করেছিল। তার জন্যে একটি মুকুটও প্রস্তুত করা হয়েছিল, শুধু অভিষেকের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে সংঘটিত হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব তথা ইসলামী বিপ্লব। মক্কা শরীফ থেকে প্রাণের মদীনায় হিজরত করলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মদীনা মোনাওয়্যারার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো। তিনি মদীনাবাসী সকলকে আহবান করলেন এক শান্তি সম্মেলনে, মদীনার বিভিন্ন গোত্র আওস, খাজরাজ, বনু নজীর, বনু কাইনুকা প্রভৃতি তাঁর ডাকে সাড়া দিল। তিনি যে কোন মূল্যে শান্তি-শৃংখলা অক্ষুন্ন রাখার আহবান জানালেন সকলের প্রতি, অবশেষে একটি শান্তি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হলো। এ শান্তি সম্মেলনেই সর্ব সম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত হলো যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলেরই মুরব্বী হলেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এমনি অবস্থায় আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের মদীনার অধিপতি হবার স্বপ্ন ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। ফলে সে ইসলামের প্রতি তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করতে লাগল। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করার ক্ষমতা বা সাহস নেই, তাই সে এবং তার অনুগামীরা

মুনাফেকীর এ দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করলো। ইসলামের কথা প্রকাশ্যে বলতো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসেও উপস্থিত হতো, তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করতো, তাঁর কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হতো এবং পরে তাঁর বিরোধিতায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। ইসলামের বিজয়-অভিযানকে রুখে দাঁড়াবার হীন এবং ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় মেতে উঠতো। এ মুনাফেকদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়াতে যার দু'টি মুখ তথা একজনের নিকট একরকম কথা অন্যজনের নিকট অন্যরকম কথা বলে, কেয়ামতের দিন তার দু'টি মুখ হবে এবং সে দু'টি মুখই হবে অগ্নিময়।

অনেক সময় দেখা যায় কারো সম্মুখে তার প্রশংসা করা হয় অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সে ব্যক্তির বিদায় নেয়ার পর উক্ত মজলিসেই তার দূর্ণাম করতে কেউ কসুর করেনা। ইসলাম এ দুর্নীতিকে পছন্দ করেনা, মোমেনের ভেতর এবং বাহির- এক হতে হবে। এটিই ইসলামের শিক্ষা। মানুষ মুনাফেকী বা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে হয় আশায়, নয়তো ভয়ে। কিন্তু মোমেন ভয় করে শুধু এক আল্লাহ পাককে, দুনিয়ার আর কোন শক্তিকে সে ভয় করেনা; করতে পারেনা। এমনিভাবে আল্লাহ পাক ব্যতীত মর্দে মোমেন কারো নিকট আশাও করে না। এক কথায় লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দের একমাত্র নিয়ামক স্বয়ং আল্লাহ পাক, এটিই মর্দে মোমেনের বিশ্বাস। মোমেন মাত্রই এ সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণে কোন ব্যক্তির অযথা প্রশংসা করে তার মতলব হাসিল করতে চায়না। আর সে ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা বা দূর্ণাম করে মনের নিভৃত কোণের ক্ষোভও প্রকাশ করেনা। এ নীতি অন্যায়, অসুন্দর, ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, পবিত্র কোরআনের আলোকে অনতিবিলম্বে বর্জনীয়।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ আমরা যখন বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হই তখন একভাবে কথা-বার্তা বলি, আর যখন বাদশাহর দরবার থেকে বেরিয়ে আসি এবং অন্য লোকের সঙ্গে কথা-বার্তা বলি তখন অন্য ভাবেই কথা বলি, আমাদের এ কাজ কেমন? এবনে ওমর (রাঃ) জবাবে বলেছিলেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমলে আমরা এ কাজকে মুনাফেকীর মধ্যে গণ্য করতাম।

বস্তুতঃ যারা মুনাফেকী বা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে তাদের এ অমার্জনীয় অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতেই শুরু হয় অপমান এবং লাঞ্ছনার মাধ্যমে কেননা, মুনাফেকেদের সম্মান কারো কাছেই থাকেনা; বরং সবাই তাকে অবিশ্বাস করে, আর আখেরাতে রয়েছে মুনাফেকদের জন্যে কঠিন এবং কঠোর শাস্তি।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ব্যক্তিকে বেহেশতের দ্বার খুলে তাতে প্রবেশ

করতে ডাকা হবে, যখন সে বেহেশতের দ্বারের নিকটবর্তী হবে তখন সে দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, এরপর তাকে বেহেশতের অন্য দ্বার থেকে আহবান করা হবে, তখন সেদিকে যাবে কিন্তু সে দ্বারও বন্ধ হয়ে যাবে, এভাবে তাকে বারে বারে ডাকা হবে, অপমান করা হবে। অবশেষে সে হতাশ হয়ে পড়বে, আহবান করলেও যাবেনা। যারা দুনিয়াতে মুনাফেকী করে মানুষকে প্রতারণা করবে, ছল-চাতুরীর মাধ্যমে মানুষের কষ্টের কারণ হবে তাদেরকে এমনি শাস্তি দেয়া হবে পরকালীন জিন্দেগীতে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ
كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ
مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায়, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো, যখন অগ্নি তার চারিপার্শ্বে আলোকিত করলো তখন আল্লাহ পাক তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে এমন ঘন-অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন যে তারা কিছুই দেখতে পায় না।

(১৮) মূক, বধির, অন্ধ, তাই তারা আর ফিরবে না।

(১৯) অথবা এ মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, আকাশ থেকে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয় তাতে থাকে ঘন তমসা, থাকে গর্জন এবং বিদ্যুৎ, যারা এ দুর্যোগের মধ্যে চলে তারা বজ্র নিনাদে মৃত্যুর ভয়ে তাদের আঙ্গুল সমূহকে স্বীয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে সর্ব দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন।

(২০) বিদ্যুৎ যেন তাদের দৃষ্টি শক্তিকে কেড়ে নেয়, যখনই তাদের উপর ক্ষণিকের জন্যে বিদ্যুৎ চমকে তখন তারা তার আলোকে চলতে থাকে। আর যখন আঁধার তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ পাক

ইচ্ছা করতেন তবে তাদের কর্ণ এবং চক্ষু সব কিছুই ছিনিয়ে নিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মুনাফেকদের অবস্থার দুটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ-দৃষ্টান্ত পেশ করেছেনঃ

মুনাফেকদের অবস্থার প্রথম দৃষ্টান্ত

যে অপরিণামদর্শী লোকেরা হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীর পথকে নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে, ঈমানের কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করে মুনাফেকীর আত্মঘাতী পথ অবলম্বন করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে দেখার আশায়, চলার প্রয়োজনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, ফলে চতুর্দিক আলোকিত হলো কিন্তু হঠাৎ সেই আলো নিভে গেল, নেমে এল ঘন অন্ধকার। পথিক হলো দিশেহারা, বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত, তদুপরি সে বধির, তাই কারও কথাও সে শ্রবণ করতে পারেনা, সে মূক, তাই কারও নিকট সে কোন কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেনা এবং সে অন্ধও, তাই সে উক্ত আলো দ্বারাও উপকৃত হতে পারে না। এক কথায় তার চক্ষু কর্ণ ও রসনা কোন কাজে লাগেনা, এমন ভাগ্যাহত ব্যক্তি কি করে সঠিক পথ পেতে পারে?

বস্তুতঃ মুনাফেকদের অবস্থা ঠিক অনুরূপ, কেননা তারা হেদায়েতের পথ বর্জন করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিজেকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে, দিশেহারা পথিকের ন্যায় বিপন্ন বিপদগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় হেদায়েতের যে আলো তারা লাভ করেছিল তা তারা কবুল করেনি। এতদ্ব্যতীত চক্ষু, কর্ণ এবং রসনার সাহায্যে যে সঠিক পথ লাভের সুযোগ ছিল তারও সদ্ব্যবহার করেনি। তার ফলে সত্য পথ তাদের জন্যে হয়েছে চিররুদ্ধ, চির কল্যাণ ও চির শান্তির পথ থেকে তারা হয়েছে চিরতরে বঞ্চিত।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করে এ মন্তব্য করেছেন যে, দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ কেননা, মুনাফেকরা প্রথমতঃ ঈমানের নূরের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু তাদের মুনাফেকীর কারণে সে সব নূর থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে এবং দিশেহারা পথিকের মত বিপন্ন হয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম যে মন্তব্য করেছেন তা এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমন করেন তখন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু পরে মুনাফেক হয়ে যায়, তাদের দৃষ্টান্ত এমনঃ কোন লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো, ফলে

চতুর্দিক আলোকিত হলে তারা ভাল-মন্দ সব-কিছু দেখতে পেল কিন্তু হঠাৎ সেই আলো নিভে গেল। তারা যে তমসায় ছিল সে তমসায় ফিরে এল। ঠিক এমনিভাবে মুনাফেকরা শেরক ও কুফরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পরে ইসলামের আলোতে সত্য-অসত্য বা ভাল-মন্দের মধ্যকার পার্থক্য দেখতে পেল, কিন্তু মুনাফেকীর কারণে পুনরায় শেরক ও কুফরের ঘন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে نور শব্দটির অর্থ হলো ঈমান, আর ظلمت শব্দের অর্থ হলো গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

হযরত মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন,

فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ

অর্থাৎ "যখন চর্তুদিকে আলোকিত হলো", এর তাৎপর্য এই যে, যখন তারা ঈমানদারী এবং হেদায়েতের প্রতি আকৃষ্ট হলো।

হযরত আতা খোরাসানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুনাফেক কখনো কখনো কল্যাণের পথ দেখে এবং সত্যকে উপলব্ধিও করে, কিন্তু মুনাফেকীর কারণে পুনরায় গোমরাহীর অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।

এ আয়াত সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন একরামা, আবদুর রহমান, হাসান (রাঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

আবুল আলীয়া বর্ণনা করেন, মুনাফেক যখন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করে তখন এর বরকতে তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হয় কিন্তু যখন মুনাফেকীর কারণে সন্দিহান হয় তখন সে নূর বিদায় গ্রহণ করে।[১]

বস্তুতঃ মুনাফেকরা আল্লাহর ভয়ে আখেরাতের চিন্তায় ইসলামের চির সত্যকে গ্রহণ করেনা; বরং ইসলামের দাবী করে মুসলমানদের নিকট থেকে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লোভে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে। ফলে কলেমার আলো তাদের অন্তরে স্থায়ী হয়না; বরং গোমরাহীর অন্ধকার তাদেরকে চির বিপন্ন করে রাখে।

তাই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ তারা আর হেদায়েতের দিকে ফিরে আসবেনা, ফলে তারা চির নিন্দিত, চির বঞ্চিত থাকবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর

মুনাফেকদের প্রথম দৃষ্টান্তটি সে সব লোকদের বেলায় প্রযোজ্য যারা মুনাফেকীতে কঠোর এবং হেদায়েতের আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এর পরবর্তী আয়াতে মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, তা সেই মুনাফেকদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কখনও কখনও ঈমানের আলো লাভ করে পুনরায় গোমরাহীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়।[১]

মুনাফেকীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তঃ

অথবা মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন, অন্ধকার রজনীতে আকাশ থেকে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়, তাতে থাকে বজ্রধ্বনি, থাকে বিদ্যুৎ, দুর্যোগের এ ঘনঘটায় যারা চলে তারা বজ্রনিনাদে মৃত্যুর ভয়ে তাঁদের অঙ্গুলী সমূহকে স্বীয় কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, মুনাফেকদের অবস্থাও এ তমসাচ্ছন্ন রজনীর বিপদগ্রস্ত মুসাফিরদের ন্যায়। যখন ইসলামের একটু আলো তারা লাভ করে তখন তারা তাতে চলতে থাকে আর যখন অন্ধকারে নিপতিত হয় তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকে। মুনাফেকরা সর্বদা দুঃসহ মানসিক পীড়ন ভোগ করতে থাকে, সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে কেননা, তাদের অন্তরে ঈমান নেই অথচ তারা ঈমানের দাবীদার হয়, এমন অবস্থায় এ ভয় তাদেরকে পেয়ে বসে, যে কোন সময় তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, তাই তারা সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। তারই পাশাপাশি ইসলামের দাবীদার হয়ে মুসলমানদের নিকট থেকে যাবতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার দুর্দমনীয় লোভে তারা থাকে উন্মত্ত, একদিকে লোভ আর অন্যদিকে ভয়। এ দু'য়ের মাঝখানে তারা থাকে দোদুল্যমান। যখন বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় হয় ব্যস্ত। কিন্তু যেভাবে বজ্রনিনাদ এবং মৃত্যুর আক্রমণ থেকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে আত্মরক্ষা করা যায়না, ঠিক তেমনি মুনাফেকরা আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকেও রক্ষা পায়না কেননা, আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাদের সকল তদ্বীর, যাবতীয় চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র তাঁর নখদর্পণে।

এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন"।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

"এবং তিনি তোমাদের অন্তরের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

১। তফসীরে কাশফুর রহমান

"তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর, সবই তিনি জানেন"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান"।

তিনি চাইলে যে কোন সময় এ মুনাফেকদের শোনার এবং দেখার শক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন"।

আলোচ্য আয়াতে মুষলধারে বৃষ্টিকে সত্য ধর্ম ইসলামের সাথে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কেননা, বৃষ্টি মানুষের অপবিত্রতা দূর করে, তাকে পাক-পবিত্র করে তোলে। ইসলাম মানুষের পরকালীন জিন্দেগীর যে চির শান্তির খোশখবরী দিয়েছে তাতে রয়েছে আশা-আকাঙ্ক্ষার আলো আর সে আলোতে মানুষ দ্বীন ইসলামের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু মুনাফেকরা মুনাফেকীর কারণে সে আলো থেকে হয় বঞ্চিত।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, বিদ্যুৎ হলো ঈমানের সেই নূরের দৃষ্টান্ত যা তাদের অন্তরে রয়েছে এবং কখনো কখনো যখন তা চমকে ওঠে তখন এ মুনাফেকরা ভয়ে স্বীয় কর্ণকুহরে অঙ্গুলী সমূহ প্রবেশ করায়, অথচ তা তাদের জন্যে আদৌ উপকারী হয়না।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ মুনাফেকদের আলোতে চলার তাৎপর্য হলো ইসলাম কবুল করা, আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার তাৎপর্য হলো কুফর বা আল্লাহর নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন, কেয়ামতের দিনও মুনাফেকদের এ অবস্থাই হবে যে, মোমেনগণ যখন ঈমানের আলোকে পুলসেরাতের দিকে অগ্রসর হবে, যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ

অর্থাৎ তুমি সেদিন দেখবে যে, মোমেন নারী ও পুরুষদের সম্মুখে এবং ডান পার্শ্বে তাদের নূর থাকবে আর তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমাদের জন্যে জান্নাতের খোশখবরী রয়েছে। সেদিন মুনাফেকরা মুসলমানদের পদাংক অনুসরণ করবে এবং মুসলমানদেরকে প্রদত্ত নূরের আলোতে চলতে চাইবে, কিন্তু তারা অন্ধকারে নিপতিত হবে, তখন তারা মুসলমানদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের জন্যে একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের নূরের দ্বারা উপকৃত হতে চাই, তখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বলা হবে তোমরা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন কর।

১। তফসীরে কাশফুর রহমান
২। তফসীরে এবনে কাসীর

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-الاية

অর্থাৎ "সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন মুনাফেক নারী ও পুরুষরা মোমেনদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর"।

এ শোচনীয় পরিণাম তাদের হবে যারা মানবতার কলঙ্ক মুনাফেকী করবে, মানুষকে প্রতারণা করবে, মানুষের কষ্টের কারণ হবে, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, মিথ্যা, ধোঁকা, ছলচাতুরী, আমানতে খেয়ানত এবং মানবাধিকার খর্ব করার মত আত্মঘাতী পথ অবলম্বন করবে, তাদের অপমান, অবনতি এবং অধঃপতন অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের কর্ম যেমন নিন্দনীয়, তেমনি কর্মফলও ভয়াবহ এবং শোচনীয়। এটিই স্রষ্টার চির শাশ্বত নীতি, এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান, বিশ্ব ইতিহাস একথারই প্রকৃষ্ট ও জ্বলন্ত প্রমাণ।

يٰٓاَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً
وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ
مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

(২১) হে মানব জাতি! তোমরা বন্দেগী কর তোমাদের প্রতিপালকের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে, হয়তো তোমরা দোযখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পার।

(২২) সেই প্রতিপালক, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্যে শয্যা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ প্রস্তুত করেছেন, আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের উপজীবিকা হিসেবে ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, কাজেই তোমরা আর কাউকে আল্লাহ পাকের শরীক স্থির করোনা, তোমরা এ সম্পর্কে অবগত রয়েছ।

(২৩) আর যদি তোমরা এই কিতাব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দিহান হও, যা আমি আমার বন্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তবে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন, আল্লাহ পাক ভিন্ন তোমাদের তথাকথিত সাহায্যকারীদেরও আহ্বান জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(২৪) কিন্তু যদি তোমরা সক্ষম না হও এবং কখনও সক্ষম হবেনা, তবে সেই নরককে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পবিত্র কোরআনের শুরু থেকে আলোচ্য আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত মানব জাতির তিনটি দলের অবস্থা এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমে মোমেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। এরপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না অর্থাৎ কাফের, তাদের সর্বনাশা কাজের অবস্থা এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সবশেষে যারা প্রকাশ্যে ঈমানের কথা প্রকাশ করে অথচ অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার এবং তাঁর বন্দেগী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মানবতার চরম অধঃপতন পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতা থেকে আত্মরক্ষার এবং চিরশান্তি লাভের তাগিদ করা হয়েছে এ আয়াতে।

এমনিভাবে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আকাশ-পাতাল, যমীন-আসমান, শষ্য-শ্যামলিমা, যাবতীয় ফল-ফলারী, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী, মেঘ-বৃষ্টি এই সমস্ত কিছু মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে একথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত, আর বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি তাই কোন অবস্থাতেই বিবেকবান মানুষ কোন সৃষ্টির নিকট মাথা নত করতে পারে না। মানুষের এ উচ্চ মর্যাদা রক্ষার একমাত্র পথ তওহীদের প্রতি

বিশ্বাস। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল)

"এবং নিশ্চয় আমি মানব জাতিকে সম্মানিত করেছি। স্থল ও সামুদ্রিকভাগে তাদেরকে আরোহণ করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম উপজীবিকা দান করেছি এবং আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে ফজিলত ও মর্যাদা দিয়েছি"।

মানব জাতিকে তওহীদের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার তাগিদ করে আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

"তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আল্লাহ পাক আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।

শুধু তাই নয়, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানব জাতির উপকারার্থেই এবং তার প্রয়োজনের আয়োজনেই বিশ্বের সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছেন।

সূরা বাকারায় এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ "তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের উপকারার্থে বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, পরে সপ্ত-আসমান প্রস্তুত করেছেন এবং আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী"।

বস্তুতঃ মানুষ যদি নীলাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার আলোয় ঝলমল নভোমন্ডলের দিকে নজর দেয়, তুমুল তরঙ্গে তরাঙ্গায়িত বিশাল

বিস্তৃত সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করে, আর ধরার ধূসর শয্যার দিকে তাকায় তবে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হতে কোন কিছুই তাকে বিরত রাখতে পারেনা। এমনকি, মানুষ যদি নিজের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে, তার অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তার জীবন-যৌবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ কালের নামে যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেন তা-ও মানুষকে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার তাগিদ দেয়। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

(সূরা যারিয়াত)

"আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এবং একত্ববাদের বহু নিদর্শন, তবুও কি তোমরা লক্ষ্য করবেনা"?

অতএব, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, তাঁর সাথে শেরক না করা প্রতিটি কল্যাণকামী, বাস্তববাদী ও পরিণামদর্শী মানুষের একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কোরআন অতি সুন্দরভাবে ঘোষণা করেছেঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অতএব, "আল্লাহ্ পাকের প্রতিদ্বন্দী স্থির করোনা, আর তোমরা তো জান"।

এর পূর্ববর্তী আয়াতে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর মাধ্যমে তোমরা তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পাবে এবং আল্লাহর রহমত তথা চিরশান্তি লাভে ধন্য হবে"।

অতএব, তওহীদে বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং এক আল্লাহর বন্দেগীই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে পরম সাফল্য লাভের একমাত্র পথ।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের এবং আল্লাহর বন্দেগী করার আদেশ ছিল, আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ আমি যে পবিত্র কালাম আমার প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করেছি তার সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের অন্তরে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, সেজন্যে পাক কালাম আদৌ দায়ী নয়, বরং দায়ী তোমাদের অপবিত্র মন, তোমাদের জ্ঞানের দৈন্য, বিবেক-বুদ্ধির অভাব, সে অভাবের কারণেই তোমরা মহা সত্য আল-কোরআনের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবিশ্বাস করেছ। তাই তোমাদের প্রতি চ্যালে হলো এই, যদি তোমরা পবিত্র কোরআনকে আল্লাহর কালাম মনে না কর, এটি মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা কর (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক), তবে পবিত্র কোরআনের মাত্র ৩ আয়াত বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রতম সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে পেশ কর, আর এ কাজে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সাহায্যকারী রয়েছে সবার সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে পার, যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হও।

বিগত চৌদ্দশ' বছর যাবত অবিশ্বাসীদের প্রতি পবিত্র কোরআনের এ স্থায়ী চ্যালে টি রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। পবিত্র কোরআন যখন নাযিল হয় তখন সূরা কাওসার আল্লাহ পাকের ঘরের সম্মুখে লিখে রাখা হয়েছিল। তদানীন্তন কালের আরবী ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের সকলেই চেষ্টা করে পবিত্র কোরআনের সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে জনৈক কবি সূরা কাওসারের নীচে একথাটি লিখে রেখেছিলঃ

ليس هذا كلام البشر

অর্থাৎ "এটি মানুষের কথা নয়, অতএব, এর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়"।

এ আধুনিক কালেও পবিত্র কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসী লোকের অভাব নেই। বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যারা নব নব আবিস্কারের মাধ্যমে মহাশূণ্য পরিভ্রমণের, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে গমনের চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা কিন্তু পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেনা। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত যে, পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ.....وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি সমগ্র মানব এবং জ্বীন জাতি একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে পবিত্র কোরআনের ন্যায় কালাম রচনা করতে, তবুও তা তাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা"।

আর সূরা হুদে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আনয়ন কর পবিত্র কোরআনের ন্যায় দশটি সূরা"।

আর সূরা ইউনুসে এভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, পবিত্র কোরআনের ন্যায় একটি সূরা রচনা করে উপস্থাপন কর, আর আল্লাহ ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তোমাদের সাহায্যের জন্যে ডাক"।

কিন্তু এমন অলংকার-সমৃদ্ধ কালাম রচনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

তাই পরবর্তী আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ-الاية

"অতএব, যদি পবিত্র কোরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, আর কোনদিন তা সম্ভব হবেও না, সুতরাং সেই দোযখকে ভয় কর -----"।

এমন অবস্থায় পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করার ভ্রান্ত নীতি পরিহার কর এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর। মনে রেখো, দোযখের আগুনের ইন্ধন হবে মানব জাতি এবং প্রস্তর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য তফসীরকারগণ حجارة শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'গন্ধক' কেননা, গন্ধক দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নি অতি শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে এবং শক্তিশালী হয়।

আর এ অগ্নি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা আছে।

অতএব, দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে এবং তার একমাত্র পন্থা হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করা।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا
رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ
وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿۲۵﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؘ يُضِلُّ
بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾
الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ
مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

তরজমা

(২৫) এবং (হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন তাদেরকে, যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার নিম্নে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। যখনই তাদেরকে বেহেশত থেকে উপজীবিকা হিসেবে ফল সমূহ প্রদান করা হবে তখন তারা বলে উঠবেঃ এ ধরণের ফল আমরা ইতিপূর্বেও প্রাপ্ত হয়েছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে প্রদান করা হবে একই ধরণের ফল এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশতে পবিত্র সহধর্মিনীগণ, অধিকন্তু তারা সেখানেই অনন্তকাল অবস্থান করবে।

(২৬) নিশ্চয় আল্লাহ পাক মশকের ন্যায় ছোট অথবা তদপেক্ষা উর্দ্ধতর দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না, অতএব যারা মোমেন তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এ দৃষ্টান্ত সঠিক আর কাফেররা বলে, এ দৃষ্টান্তে আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য কি? (এর উত্তর এই যে,) এতদ্বারা আল্লাহ পাক অনেককেই বিপথগামী করেন এবং অনেককে সুপথগামী করেন। বস্তুতঃ অবাধ্য পাপীদের ব্যতীত তিনি কাউকে বিপথগামী করেন না।

(২৭) যারা আল্লাহ পাকের সাথে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা যারা বিচ্ছিন্ন করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনে অবিশ্বাসীদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং সৎ পথের পথিক তাদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন, সে সব লোকদের যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসী এবং পরিণামদর্শী, যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সদা ব্যস্ত, তাদের জন্যে রয়েছে এমন বেহেশত যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, যখন তাদেরকে জান্নাতের ফল প্রদান করা হবে তারা বলবে, অনুরূপ ফল তো আমরা ইতিপূর্বে ভক্ষণ করেছি। মূলতঃ অবস্থা এই যে, ফলগুলো আকৃতিতে এক প্রকার মনে হলেও প্রকৃতিতে হবে ভিন্ন, তাই প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ফল সমূহ পূর্ব পরিচিত এবং পূর্বে ভক্ষন-কৃত মনে হলেও স্বাদে এবং বৈশিষ্ট্যে হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর এ স্বাতন্ত্র্য বেহেশতবাসীদের জন্যে বড় আনন্দের কারণ হবে।

এ আয়াতে মোমেনদেরকে জান্নাতের খোশ-খবরী প্রদান করা হয়েছে। আর জান্নাত হলো আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানের ফলশ্রুতি, এজন্যেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ "এ জান্নাত তোমাদেরকে প্রদান করা হলো তোমাদের জীবনের কার্যাবলীর বিনিময়ে"।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক শেরক বা আল্লাহ পাকের সাথে অংশী স্থাপনকে আদৌ মাফ করবেন না। তবে ঈমান লাভে ধন্য হলে অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করেন না, আর এতদ্ব্যতীত সমস্ত গুনাহ তিনি (দয়া করে) মাফ করেন"।

অতএব, ঈমান ব্যতীত জান্নাত লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। আর যারা মোমেন অথচ গুনাহগার তাদের জন্যে রয়েছে তওবার ব্যবস্থা। যদি কেউ খাঁটি মনে, লজ্জিত ও অনুতপ্ত অন্তরে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করে, ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন বলে খোশ-খবরী প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتُوبُوٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(সূরা নূর)

"হে মোমেনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"এবং তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মোমেনগণ! তোমরা রুকু কর এবং সেজদারত হও এবং তোমাদের প্রতিপালকের বন্দেগী কর। আর সৎ কাজ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।

এমনিভাবে সূরা জুমআয় এরশাদ হয়েছেঃ

وَاذْكُرُو اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"আর অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকর করতে থাক, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে"।

জীবন-সাধনার সার্থকতার জন্যে সর্বপ্রথম চাই আল্লাহ পাক ও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং হতে হবে সে ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল, আর এজন্যে প্রয়োজন আল্লাহর রহমতের আশা এবং আল্লাহর আযাবের ভয়। মানব মনে যখন এ দু'টি অবস্থা সৃষ্টি হয় তখনই মানুষ সৎ কাজে অগ্রসর হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সে সব মোমেন যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়"।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যারা কল্যাণকামী, যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে মুক্তি পিয়াসী তাদেরকে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে, আল্লাহর জিকর করতে হবে অধিক পরিমাণে। আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে। অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর রহমতের আশা স্থান পেতে হবে। আর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হতে হবে। শুধু এভাবেই সৎ কাজ করা সম্ভব। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনার পর সৎ কাজ করবে, আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের খোশখবরী।

আমলে সালেহ্ কি?

তফসীরকারগণ লিপিবদ্ধ করেছেন, যে কাজে ৪টি বিষয় পাওয়া যাবে তাকে আমলে সালেহ্ বলা যাবে।

১. এলম, (অর্থাৎ একথা জানা যে, এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হুকুম রয়েছে)

২. সবর,

৩. নিয়ত,

৪. আন্তরিকতা।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতে "আমলে সালেহ" শব্দটির অর্থ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ এবং আল্লাহর বন্দাদের হক্ব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন কাজের নির্দেশ প্রদান করুন যা দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা, আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমজানের রোজাব্রত পালন কর।

'জান্নাত' শাব্দিক অর্থ বাগান, জান্নাত আটটি। যথা (১) ফেরদাউস, (২) আদ্ন (৩) জান্নাতুল মাওয়া, (৪) খোলদ, (৫) দারুচ্ছালাম, (৬) দারুল মাকাম, (৭) ইল্লিয়ীন (৮) জান্নাতুন্যায়ীম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! জান্নাতের বিবরণ দান করুন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ জান্নাতের একটি ইট স্বর্ণের, আর একটি রৌপ্যের, কংকর হবে মুক্তার, জাফরানের মাটি, কস্তুরীর গারা। যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সর্বদা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত মুগ্ধ মাতোয়ারা থাকবে। বেহেশতে কেউ চিন্তিত হবেনা, মৃত্যু আসবেনা কোন দিনও। পোষাক-পরিচ্ছদ পুরনো হবে না, কোন দিন বৃদ্ধকাল আসবে না। জান্নাতে দুধ, পানি, মধুর নহর সমূহ প্রবাহিত থাকবে। বেহেশতবাসীগণ যা চাইবে সঙ্গে সঙ্গে তা পাবে।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক জান্নাতী বন্দাদেরকে যেভাবে জান্নাতের খোশখবরী দেবেন তা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

(সূরা যখরফ)

"হে আমার বন্দাগণ! আজকের দিনে তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা চিন্তিতও হবেনা। সে বন্দাগণ যারা আমার আয়াত সমূহে বিশ্বাসী ছিল, যারা ছিল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুগত"।

জান্নাতবাসীদের জন্যে তাতে রয়েছে যাবতীয় কলুষতামুক্ত পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক সহধর্মিনীগণ। জান্নাতের নেয়ামত অনন্ত অসীম, বর্ণনাতীত, অকল্পনীয় আর এ নেয়ামতের অবসান ঘটবে না কোনদিনও।

وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"তারা তাতে চিরদিন থাকবে"।

এ প্রসঙ্গে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি এরশাদ করেছেনঃ বেহেশতের মধ্যে চারটি এমন জিনিষ রয়েছে, যা বেহেশত থেকে উত্তম।

(১) বেহেশতের মধ্যে চিরদিন বাস করার সুযোগ বেহেশত থেকে উত্তম।

(২) বেহেশতে ফেরেশতাদের খেদমত তার চেয়ে উত্তম।

(৩) বেহেশতের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ বেহেশত থেকেও উত্তম।

(৪) বেহেশতের মধ্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য বেহেশত থেকেও উত্তম।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ

পবিত্র কোরআনের একটি ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ সূরা রচনার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে অবাধ্য কাফেরদের তরফ থেকে অন্য পন্থায় পবিত্র কোরআনের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। তারা বলে আল্লাহ পাক মহান, তাঁর বাণীও মহান, তাতে মশা মাছি, মাকড়শার মত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বিষয়ে উল্লেখ কেন থাকবে? যদি পবিত্র কোরআন সত্যই আল্লাহর কালাম হতো, তবে তাতে কোন নিকৃষ্ট জিনিষের উল্লেখই থাকতো না।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের মূর্খতা-প্রসূত প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ কোন বক্তব্যকে শ্রোতাদের নিকট সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করার প্রয়োজনেই দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়। তাতে বক্তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য থাকা জরুরী নয়। তাই যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাসী এবং পরিণামদর্শী তারা ঐ দৃষ্টান্তকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আর যারা বেঈমান ও অপরিণামদর্শী তারা ঐ দৃষ্টান্তে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এভাবেই পবিত্র কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পরিণামে বিপদগ্রস্ত হয়।

তার দৃষ্টান্ত এমন, ভাল যমীনের উপর যদি বৃষ্টিপাত হয় তবে তার এক প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়, আর লবনাক্ত যমীনের উপর বৃষ্টিপাত হলে তার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হয়। এমনিভাবে সুস্থ লোক যখন সুখাদ্য গ্রহণ করে, তখন সে তার দ্বারা নতুন শক্তি লাভ করে। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তি সে খাদ্য গ্রহণ করে আরও বেশী অসুস্থ হয়।

বস্তুতঃ ঈমান ও কুফরের পার্থক্য এভাবেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যখন পবিত্র কোরআনে কোন দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, সে দৃষ্টান্ত যত ক্ষুদ্র বস্তুরই হোক না কেন ঈমানদার মানুষ বলে এটি হক্ব এবং যুক্তিযুক্ত কথা। আর যারা বেঈমান তারা প্রশ্ন উত্থাপন করে যে এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য কি? এভাবে তাদের গোমরাহী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এ অবস্থা শুধু তাদেরই হয়, যারা ফাসেক।

"ফেসক" শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো সীমা লঙ্ঘন করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় "ফাসেক" সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে কবীরা গুনাহ করে শরীয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে। ফাসেকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে কেননা, কোন কোন সময় ঘটনাচক্রে গুনাহর কাজ হয়ে যায়, আর কোন কোন ফাসেক কবীরা গুনাহর কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে, আর কোন কোন ফাসেক কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাতে অনুতাপের বদলে গর্ববোধ থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ ফাসেকদের তিন অবস্থা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এ ফাসেক তথা-পাপাচারী (১) লোকেরা

আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা বিনষ্ট করে এবং (৩) দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে। কেননা, এরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সচেষ্ট হয়। ঈমান বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, এজন্যে পবিত্র কোরআন তাদেরকে অশান্তি সৃষ্টিকারী বলে আখ্যা দিয়েছে, অথচ এতদ্বারা তারা মুসলমানদের নয়; বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে। এর শোচনীয় পরিণাম তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থাৎ তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সর্বনাশ অনিবার্য, আর শোচনীয় পরিণামের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ পবিত্র কোরআনে "খাছের" (ক্ষতিগ্রস্ত) শব্দটি মুসলমানদের ব্যাপারে ব্যবহৃত না হলে, তার অর্থ হবে কাফের ও মুনাফেক। যেহেতু তারা প্রবৃত্তির তাড়নায়, দুনিয়ার লোভে মোহে মত্ত হয়ে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবার পথ অবলম্বন করেছে, এজন্যে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। তাদের অবস্থা সেই ভাগ্যাহত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর মত যার পুঁজি বিনষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর রহমতের প্রয়োজন সর্বাধিক হবে তখন এ মুনাফেক ও কাফেররা রহমতে খোদাওয়ান্দী থেকে বঞ্চিত হবে, তাই প্রকৃত অর্থেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

আ'মালুল কোরআন

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا থেকে خَالِدُونَ পর্যন্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করে কোন বাগানে রাখা হলে বাগানের ফল আল্লাহ পাকের হুকুমে বৃদ্ধি পায়। নিয়ম হলো বৃহস্পতিবার দিন রোজা রেখে শুধু কদু দ্বারা ইফতার করতে হবে, আর মাগরেবের নামাজ আদায়ের পর এ আয়াত কাগজে লিখতে হবে এবং কারও সঙ্গে কোন কথা-বার্তা না বলে বাগানে যাবে এবং বাগানের মধ্য ভাগের কোন বৃক্ষে যাতে কোন ফল না থাকে, তাতে সে কাগজটি বেঁধে দেবে। এরপর সে বাগানের কোন একটি ফল খেয়ে নেবে এবং তিন বার পানি পান করে চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ বাগানের ফলে বরকত হবে। (দুরারুত্যানজীম)

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى
السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

তরজমা

(২৮) কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাককে অমান্য কর, অথচ (প্রকৃত অবস্থা এই যে) তোমরা ছিলে সম্পূর্ণ নির্জীব, এরপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর তিনি পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই মহান দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(২৯) তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে নিখিল বিশ্বের সব কিছু। এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং তাকে যথাযথভাবে সপ্ত আসমান রূপে তৈরী করেন, তিনি যে সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর আত্ম-বিস্মৃত মানব জাতিকে তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মানব জাতি! এমন একদিন ছিল যখন তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এ পৃথিবীও ছিল না, আর পৃথিবী সৃষ্টির পরও তোমাদের নাম-নিশানাও ছিল না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

"মানুষের জীবনে এমন সময় কি ছিলনা? যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা"।

একথা প্রতিটি ব্যক্তি মাত্রের জীবনেই সত্য। জন্ম গ্রহণের পূর্বে কারোই কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না, আল্লাহ পাকই প্রত্যেকটি মানুষকে তার অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ পাকের মহান দান। এ দানের জন্যে মানুষ কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, এটিই ছিল স্বাভাবিক, আর এটিই ছিল মানুষের প্রধানতম কর্তব্য।

কিন্তু মানুষ হয়েছে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। বিভ্রান্ত মানুষ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করে চলেছে, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে এ প্রশ্ন করেছেন, কি করে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা সম্ভব হয়? কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য কর? অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ পাকই দান করেছেন তোমাদের এ জীবন। এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

"(হে বিভ্রান্ত মানুষ!) তোমাদের নিজেদের মধ্যেই আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের অগণিত দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান তবু কি তোমরা লক্ষ্য কর না"?

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ.....مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۞

(সূরা আবাসাঃ ২৪-৩২)

"(অর্থাৎ) মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান কত বেশী তার যথার্থ উপলব্ধির জন্যে মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি কি চমৎকারভাবে পানি বর্ষণ করেছি। আর আমি মাটিকেও উত্তমরূপে বিদীর্ণ করেছি। আমি তাতে উৎপন্ন করি শষ্যাদি এবং আঙ্গুর ও তরি-তরকারী, যয়তুন এবং খেজুর এবং বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান এবং ফল ও গবাদি পশুর খাদ্য (ঘাষ-পাতা)। তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের জীব-জন্তুর জন্যে"।

বস্তুতঃ মানুষের অস্তিত্ব, মানুষের জীবন ও জীবনের সর্বস্ব, এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সবই যে মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা, অসীম দানেরই অংশ।

অতএব, মানবতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হলে আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য মানুষকে তাঁর মহান হুজুরে সেজদারত হতে হবে, তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে একথা যে আমার অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাকই আমাকে প্রথমে শুক্র বিন্দুতে, পরে তাকে রক্ত পিন্ড ও মাংস পিন্ডে পরিণত করেছেন, আর প্রাণহীন মাংস পিন্ডে আল্লাহ পাকই প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তখন আমি ছিলাম মাতৃ-গর্ভে, এরপর আল্লাহ পাকই আমাকে মাতৃ-গর্ভ থেকে এ পৃথিবীতে এনেছেন, তখন আমি ছিলাম অত্যন্ত অসহায় নবজাত শিশু, এরপর আল্লাহ পাকই আমাকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি,

দর্শন শক্তি সহ যাবতীয় শক্তি এক কথায় তিনি তাঁর অগণিত নেয়ামতের মহা সমুদ্রে আমাকে নিমজ্জিত রেখেছেন।

কিন্তু এ জীবন, যৌবন, এ শক্তি-সামর্থ্য, এ ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, এ স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, এ ঐশ্বর্য্য এক কথায় এসব কিছু কি চিরস্থায়ী? না আদৌ নয়, এর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, বরং নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

অর্থাৎ এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু-মুখে পতিত করবেন। এক আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং তিনিই তোমাদের জীবনের অবসান ঘটাবেন মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে এক আল্লাহ পাকেরই কর্তৃত্ব, এতে আর কারো হাত নাই, অতএব, হে অবাধ্য কাফের! কেন তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক কর? কেন তাঁর আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখাও? কেন তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হও? অথচ তোমরা জান, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, এরপর তোমাদের প্রত্যেককে তাঁর মহান দরবারে ফিরে আসতে হবে।

যেভাবে শৈশবের পর কৈশোর, যৌবন, এরপর বৃদ্ধকাল আসে, এক অবস্থায় থাকতে অন্য অবস্থার কথা উপলব্ধিও করা যায় না এবং যে ব্যক্তির উপর এই সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাতে তার কোন এখতিয়ারও থাকে না, এসব কিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতে নিয়ম মাফিক হতে থাকে। বস্তুতঃ মানুষ একমাত্র আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই অস্তিত্ব লাভ করে, এতে তার কোন প্রকার ইচ্ছা কার্যকর হয় না, তাই কবি বলেছেনঃ

ما نبوديم وتقاضاے ما نبود + لطف تو نائگفته مامی شنود

"আমরা ছিলাম না, আমাদের কোন আকাঙ্ক্ষাও ছিলনা, কিন্তু হে খোদা! তুমি এত দয়াবান, এত মেহেরবান, তুমি এত করুণাময় যে, আমাদের না বলা কথাও তুমি শ্রবণ করে থাক, তাই আমাদেরকে দান করেছ আমাদের জীবন ও জীবনের সর্বস্ব"।

এরপর যখন মৃত্যু আসে তখনও মৃত্যু-পথের যাত্রীর ইচ্ছার তোয়াক্কা রাখা হয় না। যাঁর কুদরতে-হেকমতে, ইচ্ছা এবং মর্জিতে এ পৃথিবীতে মানুষ আগমন করে, একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা ও মর্জিতেই এখান থেকে গমনও করতে হয়।

এমনিভাবে পুনরায় তাঁরই ইচ্ছায় জীবন লাভ করতে হবে এবং তাঁর মহান দরবারে প্রত্যাবর্তনও করতে হবে। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে এ প্রত্যাবর্তন

সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(সূরা বাকারাহ)

"এবং তোমরা ভয় কর সেদিনকে যেদিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এরপর প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর বিনিময় পুরোপুরি দেয়া হবে, কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা"।

আল্লাহ পাকের দরবারে এ প্রত্যাবর্তন দু' প্রকারঃ

(১) সন্তুষ্ট চিত্তে, (২) বাধ্য হয়ে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে নেক আমল করে তাদের প্রত্যাবর্তন হয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে, তাদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই বলে আহবান জানানো হয়ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

(সূরা ওয়াল ফাজর)

"হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে আস তোমার প্রতিপালকের নিকট এ অবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এরপর আমার বন্দাগণের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার বেহেশতে প্রবেশ কর"।

আর এ শুভ-পরিণতি লাভের আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

"এরপর যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আকাংক্ষা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক না করে"।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রত্যাবর্তন করে বাধ্য হয়ে, তথা-যারা আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষা রাখেনা বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে কিছু সঞ্চয় করেনা, তাদের অবস্থার বিবরণও স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে।

এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ

"নিশ্চয় যারা আমার মোলাকাতের আকাংক্ষা রাখেনা, যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগী নিয়ে সন্তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত, আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ থেকে গাফেল, তাদের ঠিকানা হলো দোযখ, আর এ শোচনীয় পরিণামের জন্যে দায়ী হলো তাদের যাবতীয় কার্যাবলী"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের অস্তিত্ব এবং তার জীবন ও জীবনের সর্বস্ব এক আল্লাহ পাকের মহান দান।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যেভাবে মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের দান, তেমনি পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান, তার খাদ্য-দ্রব্য, পানীয় এক কথায় পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, কেননা এ পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ পাক মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং সাতটি আসমান যথাযথভাবে তৈরী করেছেন, আর তাতেও রয়েছে মানুষের অগণিত উপকার।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের অস্তিত্ব হোক বা জীবন-জীবিকা, সবই একমাত্র আল্লাহ পাকের মহান দান। তাই, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর নাফরমানী না করা। কিন্তু তবুও যেহেতু মানুষ আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়, তাই আয়াতের শুরুতে এ বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, কিভাবে মানুষ আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়!

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা বিভিন্নভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে করে অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ এবং পথ হারা মানুষ সরল-সঠিক পথ ফিরে পায়।

এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

"তোমরা কি দেখনা? যে আল্লাহ পাক আসমান জমীনের সমস্ত বস্তুকেই তোমাদের অনুগত এবং করতলগত করে দিয়েছেন, আর তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।

এমনি আরও বহু আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ এসব নেয়ামতের জন্যে দরবারে এলাহীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

মানুষ যমীনের বস্তু সমূহ দ্বারা যেমন উপকৃত হয় তেমনি আসমানী বিষয় সমূহও মানুষের উপকারে আসে, রাত ও দিনের পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, বিভিন্ন মওসুমের পরিবর্তন, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসমানের পূর্বে যমীনের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে যে, মানুষ সর্ব প্রথম এবং সর্বক্ষণ যমীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। দ্বিতীয়তঃ যমীনে যা কিছু আছে তা মানুষের মালিকানায় আসে, কিন্তু আসমানের কোন কিছুই মানুষের মালিকানাধীন হয় না।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন, আর পানির উপর স্বীয় মহান আরশ স্থাপন করেছেন, যখন অন্য কিছু সৃষ্টি করতে মর্জি হয়েছে তখন ঐ পানি থেকে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে, আর তা দ্বারা আসমান সৃষ্টি করেছেন, এরপর পানি যখন শুস্ক হয়ে যায় তখন যমীন সৃষ্টি করলেন। এরপর তা থেকে সপ্ত যমীন তৈরী করলেন, রোববার এবং সোমবার এ দু' দিনে যমীন তৈরী হলো। আর মঙ্গলবার ও বুধবারে যমীনের যাবতীয় বস্তুও তৈরী হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দিনে আসমান তৈরী হয়েছে, আর এজন্যে জুমআর দিনকে "জুমআ" বলা হয়, কারণ এ দিন আসমান যমীনের সৃষ্টি একত্রিত হয়েছে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যমীনের সাতটি স্তর রযেছে, প্রথম স্তরে মানব জাতি বাস করছে। দ্বিতীয় স্তরে বাতাস, তৃতীয় স্তরে দোযখের পাথর, চতুর্থ স্তরে দোজখের বিচ্ছু, পঞ্চম স্তরে দোজখের সর্প, ষষ্ঠ স্তরে গন্ধক, সপ্তম স্তরে রয়েছে ইবলিস শয়তান এবং তার দলবল।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এ প্রশ্ন করা হয় যে, আসমান এবং যমীনের মধ্যে কোন্‌টির সৃষ্টি পূর্বে এবং কোন্‌টি পরে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আসমানের পূর্বেই যমীন সৃষ্টি করা হয়েছিল তবে যমীনকে ছড়ানো এবং বিছানো হয়েছে পরে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, জুমআর দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর ঐদিন কেয়ামত কায়েম হবে।

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-২৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর
৩। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-২৪

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ
ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي
بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم
بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبٰى وَ
اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

তরজমা

(৩০) এবং যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। তারা বললো, আপনি কি এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন! যে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে, অথচ আমরাই আপনার প্রশংসা করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ নিশ্চয় আমি জানি, যা তোমরা জান না।

(৩১) এবং আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। এরপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের নিকট উপস্থিত করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ আমাকে এদের নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৩২) ফেরেশতাগণ আরজ করলোঃ পবিত্র তুমি, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছ তা ব্যতীত আমরা কিছুই জানিনা। নিশ্চয় তুমি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়।

(৩৩) আল্লাহ পাক বললেনঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে বস্তু সমূহের নাম বলে দাও। পরে যখন সে তাদেরকে ঐ সকল বস্তু সমূহের নাম বলেছিল তখন তিনি (আল্লাহ পাক) বলেছিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি ভূমন্ডল

ও নভোমন্ডলের গুপ্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে অবগত আছি এবং আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন কর।

(৩৪) এবং আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সেজদা কর। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সেজদা করেছিল, সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের জন্যেই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

আর এ আয়াতেও মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের যে অনন্ত-অসীম নেয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, বিশেষতঃ মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মহান দানের যে ইতিহাস রয়েছে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব মানবের প্রতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং অদ্বিতীয় অনুগ্রহের কথা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) স্মরণ করুন এবং আমার বন্দাদেরকেও স্মরণ করিয়ে দিন আমার অতুলনীয় অবদান এবং অগণিত নেয়ামতের কথা, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেনঃ আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিয়োগ করবো। এ কথা শ্রবণ করে ফেরেশতারা অবাক হলো এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীতভাবে আরযী পেশ করলো, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা তো সর্বক্ষণ তোমার মহিমা বর্ণনায়, তোমার নির্দেশ পালনে, হাম্‌দ ও তসবীহ পাঠে রত রয়েছি। এমন অবস্থায় নতুন জাতি সৃষ্টির কি রহস্য? বিশেষ করে যারা দুনিয়াতে কলহ-দ্বন্দ্ব, বিবাদ-বিসম্বাদ করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে, এমনকি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে তোমার এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলবে!

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফেরেশতাদের এ বক্তব্য মানব জাতির সৃষ্টির ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি, অভিযোগ বা আদৌ কোন প্রকার প্রতিবাদ নয়; বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই ছিল উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে সর্বদা নিয়োজিত আছে এবং থাকবে এ মিনতি প্রকাশও ছিল এর লক্ষ্য। সমস্ত তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই কিভাবে ফেরেশতাগণ এ মন্তব্য করলো যে, তারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। এর জবাব এই, মানুষের সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জ্বীন জাতি ছিল, তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছে,

মারামারি, খুন-খারাবি, অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় অপকর্ম করেছে। তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত করার জন্যে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং ফেরেশতাগণ এ দায়িত্ব পালন করেছে, তাই জ্বীন জাতির অনাচারের কথা মনে করে মানব জাতি সম্পর্কেও তারা এ আশঙ্কা করেছে। বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

মানব জাতিকে আল্লাহ পাকের খলীফা বলে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। "খলীফা" অর্থ প্রতিনিধি। অতএব, মানব জাতি এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করা এবং কায়েম করা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে জ্বীন জাতিকে পছন্দ করা হয়নি। নির্বাচন করা হয়নি ফেরেশতাদেরকে; বরং মানব জাতিকে এজন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মানুষের এমনি উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে, তিনি মানুষের সাথে কথা বলেছেন, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কোহে তূরে এবং শবে মে'রাজে সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে। মানুষের এ উচ্চ মর্যাদার কথা আল্লাহ পাক এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ "নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জাননা"। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রয়েছে তা আমি জানি, কিন্তু তোমরা তা জাননা, আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ পাকের খেলাফত কায়েম করার যোগ্যতা নেই তা আমি জানি, কিন্তু তোমরা জান না।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا.....اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

জ্বীন বা ফেরেশতাদের উপর মানুষের উচ্চ মর্যাদার কারণ তার এলম। আল্লাহ পাক মানুষকে বিশ্ব-সৃষ্টির সব কিছুর এলম দান করেছেন। পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব কিছুর নাম, গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন কেননা, পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করতে হলে, বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে যাবতীয় জ্ঞান অর্জন পূর্বশর্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ আজ যত ভাষায় কথা বলছে তার সবগুলোই হযরত আদম (আঃ) কে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। এরপর এসব কিছুর জ্ঞান পেশ করা হয় ফেরেশতাদের সম্মুখে এবং তাদের এ নামগুলো সম্পর্কে বলতে আদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তাদের পক্ষে এ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব না হওয়ায় তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আমরা এ জ্ঞান অর্জনে অক্ষম, বিশ্ব-সৃষ্টি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, অতএব, পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের খেলাফত কায়েম করতে অপারগ। ফেরেশতাদের এ উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তাদের এ আরযীতেঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

"তারা বললো, হে আল্লাহ! পবিত্র তুমি, তুমি মহিমাময়, তোমার জ্ঞান-মহিমা অনন্ত অসীম, তুমি যা কিছু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছ, তার অধিক আমরা কিছুই জানিনা"।

সোবহানাল্লাহ'র ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহর পবিত্রতা, অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাবতীয় মন্দ এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) নিকট প্রশ্ন করেছিলেনঃ আমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র (لا اله الا الله) অর্থ তো জানি, কিন্তু সোবহানাল্লাহ'র তাৎপর্য কি?

তখন হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, আল্লাহ পাক এ বাক্যটিকে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। তিনি এ বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট হন, এ বাক্যটির জিকর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

হযরত মাইমুন এবনে মেহরান এ বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ এতে আল্লাহ পাকের তা'যীম রয়েছে এবং তাঁর পবিত্রতার বর্ণনা রয়েছে। ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)-এর ফজিলতের কারণ হলো এলম বা জ্ঞান, এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, দুনিয়াতেও মানুষের মধ্যে এ এলমের কারণেই পার্থক্য হবে, যার নিকট এলম থাকবে তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; একথা যেমন ব্যক্তি জীবনে সত্য, তেমনি জাতীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনেও এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত, অর্থাৎ যে জাতি জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে সে অন্য জাতি সমূহের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

এলমের এমনি ফজিলত রয়েছে বলেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"যাদের এলম আছে আর যাদের এলম নাই, তারা কি এক সমান"? (আদৌ নয়)

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যে সকল বন্দাদের এলম আছে, শুধু তারাই তাঁকে ভয় করে।

অর্থাৎ এলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়, অথচ আল্লাহর ভয়ই হলো সকল নেক কাজের তওফিক লাভের পন্থা। এমনকি পবিত্র

কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের পূর্ব শর্তও হলো আল্লাহর ভয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ এই কিতাব পথ-প্রদর্শক তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। আর অন্তরে আল্লাহর ভয় আসে এলমের বরকতে। অতএব, এলম হাসিল করা কল্যাণকামী মানুষের প্রধানতম কর্তব্য।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রন্থ "তফসীরে কবীরে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এলমের ফজিলত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমনঃ ১. বৃষ্টি যেমন আসমান থেকে নাযিল হয়, তেমনি এলমও অবতীর্ণ হয় আসমান থেকে। ২. আর যেভাবে বৃষ্টিপাতের কারণে যমীন তৈরী হয় ফল-ফলারী সহ রকমারী খাদ্য-দ্রব্যের জন্যে, তেমনি এলমের কারণে মানুষের মনের যমীন তৈরী হয়, মানবিক গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব হয়। ৩. আর যেভাবে বৃষ্টিপাত ব্যতীত যমীন থেকে ফসলাদি বেরিয়ে আসে না, তেমনি এলম ব্যতীত মানুষের দ্বারা সঠিকভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করাও সম্ভব হয় না। ৪. আর যেভাবে আকাশে বজ্রধ্বনি হলে এবং বিদ্যুৎ চমকালে তার ফলে বৃষ্টিপাত হয় ঠিক তেমনি জান্নাতের আশা এবং দোযখের কঠিন শাস্তির ভয়, এ দুটির মাধ্যমেই এলম হাসিল হয়। ৫. আর যেভাবে বৃষ্টি কোন সময় উপকারী হয়, আর কোন সময় অপকারীও হয়। তেমনি এলম অনুসারে যদি আমল করা হয় তবে তা উপকারী হয়। পক্ষান্তরে যদি এলম অনুযায়ী আমল না হয় তবে তা অপকারী হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) বহু সংখ্যক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা এলমের ফজিলতের ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এলমের অত্যন্ত ফজিলত রয়েছে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত লাভকারী মানুষ দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ পাকের দ্বীনের এলম অন্বেষণকারী তালেবে এলমদের দিকে দৃষ্টিপাত করে। আমি সেই আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, কোন আলেমের দুয়ারে যখন কোন জ্ঞান অন্বেষণকারী এলম হাসিলের উদ্দেশ্যে হাযির হয়, তখন তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের এবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। আর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য একটি শহর তৈরী করা হয়। আর সে যখন যমীনে বিচরণ করে, যমীন তার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এস্তেগফার করে এবং তাঁর উপর সকাল সন্ধ্যা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬০-৬১

হয় এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন, আর ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা দোযখ থেকে নাজাত হাসিলকারী। আর হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, এরপর আল্লাহর দ্বীনের আলেমদেরকে বাছাই করে নেবেন এবং এরশাদ করবেন, আমি তোমাদের মধ্যে যে নূর প্রদান করেছিলাম, তা ছিল শুধু আমার এলমের নূর, আর আমি আমার এলম এজন্যে দান করিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব, অতএব তোমরা চলে যাও, তোমাদেরকে মাফ করে দেয়া হলো।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে একখানি হাদীসে বর্ণিত আছে, তাতে এরশাদ হয়েছে, যে কোন আলেমের পেছনে নামাজ আদায় করলো, সে যেন আল্লাহর কোন নবীর পেছনে নামাজ আদায় করলো। হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের রহমত হোক আমার খলীফাদের প্রতি (প্রতিনিধিদের প্রতি), তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কারা আপনার খলীফা? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যারা পৃথিবীতে আমার সুন্নত বা আদর্শকে জীবিত করবে এবং আল্লাহর বন্দাদেরকে তা শিক্ষা দেবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় এরশাদ করেছিলেনঃ তোমার দ্বারা যদি একজন লোকও হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্যে সারা বিশ্ব থেকে উত্তম সম্পদ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এলম হাসিল করে মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ পাক তাকে ৭০ জন নবীর সওয়াব দান করবেন।

আরও একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আলেমের কলমের কালি এবং শহীদের রক্তের পরিমাপ হবে, তখন আলেমের লেখার কালি হবে প্রাধান্য বিস্তারকারী।

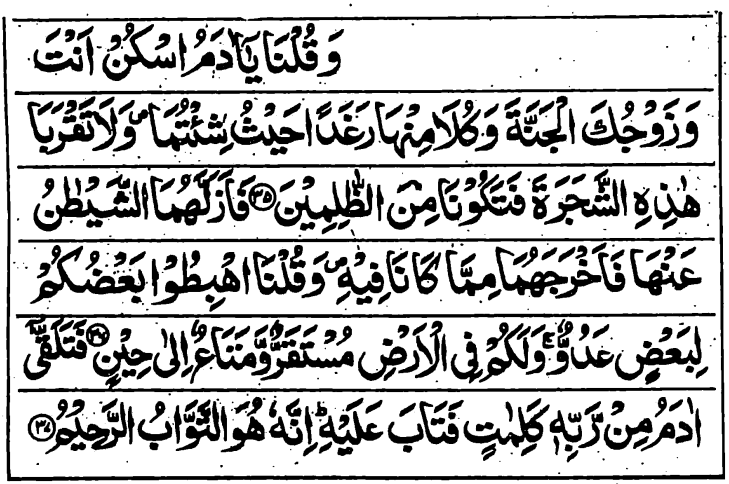
এ প্রসঙ্গে ইমাম রাজী (রঃ)-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ দুনিয়া হলো একটি বাগান, এতে রয়েছে ৫টি জিনিষ, (১) ওলামায়ে কেরামের এলম, (২) ক্ষমতাবানদের সুবিচার, (৩) এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল লোকদের এবাদত, (৪) ব্যবসায়ীদের আমানত, (৫) নসিহতকারীদের নসিহত।

বাগানের এ ৫টি বৃক্ষ বিনষ্ট করার জন্যে ইবলিস শয়তান ৫টি পতাকা স্থাপন করেছে। এলমের পার্শ্বে সে রেখেছে লোক দেখানোর দুর্বলতা বা রিয়া, আমানতের পার্শ্বে স্থাপন করেছে খেয়ানত, আর নসীহতের পার্শ্বে রেখেছে প্রতারণা।[১]

এভাবে ইবলিস মানব বাগানকে ধ্বংস করে চলছে। মানব জীবনকে অশান্ত করে তুলেছে এবং বিশ্ব শান্তিকে করেছে ক্ষুন্ন।

অতএব, শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে সকলকে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এলমের আলোকে নিজেকে আলোকিত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করতে হবে।

শুধু এভাবেই পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করা মানুষের পক্ষে হবে সম্ভব এবং মানুষের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করাও সহজ হবে।


وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ
عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقّٰٓى
اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৫) এবং আমি বলেছিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার জীবন-সঙ্গিনী বেহেশতে বাস কর এবং এখান থেকে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী খাও তবে এ বৃক্ষের নিকটবর্তীও হয়োনা, নচেৎ তোমরা অত্যাচারীদের মধ্যে পরিগণিত হবে।

(৩৬) অতঃপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিল এবং তারা যেখানে ছিল সেই সুখ সম্মান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করলো এবং আমি বলেছিলাম যে, তোমরা বেহেশত থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু, আর জগতে তোমাদের জন্যে এক নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬২

(৩৭) অতঃপর আদম (আঃ) স্বীয় প্রভু থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিল, ফলে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন, নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাগণ সম্মানসূচক সেজদা দিয়েছে এবং সেজদা প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে শয়তান চির অভিশপ্ত হয়েছে।

এ আয়াতেও হযরত আদম (আঃ)-এর সম্মান, উচ্চ মর্তবা এবং অধিকতর সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি আদমকে এ নির্দেশ করলাম, হে আদম! তুমি তোমার স্ত্রী হাওয়া সহ বেহেশতে বসবাস কর আর যেখানে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত থেকে ভোগ কর।

উল্লেখ্য, হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেশতে নিদ্রিত ছিলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর বাম পাঁজর থেকে তাঁর সহধর্মিনী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ইবলিসকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করার পর হযরত আদম (আঃ)-কে জান্নাতে স্থান প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন একা, তাই নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর পাঁজর থেকে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। হযরত আদম (আঃ) জাগ্রত হয়ে তাঁকে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আর কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? হযরত হাওয়া (আঃ) বললেন, আমাকে আপনার জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে এবং আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার উপকরণ স্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলো, হে আদম! বলুন তো এর নাম কি? সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম (আঃ) জবাব দিলেনঃ হাওয়া। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলো, এ নামকরণের কারণ কি? তিনি বললেনঃ যেহেতু তাকে একজন জীবিত মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই নাম হাওয়া।

আর ঠিক সেই সময় আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করলেনঃ হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে বাস কর, আর যা ইচ্ছা পানাহার কর। তবে ঐ গাছটির কাছেও যেওনা।

ঐ গাছটি কি গাছ ছিল? এ নিয়ে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন গম গাছ, কেউ বলেছেন আংগুর গাছ আর কেউ বলেছেন, খেজুর গাছ। তবে সমস্ত তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রকৃতপক্ষে এটি কি গাছ ছিল তা

একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।[১] পবিত্র কোরআনে ও হাদীস শরীফের কোথাও এ গাছটির কোন নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম এবনে জরীর (রঃ) সহ সকলেই এ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। তবে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ এ বৃক্ষকে নিষিদ্ধ করা ছিল হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যে পরীক্ষা।[২]

হযরত হাকীমুল উম্মত মওলানা থানবী (রঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক বাড়ীর মালিক ইচ্ছা করলে তাঁর ভৃত্যকে বাড়ীর কিছু জিনিষ যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুমতি দিতে এবং কোন জিনিষ ব্যবহার করতে নিষেধও করতে পারেন। এমনিভাবে হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক এ ব্যবস্থাই করেছেন যে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, যা খুশী খেতে পার, কিন্তু ঐ গাছটি নিষিদ্ধ একথা মনে রেখো।[৩]

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবুজর (রাঃ) একবার প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হযরত আদম (আঃ) কি নবী ছিলেন? তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ হ্যাঁ, তিনি নবী এবং রসূলও ছিলেন। এমনকি আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মুখে রেখে কথাও বলেছেন, হযরত আদমকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ "তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর"।[৪]

এ আয়াতে انت وزوجك। অর্থাৎ "তুমি ও তোমার স্ত্রী", এ শব্দ দু'টি দ্বারা তফসীরকারগণ দুটি তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন প্রথমতঃ স্ত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হয় তার স্বামীর উপর।

দ্বিতীয়তঃ বসবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রী থাকবে স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন, যে বাসস্থানে স্বামী বাস করবে স্ত্রীকেও সেখানেই বাস করতে হবে।

এতদ্ব্যতীত আয়াতে ব্যবহৃত اسكن। শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কেননা, এ শব্দটির অর্থ হলো তোমরা বাস কর। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর জান্নাতে অবস্থান ছিল নিতান্ত সাময়িক কেননা, যদি সাময়িক ব্যবস্থা না হয়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হতো তাহলে বলা হতো, এ জান্নাত তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হলো কেননা, আল্লাহ্ পাক জানতেন কিছুক্ষণ পরই আদম (আঃ)-কে বেহেশত ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে হবে। আর জান্নাতের স্থায়ী অধিবাসী হতে হলে পূর্ণ ঈমান এবং নেক আমলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, যা কেয়ামতের পরে হবে।[৫]

১। তফসীরে এবনে কাসীর
২। তফসীরে এবনে কাসীর
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন
৪। তফসীরে এবনে কাসীর
৫। তফসীরে এবনে কাসীর

হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে কতক্ষণ ছিলেন?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) আছরের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জান্নাতে ছিলেন।

হযরত হাসান (রঃ) বর্ণনা করেনঃ এর একটি ঘন্টা দুনিয়ার ১৩০ বছরের সমান ছিল।

হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশতে বসবাস শয়তানের প্রতিহিংসার আগুনকে দ্বিগুণ করে দেয়। সে হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে প্রতারণা করে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলেঃ এ নিষিদ্ধ গাছের কাছেও না যাওয়ার যে নির্দেশ আপনাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তার বিশেষ কারণ আছে। কারণ হলো ঐ গাছের ফল ভক্ষণ করলে আপনারা বেহেশতে চিরকাল থাকতে পারবেন, চিরসুখী হতে পারবেন এবং আল্লাহ পাকের চির সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হবেন। শয়তান হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতারণা করার জন্যে শুধু যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের অপব্যাখ্যা করলো তাই নয়, বরং এ প্রতারণাকে মজবুত করার জন্যে সে শপথ করলো। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এর বিবরণ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ

অর্থাৎ শয়তান তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললোঃ নিশ্চয় আমি কল্যাণকামী। আমি তোমাদের কল্যাণের খাতিরেই বলছি, এ গাছটির ফল খেয়েই দেখ।

এর শোচনীয় পরিণতি সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হলো, বেহেশতী পোষাক আপনা-আপনি সরে গেল, নিজেদেরকে নগ্ন দেখে তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আদম! আমার নিকট থেকে পলায়ন করছো?

আদম (আঃ) আরজ করলেনঃ না! আদৌ পলায়ন করছিনা; বরং লজ্জায় মুখ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছি।

পবিত্র কোরআনে একথাটি এভাবে ঘোষণা করা হয়েছঃ

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ

زلّ শব্দটির অর্থ হলো পদস্খলন, অর্থাৎ শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্খলিত করলো, প্রতারিত করলো, পরিণামে বেহেশত থেকে বহিস্কার করার ব্যবস্থা করলো।

পদস্খলনের জন্যে দায়ী করা হয়েছে ধূর্ত শয়তানকে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে, হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণকে সাধারণ

পাপীদের মত মনে করা আদৌ উচিত নয়। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ ঘোষণা করেছেনঃ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

অর্থাৎ "আদম আমার নির্দেশ ভুলে গেল, আর আমি তাতে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি"।

এতেও একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত আদম (আঃ) ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর নাফরমানী করেননি, বরং তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ভুল হলেও ঐ ভুলের মাশুল অবশ্যই আদায় হবে, অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তাই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হুকুম হলোঃ তোমরা নীচে নেমে যাও, জান্নাতে বসবাস আর নয়; বরং জান্নাত থেকে যমীনে চলে যাও। আর তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে, অথচ জান্নাত পরস্পরের শত্রুতা এবং কলহ-দ্বন্দ্বের স্থান নয়, অতএব তোমাদের পরীক্ষার জন্যে যে বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী তৈরী হয়েছে, তোমরা সকলে সেখানে চলে যাও।

এ হুকুমের বাস্তবায়ন হলো যথা সময়ে, হযরত আদম (আঃ) অবতরণ করলেন সরন্দীপে, (যাকে বর্তমানে শ্রীলংকা বলা হয়) আর হযরত হাওয়া (আঃ) অবতরণ করলেন আরব দেশের অর্ন্তগত জেদ্দায়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত এবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) সাফা পাহাড়ের উপর এবং হযরত হাওয়া (আঃ) মারওয়াহ পাহাড়ের উপর অবতরণ করেছেন।[১]

একখানি হাদীসে রয়েছে, সকল দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমআর দিন, এ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে আর এ দিনই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে, আর এ দিনই তাঁকে বেহেশত থেকে বের করা হয়েছে।[২]

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, এতে সমগ্র মানব জাতির জন্যে বিরাট সতর্কবাণী রয়েছে, মাত্র একটি ভুলের জন্যে আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়ের শাস্তি হয়েছে, অনিচ্ছাকৃত গুনাহর জন্যে তাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর
২। পূর্বোক্ত

অতএব, আদম সন্তান মাত্রকেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জীবন-যাপন করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানী থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্য এবং ফরমাবরদার থাকতে হবে।

বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর কি অবস্থা হয়েছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করেছেন, হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর চল্লিশ বছর যাবত কিছুই পানাহার করেননি, আর লজ্জার কারণে তিনশত বছর যাবত উপরের দিকে মাথা তোলেননি। এ সুদীর্ঘ সময় তাঁরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্রন্দনরত ছিলেন।[১]

হযরত আদম (আঃ) তাঁর একটি মাত্র ভুলের জন্যে কত কান্না-কাটি করেছিলেন, তার একটি বিবরণ পেশ করেছেন ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরে। এ প্রসঙ্গে তিনি একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সারা দুনিয়ার মানুষের কান্না-কাটিকে একত্রিত করা হয় হযরত দাউদ (আঃ)-এর কান্না-কাটির সম্মুখে, তবে হযরত দাউদ (আঃ)-এর কান্না-কাটি অধিকতর হবে। আর যদি সারা দুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনের পাশাপাশি রাখা হয়, তবে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দন অধিকতর প্রমাণিত হবে। আর যদি সারা দুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করা হয় এবং হযরত আদম (আঃ) তাঁর একটি গুনাহর জন্যে যে ক্রন্দন করেছেন তা সম্মুখে রাখা হয়, তবে হযরত আদম (আঃ)-এর ক্রন্দন অধিকতর বলে প্রমাণিত হবে।[২]

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ

হযরত আদম (আঃ)-এর ক্রন্দনের কারণে তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া হলো। তিনি তাঁকে তওবার পন্থা শিক্ষা দিলেন, আর যে ভাষায় তওবা করতে হবে তা-ও শিক্ষা দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছেন। তখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আদম! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে? তুমি কিভাবে জানলে?

১। খোলাফাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৩

হযরত আদম (আঃ) আরযী পেশ করলেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমার সৃষ্টির পর আমি যখন আরশের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন তাতে দেখতে পাই, লেখা রয়েছেঃ

لَآ اله الا الله محمد الرسول الله

তখনই আমি উপলব্ধি করি যে, তোমার মহান দরবারে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, এজন্যে তাঁর উসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ হে আদম! তিনি সর্বশেষ নবী, তিনি তোমারই সন্তান। যদি তাঁকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা না হতো তবে হে আদম! তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।[১]

এরপর আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিলেন। কোন্ কথা বললে তওবা কবুল হবে, কোন্ দোয়া পাঠ করলে তাঁর আরযী মঞ্জুর হবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সে দোয়াটি হলোঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন আর আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব"।

একথা গুলো দ্বারা যখন হযরত আদম (আঃ) মুনাজাত করলেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর তওবা কবুল করেন।

আর হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) উভয়েই এ দোয়া করেছিলেন। সূরায়ে আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ -الاية

অর্থাৎ তারা উভয়ে বলেনঃ "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের প্রতি জুলুম করেছি" এ সুদীর্ঘ সময়ের কান্না-কাটির পর আল্লাহ পাক ক্ষমা করার জন্যে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিলেন, অবশেষে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় ক্ষমা প্রার্থনার তওফিক দান করলেন। এরপর আল্লাহ পাক তাঁদের তওবা কবুল করলেন।

এখানে تَابَ عَلَيْهِ বাক্যে তওবার সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে, এর অর্থ হলো কবুল করা।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩০

তবে তওবা শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো ফিরে আসা। যখন এ শব্দটির সম্পর্ক মানুষের সাথে হয় তখন তার তাৎপর্য হয় কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, সে অন্যায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা, ভবিষ্যতে এমনি অন্যায় না করার দৃঢ়-সংকল্প পোষণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর নাম তওবা।

বস্তুতঃ যে কৃত অন্যায়ের জন্য তওবা করবে, সে অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকতে সচেষ্ট হবে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ সমূহকে যত্ন সহকারে আদায় করবে। যদি হক্কুল ইবাদ তথা মানুষের হক্ব বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবে তা আদায় করবে। যদি কোন মানুষকে গাল-মন্দ দিয়ে থাকে, বা কারো গীবত-শেকায়েত করে থাকে বা কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম-অত্যাচার করে থাকে তবে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রত্যেকটি বন্দার কর্তব্য হলো সর্বদা দরবারে এলাহীতে তওবা করতে থাকা এবং ক্ষমা প্রার্থী হওয়া। এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল এমন একজন লোক সম্পর্কে যে গুনাহ করে, পরে তওবা এস্তেগফার করে, পুনরায় গুনাহ করে। আবার তওবা এস্তেগফার করে। পুনরায় গুনাহর কাজে মশগুল হয় এবং আবার তওবা এস্তেগফার করে। এ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেনঃ তার কর্তব্য হলো সর্বদা এস্তেগফার করতে থাকা কেননা, তওবা এস্তেগফার অব্যাহত থাকলে শয়তান ব্যর্থ হয়ে যাবে। শয়তান বলবে এ ব্যক্তিকে গুণাহর কাজে সর্বদা মশগুল রাখতে আমি অক্ষম।

· হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তওবা করতে থাক কেননা, আমি নিজে দৈনিক ১০০ বার তওবা করি।[১]

বস্তুতঃ বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া-মায়া, তাঁর করুণা অনন্ত অসীম। তাই তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ "নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়াময়"।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কথা শ্রবণ করেছি, যা তোমাদের নিকট থেকে গোপন

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৩

রেখেছিলাম তা এই, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমরা গুনাহ করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার না করতে, তবে আল্লাহ পাক এমন মখলুক সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করতো, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করতেন। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে।[১]

(হে আল্লাহ! আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর, তোমার সন্তুষ্টি লাভের তওফিক দাও, আমীন।)

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾
يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۠ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৮) আমি আদেশ দিলাম তোমরা সকলে এখান থেকে নীচে নেমে যাও, এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যারা আমার হেদায়েত মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

(৩৯) আর যারা আমার নাফরমানী করবে, অবাধ্য হবে, আর আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে তারা হবে নরকবাসী, তারা তন্মধ্যে চিরকাল থাকবে।

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! তোমাদেরকে আমি যে নেয়ামত দান করেছি তা স্মরণ কর এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করবো এবং শুধু আমাকেই ভয় কর।

(৪১) আর আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এটি সত্যতা প্রমাণকারী সেই কিতাবের যা তোমাদের নিকট রয়েছে, আর তোমরা ঐ কিতাবের প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়োনা। আর আমার আয়াত সমূহের তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা এবং একমাত্র আমাকেই ভয় কর।

১। পূর্বোক্ত

তফসীরুল কোরআন

قُلْنَا

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা এখান থেকে পৃথিবীতে চলে যাও, অর্থাৎ যদিও আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) তওবা কবুল করেছেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তবুও ইতিপূর্বে বেহেশত থেকে চলে যাওয়ার এবং পৃথিবীতে অবস্থানের যে আদেশ হয়েছিল তা বহাল রইল। মূলতঃ এতদ্বারা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হলো কেননা, আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন এ পৃথিবীর জন্যে, বেহেশতের জন্যে নয়।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এজন্যেই আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশ ছিল শাস্তিমূলক। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং তাঁদের তওবা কবুল করলেন, তখন পৃথিবীতে অবতরণের মূল হুকুম বহাল থাকলেও তার রূপ এবং উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হলো এবং হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর অবতরণ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর অভিজাত সৃষ্টি রূপে, এ সময় আল্লাহ পাক শান্তি ও নিরাপত্তার অভয়বাণী শ্রবণ করালেন হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে, এ মর্মে যে তোমরা জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ করোনা কেননা, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্যে বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, যদি তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়নে আত্ম-নিয়োগ কর এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হও। এবার তো শুধু এতটুকুই হলো যে, একটি আদেশ অমান্য করার কারণে বেহেশত থেকে বের করা হলো, পরে তা মাফ করা হলো।

কিন্তু তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যদি দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্য করে আর আল্লাহর তরফ থেকে আগত হেদায়েতকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়; তাদেরকে চিরদিন দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১]

এজন্যেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَامَّا يَاْتِيَنَّكُمْ.....هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"অতঃপর আমার নিকট থেকে আসবে হেদায়েত, যারা এ হেদায়েত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবেনা, পক্ষান্তরে যারা নাফরমান বা অবাধ্য

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩১

হবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, তারা হবে দোযখবাসী। তাতে তারা চিরদিন থাকবে"।

যারা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়েত মেনে চলবে, (হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের মতে, এ হেদায়েতের তাৎপর্য হলো আসমানী কিতাব সমূহ এবং আল্লাহর রসূল)[১] তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে তার কারণে মানব মনে যে ভীতির সঞ্চার হয়, তাকে (خوف) খাওফ বলা হয়।

এর পাশাপাশি বিপদগ্রস্ত হবার পর মানব-মনে যে শোকের ছায়া নেমে আসে, তাকে বলা হয় (حزن) হোয্ন।

যারা আল্লাহর পেয়ারা বন্দা হবে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে তাদের কোন ভয় এবং চিন্তা থাকবেনা। এটি হবে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলশ্রুতি।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"সতর্ক হও, মনে রেখো, যারা হবে আল্লাহর পেয়ারা তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা"।

আলোচ্য আয়াতে একথার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে, যারা হবে আল্লাহ পাকের অনুগত, সুপথ প্রাপ্ত, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, তারা থাকবে নিশ্চিন্ত এবং নিঃসন্দেহে তারা বেহেশতে গমন করবে। ভয়-ভীতি-শংকা, দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ তাদেরকে স্পর্শও করবেনা। তবে শর্ত হলো তাদের জীবন হতে হবে আল্লাহর বিধান মোতাবেক, তাদেরকে হতে হবে আল্লাহর প্রিয়, মূলতঃ এ কারণেই তারা হবে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত।

এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, হাদীস শরীফে রয়েছে কেয়ামতের দিন সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, এমনকি আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য ব্যক্তিরাও সেদিন অত্যন্ত বেশী ভীত হবেন, এমন অবস্থায় এ আয়াতের لا خوف কথাটির তাৎপর্য কি?

এ প্রশ্নের জবাবে তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। ভয় দু' প্রকার-

১। তানবীরুল মেকবাস, পৃষ্ঠা-৭

(১) নিজের অপরাধের শাস্তির ভয়,

(২) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতা ও কুদরতের কারণে মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে যে ভয়ের উদ্রেক হয়, সেই ভয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম প্রকার ভয় হবেনা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালাগণ করুণাময় আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করবেন, কোন অপরাধের শাস্তির সম্মুখীন তাঁরা হবেন না। কিন্তু আল্লাহ পাকের আজমত ও জালালের, তাঁর অসাধারণ প্রভাব ও দাপটের ভয় সর্বদা হবে। আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরে এ ভয় সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, "আল্লাহর পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার ভয়, তা তো হবে পরিপূর্ণভাবে। আর যারা আল্লাহর সর্বাধিক আপন, তাদের ভয় অত্যন্ত বেশী"।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেনঃ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যদি তার আইন উপদেষ্টা এ মর্মে নিশ্চিন্ত করেন যে, "এ মোকদ্দমায় তোমার কোন শাস্তি হবে না, তাতে তোমার কোন ভয় নেই", এতে সে নিশ্চিন্ত হবে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তার মনে স্বভাবগতভাবে যে ভয়-ভীতি থাকার কথা তা-ও থাকবেনা, বরং তা তো অবশ্যই থাকবে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরও বলেছেন, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হেদায়েত মেনে চলবে, তাদের দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবার কোন ভয় নেই এবং আখেরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবার কোন প্রকার আশঙ্কা হবে না।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে গমন করবে এবং দোযখবাসীগণ দোযখে চলে যাবে এবং মৃত্যুকে জবেহ করে দেয়া হবে, দোযখের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে তখন জান্নাতবাসীগণের আর কোন ভয় থাকবেনা এবং তারা কোন দিন আর চিন্তিতও হবে না।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ[৪] জান্নাত থেকে বের করার সময় হযরত আদম (আঃ) হযরত হাওয়া (আঃ) এবং ইবলিসকে আল্লাহ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠ-২৩৮
২। পূর্বোক্ত
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস (রাঃ), পৃষ্ঠা-৭
৪। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২

পাক যে নসিহত করেছেন, তা এ আয়াতে স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নবী রসূলগণ আগমন করবেন, আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হবে, আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হবে। ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে, সত্য পথ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হবে। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন এবং তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবে।

অতএব, যে তার যুগে প্রেরিত নবীর অনুসরণ করবে, কেয়ামতের ময়দানে তার কোন ভয় হবে না, আর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার কোন শোকও তার থাকবেনা। পবিত্র কোরআনের সূরা তোয়াহাতেও অনুরূপ ঘোষণা রয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

পবিত্র কোরআনে ইতিপূর্বে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

অর্থাৎ হে মানব জাতি! এরপর মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মানব জাতির একটি বিশেষ সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল জাতিকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাঁর অনুসারী হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেছিলো, দুনিয়ার ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো এবং তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হলো, তখন এ বনী ইসরাঈল জাতিই সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করতে লাগল, তাই এ সম্প্রদায়কে তাদের পিতামহের নাম ধরে ডাক দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের একজন নবীর সন্তান, অন্ততঃ তোমাদের বংশ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করেও তোমরা অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাক।

"ইসরাঈল" শব্দের ব্যাখ্যা

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেনঃ সমস্ত তফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসরাঈল নাম হলো হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পিতা হলেন হযরত ইসহাক (আঃ) এবং

তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র। হিব্রু ভাষায় "ইসরাঈল" শব্দটির অর্থ হলো আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বন্দা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু' পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ)। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একমাত্র নবী হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি শুধু নবীই নন, বরং তিনি নবী রসূলগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন এবং তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনি সর্বকালের জন্যে নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আগমন করবেন না। তবে পূর্ববর্তী কোন নবীর আগমন হলে তাঁর প্রতিও কর্তব্য হবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করা।

এজন্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি কোরআনের আহ্বান হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, এটিই চির শান্তি লাভের এবং চির নাজাত অর্জনের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতি এ মহা সত্য মেনে নিতে প্রস্তুত হলোনা, বরং এ মহা সত্যের বিরোধিতা করতে থাকে, তাই আল্লাহ পাক অতি সুন্দরভাবে তাদের পিতামহের নাম ধরে ডাক দিয়েছেন এবং তাদেরকে এ মহা সত্য গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বলে সম্বোধন করে তাদেরকে একথা বোঝানো হচ্ছে যে, তোমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তোমরা যেমন একজন নবীর বংশধর, তেমনি তোমাদের নিকট রয়েছে আল্লাহর কিতাব তৌরাত, আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পবিত্র কোরআন এ তৌরাতের সত্যতা বর্ণনাকারী। অতএব, তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর অনুসারী হওয়া।

হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করেছ, তা স্মরণ কর। কেননা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত দু' হাজার বছরের মধ্যে বনী ইসরাঈলে চার হাজার নবী আগমন করেছেন। তৌরাত সহ অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ পাক এ জাতিকে জালেম ফেরাউনের বর্ণনাতীত জুলুম থেকে উদ্ধার করে শ্যাম দেশের তথা সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন করেন। শুধু তাই নয়, ময়দানে তীহে তাদের খাবার হিসেবে "মান্না" "সালওয়া" নাযিল করেন, এমনিভাবে তাদের প্রয়োজনের আয়োজনে একই পাথর থেকে তাদের ১২টি গোত্রের জন্যে ১২টি নির্ঝরণী প্রবাহিত করেন। তাদেরকে দুনিয়ার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেন। এমনি আরও অসংখ্য নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, যা স্মরণ করার তাগিদ দিয়ে হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে।[১]

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতি থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, যখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হবে তখন তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। কিন্তু তারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো, তৌরাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলী বর্ণিত আছে, সেগুলো গোপন করতে সচেষ্ট হলো। প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে বাঁধা দিতে প্রয়াসী হলো।

তাই বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, "তোমরা আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করো। তাহলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূরণ করবো"।

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এ মহাগ্রন্থ তোমাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ সমূহের সত্যতা বর্ণনাকারী, অতএব তোমরা এ কিতাবের অস্বীকারকারী হতে পার না। অথচ আহলে কিতাবের মধ্যে বনী ইসরাঈলই সর্ব প্রথম পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করেছে। এজন্যে তাদেরকে বলা হয়েছেঃ "প্রথমেই এ কিতাবের অমান্যকারী হয়োনা" আর দুনিয়া আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের অনুপাতে অতি সামান্য ও নগণ্য, তার লোভে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়োনা, বরং আল্লাহকে ভয় কর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪২) এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করোনা, আর সত্যকে গোপনও করোনা অথচ তোমরা জান।

(৪৩) এবং নামাজ কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর, আর বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-২,, পৃষ্ঠা-১৩

(৪৪) তোমরা মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছ সৎ কার্যের, আর ভুলে যাও নিজেদেরকে? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক, তোমরা কি একথাটিও বুঝতে পার না?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের কথা, তওহীদ ও রেসালতের এ মৌলিক নীতি ঘোষণা করার পর ইসলামের বিভিন্ন বিধানের নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কিন্তু ইসলামের এ নির্দেশ পালনের পথে তখন যে দু'টি অন্তরায় ছিল সে সম্পর্কে সর্ব প্রথম হুশিয়ারী বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইহুদীরা জানতো যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই সত্য নবী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কিন্তু তারা ছিল জ্ঞানপাপী। ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা এ জ্ঞানকে গোপন রাখতো। দ্বিতীয়তঃ সত্যকে গোপন রাখতে না পারলেও তারা সত্যের সঙ্গে কিছু অসত্য কথা সংযোজিত করে মূল সত্য থেকে মানুষকে দূরে রাখার অপচেষ্টা করতো, যাতে করে কোন ভাবেই মানুষ সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করতে না পারে। আরবী ভাষায় এ কাজটিকেই বলা হয় "লাবস", তাই এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে, হক্ব ও বাতিল তথা সত্য ও অসত্যকে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করোনা। আর তোমাদের নিকট যে আসমানী কিতাব রয়েছে তাতে সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তা গোপন করোনা। তোমরা তো এ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যারা পৌত্তলিক তারা হয়তো তাঁর সম্পর্কে জানেনা, কিন্তু তোমরা তো জান অতএব, সত্যকে অসত্যর সাথে মিশিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো্না।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষকে বিভ্রান্ত করার নিমিত্তে সত্যের সাথে অসত্যকে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা নিতান্ত অবৈধ কাজ।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনের সময় সত্যকে গোপন করাও অন্যায় এবং অবৈধ কাজ। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

সত্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম কুরতবী (রঃ) এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা মুসনাদে দারমীতে সনদ সহ বর্ণিত আছে। এ ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কেননা, এতে সত্য প্রকাশের দৃষ্টান্ত রয়েছে। উমাইয়া বংশীয়

খলিফা সোলায়মান এবনে আবদুল মালেক একবার মদীনা মোনাওয়্যারায় হাযির হলেন। তিনি মানুষের নিকট জানতে চাইলেন, বর্তমানে মদীনা শরীফে এমন কে আছেন যিনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন? তাঁকে বলা হলো, বর্তমানে এমন ব্যক্তি হলেন হযরত আবু হাযেম (রঃ)। সোলায়মান তখন তাঁর খেদমতে দূত প্রেরণ করে তাঁর সাক্ষাত লাভের আকাঙ্ক্ষা পেশ করলেন। তিনি তশরীফ আনলেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হলো এভাবেঃ

সোলায়মানঃ হে আবু হাযেম! এ কোন্ ধরনের অসৌজন্যমূলক কাজ?

হযরত আবু হাযেমঃ আপনি আমার মধ্যে কোন্ কাজটি দেখলেন যাকে অসৌজন্যমূলক বলা যায়?

সোলায়মানঃ মদীনা শরীফের সকল বিখ্যাত অধিবাসীই আমার মোলাকাতের জন্যে এসেছেন কিন্তু আপনি আসেননি।

হযরত আবু হাযেমঃ আমীরুল মোমেনীন, যা অবাস্তব এমন কথা বলা থেকে আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইতিপূর্বে আপনি আমাকে জানতেন না, আর আমি আপনাকে কখনো দেখিনি। এমনি অবস্থায় আপনার সঙ্গে মোলাকাতের প্রশ্ন অবাস্তব। তাই অসৌজন্যতা কিভাবে হলো?

হযরত আবু হাযেমের কাছ থেকে এ জবাব শ্রবণের পর সোলায়মান এবনে শেহাব যুহরী সহ অন্যান্য উপস্থিত সুধী মন্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

তখন ইমাম যুহরী (রঃ) মন্তব্য করলেনঃ আবু হাযেম তো যথার্থই বলেছেন; বরং আপনার কথা আদৌ নির্ভুল নয়। এভাবে সোলায়মান আলোচনার ধারা পরিবর্তন করে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

সোলায়মানঃ হে আবু হাযেম! আমি কেন মৃত্যুর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি?

হযরত আবু হাযেমঃ আপনি দুনিয়াকে করেছেন আবাদ, আর আখেরাতকে করেছেন বরবাদ। আর আবাদকে ছেড়ে বরবাদের দিকে মনের আকর্ষণ না হওয়াই স্বাভাবিক।

সোলায়মানঃ পরকালে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কিভাবে হাযির হতে হবে?

আবু হাযেমঃ কোন মুসাফির সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়জনদের সাথে যেভাবে একত্রিত হয় ঠিক তেমনি নেককারগণ করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবেন। পক্ষান্তরে, কোন পলাতক গোলামকে যেভাবে তার মনিবের দরবারে হাযির করা হয়, ঠিক তেমনি পাপীদেরকে উপস্থিত করা হবে।

একথা শ্রবণ করে সোলায়মান ক্রন্দনরত হলেন এবং বললেন, হায়! যদি জানতে সক্ষম হতাম যে, আল্লাহ পাক আমার জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে কি ব্যবস্থা রেখেছেন?

হযরত আবু হাযেম (রঃ) বললেনঃ স্বীয় কার্যাবলীকে পবিত্র কোরআনের কষ্টি পাথরে বিচার করুন, এভাবে আখেরাতে আপনার কি অবস্থা হবে তা জানতে পারবেন।

সোলায়মানঃ পবিত্র কোরআনের কোন্ আয়াতে এর সন্ধান পাওয়া যায়?

হযরত আবু হাযেমঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

"নিশ্চয় নেককারগণ বেহেশতের সুখ সম্পদে বাস করবেন, আর বদকার লোকেরা থাকবে দোযখে"।

সোলায়মানঃ আল্লাহ পাকের রহমত তো অনন্ত অসীম, তা বদকার ও নাফরমান লোকদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

হযরত আবু হাযেমঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছেঃ

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের রহমত নেককার লোকদের অতি নিকটবর্তী"।

সোলায়মানঃ আল্লাহ পাকের বন্দাগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী কে?

হযরত আবু হাযেমঃ যার মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণ শালীনতা এবং মানবতাবোধ, যে কঠিন জ্ঞানের অধিকারী ও প্রকৃত বিবেকবান।

সোলায়মানঃ সর্বোত্তম কাজ কোনটি?

হযরত আবু হাযেমঃ অবৈধ বা হারাম বস্তু সমূহ বর্জন করা এবং অবশ্য কর্তব্য সমূহ যথার্থভাবে পালন করা।

সোলায়মানঃ কোন্ দোয়াটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য?

হযরত আবু হাযেমঃ দাতার জন্যে দান গ্রহীতার দোয়া।

সোলায়মানঃ সর্বোত্তম দান কোন্টি?

হযরত আবু হাযেমঃ নিজের অত্যন্ত প্রয়োজন এবং অতীব অনটন থাকা সত্ত্বেও সাহায্য প্রার্থীকে দান করা, যদি দান গ্রহীতাকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া হয়, এমনকি দানের উল্লেখ করে তাকে লজ্জিতও না করা হয়।

সোলায়মানঃ কোন্ কথাটি সর্বোত্তম?

হযরত আবু হাযেমঃ যার ভয়ে ভীত থাকতে হয় অথবা যার নিকট কিছু আশা করা হয়, তার সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে সত্য কথা প্রকাশ করা।

সোলায়মানঃ সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী এবং পরিণামদর্শী মুসলমান কে?

হযরত আবু হাযেমঃ যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি থাকে অনুগত, অন্যকেও আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে।

সোলায়মানঃ তাহলে এবার বলুন, মুসলমানদের মধ্যে সবেচেয় বড় নির্বোধ কে?

আবু হাযেমঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে জুলুমের কাজে কোন প্রকার সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বীয় ধর্মকে বিক্রি করে অপরের জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার করে।

সোলায়মানঃ আপনি সঠিক কথা বলেছেন তবে এবারে আমাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

হযরত আবু হাযেমঃ এ প্রশ্নের জবাব থেকে অব্যাহতি দান করাকে অতি উত্তম কাজ মনে করি।

সোলায়মানঃ দয়া করে আমাদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

হযরত আবু হাযেমঃ আপনার পূর্ব পুরুষগণ তরবারী বলে ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে শাসন করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

বড়ই আক্ষেপ! যদি আপনি এ বিষয় অবগত হতেন, মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা কি এবং তাদের বক্তব্য কি? আর তাদেরকে কি বলা হচ্ছে?

খলীফা সোলায়মানের জনৈক অনুচর হযরত আবু হাযেমের সুস্পষ্ট মন্তব্য শ্রবণ করে বললো, আবু হাযেম! তুমি অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য করলে। তিনি বললেনঃ না তুমি ভুল বলছো। কোন অন্যায় কথা বলিনি। মূলতঃ আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে সে অনুসারেই কথা বলেছি কেননা, আল্লাহ পাক আলেমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা মানুষের নিকট সত্য কথা প্রচার করবে, কোন অবস্থাতেই সত্য গোপন করবে না।

এরশাদ হয়েছেঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

অর্থাৎ যা সত্য তা তোমরা মানুষের নিকট প্রচার করবে, আর সত্যকে গোপন করবেনা।

সোলায়মানঃ আমাদের "এসলাহ" বা সংশোধন কিভাবে হতে পারে?

হযরত আবু হাযেমঃ গর্ব ও অহংকারের পথ বর্জন কর, বিনয় ও নম্রতা এবং ভদ্রতা-শালীনতার পথ গ্রহণ কর, আর যারা হক্বদার, তাদের প্রাপ্য হক্ব নিয়ম-নীতি অনুসারে তাদের মাঝে বিতরণ কর।

সোলায়মানঃ আপনি কি দয়া করে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করতে পারেন?

হযরত আবু হাযেমঃ আল্লাহ্ পাক আমাকে এ কাজ থেকে রক্ষা করুন।

সোলায়মানঃ কেন আত্মরক্ষার প্রয়াস?

হযরত আবু হাযেমঃ যেন তোমাদের ধন-দৌলত, মান-মর্যাদা, ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পড়ি কেননা, এর পরিণাম কঠোর শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সোলায়মানঃ আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে দয়া করে বলুন, সকল প্রয়োজনের আয়োজন করা হবে।

হযরত আবু হাযেমঃ একটি প্রয়োজন অবশ্যই আছে, দোযখের শাস্তি থেকে নাজাত লাভ ও বেহেশতে প্রবেশাধিকার।

সোলায়মানঃ এ প্রয়োজনের আয়োজন তো আমার সাধ্যাতীত।

হযরত আবু-হাযেমঃ তাহলে আপনার কাছে আমাদের চাওয়া পাওয়ার কোন কিছুই নেই।

সোলায়মানঃ আপনার সমীপে দোয়া প্রার্থনা করি, আমার জন্যে দোয়া করুন।

হযরত আবু হাযেম এই বলে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! সোলায়মান যদি আপনার পছন্দনীয় মানুষ হয়ে থাকে তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের যাবতীয় কল্যাণ তাকে দান করুন। আর যদি সে আপনার দুশমন হয়ে থাকে, তবে তাকে আপনার আনুগত্যের জন্য বাধ্য করুন।

সোলায়মানঃ আমাকে কিছু নসীহত করুন।

হযরত আবু হাযেমঃ স্বীয় পালনকর্তাকে এত বড় এবং ক্ষমতাবান মনে কর যে, তিনি যেন তোমাকে এমন জায়গায় বা অবস্থানে দেখতে না পান, যা তাঁর অপছন্দনীয়, তাঁর নিকট থেকে অবৈধ বলে ঘোষিত, আর যে স্থানে উপস্থিতির নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে যেন তুমি অনুপস্থিত না থাক।

এরপর সোলায়মান তাঁর জন্যে কিছু হাদীয়া প্রেরণ করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বস্তুতঃ এভাবে পূর্বকালের ওলামায়ে কেরাম সত্যকে প্রকাশ করতেন, সত্যের প্রচার করতেন, অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম অব্যাহত রাখতেন। তাঁদের সত্য প্রকাশের বহু দৃষ্টান্ত সংরক্ষিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

তবে এ আয়াতে ইহুদীদের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী কেননা, তারা তৌরাতের মাধ্যমে এ বিষয়টি অবগত হয়েছিল যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত কোন মানুষ সত্যের সন্ধান পেতে পারে না, আর সত্যের সন্ধান না পেলে কেউ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ ইহুদীরা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

وَاَقِيْمُوا

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (যখন তোমরা জান হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী) অতএব, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ কর। তাঁর সাথে নামাজ কায়েম কর। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তোমরা অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় কর। আর মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হও, সকল নেক কাজে মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে থাক, আর সমস্ত নেক কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নামাজ। অতএব, নামাজের জামাতে মুসলমানদের সাথে শামিল হও।

ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী বা-জামায়াত নামাজকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে জামায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।[১]

এবনে কা'বের বর্ণনায় রয়েছেঃ জামায়াত যত বড় হবে, তা আল্লাহ পাকের দরবারে ততই পছন্দনীয় হবে।

ইমাম আওজায়ী বর্ণনা করেছেন, জুমআর নামাজ ও জামাআত ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য প্রকাশ করা শরীয়ত সম্মত নয়, অর্থাৎ পিতা-মাতা যদি জুমআর নামাজ বা জামাআতের নামাজে হাযিরী দিতে বাধা দেন তবে তাঁদের নির্দেশ লঙ্ঘন করেও জুমআর নামাজে এবং নামাজের জামাআতে হাযির হতে হবে।[২]

اَتَاْمُرُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইহুদীদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তোমরা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ পাকের প্রতি, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, মুসলমানদের সাথে নামাজের জামাআতে শামিল হও।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩
২ : তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা তা না কর তবে কি তোমরা শুধু মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক আর সৎ কাজের ব্যাপারে নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা আসমানী কিতাব পাঠ করে থাক, এ স্ববিরোধী নীতি যে কত অন্যায়, তা কি তোমরা উপলব্ধি কর না?

প্রখ্যাত তফসীরকারগণ এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ মদীনা তৈয়্যেবায় কোন কোন ইহুদী তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে গোপনে ইসলাম কবুল করতে উদ্বুদ্ধ করতো, ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে মানুষকে এজন্যে অনুপ্রাণিত করতো, তবে নিজে ইসলাম কবুল করতো না। এ আয়াতে তাদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, তোমরা মানুষকে যে সত্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে থাক, সত্যকে নিজেদের জীবনে বরণ করে নিতে কেন বিরত হও?[১]

এ আয়াতে ভর্ৎসনা রয়েছে সেসব লোকদের জন্যে যারা মানুষকে সৎ কাজের আহ্বান জানায় কিন্তু নিজে সেই সৎ কাজ করে না, অথচ কর্তব্য হলো নিজে সৎ কাজ করা এবং অপরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া। যারা এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করে, তাদের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী।

একটি প্রশ্ন

বে-আমল আলেমদের ওয়াজ নসিহত করা কি উচিত? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত "তফসীরে রুহুল মাআনী"তে লিখেছেনঃ এতে বে-আমল উপদেশ দানকারীর প্রতি তিরস্কার রয়েছে সত্য কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বে-আমল ব্যক্তি অপরকে নসিহত করতে পারবে না, বরং নসীহত অবশ্যই করতে পারবে এবং নিজেও আমল করতে সচেষ্ট হবে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেন, এ আয়াত সে ব্যক্তির জন্যে দলিল নয় যে মনে করে বে-আমল লোকদের নসীহত করা অনুচিত কেননা, নিজে আমল না করে অপরকে নসীহত করা, এতে দুটি কাজ হলো (১) নিজে আমল না করা (২) অপরকে নসীহত করা। প্রথম কাজটি মন্দ, দ্বিতীয় কাজটি ভাল, এখন যদি অপরকে নসীহত বর্জন করা হয় তবে দু'টি কাজই হবে মন্দ, তাই বে-আমল লোকও সত্যের নির্দেশ দিতে পারবে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরও বলেন, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করা একটি বিশেষ কর্তব্য। আর এ কর্তব্য সে ব্যক্তির প্রতিও বর্তায় যে নিজেও মন্দ কাজে লিপ্ত। তিনি বলেছেনঃ মন্দ কাজ করা একটি অপরাধ আর মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাও আর একটি স্বতন্ত্র মন্দ কাজ।[২]

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩৩
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৮

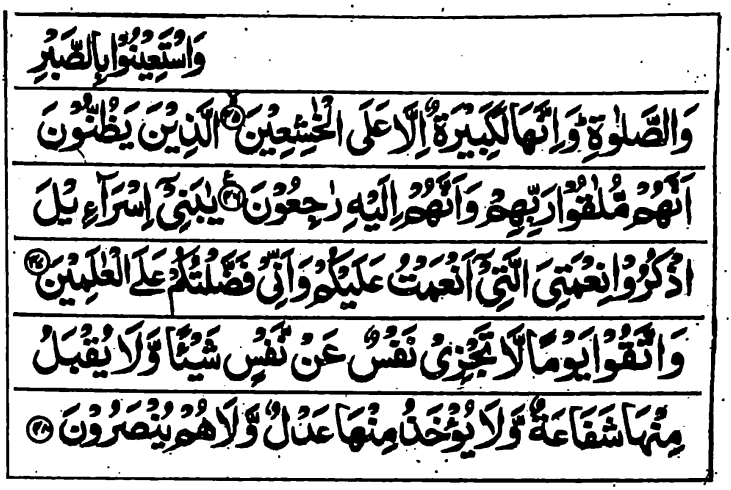
হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) তাঁর "তফসীরে বয়ানুল কোরআনে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ "এতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বে-আমল আলেমের পক্ষে ওয়ায়েজ বা উপদেশ দানকারী হওয়া অবৈধ, বরং একথাই প্রমাণিত হয় যে, ওয়ায়েজ বা উপদেশ দানকারীর জন্যে বে-আমল হওয়া জায়েয নয়। এ দু'টি কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আকাশ-পাতালের, অর্থাৎ আমলের ত্রুটির জন্যে ওয়াজ-নসিহত পরিত্যাগ না করে নিজের সংশোধনের তথা আমল সম্পাদনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

হযরত মুফতী শফী সাহেব (রঃ) "মা'আরেফুল কোরআনে" এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা একথা বোঝা যায় না যে, কোন বে-আমল ব্যক্তির পক্ষে অপরকে উপদেশ দেয়া জায়েয নয়, কেননা সৎ কাজ করা একটি স্বতন্ত্র নেক কাজ। আর সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া আরেকটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নেক কাজ। একটির জন্যে আরেকটিকে বর্জন করার কোন যুক্তি নেই। তিনি আরও লিখেছেনঃ যদি প্রত্যেকটি মানুষ নিজেকে পাপী বলে অন্যকে পাপ কার্য থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দেয়, আর সে একথা মনে করে যে, যেদিন নিজে সম্পূর্ণ নিঃস্পাপ হবো সেদিনই অপরকে নসীহত করবো, তাহলে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যের নির্দেশ দেয়ার কেউ থাকবে না কেননা, এ পৃথিবীতে কে আছে যে সম্পূর্ণ নিঃস্পাপ? এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত হাসানের একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

"শয়তানের আকাঙ্ক্ষা তো এই, মানুষ এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দ্বীনের তবলীগের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকুক"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, আলোচ্য আয়াতে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া যেমন কর্তব্য, তেমনি ভাল কাজ করাও একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য। অতএব, নিজেও ভাল কাজ করবে এবং অন্যকেও ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। এটিই হলো এ আয়াতের মর্মবাণী।

অতএব, পূণ্যবান হতে হবে এবং পূণ্য পথের প্রদর্শকও হতে হবে। আত্ম-সংশোধনে সচেষ্ট থাকতে হবে, আর অন্যের সংশোধনেও আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। সত্যের সাধনায় অপরকে অনুপ্রাণিত করে নিজেকে বিস্মৃত করা হবে নিতান্ত অনুচিত।


وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾ يٰبَنِي إِسْرَآءِيلَ
اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৪৫) এবং সবর ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় নামাজ একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ বটে তবে, সেসব লোকদের জন্যে কঠিন নয়।

(৪৬) যারা মনে রাখে যে, তারা স্বীয় প্রভুর দরবারে হাযির হবে এবং তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

(৪৭) হে ইসরাঈল বংশধরগণ! আমি যে নেয়ামত তোমাদেরকে দান করছি, তা স্মরণ কর। আর আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছি একথাও স্মরণ কর।

(৪৮) আর সেদিনকে ভয় কর, যেদিন একজন অন্যজন থেকে এতটুকুও উপকৃত হবে না এবং সেদিন কারো কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারো নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

ইহুদী ধর্ম-যাজকরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকতো, এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ নিন্দনীয় আচরণের জন্যে তিরস্কার রয়েছে, আর এ আয়াতে তাদের সংশোধনের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

সাধারণতঃ অর্থলোভ ও পদ-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে এমন অন্যায় আচরণে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন একখানি হাদীসে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ বয়ঃবৃদ্ধ হয় (কিন্তু তার পাশাপাশি) সেই মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র যৌবন লাভ করতে থাকে– একটি অর্থ-সম্পদের লিপ্সা, অন্যটি পদ মর্যাদার লোভ।

মূলতঃ এগুলো হলো মানব অন্তরের ব্যাধি। এ ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ হলো নামাজ এবং সবর।

তাই এ আয়াতে সত্য-গ্রহণের অন্তরায় তথা অর্থ-সম্পদের লিপ্সা ও পদ মর্যাদার লোভ দূরীভূত করার নিমিত্তে নামাজ ও সবর দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নামাজের মাধ্যমে যে বিনয় এবং নম্রতার শিক্ষা লাভ হয়, তা দ্বারা পদ-মর্যাদা লাভের যে লোভ মানব-অন্তরে সৃষ্টি হয়, তা দূরীভূত করা সম্ভব হয়। এমনিভাবে অর্থ-লোভের রোগের অত্যন্ত সার্থক প্রতিষেধক হলো সবর।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবর তিন প্রকার ঃ (১) বিপদাপদের সময় সবর, (২) পাপাচার পরিহার করার জন্যে সবর, (৩) আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূলের হুকুম পালনার্থে সবর।

হযরত আলী (রঃ) বলেছেনঃ সবর হলো ঈমানের রহস্য, তাই যার মধ্যে সবর নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই।

এমনিভাবে আল্লাহ পাকের সকল নবী রসূলগণের নিয়ম ছিল তাঁরা কোন সংকটের সম্মুখীন হলে নামাজে মশগুল হতেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাকওয়া-পরহেজগারী, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা ও এবাদতের মাধ্যমেই চরম ও পরম সাফল্য অর্জিত হয়।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কাজে নামাজ এবং সবর দ্বারা প্রার্থনা কর। তোমাদের প্রতি যা অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ বলে ঘোষিত হয়েছে; তা পালন কর, নামাজ আদায় কর, রোজাব্রত পালন কর ও সবর অবলম্বন কর। এজন্যে মাহে রমজানকে সবরের মাস বলা হয়েছে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রোজা হলো অর্ধেক সবর আর সবরের আরও একটি অর্থ হলো পাপাচার থেকে বিরত থাকা। যদি সবরের এ তাৎপর্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে পাপাচার থেকে বিরত হওয়া এবং সৎ কাজ করা উভয়ের বর্ণনা হয়ে গেল, কেননা সৎ কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নামাজ। হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সবর দু' প্রকার (১) বিপদের সময় সবর অবলম্বন করা এবং (২) পাপাচার পরিহার করার সময় সবর, আর এ সবর উত্তম।

হযরত সাঈদ এবনে যোবাইর (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ মানুষের সব কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়, এ কথা বিশ্বাস করা, সওয়াবের অন্বেষণ করা, বিপদাপদের জন্যেও আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সওয়াব পাওয়া যাবে, একথা

উপলব্ধি করা হলো সবর। অতএব, আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক কার্যাবলীতে সবর করা কর্তব্য।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজে নামাজ দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

অর্থাৎ নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয় নামাজ অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে বিরত রাখে, আর আল্লাহর জিকর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি নামাজে মশগুল হতেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় হযরত হোজায়ফা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে রাত্রে হাযির হয়ে দেখলেন তিনি নামাজে রত রয়েছেন।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ বদরের যুদ্ধের রাত্রে লক্ষ্য করেছি আমরা সকলেই নিদ্রা সুখ ভোগ করছি, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত নামাজ ও দোয়ায় মশগুল ছিলেন।[১]

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। ৩১৩ জন নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমান এক হাজার সশস্ত্র কাফেরের মোকাবেলায় সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, আল্লাহর দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উপস্থিত হয়েছেন। এমনি সংকটময় মুহূর্তে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকল যুগের প্রতিটি মুসলমানের জন্যে এ মহান আদর্শ রেখে গেছেন যে, যে কোন সংকটের সময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে এবং সবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

নামাজঃ অতএব, জীবন-সংগ্রামে সাফল্যের জন্যে নামাজের গুরুত্ব সমধিক। কেননা, নামাজ হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর বন্দার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম।

মানুষ মাত্রেরই এ নশ্বর জগতে থাকা অবস্থায় মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তার হুজুরে দন্ডায়মান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আসে নামাজের সময়। আল্লাহ পাকের পবিত্র

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬

সান্নিধ্যে উপস্থিতি, তাঁর স্মরণে বিভোর ও তন্ময় থাকা, তাঁর প্রতিটি হুকুম পালনের শপথ গ্রহণ করা, তাঁর প্রতি বন্দা মাত্রের আন্তরিক বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করা, তাঁর রহমত লাভে ধন্য হওয়া, নয়ন মনের শান্তি অর্জন করা, আত্ম-পরিচিতি লাভ করে আত্মোন্নতি অর্জনের সুযোগ এনে দেয় নামাজ। সকল অশান্তি, অন্যায়-অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে নামাজ। তাই নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

সবরঃ এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে জীবন-সমস্যার সমাধান-কল্পে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। কেননা সবরই একমাত্র পন্থা যদ্বারা জীবন-সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করা সহজ এবং সম্ভব হয়, এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

দুনিয়াতে যদি কোন ব্যক্তিকে সবর অবলম্বনের গুণ প্রদত্ত হয় তবে মনে করতে হবে, তাকে সবচেয়ে উত্তম এবং ব্যাপকতর নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে। সবরের তাৎপর্য হচ্ছে নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে তথা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখা। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, অথবা প্রাপ্ত নেয়ামতকে স্মরণ করে বর্তমান বিপদে সবর অবলম্বন করা। জীবন সাধনার সার্থকতায় এ সবরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তাই সবরের গুণ অর্জনের তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সফরে ছিলেন। এমন সময় তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পাঠ করলেন এবং উষ্ট্রকে পথের পার্শ্বে বসিয়ে নামাজ শুরু করলেন এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামাজে রত রইলেন।

এভাবে পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম সবর এবং নামাজ দ্বারা জীবনের জটিল সমস্যার মোকাবেলা করতেন এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন করতেন।

وَاِنَّهَا

আর এ নামাজ অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে তাদের জন্যে আদৌ কঠিন নয়। যারা একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তারা স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে হাযির হবে।

যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

(নিশ্চয় আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে এক দিন আমাকে জীবনের কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ দিতে হবে।)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন একজন গুনাহগার বন্দাকে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেনঃ আমি কি তোমাকে স্ত্রী পুত্র পরিবার দান করিনি? তোমাকে বিভিন্ন নেয়ামত কি দান করিনি? বিভিন্ন প্রকার জীব জন্তুকে তোমার অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাদের জন্যে পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? আমি কি তোমাকে সুখ-সামগ্রী দান করিনি?

সে বন্দা জবাবে আরজ করবে, হে আল্লাহ! এ সমস্ত নেয়ামত আমি ভোগ করেছি। তখন আল্লাহ পাক পুনরায় জিজ্ঞাসা করবেনঃ তুমি কি একথা বিশ্বাস করতে না যে, তোমাকে আমার দরবারে হাযির হতে হবে? তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! একথাটি আমি বিশ্বাস করতাম না।

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ যেভাবে দুনিয়াতে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে ঠিক তেমনি আজ তোমাকেও আমি ভুলে যাব। যেমন পবিত্র কোরআনেও একথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

"এভাবেই এসেছিল তোমার নিকট আমার আয়াত সমূহ, যা তুমি ভুলে গিয়েছিলে, এমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে"।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সে নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর যা তোমাদেরকে আমি দান করেছি কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি আল্লাহ পাক অনন্ত-অসীম নেয়ামত দান করেছিলেন, বহু নবী প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও দান করেছেন। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পরিপূণ অনুসরণ করা।

বিশেষভাবে তাদের একথা স্মরণ করা উচিত যে, বনী ইসরাঈল জাতিকে যখন আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছিলেন তখন তাদের সম-সাময়িক মানুষদের মধ্যে তাদেরকে দান করেছিলেন বিশেষ ফজিলত। এ ফজিলতের বিবরণ রয়েছে অন্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

"এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদের মাঝে নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা"।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলকে যে ফজিলত বা মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তা আদৌ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বা তাঁর উম্মতের উপর নয় কেননা, তাদের মাঝে আগমনকারী নবীগণের জন্যেই বনী ইসরাঈলের ফজিলত।[১]

আর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ফজিলত অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই উত্তম জাতি, তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানব জাতির উপকারার্থে"।

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে ঈমানের জন্যে অনুপ্রাণিত করা কেননা, এই সমস্ত দানে ধন্য হবার কথা জানার পর তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কিন্তু তারা এ কর্তব্য পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। তাই পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا

দুনিয়াতে সাধারণতঃ নিয়ম হলো কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্ত হলে তার আপন-জনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়, নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয় তখন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে বিনিময়-মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয় তখন সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন অবস্থায় যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। বনী ইসরাঈল জাতির ধারণা ছিল হয়তো আখেরাতেও এ সমস্ত প্রক্রিয়ার বিপদ মুক্ত হওয়া যাবে কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অনেক নবী রসূল ছিলেন, তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করিয়ে দেবেন।

কিন্তু এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় বনী ইসরাঈল জাতির এসব ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা এবং অসারতা ঘোষণা করেছেনঃ সেদিনকে ভয় কর অর্থাৎ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫০

কেয়ামতের দিন, যে দিন কেউ কারও কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো তরফ থেকে কোন বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না।

অতএব, কেয়ামতের দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৯) এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন ফেরাউনের দল থেকে আমি তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম, তারা তোমাদেরকে নিদারুণ কষ্ট দিত, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং মেয়েদেরকে রাখতো জীবিত। আর এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে মহা পরীক্ষা।

(৫০) আর আমি যখন সমুদ্রকে তোমাদের জন্যে বিদীর্ণ করি, অতঃপর তোমাদেরকে নাজাত প্রদান করি এবং ফেরাউনের দলকে নিমজ্জিত করি, তোমরা সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলে।

(৫১) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে চল্লিশ রাতের অঙ্গীকার করেছিলাম তখন তোমরা মূসার অবর্তমানে গো-বৎসকে উপাসনার জন্যে পছন্দ করেছিলে। মূলতঃ তোমরাই ছিলে অত্যন্ত অন্যায়কারী।

(৫২) এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ

এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি নাজাত দিয়েছিলাম তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে) ফেরাউনের দলের জুলুম থেকে, তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানে সচেষ্ট থাকতো, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে তারা হত্যা করতো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে তারা জীবিত রাখতো (আর তা নিতান্ত নিজেদের স্বার্থে কেননা, স্ত্রীলোকদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায় বাঁদী হিসেবে ব্যবহার করতো, তাদেরকে বেগার খাঁটানো হতো, তাদের দ্বারা বাড়ী-ঘর নির্মাণের কাজ করানো হতো, কৃষি কাজেও তারা ব্যবহৃত হতো, বোঝা বহনে বাধ্য করা হতো এবং এমনি আরও বহু কঠোর পরিশ্রমের কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা হতো)।[১]

পুত্র সন্তানদের যবেহ করা এবং মেয়েদের জীবিত ছেড়ে দেয়ার কারণ ছিল ফেরাউনের একটি স্বপ্ন। ফেরাউন স্বপ্নে দেখেছিল, "একটি অগ্নিকুন্ড বায়তুল মোকদ্দাসের তরফ থেকে এসে সমগ্র মিশরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় কেবতীদের জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে"। এ স্বপ্নের কারণে ফেরাউন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। রাজ-দরবারের জ্যোতিষীরা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললোঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে, যার হাতে তোমার পতন এবং তোমার সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ফেরাউন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে এ নির্দেশ দেয় যে, বনী ইসরাঈলের সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হোক। কোন অবস্থাতেই যেন বনী ইসরাঈলের কোন পুত্র সন্তান জীবিত না থাকতে পারে তার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এভাবে সে বনী ইসরাঈলের বার হাজার শিশু হত্যা করে।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আমার নিকট এ বিবরণ পৌঁছেছে যে, ফেরাউন ৯০ হাজার শিশু হত্যা করেছে। এরপর বণী ইসরাঈলের বৃদ্ধ লোকদের মধ্যেও মহামারীর কারণে অনেকের মৃত্যু হয়। তখন কেবতী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ অবস্থায় অস্থির হয়ে ফেরাউনকে বললো, বনী ইসরাঈলের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৩

শিশুরা আপনার আদেশ ক্রমে নিহত হচ্ছে এবং বৃদ্ধরাও স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করছে, এমন অবস্থায় বনী ইসরাঈল জাতি নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অবশেষে কোন কাজের লোক পাওয়া যাবেনা এবং সকল পরিশ্রমের দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তাবে। তখন ফেরাউন এ নির্দেশ জারী করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা করা হবে, আর এক বছর তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ পাকের কুদরতের কি মহিমা, যে বছর হত্যা না করার নির্দেশ ছিল সে বছর জন্ম গ্রহণ করলেন হযরত হারুন (আঃ), আর যে বছর শিশু হত্যা করা হচ্ছিল সে বছর জন্ম গ্রহণ করলেন হযরত মূসা (আঃ)। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের পতনের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, সেজন্যে তাঁকে হত্যা করা ফেরাউন এবং তার সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হযরত মূসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতা ফেরাউনের সৈন্যদের আক্রমণের কথা চিন্তা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। তাই তিনি একটি কাঠের বাক্সে নবজাত শিশু মূসা (আঃ)-কে রেখে বাক্সটি নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন। সে বাক্স ভাসতে ভাসতে মিশরের রাজমহলের সম্মুখে পৌঁছলে ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া যিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, যিনি ছিলেন নিঃসন্তান, তিনি ওই বাক্সটি এবং তাতে সংরক্ষিত নবজাত শিশুটি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং শিশুটিকে লালন-পালনের ইচ্ছা করলেন। ফেরাউনকে তিনি এই বলে রাজি করালেন যে তুমি অনেক শিশুকে হত্যা করেছ, আমি এই একটি শিশুকে রাখতে চাই, তুমি এতে বাধা দিওনা। অবশেষে ফেরাউনের বাড়ীতেই হযরত মূসা (আঃ) বড় হলেন (ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র হবে)।

ফেরাউন

আমালেকা জাতির রাজার খেতাব ছিল ফেরাউন। যেমন পারশ্য রাজার খেতাব ছিল কেসরা এবং তুরস্কের রাজার খেতাব ছিল খাকান, ইয়ামনের রাজার খেতাব ছিল তোব্বা এবং আবিসিনিয়ার রাজার খেতাব ছিল নাজ্জাশী। ঠিক এমনিভাবে মিশরের অধিবাসী কেবতীদের রাজার খেতাব ছিল ফেরাউন। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল ওলীদ এবনে মাসআব এবনে রাইয়ান। তার বয়স হয়েছিল চারশত বছরেরও অধিক। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল রাইয়ান। এ দু' ফেরাউনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল ৪০০ বছরের।[১]

وَفِىْ ذٰلِكُمْ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯

অর্থাৎ এ ঘটনায় তাদের জন্যে একটি বিরাট পরীক্ষা ছিল। এ ঘটনা বলতে দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যাকান্ড, দ্বিতীয়টি হলো ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার থেকে বণী ইসরাঈলের নাজাত লাভ। প্রথম অর্থে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যা নিঃসন্দেহে একটি পরীক্ষা ছিল। আর এতে সবর বা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা হয়। আর ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাতের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের প্রতি বিরাট নেয়ামত দান করা হয়। আর এতে শোকর গুজারীর তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরীক্ষা হয়। মূলতঃ আরবী ভাষায় 'বালাউন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদি বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে তবে 'বালা' শব্দের অর্থ হবে বিপদ। পক্ষান্তরে, যদি ফেরাউনের জুলুম থেকে তাদের নাজাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তবে এ শব্দটি নেয়ামত অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর যদি উভয় উদ্দেশ্যেই শব্দটি ব্যবহার করা হয় তবে এর অর্থ হবে পরীক্ষা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে ভাল এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করবো"।

অতএব, যখন আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত অর্জিত হয় তখন তাঁর শোকর আদায় করা কর্তব্য। আর যখন কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তখন সবর করা উচিত। যেমন এ ঘটনায়ও এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি চরম জুলুম-অত্যাচার করছিল এবং তারা ছিল তখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। এরপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ বিপদ থেকে নাজাত দিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রেরণের মাধ্যমে। যখন তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করলো এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিল, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত দিলেন। এটি ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিরাট নেয়ামত। পরবর্তী আয়াতে এ নেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় ইহুদীরা তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ আয়াত দ্বারা এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন যে, যেভাবে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের মাধ্যমে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেয়েছিল, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার সময় যারা দুনিয়াতে বর্তমান ছিল এবং অনাগত ভবিষ্যতে যারা আসবে তাদের সকলের জন্যে পবিত্র কোরআনের এ আহ্বান, তারা যদি পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ

নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসরণ করে, তবে তাদেরও চির কল্যাণ হবে সুনিশ্চিত।

وَإِذْ فَرَقْنَا

আর সেদিনকার কথা স্মরণ কর, যখন ফেরাউনের ভয়ে তোমাদেরকে অর্থাৎ তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে দেশ ত্যাগ করে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে লোহিত সাগরের উপকূলে হাযির হতে হয়, তখনকার অবস্থা ক্ষণিকের জন্যে কল্পনা কর। তাদের সম্মুখে ছিল সাগর, পশ্চাতে ছিল জালেম ফেরাউন ও তার সৈন্যদল, এমনি উভয় সংকেট পতিত বনী ইসরাঈলকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি সাগরকে বিভক্ত করে দিলাম। অতঃপর হে বনী ইসরাঈল! তোমাদেরকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করলাম এবং ফেরাউনকে তার সৈন্যদল সহ নিমজ্জিত করে দিলাম, আর সে ভয়াবহ দৃশ্য তোমরা অবলোকন করছিলে।

এ ঘটনা সে সময়কার, যখন হযরত মূসা (আঃ) নবুওয়্যত লাভ করলেন এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে ফেরাউনকে সত্য পথ গ্রহণের আহ্বান জানালেন, কিন্তু ফেরাউন সত্য পথ গ্রহণে আদৌ রাজি হলোনা, এমন অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিশর থেকে বেরিয়ে যাও আর এ ভ্রমণের বিষয় গোপন রাখ, এমনকি ভ্রমণের প্রস্তুতিও গোপন রাখ। এদিকে কেবতীদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত তারা মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত রইল, হযরত মূসা (আঃ) ঐ সময়ে ৬ লক্ষ বনী ইসরাঈলের একটি বিরাট দল নিয়ে মিশর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আমর এবনে মায়মুন বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আঃ) যখন যাত্রা শুরু করেন, তখন এ খবর ফেরাউন পেয়ে যায়, ফেরাউন বললো, যখন রাতের শেষ প্রহরে মোরগ ডাক দেয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে এবং বনী ইসরাঈলদেরকে হত্যা করবে, কিন্তু সে রাতে আল্লাহ পাকের কুদরতে মোরগ ডাক দিলনা, ফলে মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈল জাতিকে নিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেলেন। দলের সম্মুখে ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হযরত হারুন (আঃ), আর হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন সবার পশ্চাতে।

এদিকে ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের পলায়নের সংবাদ পাওয়া মাত্র ১ কোটি ৭ লক্ষ লোকের বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো, তাদের সঙ্গে ছিল ৭০ হাজার কৃষ্ণ বর্ণের অশ্ব।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৫

যখন উভয় দল পরস্পরের নিকটবর্তী হলো এমনকি, একে অন্যকে দেখে ফেললো তখন হযরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গীরা বলতে লাগলো, আমরা যে পাকড়াও হয়ে গেলাম। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, অসম্ভব। কখনও তারা আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারবেনা, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ۞ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

অর্থাৎ যখন দু' দল পরস্পরকে দেখতে লাগলো তখন মূসা (আঃ)-এর লোকেরা বলতে লাগলো, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম, মূসা (আঃ) জবাবে বললেনঃ কখনও নয়, আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি আমাকে পথ-প্রদর্শন করবেন।

তখন আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন,

اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

(সূরা শুআরা)

অর্থাৎ লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর, ফলে সাগর বিভক্ত হলো এবং একেকটি খন্ড পাহাড়ের মত হয়ে গেল এবং সাগরের মাঝে পথ তৈরী হলো। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র, বারটি পথে সমুদ্র অতিক্রম করে ফেরাউনের জুলুম থেকে শান্তিপূর্ণভাবে নাজাত লাভ করলো, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে নাজাত দিলাম ফেরাউনের অত্যাচার থেকে এবং নিমজ্জিত করলাম ফেরাউনের লোকদেরকে"।

এদিকে ফেরাউন এবং তার লোকদের অবস্থা ছিল এই, ফেরাউন যখন দেখলো লোহিত সাগরের মাঝে পথ তৈরী হয়ে আছে তখন সে গর্ব করে বললোঃ দেখ, আমার ভয়ে সাগর বিভক্ত হয়েছে এবং তোমাদের জন্যে পথ করে দিয়েছে, যাতে করে আমরা পলাতকদেরকে পাকড়াও করতে পারি। ফেরাউন একটি কৃষ্ণ বর্ণের অশ্বে আরোহী ছিল।

আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত জীব্রাইল (আঃ) মানব রূপ ধারণ করে একটি মাদী ঘোড়ার উপর আরোহী হয়ে সাগরের পথে এগিয়ে চললেন। ফেরাউনের ঘোড়া ছিল নর, এটি অনুসরণ করলো অগ্রগামী মাদী ঘোড়ার আর সমস্ত ঘোড়া এভাবেই এগিয়ে

চললো। হযরত মীকাঈল (আঃ) ফেরাউনের দলের পেছনে ছিলেন আর সকলকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, চল, চল, এগিয়ে চল, সাথীদের সঙ্গে একত্রিত হও।

যখন সকলে সাগরের ভেতর পৌঁছে গেল তখন আল্লাহ পাকের কুদরতে দু'দিকের পানি একত্রিত হলো এবং ফেরাউনের এ বিরাট বাহিনীর সলিল সমাধি হলো। সাগরের অপর পারে দাঁড়ানো বনী ইসরাঈল জাতি ফেরাউন ও তার লোকদের এ শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখলো। তাই কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

অর্থাৎ তোমরা তাদের ধ্বংস হওয়া স্বচক্ষে দেখলে।

وَإِذْ وَعَدْنَا

"আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে ৪০ রাতের অঙ্গীকার করি"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, ৪০ রাতের মধ্যে ৩০ রাত ছিল জিলক্বদ মাসের আর ১০ রাত ছিল জিলহজ্ব মাসের।

এ ঘটনার বিবরণ এই, ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পাওয়ার পর আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তৌরাত দানের খোশ খবরী প্রদান করলেন, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায় বণী ইসরাঈলকে বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করি এবং আমার ভাই হারুন (আঃ)-কে তোমাদের নিকট আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করি। এই বলে তিনি কোহে তূরের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে কোহে তূরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ছিলেন অশ্বারোহী, তাঁর অশ্বের পা যেখানেই পড়তো সঙ্গে সঙ্গে সে যমীনে কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো।

বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত চতুর, তার নাম ছিল সামেরী, সে এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর অশ্বের পা ছোঁয়া একটু মাটি নিয়ে গেল। সামেরী বনী ইসরাঈলের নিকট যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকে একত্রিত করে গো-বৎসের মত তৈরী করলো এবং তার ভেতর ঐ মাটি রেখে দেয়া মাত্র স্বর্ণের তৈরী ঐ গো-বৎস জীবিত গো-বৎসের মত চিৎকার করতে লাগলো, এদিক-সেদিক দৌড়াতে লাগলো, তখন সামেরী মানুষকে পথভ্রষ্ট করে বললোঃ "এটিই হলো তোমাদের ও মূসা (আঃ)-এর উপাস্য (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)"।

হযরত হারুন (আঃ) এ ফেৎনা থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। হযরত হারুন (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক শুধু ১২ হাজার বনী ইসরাঈল আত্মরক্ষা করলো, অবশিষ্ট লোক পথভ্রষ্ট হলো এবং ঐ গো-বৎসকে

উপাস্য মানতে লাগলো। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ

এরপর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করলে, আর তোমরা ছিলে তখন জালেম কেননা, এ অপকর্মের শোচনীয় পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার কোন সীমা নেই, তাই তিনি এত বড় ঘটনার পরও তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ عَفَوْنَا

"এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এখানে শোকরের তাৎপর্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, তথা তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা। শোকর হলো নেয়ামতদাতার জিকর করা তথা তাঁকে স্মরণ করা।

আর হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলেছেনঃ কোন নেয়ামতের শোকর গুজারীর পন্থা হলো নেয়ামতদাতা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সে নেয়ামতকে ব্যয় করা।

আর কোন কোন আলেম বলেছেন, মানুষ যে আল্লাহর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অক্ষম, এ অক্ষমতা প্রকাশের নামই হলো শোকর গুজারী।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরয করলেনঃ হে আল্লাহ! তোমার অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করছি, তুমি এ নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর আদায় করার আদেশ প্রদান করেছ, কিন্তু কোন নেয়ামতের শোকর গুজারীও যে একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হে মূসা! মনে রেখো, যখন কোন বন্দা একথা স্মরণ রাখে যে, যা কিছু সে লাভ করেছে সবই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নেয়ামত, এ উপলব্ধিই হলো আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী।

আর হযরত দাউদ (আঃ) এভাবে মুনাজাত করতেনঃ পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যিনি বন্দার শোকর গুজারীর অক্ষমতা প্রকাশকে শোকর গুজারী বলে মেনে নিয়েছেন। যেমন, তাঁর মা'রেফাত হাসিলের অক্ষমতাকে মা'রেফাত বলে গ্রহণ করেছেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৯-২০

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا
إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ
قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ
الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

তরজমা

(৫৩) এবং (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং ফোরকান প্রদান করেছিলাম, হয়তো তোমরা সুপথগামী হবে।

(৫৪) আর (সে সময়কে স্মরণ কর) যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছ, গো-বৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করে, অতএব, তোমরা তোমাদের স্রষ্টার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং একে অন্যকে হত্যা কর, তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটি অত্যন্ত উত্তম কাজ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, তিনি করুণাময়।

(৫৫) এবং (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা! যে পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখব সে পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা, তখন বজ্র তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা স্বচক্ষে দেখেছিলে।

তফসীরুল কোরআন

এবং সে সময়কে স্মরণ কর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফোরকান দান করেছি। এ কিতাব হলো তৌরাত। এ বিষয়ে সকল তফসীরকারগণ একমত। "ফোরকান" শব্দের আভিধাণিক অর্থ হলো যা হক্ব ও বাতিল, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, তথা সত্য ও অসত্যের মধ্যকার তফাৎ বা

ব্যবধান যে প্রকাশ করে দেয়। এ ফোরকান শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

১. ফোরকান শব্দ দ্বারাও তৌরাতই বোঝানো হয়েছে।

২. ফোরকানের তাৎপর্য হলো শরীয়ত, যা হালাল ও হারাম বা সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

৩. ফোরকান অর্থ সেই অলৌকিক শক্তি, যদ্বারা হযরত মুসা (আঃ) তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন যেমন তাঁর হাতের ছড়ি, যা দ্বারা তিনি ফেরাউনের মোকাবেলা করেছিলেন, তাঁর ছড়িটি অজগর সর্পে পরিণত হয়ে যাদুকরদের সকল সর্পকে এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল, এমনিভাবে তাঁর হস্ত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মোযেজা, যা তাঁর যুগে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু এ মোযেজা সমূহ দ্বারা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সত্যতা উদ্ভাসিত হয়েছে, তাই তাকে ফোরকান বলা হয়েছে।

৪. সেই সাহায্য যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর নবীর জন্যে এসেছে, যা বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে, আর যা হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতার স্বাক্ষর বহন করে। হয়তো তোমরা আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহর নবীর প্রদর্শিত পথ লাভ করতে পারবে।

وَإِذْ قَالَ

"এবং (সে সময়কেও স্মরণ কর) যখন মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, অতএব তোমরা তোমাদের স্রষ্টার নিকট তওবা কর"।

এ তওবার পন্থা হলো একে অন্যকে হত্যা করা।

গো-বৎসকে পূজা করার প্রশ্নে বনী ইসরাঈল তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিলঃ

১. একদল এ অন্যায় কাজকে অন্যায় মনে করে এবং অন্যদেরকে এ অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়।

২. দ্বিতীয় দল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ গো-বৎসকে পূজা করেনি ঠিকই, কিন্তু অবৈধ কাজে অন্যদেরকে বাধাও দেয়নি।

৩. তৃতীয় দল গো-বৎসকে পূজা করে, শেষোক্ত দু'টি দলই অন্যায়কারী। যদিও দু'দলের অন্যায়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু যেহেতু অন্যায় না করা যেমন কর্তব্য তেমনি অন্যায়কে প্রতিরোধ করাও কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। তাই

গো-বৎসকে পূজাকারী এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনকারী উভয় দলের প্রতি তওবার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যারা গো-বৎসকে পূজা করে, তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় দ্বিতীয় দলটির প্রতি।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ

পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাতের জন্যে হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তওবা করাকে আল্লাহ পাক উত্তম পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন।

বনী ইসরাঈলকে যখন হযরত মূসা (আঃ) গো-বৎসের পূজা সম্পর্কে তিরস্কার করলেন তখন তারা লজ্জিত হলো এবং তওবা করতে প্রস্তুত হলো। হাতে হাতিয়ার নিয়ে নিল কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে এভাবে হত্যা করা সম্ভব হলো না। কারো কারো হাত থেকে অলক্ষ্যে হাতিয়ার পড়ে গেলো, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অন্ধকার নেমে এলো, এরপর তারা পরস্পরকে হত্যা করলো, এভাবে ৭০ হাজার বনী ইসরাঈল নিহত হলো। এদিকে হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে ক্রন্দন করতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করে নিলেন। অন্ধকার কেটে গেলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়কেই ক্ষমা করা হলো, উভয়ই হবে জান্নাতী। আর যারা অবশিষ্ট রইল তাদেরকেও ক্ষমা করা হলো। এভাবে আত্মদান ও আত্মীয়-স্বজন নিধন হলো তাদের ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমেই চির শান্তি লাভ করা সম্ভব হয়, তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

বনী ইসরাঈল জাতির তওবার নিয়ম ছিল এই, কেউ কবীরা গুনাহ করলে তাকে হত্যা করে ফেলা হতো, আর এটিই ছিল তার তওবা।

হযরত মূসা (আঃ) তৌরাত কিতাব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এটি আল্লাহ পাক প্রদত্ত কিতাব, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করলো, যখন আল্লাহ পাক স্বয়ং আমাদেরকে বলবেন, তখন আমরা বিশ্বাস করবো যে এটি সত্যিই আসমানী কিতাব। হযরত মূসা (আঃ) এ বিষয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দরখাস্ত করলেন। এরপর আল্লাহ পাক হযরত মূসা আঃ)-কে এ নির্দেশ প্রদান করলেনঃ ৭০ জন লোককে নির্বাচন করে হাযির কর, যারা সকলের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হবে। হযরত মূসা (আঃ) ৭০ জন বিশিষ্ট নেককার লোককে নির্বাচন করে তাদেরকে রোজাব্রত পালনের নির্দেশ দিলেন এবং রোজাদার অবস্থায় তাদেরকে কোহে তূরে নিয়ে আসলেন, তখন আল্লাহ পাকের

তরফ থেকে সাদা আবরের ন্যায় একটি নূর সমগ্র কোহে তূরকে পরিবেষ্টন করলো, হযরত মূসা (আঃ) সেই নূরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তাঁর সকল সঙ্গী সেজদারত হলো।[১]

ঐ সময় আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা আরম্ভ করলেন। আল্লাহ পাকের কথার সময় হযরত মূসা (আঃ)-এর চেহারা থেকে এমন বিস্ময়কর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো যে, তখন তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। আর তখন তাঁর মধ্যে এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একটা আবরণ এসে পড়ে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সেই ৭০ জন সঙ্গী বললো, কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে, আমাদের সাথে হয়নি, আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের রয়েছে। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকেও এ তওফিক দান করলেন, আবর থেকে একটি নূর বিচ্ছুরিত হলো, তারা এ কলেমা শ্রবণ করলোঃ

اِنِّیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا اَخْرَجْتُكُمْ مِنْ اَرْضِ مِصْرَ فَاعْبُدُوْانِیْ وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِیْ

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই, আমিই তোমাদেরকে মিশরের যমীন থেকে বের করে এনেছি, অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, আমাকে ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা"।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈলরা বলতে লাগল, পাক কালাম শ্রবণেও আমরা তৃপ্তি লাভ করিনি, স্বয়ং স্বচক্ষে প্রকাশ্যে আল্লাহ তায়ালাকে না দেখা পর্যন্ত হে মূসা! আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না। এমনি চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যের শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ তারা হলো বজ্রাহত এবং নিহত। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এ ঘটনার বিবরণ দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ এবং সে সময়কে স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! প্রকাশ্যে আল্লাহ পাককে না দেখা পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না, ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ এ দরখাস্তের কারণে তোমাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিল। ফলে, তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলে। এরপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্রন্দন করতে থাকেন এবং তাদের পুনর্জীবনের জন্যে আরযী পেশ করতে থাকেন। তখন আল্লাহ পাক এক একজন করে তাদেরকে জীবিত করেন, যাতে করে একে অন্যের জীবিত হওয়ার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পারে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ-الاية

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৮
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১১
খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮

এরপর আমি মৃত্যুর পর জীবিত করেছি তোমাদেরকে, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে, আল্লাহ পাকের এ মহান দানের জন্যে তাঁর হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"।

বস্তুতঃ বনী ইসরাঈল জাতি ছিল অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ কেননা, আল্লাহ পাকের বিরাট নেয়ামতের জন্যে তাদের চির কৃতজ্ঞ থাকা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে তারা জালেম ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পেয়েছিল, অথচ হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থ তৌরাত নিয়ে আসলেন তখন বনী ইসরাঈল বললোঃ আমরা নিজেরা যে পর্যন্ত আল্লাহর কালাম না শুনবো, সে পর্যন্ত এই কিতাবের অনুসারী হবোনা।

এরপর ৭০ জন নির্বাচিত ব্যক্তিকে হযরত মূসা (আঃ)-কোহে তূরে নিয়ে গেলেন, তারা আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করলো, এতদসত্ত্বেও তারা বললো, এসব কথা তা শুধু আপনার সঙ্গে হয়েছে, আমাদের সঙ্গে কথা না হলে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করি?

অতঃপর করুণাময় আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে কথা বললেন।

কিন্তু এ নাফরমান লোকদের নাফরমানী ও বেয়াদবীর শেষ নেই, তারা এবার বললোঃ কথাতো হলো কিন্তু তাতে কাজ হবে না, যে পর্যন্ত আমরা স্বচক্ষে আল্লাহ তায়ালাকে না দেখব, সে পর্যন্ত আপনার প্রতি ঈমান আনবো না। এর চেয়ে অধিক ধৃষ্টতা, বে-আদবী এবং নাফরমানী আর কি হতে পারে? তাই তারা কোপগ্রস্ত হলো; বজ্রাঘাতে তাদের জীবনের অবসান ঘটলো। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলো, তিনি তখন বনী ইসরাঈলের নিকট প্রত্যাবর্তন করে কি জবাব দেবেন? যারা তাদের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুবরণ করলো; তাদেরকে না দেখলে বনী ইসরাঈল বলবে, হে মূসা! আপনি হয়তো আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতে অপারগ হয়ে তাদেরকে হত্যা করেছেন।

এমন অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে দরখাস্ত করায় আল্লাহ পাক তাদেরকে পুনর্জীবন দান করেছেন।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেনঃ উম্মতে মোহাম্মদীয়া যে সর্বোত্তম উত্তম, তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ বনী ইসরাঈলের এ সমস্ত ঘটনাবলী। কেননা, এত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এবং আলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরও বনী ইসরাঈল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অথচ পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর উম্মতে মোহাম্মদীয়া তাকে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত রূপে বরণ করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ এ ঘটনার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন না, তিনি বই-পুঁথি পাঠ করতেও পারতেন না। তাহলে কিভাবে বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষদের এ সমস্ত সত্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন?

এটিও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতার এবং তাঁর নিকট যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অহরহ ওহী অবতীর্ণ হয় একথারও। এতদ্বারা ইহুদীদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের একটি সুবর্ণ সুযোগ এসেছে কিন্তু বদ নসীব ইহুদী জাতি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি।

ইমাম রাজী (রঃ) আরও লিখেছেন, এ ঘটনাবলীতে আরও সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেননা, আরবের পৌত্তলিক, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে এবং তাঁকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়ার কারণে তাঁর মন যেন আহত না হয়, বরং ইসলামের জন্যে যত কষ্টই ভোগ করতে হয়, তাতে সবর অবলম্বন করেন। হযরত মূসা (আঃ)-কে যেভাবে বনী ইসরাঈল কষ্ট দিয়েছে তার কিছুটা বিবরণ এ আয়াত সমূহে রয়েছে। এতদ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ
وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾
وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

তরজমা

(৫৬) আবার তোমাদের মৃত্যুর পর জীবন দান করলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

(৫৭) (হে বনী ইসরাঈল!) স্মরণ কর সেই কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ পাকের অপার রহমতের কথা, যখন তোমরা ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত লাভ করলে এবং সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলে। ময়দানে তীহে রৌদ্রের প্রখর তাপে তোমাদের সেই নিদারুণ কষ্টের সময় আমি তোমাদেরকে মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করলাম এবং তোমাদের জন্যে "মান্না, "সালওয়াকে" সুখাদ্য হিসাবে অবতরণ করলাম, তোমরা ভক্ষণ কর উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহ থেকে যা আমি তোমাদেরকে দান করছি। তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছিল।

(৫৮) এবং (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা এ শহরে প্রবেশ কর, আর একথা বল যে, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, তাহলে তোমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবো, আর অনতিবিলম্বেই নেককার লোকদেরকে অধিকতর দান করবো।

(৫৯) এরপর অত্যাচারীরা পরিবর্তন করলো সে কথা, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল, পরে যেহেতু তারা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, এজন্যে আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম।

তফসীরুল কোরআন

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ

তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির এসব লোককে পুনর্জীবন দান করলেন। ইমাম কাতাদা বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ পাক তাদেরকে এজন্যে পুনর্জীবন দান করলেন, যেন তারা স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের যে রিয্ক দুনিয়াতে রয়েছে, তা ভোগ করতে পারে। যদি তারা স্বীয় জীবনের সকল মুহূর্ত শেষ করে মৃত্যুবরণ করতো তবে শুধু কেয়ামতের দিনই উত্থিত হতো।[১]

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক তাদেরকে একেক জন করে পুনর্জীবন দান করেছেন, যাতে করে তারা জীবন ও মৃত্যুর দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের অপূর্ব নমুনা প্রত্যক্ষ করতে পারে।[২]

وَظَلَّلْنَا

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৩
২। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৩৮

বনী ইসরাঈল জাতির পূর্ববর্তী বাসস্থান সিরিয়া দখল করে বসেছিল আমালেকা জাতি, তাদের বিরুদ্ধে বনী ঈসরাঈল জাতিকে আল্লাহ পাক জেহাদের নির্দেশ প্রদান করলেন, কিন্তু তারা এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে, আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়। সিরিয়া এবং মিশরের মধ্যস্থলে একটি মরুভূমি রয়েছে যাকে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "তীহ" বলা হয়। এ "ময়দানে তীহে" বনী ইসরাঈল জাতিকে চল্লিশ বছর যাবত দিশেহারা অবস্থায় অতিবাহিত করতে হয়, তারা প্রতি দিন সকালে তাদের যাবতীয় মালামাল নিয়ে যাত্রা শুরু করতো, সারাদিন মালপত্রের বোঝা বহন করে পথ চলতো, সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যখন মালপত্র এক স্থানে রেখে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তখন দেখতো, সকালে যে স্থান থেকে রওয়ানা হয়েছিল, সারা দিন পথ চলার পর সেখানেই ফিরে এসেছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণেই তারা এভাবে কোপগ্রস্ত হয়েছিল। আর এ অবস্থায় প্রচন্ড সূর্য তাপের কারণে তাদের কষ্টের অন্ত ছিলনা। তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আবর দ্বারা তাদের ছায়া দান করেছিলেন, এটি ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা সেই কঠিন সংকটের কথা স্মরণ কর, যখন উম্মুক্ত আকাশের নীচে রৌদ্রের প্রখর তাপে তোমরা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছিলে, তখন আল্লাহ পাক আবর দ্বারা তোমাদের ছায়া দান করেছিলেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ ঘটনা সেই সময়ের যখন বনী ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের জুলুম থেকে উদ্ধার পেয়ে লোহিত সাগর পার হয়ে সিরিয়া অভিমুখে গমন করছিলো, তখন পথে তাদের তাবু ছিড়ে যায় এবং সূর্যের তাপ সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দান স্বরূপ তাদের প্রতি আবরেব ছায়া দান করেন। আর সেই অবস্থায় তাদের উপজীবিকা হিসেবে আল্লাহ পাক তাঁর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে অবতরণ করেন তাদের জন্যে "মান্না", "সালওয়া"।

"মান্না" এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য বস্তু যা বনী ইসরাঈলদের নিকট কুয়াশার ন্যায় বর্ষিত হতো, আর "সালওয়া" হলো এক প্রকার ছোট পাখী। সন্ধ্যার সময় বনী ইসরাঈলের নিকট এ পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাযির হতো। একটু অন্ধকার হলেই বনী ইসরাঈলরা এ পাখীগুলি অতি সহজে ধরে নিত, এগুলোর কাবাব তৈরী করে তারা আহার করতো।

আল্লাহ পাক কত মহান, কত বড় দাতা, তারা ছিল কোপগ্রস্ত কিন্তু তবুও তাদের নিয়মিত পানাহারের সুব্যবস্থা করেছেন, তারা প্রখর রৌদ্র তাপে কষ্ট পাচ্ছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদের আরামের যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন, মেঘমালা দ্বারা তাদেরকে ছায়া প্রদান করলেন।

আর যখন পানির প্রয়োজন হলো তখন হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার নির্দেশ প্রদান করলেন, তখন ঐ পাথর থেকে পানির ঝরণা বেরিয়ে এলো, এভাবে বনী ইসরাঈলের পানি সমস্যার সমাধান হলো। এমনিভাবে রাতের অন্ধকারের সমস্যা সমাধান কল্পে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে স্থায়ী আলোর ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ পাকের খাস কুদরতে তাদের এলাকার ঠিক মাঝখানে এ আলো ঝুলন্ত অবস্থায় থাকত, যাতে করে সকলেই আলো পেতে পারে।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, আলো এবং পোষাক। এ পোষাকের ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক করলেন তাঁর বিশেষ রহমতে এবং কুদরতে, বনী ইসরাঈলরা যে পোষাক পরিধান করেছিল তা ময়লা হতো না এবং ছিড়ে যেতোনা শুধু তাই নয়, বরং শিশুদের শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের পরিধেয় পোষাকও প্রয়োজন মোতাবেক বড় হতো।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক তাই এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে গণনা করতে চাও তবে তা সম্ভব হবেনা কেননা, আল্লাহ পাকের নির্দেশ ছিল এই, তোমাদেরকে যে সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করা হয়েছে তা প্রয়োজন মোতাবেক তোমরা গ্রহণ কর, আগামীকালের জন্যে সঞ্চয় করে রেখোনা তথা-মওজুদদারী করোনা, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, যিনি আজ তোমাদেরকে এ রিয্ক দান করেছেন, তিনি আগামীকালও দান করবেন। অতএব, আগামীকালের জন্যে মওজুদদারী নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কিন্তু বদ-নসীব বনী ইসরাঈল জাতি এ নির্দেশটিও অমান্য করলো, আল্লাহ পাকের দান স্বরূপ যে খাদ্য লাভ করতো তা মওজুদ করা শুরু করলো, ফলে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো।

এতদ্ব্যতীত, তারা এ সুস্বাদু খাদ্যের পরিবর্তে মশুর, পেয়াজ, গম প্রভৃতির আবদার করলো, পরিণামে তারা বর্ণনাতীত কষ্টের সম্মুখীন হলো, আর এ কষ্টের জন্যে দায়ী তারা নিজেরাই, তাদের অন্যায় আচরণই তাদেরকে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত করেছে, তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থাৎ আর তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; বরং নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا

আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আমি বলেছিলাম, এ শহরে প্রবেশ কর আর তাতে যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, বিনয়ী ভাব নিয়ে সেজদারত হয়ে ঐ শহরে প্রবেশ কর। আর তখন মুখে থাকবে তোমাদের একটি কথা। তা হলো; হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা কর, তওবা তওবা! (যদি তা কর) তবে আমি তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেব, আর যারা আন্তরিকতার সাথে সৎ কাজ করে তাদের প্রতিদান আরও বাড়িয়ে দেব।

ময়দানে "তীহে" অনেক দিন একটানা অবস্থানের কারণে এবং একই প্রকার খাদ্য "মান্না", "সালওয়া" খেতে খেতে বনী ইসরাঈল অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তখন তারা সাধারণ খাদ্যের জন্যে ফরিয়াদ করলো, (যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে) তখন তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের হুকুম হলো, এমন এক শহরে গমন কর যেখানে সর্বদা ব্যবহার্য পানাহারের দ্রব্য-সম্ভার সহজলভ্য হয়। তবে ঐ শহরে প্রবেশের জন্যে দু'টি শর্তারোপ করা হয়। প্রথমতঃ নত শিরে প্রবেশ করতে হবে ঐ শহরে, দ্বিতীয়তঃ প্রবেশকারীদের মুখে একটি কথা থাকবে, তাহলো "হিত্যাতুন" অর্থাৎ তওবা, তওবা" বলে অত্যন্ত আদব এবং বিনয়ের সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে।

যে শহরে প্রবেশ করার কথা, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে তফসীরকারদের মধ্যে।

কারো কারো মতে, এ শহর হলো বায়তুল মোকাদ্দাস, আর কোন কোন তফসীরকারের মতে এ শহরটি ছিল "আরীহা"। এ শহরে আমালেকা জাতি বাস করছিল, তাই বনী ইসরাঈল জাতিকে তাদের সাথে জেহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কিন্তু বদনসীব বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলো حطة (ক্ষমা চাই) এর পরিবর্তে বললো حنطة (অর্থাৎ গম চাই)। নত শিরে, তথা সেজদারত অবস্থায়ও তারা প্রবেশ করলো না, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ

এরপর সেই অত্যাচারী লোকেরা উক্ত শব্দটিতে অন্য একটি শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করলো যা তাদের প্রতি আদিষ্ট শব্দের সম্পূর্ণ বরখেলাফ ছিল। তাই আমি অত্যাচারীদের উপর একটি আসমানী বিপদ অবতীর্ণ করলাম কেননা, তারা আদেশ অমান্য করেছিল।

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আসমানী বিপদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি ছিল প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব।[১] এ মহামারীর কারণে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে বনী ইসরাঈল জাতির ৭০ হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়।[২] এ শাস্তির কারণ ছিল

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৯
২। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৪০

এই যে, তাদেরকে বলা হয়েছিল বিনীতভাবে শহরে প্রবেশ করতে। কিন্তু তারা গর্বভরে শির উঁচু করে প্রবেশ করে। তাদেরকে বলা হয় সেজদারত অবস্থায় প্রবেশ কর। কিন্তু তারা সেই স্থলে নিতম্বের উপর ভর করে উক্ত নগরে প্রবেশ করে। তাদেরকে বলা হয়, "হেত্যাহ" বলতে তারা বলে "হেনতাহ"।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে ঔদ্ধত্ব বা গর্ব প্রকাশ করে, বা যারা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধের প্রতি বিদ্রুপ করে এবং বিধি-নিষেধ পালনে বেআদবী করে, বা আল্লাহর বিধি-নিষেধকে অমান্য করে তার পরিবর্তন করে এবং নিজের তরফ থেকে বানানো জিনিসকে আল্লাহর বিধি-নিষেধ নামে চালিয়ে দিতে চায় তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন ও কঠোর শাস্তি। বস্তুতঃ যা ধর্মের মৌলিক শিক্ষায় নেই এবং যা কোরআন, সুন্নাহ, এজমা, কেয়াছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কাজকে ধর্মীয় কাজ বলে দাবী করাকে শরীয়তের পরিভাষায় "বেদআত" বলা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ সব বেদআতই গোমরাহী।

এ গোমরাহীর আমদানীকারকের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে তার প্রতিও রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী, এরশাদ হয়েছেঃ

"যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামে এমন কিছু আমদানী করে যা দ্বীন ইসলামে নেই, তার সম্মান প্রদর্শনকারী ব্যক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে"।

এজন্যে অন্য হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "আমার উম্মতে যখন ফেতনা-ফ্যাসাদ হবে তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে, তাকে একশত শহীদের সওয়াব প্রদান করা হবে"। (মেশকাত শরীফ)

সুন্নতকে আঁকড়ে ধরায়, এ উচ্চ মর্তবার মূল কারণ এই, তখন সাধারণতঃ মানুষ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান সুন্নতকে ছেড়ে দেবে। বেদআতকে আপন করে নেবে, বেদআতীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এমনকি, আল্লাহর রসূলকে মানবে না এমন গোমরাহ লোকদেরকে সম্মান করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তখন মুসলিম জাতি দুর্যোগের সম্মুখীন হবে। ফেতনা-ফ্যাসাদ, অশান্তি-অকল্যাণ চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নত তথা মহান আদর্শকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। কোন অবস্থাতেই যেন দ্বীন ইসলামের প্রতি কোন প্রকার বিদ্রুপ বা বিরোধিতা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা এবং আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করতে থাকা, এমন সময় নাজাত তথা আত্মরক্ষা লাভের বাস্তব পন্থা।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতের তফসীরে বলেছিলেন, যখন মক্কা বিজয় হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনীতভাবে নত শিরে মক্কায় প্রবেশ করেন এমনকি, উষ্ট্রের পালানের সঙ্গে স্বীয় মস্তক মোবারক ঝুঁকিয়ে ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গোছল সুসম্পন্ন করে আট রাকাআত নফল নামাজ আদায় করেন, এটি চাশ্‌তের নামাজ এবং বিজয় লাভের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকরিয়ার নামাজ।

এভাবে হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) পারশ্য বিজয়ের পর যখন শাহী মহলে প্রবেশ করেন তখন এ সুন্নতের উপর আমল করে আট রাকাআত নফল নামাজ শোকরানা আদায় করেন। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি বিনয়ী হয়ে নত শিরে ঐ শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়, কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করে।[১]

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পবিত্র কোরআনে যেখানেই رجز শব্দটির উল্লেখ রয়েছে সেখানে আল্লাহর আযাব অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। আর অভিধাণে رجز এবং رجس এমন জিনিসকে বলা হয়ে থাকে যাকে ঘৃণা করা হয়।[২]

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

অর্থাৎ প্লেগের মত মহামারী আল্লাহর আযাব হিসেবে বনী ইসরাঈলের উপর নেমে এলো তাদের নাফরমানীর কারণে, তারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর হুকুমের প্রতি বিদ্রুপ করে ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করে, তাই সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি আসে মহামারী রূপে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণেই এমন মহামারীর পাদুর্ভাব ঘটেনা; বরং কখনো আল্লাহর নাফরমানীর কারণেও এমনি মহামারী আসমানী গজব হিসেবে দেখা দেয়।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-১১৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৬
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪

وَإِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى
لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ
بَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ
خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

তরজমা

(৬০) এবং (সে সময়কে স্মরণ কর) যখন (হযরত) মূসা (আঃ) তাঁর জাতির জন্যে পানির আরযী পেশ করলেন, তখন আমি বলেছিলাম, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। তখনই প্রবাহিত হলো বারটি প্রস্রবন, প্রতিটি সম্প্রদায় চিনে নিল তাদের নিজ নিজ পান করার স্থান, (তখন আমি উপদেশ দিলাম) তোমরা আল্লাহর দান থেকে আহার কর এবং পান কর, আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

(৬১) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা (আঃ)! আমরা একই প্রকার খাদ্যের উপর কখনও আর সন্তুষ্ট থাকতে পারব না, অতএব, তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, যেন ভূমিজাত বস্তু যেমন শাক-শব্জি, শশা, গম, মশুর, পেয়াজের ব্যবস্থা করে দেন, (হযরত) মূসা (আঃ) বললেনঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও? তাহলে তোমরা কোন নগরে অবতরণ কর, তোমরা যা চাও তাই পাবে এবং তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র্য নিপতিত করা হলো এবং পুনরায় তারা আল্লাহ তায়ালার কোপগ্রস্ত হলো, আর তা একমাত্র এজন্যে যে, তারা অবিশ্বাস

করতো আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ সমূহকে, আর নবীগণকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করতো, এ কারণে তাদের এ দুর্দশা এজন্যে যে, তারা ছিল আল্লাহ্র অবাধ্য এবং তারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতেও বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের এক বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে তীহ্ প্রান্তরে[১] যখন বনী ইসরাঈল তৃষ্ণার্ত হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট পিপাসার কষ্টের কথা প্রকাশ করলো তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে পানির জন্যে আরযী পেশ করলেন, আল্লাহ্ পাক এ নির্দেশ প্রদান করলেনঃ তোমার লাঠি দিয়ে এ পাথরটিকে আঘাত কর। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি দ্বারা যখন একটি বিশেষ পাথরের উপরে আঘাত করলেন, তখন আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দানে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোযেজা স্বরূপ উক্ত পাথর থেকে বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্রের জন্যে ১২টি নির্ঝর প্রবাহিত হলো। বনী ইসরাঈলের ১২টি গোত্র হওয়ার কারণ হলো, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের সংখ্যা ছিল ১২। আর প্রত্যেক সন্তানেরই বংশধরগণ সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিভক্ত ছিল আর প্রত্যেক গোত্রের দলপতিও নির্দিষ্ট ছিল। তাই প্রত্যেক গোত্রের জন্যে স্বতন্ত্র নির্ঝরের ব্যবস্থা করা হলো। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান স্বরূপ বণী ইসরাঈলের প্রতিটি গোত্র তার নির্দিষ্ট স্থান চিনে নেয়। অর্থাৎ পাথরের কোন্ দিকের কোন্ ঝরণায় কোন্ গোত্র পানি নেবে তা যেমন নির্দিষ্ট ছিল, তেমনি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতেই প্রত্যেক গোত্র তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানও চিনে নেয়।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا

তখন আল্লাহ্ পাকের হুকুম হলো, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত "মান্না","সালওয়া" খাও এবং এ নির্ঝর থেকে পানি পান কর আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

উপরোল্লিখিত আয়াতে যে পাথরের কথা বলা হয়েছে তা ছিল একটি সুনির্দিষ্ট পাথর। ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত "তফসীরে কবীরে" তাই বলেছেন, তাঁর ভাষায়ঃ

الاشارة الى حجر معلوم

অর্থাৎ আলিফ লাম দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট পাথরের দিকে। এমনিভাবে তফসীরে মোআলেমু ত্যানজীলেও বর্ণিত আছে যে, এটি ছিল একটি নির্দিষ্ট পাথর। এ পাথরটি মানুষের মাথার মত চতুস্কোণ বিশিষ্ট ছিল। এ গোলাকার পাথরের প্রত্যেক কোণ থেকে ৩টি করে নির্ঝর প্রবাহিত হয়।

১। তানবীরুল মেকবাস, পৃষ্ঠা-১০

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেনঃ এ পাথরটি সেই পাথর, যার উপর মূসা (আঃ) কাপড় রেখে একবার গোসল করতে গিয়েছিলেন, তখন পাথরটি কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল। হযরত মূসা (আঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। যেহেতু বনী ইসরাঈলের কিছু লোকের ধারণা ছিল যে মূসা (আঃ)-এর দেহ ত্রুটিপূর্ণ। এজন্যে তিনি সর্বদা আবৃত অবস্থায় থাকেন। এ ঘটনায় তাদের ভুল ধারণার নিরসন হলো। পাথর পলায়নের এ ঘটনা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফেও রয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্য বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, পাথর পলায়নের ঐ সময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জীব্রাঈল (আঃ) এসে মূসা (আঃ)-কে বললেনঃ আল্লাহর হুকুম হলো এ পাথরটি আপনি তুলে নেন, এতদ্বারা আল্লাহ পাকের কুদরত এবং আপনার মোযেজার বহিঃপ্রকাশ হবে।

একটি ছোট পাথর থেকে ৬ লক্ষ মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা হলো

ইমাম কাতাদার বর্ণনা এই, পাথরটি ছিল তূর পাহাড়ে, বনী ইসরাঈল তা সঙ্গে সঙ্গে রাখতো। যখন পানির প্রয়োজন হতো তখন হযরত মূসা (আঃ) তাতে স্বীয় লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে ১২টি নির্ঝর প্রবাহিত হতো এবং তা দ্বারা বনী ইসরাঈলের ৬ লক্ষ মানুষ তাদের পানির প্রয়োজন পূরণ করতো।[১]

জান্নাতী পাথর

বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা জমখশরী বর্ণনা করেনঃ এ পাথরটি কোন নির্দিষ্ট পাথর ছিল না; বরং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি এ আদেশ হয়েছিল, যে কোন পাথরের উপর তার লাঠি দ্বারা আঘাত করার জন্যে। হযরত হাসানও এ মত পোষণ করতেন। আর এতদ্বারা মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনার অলৌকিকত্ব সুস্পষ্টতরভাবে প্রকাশিত হয়। এমনিভাবে আরও একটি বিবরণ রয়েছে যে, এটি ছিল জান্নাতী পাথর। হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আর লাঠিটিও ছিল জান্নাতী। এ দু'টি জিনিষ একের পর এক হাত বদল হতে হতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে এবং তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে দান করেন।[২]

আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত

লাঠির আঘাতে পাথর থেকে নির্ঝর প্রবাহিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের সম্মুখে কোন কিছুই কঠিন নয়। যদি চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করতে পারে তবে পাথর পানিকেও আকর্ষণ করতে পারে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২৬-২৭

আল্লাহর সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আল্লাহ পাক এমনি বহু বিস্ময়কর গুণাবলী রেখে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, এটি ছিল আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোযেজা ও বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর দান। এটি অস্বাভাবিক হলেও আদৌ অসম্ভব নয়। পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নতুন কিছু নয় কেননা, অনেক পাহাড়ের পাদদেশে ঝরণা বা নহর প্রবাহিত হতে দেখা যায়। যেমনঃ পবিত্র কোরআনেও রয়েছে এর বর্ণনা, এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

"নিশ্চয় পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়। পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়, এরপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমন পাথরও আছে যা আল্লাহ পাকের ভয়ে উপর থেকে পড়ে যায়"।

অতএব, হযরত মূসা (আঃ)-এর এ মোযেজাকে যারা অস্বীকার করে তারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। আর তা ঈমানের অভাবেই করে।

অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা

এর চেয়ে অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে ষষ্ঠ হিজরীতে ঐতিহাসিক হোদায়বিয়া নামক স্থানে। যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাঁর নিকট পানির কষ্টের কথা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি বললেনঃ যদি সামান্যতম পানিও তোমাদের নিকট থাকে তবে তা নিয়ে আস। একটি পাত্রে খুবই সামান্য পানি পেশ করা হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাতে তাঁর হাত মোবারক রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুল সমূহ থেকে অলৌকিক ভাবে পানি বের হতে লাগলো। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন যার যত প্রয়োজন সে অনুযায়ী এখান থেকে পানি নিয়ে যাও। অল্প সময়ের মধ্যেই চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে প্রবাহিত এ পানি দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। এটি ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। আল্লাহ পাক তাঁর নবীগণের দ্বারা এমন অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেন যা শুধু যে বিস্ময়কর হয় তা নয়, বরং মানুষকে আল্লাহর নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে সহায়কও হয়, যেমন আলোচ্য আয়াতের এ ঘটনায় কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেকবান মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

যা বিবেকবান মানুষকে আকৃষ্ট করে

১. একটি পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া।

২. এমন একটি ক্ষুদ্র পাথর থেকে ৬ লক্ষ মানুষের পানির প্রয়োজন মেটানো তথা এত অধিক পরিমাণে পানি প্রবাহিত হওয়া।

৩. বনী ইসরাঈলদের প্রয়োজন মোতাবেক পানি বের হওয়া।

৪. পানির প্রয়োজন শেষ হলে দ্বিতীয় আঘাত দ্বারা পানি বন্ধ হয়ে যাওয়া।[১]

এসব বিষয় আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন এবং আল্লাহর নবীর প্রতি বিশেষ দানের বাস্তব প্রমাণ।

وَاِذْ قُلْتُمْ

এ আয়াতেও তীহ প্রান্তরের আরেকটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। বণী ইসরাঈল জাতি যখন আসমান থেকে অবতীর্ণ খাদ্য মান্না-সালওয়া খেতে খেতে তাদের অরুচি হলো তখন তারা বললোঃ হে মূসা! আমরা আর এক প্রকার খাদ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারিনা, আপনার পরওয়ারদেগারের দরবারে দোয়া করুন যেন আমাদেরকে ভূমিতে উৎপন্ন খাদ্য প্রদান করা হয়, যেমন তরি-তরকারী, গম, মশুর, রসূন, পেয়াজ, শশা প্রভৃতি। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি উৎকৃষ্ট বস্তুর বদলে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করতে চাও? তবে কোন শহরে প্রবেশ কর, যেখানে তোমাদের চাহিদা মোতাবেক খাদ্য-সামগ্রী পাবে। যদিও প্রকাশ্য দৃষ্টিতে এটি হযরত মূসা (আঃ)-এর আদেশ মনে হয় কিন্তু মূলতঃ এর দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্রোধই প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, বনী ইসরাঈলকে ৪০ বছরের জন্যে তীহ প্রান্তরে আবদ্ধ রাখা হয় এবং এ সময় শেষ না হওয়ার পূর্বে তাদের কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর।[২] হযরত মূসা (আঃ)-এর এ আদেশটির দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনের সূরা আর রাহমানের একখানি আয়াতেও রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا

'হে জীন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমান যমীনের চৌহদ্দী থেকে বেরিয়ে যেতে পার তবে বেরিয়ে যাও'।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আসমান যমীনের পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোন সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব নয় তবুও একথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, এতে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে সে সব লোকদের প্রতি যারা আল্লাহর সৃষ্ট পৃথিবীতে বাস করে তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত উপভোগ করে তাঁর প্রতি অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়। ঠিক এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বলেছেনঃ তোমরা কোন শহরে প্রবেশ কর যেখানে তোমাদের রুচি মোতাবেক খাদ্য পাবে কেননা, তাদের বক্তব্যে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৭
২। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৪১

لن نصبر শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা আর কোন অবস্থাতেই এক প্রকার খাদ্য সহ্য করিতে পারিনা। এতে প্রমাণিত হয়, আসমানী খাদ্যের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি। তাই আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ "রুহুল মাআনী" তে লিখেছেনঃ তাদের একথা যে আমরা আর এই প্রকার খাদ্য সহ্য করতে পারবো না, এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত খাদ্যকে অপছন্দ করছে আর শুধু অপছন্দই নয়, বরং তারা নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছে। আর কোন নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা সে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কোন নেয়ামতের প্রতি যখন কোন প্রকার অবজ্ঞা অথবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় তবে তার অর্থ হয় যে, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সে নেয়ামতের বিনাশ কামনা করে এবং সে স্থানে অন্য কিছুর দাবী করে।[১]

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

বণী ইসরাঈল জাতির শাস্তির ঘোষণা

বণী ইসরাঈল জাতি এভাবে বহুবার আল্লাহ পাকের অনন্ত-অসীম নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাই, এ আয়াতে তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তাদের প্রতি আল্লাহর গজবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের উপর চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা, অপমান, দারিদ্র্য নিপতিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর তরফ থেকে ইহুদীদের জন্যে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর এ শাস্তি ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং চিরস্থায়ী। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হয় তখন তাদেরকে মদীনা শরীফ ও তার উপকণ্ঠ থেকে বহিস্কার করা হয়। এ ঘটনাটি ঘটে ৫ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের পর। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে তার পরিণতি স্বরূপ। এরপর ৭ম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধেও মুসলমানদের নিকট তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এবং লাঞ্ছিত হয়। তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে হয়, ভিক্ষুক হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। কোরআনে করীম তাদের জন্যে যে শাস্তি ঘোষণা করেছে সে শাস্তি তারা যুগ যুগ ধরে ভোগ করে চলেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করবে। আর কেয়ামতের পর তাদের জন্যে যে শাস্তি অবধারিত রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ধনীও রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ইহুদীরা দারিদ্র্য-পীড়িত, যে দেশেই তারা বাস করে বিশেষ কিছু লোককে বাদ দিলে সাধারণতঃ ইহুদী জনগণের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, বরং দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাদের অনেকেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫

মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত "তফসীরে মাজেদী"তে আধুনিক ইউরোপ-আমেরিকায় ইহুদীদের একটা বিরাট অংশ যে দারিদ্র্যের শিকার, একথার অনেক প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[১] আর ইহুদীদের অবমাননার কথা তো সকলেরই জানা, জার্মানীর হিটলার ইহুদীদেরকে কচুকাটা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছে। আর শুধু জার্মানীতেই নয়, ইটালী, হাঙ্গেরী, রোমানীয়া সহ ইউরোপের বহু দেশ থেকে তাদেরকে বহিস্কার করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ঐতিহাসিক ঘোষণার সত্যতাই এভাবে বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা পবিত্র কোরআনের ঘোষণার পরিপন্থি নয়

কারো কারো মধ্যে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, পবিত্র কোরআনে ইহুদীদের অবমাননার যে ঘোষণা রয়েছে তা সত্ত্বেও ইহুদীরা ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ এমন সন্দেহের কোন ন্যায্য কারণ নেই কেননা, বর্তমান দুনিয়ায় দু' ধরনের রাষ্ট্র বিদ্যমান রয়েছে। এক প্রকার রাষ্ট্র হলো যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, কারো মুখাপেক্ষী নয়, পরনির্ভরশীল নয়, আপন গুণে-জ্ঞানে, জাতীয় স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তায় এবং ক্ষমতায় ধন্য, অন্য কারো তোয়াক্কা রাখার তার প্রয়োজন নেই, বরং অন্যদের প্রয়োজন তার কাছে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার রাষ্ট্র হলো, যে রাষ্ট্র অন্যদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যদের ইশারা-ইঙ্গিতেই সে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, অন্যদের ক্ষমতাই তার উপর চলে। বলাবাহুল্য, ইসরাঈল এমনি একটি রাষ্ট্র যা বৃটেন এবং আমেরিকা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তাও ইহুদীদের জন্যে নয়, ইহুদীদের উদ্দেশ্যে নয়; বরং বৃটেন এবং আমেরিকা তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। একথার অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল খৃষ্টানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে ইহুদীরা কোন প্রকার সম্মানের অধিকারী হয়নি, বিশ্ববাসীর অন্তরে ইসরাঈল রাষ্ট্রের কারণে ইহুদীদের জন্যে আদৌ কোন সম্মান বোধ সৃষ্টি হয়নি। এটিই পবিত্র কোরআনের ঘোষণার বাস্তব প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআন একথা ঘোষণা করেনি যে, কোন দিন ইহুদীদের কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না, বরং পবিত্র কোরআন বলেছে তারা চির অপমানিত, চির লাঞ্ছিত থাকবে। তাই আজকের বিশ্বে ইসরাঈল রাষ্ট্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীদের কোন সম্মান নেই কেননা, সকলেই জানে, যদি আজ আমেরিকা ইসরাঈলের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, তবে পরদিন সকালে ইসরাঈলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬

এতদ্ব্যতীত, এখানে আরও একটি কথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, খৃষ্টান জাতি তথা বৃটেন ও আমেরিকা যদিও ইসরাঈল রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে এবং আরব দেশ সমূহের বিরুদ্ধে ইসরাঈলকে লেলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্তরেও এ ইহুদীদের জন্যে কোন সম্মান নেই, কেননা তারা নিজেদের দেশে তথা ইউরোপ-আমেরিকার কোথাও ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত মনে করেনি; বরং এ হীন এবং ঘৃণ্য জাতিকে হাজার হাজার মাইল দূরে মধ্যপ্রাচ্যে আবাদ করেছে এবং তারা এর দ্বারা এক গুলিতে দু' শিকার করছে। প্রথমতঃ ইহুদীদের মত ঘৃণ্য ও অপমানিত জাতিকে নিজেদের থেকে দূরে রাখা হলো। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোন সময় এ আন্তর্জাতিক দস্যুদের ব্যবহার করার ব্যবস্থাও করেছে। লন্ডন টাইমসের সংবাদদাতার প্রতিবেদন এ পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য, হিটলারের প্রচার মন্ত্রী ডক্টর গুয়েবলস নাজী কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় বর্ক্তৃতা করার সময় এ রহস্য উদঘাটন করেছেনঃ

ইহুদী একটি অত্যন্ত জঘন্য রক্তচোষা জাতি। যারা অন্যের রক্ত চুষে নিজের উদর পূর্ণ করে। যে সত্যটি জার্মান জাতি আজ উপলব্ধি করেছে, হয়তো ইংরেজ জাতি বহু পূর্বেই তা বুঝেছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জার্মান জাতি এ জঘন্য মানব রূপী জোঁকদের থেকে স্বদেশকে রক্ষার্থে তাদের একটি একটি করে খুঁজে খুঁজে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। আর ইংরেজরা এদের জঘন্য চরিত্রের দ্বারা অন্যায় ফায়দা লুটবার জন্যে তাদের প্রতিপালন শুরু করেছে এবং তাদের মুরুব্বি সেজেছে, যাতে করে তারা যে কোন দেশকে দখল করার অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে এ জোঁকদের ব্যবহার করতে পারে। সর্ব প্রথম সেখানে এ জোঁকদের একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়, এ রক্ত চোষা সম্প্রদায় সে দেশের মানুষের রক্ত চুষে তাদেরকে শুধু যে অকেজো করে দেয় তাই নয়; বরং মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এরপর ইংরেজরা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত সে দেশে প্রবেশ করে এবং তাদেরকে অতি সহজে গোলাম বানিয়ে নেয়। যেমন এ জোঁকদের যোগ্যতা প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছে প্যালেষ্টাইনে, এ পরীক্ষায় তারা সফল হয়েছে, লক্ষ লক্ষ প্যালেষ্টাইনবাসীকে তারা শুধু গৃহচ্যুতই করেনি, বরং তাদের রক্ত চুষে, তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

যদিও আমেরিকা ইসরাঈলকে সর্বাধিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে, বরং আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে আমেরিকাই ইসরাঈলের শক্তির মূল উৎস, কিন্তু তবু আমেরিকাও ইহুদীদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং মানব জাতির কলঙ্ক বলে মনে করে। দিল্লী থেকে প্রকাশিত দৈনিক দাওয়াত পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে এ সত্যের প্রমাণ স্বরূপ যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক মিষ্টার রবার্ট গোস্তার এমন ৬৫টি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন, যারা ইহুদীদের দুশমন। এ লেখক এমন বহু কারখানা এবং অফিসের নাম উল্লেখ করেছেন যেখানে ইহুদীদেরকে সর্বশেষ চাকরি দেয়া হয় এবং সর্ব প্রথম তাদেরকে বহিস্কার করা হয়। সামরিক গুরুত্বের অধিকারী কল-কারখানায় তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত চাকরি দেয়া হয় না, যতক্ষণ তাদের কেউ বিজ্ঞানী হিসাবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী না হয়। অনুরূপ অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও বিদ্যমান। অনেক ক্লাবে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে এমনি সাইনবোর্ড লাগানো আছেঃ **"এখানে ইহুদীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ"** ।

তিনশ' বছর ধরে ইহুদীরা আমেরিকায় বসবাস করছে। আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই সাদা। কিন্তু তাদের ঘৃণ্য চরিত্রের কারণে তারা এখনো আমেরিকান সমাজের অংশ হিসাবে পরিগণিত হতে পারেনি, এমনকি শহরে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর এলাকায় ইহুদীরা বাড়ী পর্যন্ত পায় না।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকা ইহুদীদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন সমাজে ইহুদীরা অপমানিত এবং ঘৃণিত। অতএব, ইহুদীরা ইসরাঈল রাষ্ট্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের ঘোষণার সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকাতে তাদের অপমানের বোঝা এতটুকু লাঘব হয়নি আর এতদ্বারা পবিত্র কোরআনের ঘোষণার সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে।[১]

যদিও ইসরাঈলকে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে ইহুদীদের রাষ্ট্র মনে হয়, কিন্তু এর প্রকৃত ক্ষমতা তাদের হাতে, যারা এ রাষ্ট্র তৈরী করেছে আর তারা নিশ্চয় ইহুদী নয়, বরং বৃটেন এবং আমেরিকা, অতএব পরের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে সম্মান পাওয়ার বদলে অপমানের গ্লানিই তাদেরকে ভোগ করতে হয়। এজন্যে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা তথা ইহুদীদের চিরন্তন অবমাননা চির সত্যই থেকে যায়। বৃটেন এবং আমেরিকার তল্পিবাহক রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাঈল তার তাবেদারী চরিত্রের প্রমাণ বহুবার হাযির করেছে।

এতদ্ব্যতীত ইহুদী জাতি একটি অত্যন্ত নীচ, হীন এবং ঘৃণ্য জাতি। তাদের ঘৃণ্য চরিত্রের যে পরিচয় পবিত্র কোরআনে রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও ইহুদীদের চির অবমাননার কথা উপলব্ধি করতে এতটুকু বিলম্ব হয়না। ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-কে চরম কষ্ট দিয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে তারা হত্যা করার অপচেষ্টা করেছে। অবশেষে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও তারা বর্ণনাতীত কষ্ট দিয়েছে। ইতিপূর্বে তারা বহু নবীকে হত্যা করেছে। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

১। "এত্তেকলাল" দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৩, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সংখ্যা, "দৈনিক দাওয়াত" দিল্লী, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০ইং প্রকাশিত, সম্পাদকীয় শিরোনাম "আমেরিকায় ইহুদী"।

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের গজবের উপযুক্ত হলো এ কারণে যে, তারা আল্লাহর বিধান সমূহকে অস্বীকার করতো এবং তারা আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করতো, আর এজন্যে যে তারা আল্লাহর অবাধ্য এবং সীমা লঙ্ঘনকারী, অতএব তারা ধনী হলেও নির্ধন। এমনকি ভিখারী থেকেও অধম, তারা আল্লাহর রহমত থেকে চির বঞ্চিত, তাদের অবমাননা চির অবধারিত।

সাম্প্রতিক কালের ঘটনা

ইহুদীদের একটি রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও তারা যে অপমানিত জাতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৮২ সালের শেষার্ধে, যখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেগীন বক্তৃতা করতে গিয়েছিল, তখন প্রায় সকল সদস্য অধিবেশন পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। এতদ্বারা ইহুদীদের চির অবমাননার যে ঘোষণা পবিত্র কোরআনে রয়েছে তার সত্যতার এক নতুন প্রমাণ উপস্থাপিত হলো।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ
اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

তরজমা

(৬২) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা ইহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টানরা ও সাবেয়ীদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এনেছে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন দিন চিন্তিতও হবেনা।

(৬৩) এবং যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করি এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত উত্তোলন করে রাখি, যাতে করে তোমরা আমার প্রদত্ত

কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, আর তাতে যা কিছু রয়েছে তা স্মরণ কর। হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

(৬৪) তারপরও তোমরা আবার ফিরে গেলে, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ না হতো, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যখনই কাফেরদের কথা বলা হয় তার পাশাপাশি মোমেনদের উল্লেখও থাকে। এমনিভাবে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষিত হলে মোমেনদের পুরস্কারের কথাও উল্লেখিত হয়। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের কাফেরদের নাফরমানী, ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতার বহু ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের শাস্তির কথাও ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে এ আয়াতে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে তথা খাঁটি মোমেন হবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবেনা।

এখানে আরও উল্লেখ্য, ইহুদীরা সর্বদা নিজেদের বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে অহংকার করে বেড়াত, তারা আল্লাহর নবীর বংশধর বলে আত্মগরিমা বোধ করতো, এজন্যে এ আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির শান্তি, চির মুক্তি, আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য, নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার নেই, আর তা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কারণেও নয়, বরং তার জন্যে একটি মাত্র মানদন্ড রয়েছে তা হলো এক আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আর সেই ঈমান মোতাবেক নেক-আমল। যে বা যারা এ মানদন্ডের উপর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, অর্থাৎ এক আল্লাহ পাকের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ ও রসূলের বিধি-নিষেধ পালন করবে, সে যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, তার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে প্রতিদান, তার কোন ভয়ও নেই এবং সে চিন্তিতও হবেনা।

এ আয়াতের মূল বক্তব্যকে কোন কোন তফসীরকার এভাবেও পেশ করেছেন যে, যেহেতু ইতিপূর্বে ইহুদীদের অন্যায় আচরণের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই কোরআনে করীমের এ আয়াত শ্রবণ করে কারো মনে এ ধারণা হতে পারে যে, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর নাফরমান ছিল, তারা এখন ঈমান আনলেও হয়তো তা দরবারে এলাহীতে গ্রহণযোগ্য হবেনা। কারো মনে এমনি নিরাশার ভাব দেখা দিলে তা দূর করার জন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে একটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেন, আর সে নীতি হলো, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কে ইহুদী ছিল, কে ছিল খৃষ্টান বা সাবেঈ– এটি বড় কথা নয়, বরং বড় কথা হলো এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনে সে অনযায়ী নেক কাজে মশগুল হওয়া। যারা এ গুণ অর্জন করবে তথা ইসলামের এ মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী হবে তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে সুসংবাদ তথা আল্লাহ পাকের দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে বিশেষ প্রতিদান, তাদের কোন ভয় নেই।

পক্ষান্তরে, যদি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পরও কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তাঁর আদর্শ ও মহান শিক্ষার অনুসারী না হয় তবে শাস্তি অবধারিত। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে জীবন বিধান রূপে গ্রহণ করবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হবে না"।

এমনিভাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, কোন লোক যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী না হয়, তাঁর অনুসারী না হয়, সে ইহুদী নাসারা যাই হোক সে হবে দোযখবাসী।

আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে বা লৌকিকভাবে মুসলমানদের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, যেমন মুনাফেকদের অবস্থা।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা ফাতেহ মোহাম্মদ তাইয়্যেব লখনবী (রহঃ) তাঁর 'খোলাসাতুত তাফাসীর' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ ঈমানের জ্ঞান যারা অর্জন করেছে, যেমন বর্তমান যুগের মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিকে মুসলমানই মনে করা হয়, যদিও তারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতের এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, ওয়ারিশ সূত্রে মুসলমান হয়ে যারা ইসলামের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩০

বিধি-নিষেধকে অমান্য করে চলেছে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তারা শুধু নামেই মুসলমান হবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) সর্ব প্রথম হযরত এবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে" অর্থাৎ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের বাতিল আকীদা থেকে দূরে রয়েছে যেমন কিস এবনে সায়েদা, বাহীরায়ে রাহেব, হাবিবুন নাজ্জার, যায়েদ এবনে আমর, এবনে নোফায়েল, ওরাকা এবনে নওফেল, সালমান ফারসী, আবুযর গাফফারী এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতিনিধি দল। এ আয়াতের মর্ম এই, যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে ঈমান এনেছে, আর যারা বাতিল পন্থী যেমন ইহুদী, খৃষ্টান বা সাবেঈ এদের যে কেউ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আখেরাতের প্রতি আস্থাবান হবে এবং সৎ কাজ করবে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের জন্যে রয়েছে বিশেষ প্রতিদান, নিঃশঙ্ক জীবন, চির শান্তির নিশ্চয়তা।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হতে পারে এই যে, আল্লাহ্ পাক এ সূরার শুরুতে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, এরপর ইহুদীদের উল্লেখ করেছেন অতএব, "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে" এর তাৎপর্য হলো যারা মৌখিক ঈমান এনেছে তথা-যারা মুনাফেক, যারা ইহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈ এসব বা যে-ই হোক, যদি কেউ আল্লাহর প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত এবং খাঁটি ঈমান আনয়ন করে, তার জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে বিশেষ সওয়াব।

এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হলো "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে", অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং পরেও সে ঈমানের উপর সুদৃঢ় ভাবে কায়েম রয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে বিশেষ পুরস্কার।

হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে 'বয়ানুল কোরআনে' লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তাতে মুসলমানদের উল্লেখ আবশ্যকীয় মনে হয়না কেননা, মুসলমানগণ তো এ নীতির অনুসারী রয়েছেই। কিন্তু মুসলমানদের উল্লেখ করে বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে এবং বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৪২

হযরত থানভী (রহঃ) এ সৌন্দর্যের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেমন কোন বাদশাহ কোন আইন ঘোষণা করতে গিয়ে এভাবে বলে, "মিত্র হোক বা শত্রু যে আমার এ আইন মেনে চলবে, সে-ই আমার অনুগ্রহের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে"।

মূলতঃ এ আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের জন্যে রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রিয়, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।

প্রশ্ন হলো কারা আল্লাহর প্রিয়? তার জবাবে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

"যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সর্বদা আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে"।

وَالَّذِيْنَ هَادُوْا

আর যারা ইহুদী হয়েছে, এ শব্দটি "হাদা" থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ তওবা করা, আর এ জাতিকে ইহুদী বলা হয় এজন্যে যে, গো-বাছুর পূজার অন্যায় থেকে তারা তওবা করেছিল, আর ইহুদী "মোয়াদ্দত" থেকে নিষ্পন্ন মনে করা হলে পরস্পরের সম্প্রীতির অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। তাদের তওবা ও সম্প্রীতির জন্যে ইহুদী নামকরণ করা হয়েছে।

কোন কোন আলেমের মতে, ইয়াহুদী নাম হলো হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের, সে নামানুসারে এদেরকে ইহুদী বলা হয়।[১]

وَالنَّصٰرٰى

অর্থাৎ যারা খৃষ্টান হয়েছে, তাদেরকে নাসারা বলা হয় এজন্যে যে, প্যালেষ্টাইনের একটি এলাকার নাম নাসেরা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে তারা এ স্থানে এসেছিল।

"নাসারা" শব্দটির বহুবচন হলো নাসরান। যেহেতু তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্য করেছিল এজন্যেও তাদেরকে "নাসারা" বলা হয়। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯

مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করবে? তখন হাওয়ারীগণ বলেছিলেন, আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করবো। তাই তাদেরকে নাসারা বলা হলো।[১]

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তাদেরকে "নাসারা" বলা হয় এজন্যে যে, ঈসা (আঃ)-এর গ্রামের নাম ছিল নাসেরা।

وَالصّٰبِئِيْنَ

"সাবেঈ" তাদেরকে বলা হয় যারা বে-দ্বীন, যারা ধর্মত্যাগী, আহলে কেতাবদের একটি ফেরকার নাম সাবেঈ, যারা তৌরাত পাঠ করতো। হযরত হাসান এবং হযরত হাকাম বর্ণনা করেন, এরা ছিল অগ্নি পূজকদের মত। বর্ণিত আছে যে, এরা ফেরেশতাদের পূজারী ছিল।

আবদুর রহমান এবনে যায়েদ বর্ণনা করেন যে, এরা ছিল ইরাকের মোসেল এলাকার অধিবাসী, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করতো কিন্তু নবী বা আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করতো না। তারা ইহুদীও ছিলনা, খৃষ্টানও ছিলনা, অগ্নিপূজকও ছিলনা, কোন ধর্মমতের অনুসারীও ছিল না।

তাদেরকে সাবেঈ এজন্যে বলা হয়, 'সাবাআ' অর্থ বেরিয়ে যাওয়া, আর 'সাবা' অর্থ কোন দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এ ফেরকার লোকেরা সত্য-দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে এবং বাতিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাই তাদেরকে সাবেঈ বলা হয়।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং কেয়ামতের দিনের প্রতিও বিশ্বাস করবে আর সে বিশ্বাস অনুযায়ী নেক আমল করবে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাকের দরবারে মহান পুরস্কার। এখানে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, শুধু আল্লাহকে মানি একথার দাবী যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহর নবীগণের প্রতি, আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি, আখেরাতের প্রতি, ফেরেশতাগণের প্রতি, তকদীরের প্রতি, বেহেশত ও দোযখের প্রতি, শুধু তাই নয়, বরং নেক আমলও করতে হবে। যদি আমল ঈমান বিরোধী হয় তবে ঈমানের প্রমাণ অনুপস্থিত থাকে। অতএব, সৎ কাজের তথা আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করতে হবে। প্রকৃত মোমেন, খাঁটি মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করতে হবে, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার নির্লজ্জ অজুহাত এ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-২৯

পর্যায়ে সম্পূণ অকেজো। বর্তমান যুগে মুসলমান হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও এ অজুহাত দেখিয়ে অনেকেই ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন থেকে বিরত থাকার যে অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।

অতএব, যাদের মধ্যে ঈমান এবং আমলে সালেহ রয়েছে, তাদেরই জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে বিশেষ প্রতিদান, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা কোন ব্যাপারে অনুতপ্তও হবে না।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ

এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ তৌরাতের উপর তোমরা আমল কর আর এ অঙ্গীকার গ্রহণের জন্যে আমি তোমাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরলাম এবং বললামঃ আমি যে কিতাব তোমাদেরকে প্রদান করেছি তাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং তাতে যে বিধি-নিষেধ রয়েছে সেগুলোকে সর্বদা স্মরণ রেখো, এভাবে হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করতে পারবে।

ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট বণী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি কিতাবের জন্যে আবদার করতে থাকে। তাদের বারংবার আবদার-আবেদন এবং সেই কিতাব অনুসারে জীবন-যাপনের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দানের পরই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তৌরাত নাযিল হয়। কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতি এই কিতাব সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ফেলে। এমনি অবস্থায় তাদের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জলিত হয় এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে ফেরেশতাগণ তূর পর্বতকে তাদের মাথার উপর তুলে ধরেন এবং তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব মানবে কি মানবেনা, একথার জবাব দাও। সম্মুখে অগ্নি, উপরে পাহাড়– এমনি অবস্থায় তৌরাত মেনে চলবার অঙ্গীকার করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর ছিলনা, তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে সেজদারত হয় এবং এ অবস্থা থেকেই আকাশ পানে তাকাতে থাকে এবং মাথার উপরে পাহাড় রইলো কি সরে গেল তা দেখতে থাকে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে এ ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"তূর" শব্দ দ্বারা তফসীরকারগণের মতে, তূর নামক বিশেষ পাহাড় বোঝানো হয়েছে।

কারো কারো মতে, সিনাই এলাকার যে কোন পাহাড় অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ

অর্থাৎ তৌরাতে সৎ কাজের যে সওয়াব এবং মন্দ কাজের যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা স্মরণ রেখো জীবনের প্রতি মুহূর্তে এবং তৌরাতে যে হালাল-হারামের বিবরণ রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন কর। হয়তো এভাবে তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে তথা আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, ইসলামে তো ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি নেই, যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই"।

অথচ সম্মুখে অগ্নি রেখে মাথার উপরে পাহাড় তুলে, ধর্মগ্রন্থ পালনের জন্যে বাধ্য করা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে জবরদস্তিই মনে হয়। বস্তুতঃ "ধর্মে জবরদস্তি নেই" একথার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে জবরদস্তি করা হয়না কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনের জন্যে জবরদস্তি অযৌক্তিক নয়। যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে নিয়ম সর্বত্র স্বীকৃত তা এই, কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্যে কাউকে বাধ্য করা হয় না কিন্তু যদি কেউ স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, এরপর সে রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলা তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এজন্যে তাকে বাধ্য করা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই কর্তব্য মনে করে। তুরস্কের বাদশাহ যখন ক্ষমতায় তখন তার দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন শেখ জামালী। একবার বাদশাহ শেখ জামালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, জেহাদ করে কোন দেশ দখল করা অথবা কোন অমুসলমানকে মুসলমান বানানো, এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর উত্তম কাজ। শেখ জামালী বললেনঃ "অমুসলমানকে মুসলমান বানানো উত্তম কাজ"। এরপর শেখ জামালী দরবার থেকে বাড়ী ফিরে এলেন, এর মধ্যে সরকারী ঘোষণা শ্রুত হলোঃ "সকল অমুসলমান যেন তিন দিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে অন্যথায় তাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত"।

এ ঘোষণা শ্রবণ করে শেখ জামালী দ্রুতবেগে শাহী দরবারে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বাদশাহকে এ ঘোষণা অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্যে অনুরোধ করলেন।

বাদশাহ বললেনঃ কেন? অথচ একথাতো আপনিই বলেছেন।

শেখ জামালী বললেনঃ আমি বলেছি অমুসলমানকে মুসলমান বানানো উত্তম কাজ কিন্তু এজন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না, কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে

ইসলাম কবুল করে তবে তা অত্যন্ত উত্তম কাজ। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। আর যারা স্বেচ্ছায় স্ব-জ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে ইসলাম বিরোধী জীবনের জন্যে ছেড়েও দেয়া যায়না।

আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির মাথার উপর তূর পর্বত তুলে ধরার যে ঘটনা রয়েছে তা এজন্যে যে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ইতিপূর্বে আসমানী কিতাবের জন্যে শুধু আবেদন-নিবেদনই নয়; বরং পীড়া-পীড়ি করেছে। আর যখন কিতাব নাযিল হয়েছে তখন তারা তা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই তাদের মাথায় উপর পাহাড় তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে পুনরায় তৌরাত মেনে চলার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তবু তারা এ অঙ্গীকারও ভঙ্গ করেছে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

"অতঃপর অঙ্গীকার গ্রহণের পরও তোমরা ফিরে গেছ"।

এমন অবস্থায় তোমাদের শাস্তি অবধারিত, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টি তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে তাই তোমরা বিপদমুক্ত হয়েছ, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর দান না হতো এবং যদি রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব না ঘটতো তবে তোমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদের প্রতি বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনাও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার শামিল, অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে তারাও নাজাতের পথ গ্রহণ করতে পারতো।

যেভাবে তাদের পূর্ব পুরুষদের উপর অন্যায়ের পরিণাম স্বরূপ আল্লাহর আযাব এসেছে, আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতে সেই আযাব এ যমানার ইহুদীদের উপর আসেনি। নতুবা তারাও আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। অতএব, এজন্যে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ অনুকরণ করা।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ
اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ۭ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۭ
قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৬৫) এবং তোমরা নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে অবগত আছ, তোমাদের মধ্য থেকে যারা শনিবার সম্পর্কীয় আদেশ অমান্য করেছিল, সুতরাং তাদেরকে আমি বলেছিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানরে পরিণত হও।

(৬৬) এ ঘটনাটিকে বর্তমান ও পরবর্তী লোকদের জন্যে আদর্শ শাস্তি এবং ধর্মভীরু লোকদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ রেখেছি।

(৬৭) আর (সে সময়কে স্মরণ কর) যখন মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একটি গরু জবেহ করার আদেশ দিচ্ছেন, তখন তারা বলেছিলঃ তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছো? (হযরত) মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ আল্লাহ না করুন, আমি কি মূর্খ লোকদের অর্ন্তগত হতে পারি?

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির আরও একটি নাফরমানীর ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটে হযরত দাউদ (আঃ)-এর যমানায়। নদী তীরে একটি শহর আবাদ ছিল। তফসীরকারগণ বলেছেন, এ শহরটির নাম ছিল 'আইলা'। এর জনসংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। যেভাবে মুসলমানদের জন্যে শুক্রবার বা জুমআর দিন হলো বিশেষ পবিত্র এবং বৈশিষ্ট্য-মন্ডিত দিন। এ দিনের পবিত্রতা রক্ষা করা, এ দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার তাগিদ রয়েছে কোরআনে করীমের সূরা জুমআয়, এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ- الاية

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ! যখন জুমআর দিন নামাজের আজান হয় (জুমআর নামাজের) তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্যে তথা জুমআর নামাজের জন্যে

দ্রুত গমন কর এবং (সে সময়ের জন্যে) ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর। এ পন্থা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পার"।

আজানের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে গমন করা, আর এ উদ্দেশ্যে সে মুহূর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করা হলো জুমআর দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এমনিভাবে খৃষ্টানদের জন্যে বিশেষ দিন হলো রোববার আর ইহুদীদের জন্যে শনিবার। তাদের শরীয়ত মোতাবেক এ দিনটি ছিল শুধু আল্লাহর এবাদতের জন্যে। এ কারণেই এদিন মৎস্য শিকার অবৈধ ছিল। অবশ্য মৎস্য শিকার ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের পরীক্ষা স্বরূপ মৎস্যগুলো শনিবার দিন ভাসমান থাকতো এবং তাদের হাতের নাগালের ভেতর থাকতো, কিন্তু অন্য দিন মৎস্য আদৌ দেখা যেতনা। কিছুদিন তারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চললো কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আইন অমান্য করে আর এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করে যেমনঃ শনিবার দিন বিভিন্ন পন্থায় মৎস্যগুলোকে তারা আবদ্ধ করে রাখতো এবং রোববার দিন অতি সহজে সেগুলো ধরে নিয়ে আসতো। এ প্রতারণাপূর্ণ কাজের কারণে তাদের মধ্যে তিনটি দল হলোঃ (১) যারা তাদেরকে বাধা দিয়েছে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে (২) যারা এ অন্যায় কাজে শরীক হয়নি তবে তাদেরকে বাধাও দেয়নি (৩) যারা এ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং কারো উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত হয়নি।

যারা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে তারা এ সতর্কবাণী করতে থাকেঃ তাহলে যে কোন সময় আল্লাহর গজব আসতে পারে কিন্তু তবুও যখন আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হতে তারা রাজী হয়নি, তখন উপদেশ দানকারী দল তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বস্তির মধ্যখানে একটি দেয়াল দিয়ে অন্যায়কারীদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে, শুধু একটি দুয়ার তাদের গমণাগমণের জন্যে খোলা রাখা হয়। আর দ্বিতীয় দল যাদেরকে সুবিধাভোগী দল বলা যেতে পারে, যারা অন্যায় কাজ করতো না ঠিকই কিন্তু অন্যায়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করতো না, তারা প্রথম দলকে বলেঃ আপনারা এমন এক সম্প্রদায়কে কেন নসীহত করছেন যাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করবেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আ'রাফে আল্লাহ পাক তাদের বক্তব্যকে এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"এবং যখন তাদের একটি দল বললো, কেন উপদেশ প্রদান কর এমন এক সম্প্রদায়কে যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন, অথবা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন,

তখন তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে আর এ আশায় যে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে"।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

"তাদেরকে যে উপদেশ প্রদান করা হতো তারা যখন তা বিস্মৃত করলো, তখন আমি সে সব লোকদেরকে নাজাত দিলাম যারা মন্দকাজ থেকে মানুষকে বাধা দিত, আর জালেমদেরকে কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তাদের নাফরমানীর কারণে"।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা যেমন কর্তব্য তেমনি অন্যায়কে প্রতিরোধ করাও অত্যন্ত বড় দায়িত্ব। পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-এমরানে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে আহ্বান জানাবে, মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম"।

এ সম্পর্কে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাগিদ করেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যে কোন প্রকার অন্যায় দেখবে তার কর্তব্য হলো অন্যায়কে প্রতিরোধ করা, যদি এ শক্তি তার না থাকে তবে অবশ্যই মৌখিক ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে আর যদি এ শক্তিও না থাকে তবে অন্ততঃ মন্দকে অন্তরে মন্দ জানবে। আর তাহলো দূর্বল ঈমানের পরিচায়ক"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীদের যে দলটি শনিবারে শিকারের অপকৌশল গ্রহণ করে তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়। তাদের সকলকে বানরে পরিণত করা হয়। নারী-পুরুষ-শিশু সকলেরই আকৃতি পরিবর্তন হয়, সকলেরই লেজ বেরিয়ে যায়। পুরুষরা বড় বড় বানরে পরিণত হয়। তাদের স্ত্রীলোকরা বানরীতে রূপান্তরিত হয় এবং শিশুরা ছোট ছোট বানরে পরিণত হয়।

আর দ্বতীয় দল, যারা তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়নি, তাদের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করেনি, তারাও আল্লাহ পাকের গজবে নিপতিত হয় এবং

বানরে পরিণত হয়। এ দু'দল লোক যারা বানরে পরিণত হয়, তারা অন্যদেরকে দেখলে চিনতে পারত, বুঝতে পারত এবং কাঁদতে থাকতো। তিনদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।[১]

'আইলা' নামক স্থানের ঘটনা

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ ঘটনা হলো "আইলা" নামক স্থানের অধিবাসীদের। এদের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। যখন তারা আল্লাহর নাফরমানী করলো এবং উপদেশদানকারীদের উপদেশও প্রত্যাখ্যান করলো, তখন হযরত দাউদ (আঃ) তাদের প্রতি লা'নত দিলেন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর গজব নাযিল হলো আর তারা ইতর বানরে পরিণত হল।[২]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীরে রুহুল মাআনীতে লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর এবাদত বন্দেগীকে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেনঃ যাতে করে এর দ্বারা মানব অন্তরের কালিমা দূরীভূত হয়। যে বা যারা ঐ এবাদতের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখে তাদের অন্তরের কালিমা দূরীভূত হয়ে যায়।

শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘনকারীদের ন্যায় তাদের আকৃতিরও পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ যে জন্তুর বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে দেখা দেয়, তার মধ্যে সে জন্তুর মেজাজ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়। কোন কোন বুজুর্গ যারা কাশ্‌ফ-শক্তির অধিকারী তাঁরা এমন লোকদেরকে তাদের প্রকৃত অবস্থায় দেখেছেন। অতএব, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করে মানবতাকে রক্ষা করা। অবশ্যই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়ার বরকতে এ উম্মত থেকে মানবাকৃতি পরিবর্তনের এ শাস্তি রহিত হয়েছে। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে একবার উম্মতের জন্যে তিনটি দোয়া করেছিলেন (১) হে আল্লাহ্! আমার উম্মতকে অন্যান্য উম্মতের ন্যায় কোন জন্তুতে পরিণত করোনা। আল্লাহ্ পাক এ দোয়া কবুল করেছেন। (২) হে আল্লাহ্! অন্যান্য উম্মতের ন্যায় আমার উম্মতকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করোনা। আল্লাহ্ পাক এ দোয়াও কবুল করেছেন। (৩) হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের মধ্যে যেন খুন-খারাবী না হয়, আল্লাহ্ পাক এ দোয়া কবুল করেননি।

অতএব, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক এ উম্মতকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে এমন কঠোর শাস্তি থেকে নাজাত দিয়েছেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৩১
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৪

যারা বানরে পরিণত হয়েছে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে

আয়াতে উল্লেখিত ঘটনায় যারা বানরে পরিণত হয়েছে, বর্তমান যুগের বানর আদৌ তাদের বংশধর নয়। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, কয়েকজন সাহাবী প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের সময়ের বানর শুকর কি বানরে পরিণত সেই ইহুদী সম্প্রদায়?

তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ আল্লাহ পাক যখনই কোন সম্প্রদায়কে আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি প্রদান করেন তখন তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন। তিনি আরও এরশাদ করেনঃ বানর ও শুকর দুনিয়াতে ইতিপূর্বেও ছিল পরেও থাকবে। তাদের সাথে সেই ইহুদীদের কোন সম্পর্ক নেই।

فَجَعَلْنٰهَا

অর্থাৎ আইলা নামক স্থানের এ ঘটনার যারা প্রত্যক্ষদর্শী এবং যারা অনাগত ভবিষ্যতে আগমনকারী সকলের জন্যেই রয়েছে এ ঘটনায় অতি মূল্যবান শিক্ষনীয় বিষয় ও অমূল্য উপদেশ এবং সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আয়াতে "মুত্তাকীন" শব্দটি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মুত্তাকী পরহেযগার লোকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নাজাত লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকা পূর্বশর্ত, শুধু তাই নয়; বরং অন্যকেও দূরে রাখার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, এ আয়াতে উল্লেখিত ঘটনায় যারা আল্লাহর নাফরমানী করেনি কিন্তু নাফরমানদের অন্যায় থেকে বিরত রাখতে সচেষ্টও হয়নি, তারাও নাফরমানদের সঙ্গে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। নাজাত শুধু তারাই লাভ করেছে যারা নিজেরা অন্যায় থেকে বিরত রয়েছে এবং অন্যকেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহর অবাধ্য লোকদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন সমাজে পাপকার্য হতে থাকে এবং তাতে বাধা দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা না করা হয়, তখন তার শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ সেই সমাজের প্রতি আল্লাহর আযাব পতিত হয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৪

আরও একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ

"আল্লাহ পাক জীব্রাইল (আঃ)-কে এ নির্দেশ দিলেন যে, অমুক জনপদকে উল্টিয়ে ধ্বংস করে দাও, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ! ঐ জনপদে তোমার এক বন্দা রয়েছে, সে কোনদিন তোমার নাফরমানী করেনি, আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ "সে ব্যক্তিকে সহ ঐ এলাকা ধ্বংস কর কেননা, আমার নাফরমানী যখন হচ্ছিল তখন তার বিরুদ্ধে এ ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি"।

অতএব, সমাজ জীবনের অন্যায় অনাচারকে প্রতিরোধ করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ

যখন পবিত্র কোরআন নাযিল হচ্ছিল, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসলামের পতাকাতলে সমেবেত হওয়ার জন্যে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তখন অন্যান্যদের মত ইহুদীরাও তাঁকে বিভিন্ন ভাবে চরম কষ্ট দিচ্ছিল, তাই আল্লাহ পাক ইহুদীদের পূর্ব পুরুষদের নাফরমানীর বিবরণ সম্বলিত ঘটনাবলী এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে যে, এদের পূর্ব পুরুষরা হযরত মূসা (আঃ)-এর বহু অলৌকিক ঘটনা দেখা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আঃ)-কে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে, তাই তাদের বংশধর বর্তমান ইহুদীরা যদি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি করে বা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে শুধু একটি গরু জবেহ করার হুকুম দিয়েছিলেন, এ হুকুম পালনে তারা যত গড়িমসি করেছে এবং যত নতুন নতুন কথা তুলেছে তার উল্লেখ রয়েছে এ আয়াতে। ঘটনাটির বিবরণ পরবর্তী রুকুর এ আয়াত وَاِذْ قَتَلْتُمْ থেকে শুরু হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে ঘটনার শেষাংশ বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আগে পরে বর্ণনার কারণ হচ্ছে এই, যদি এ বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হতো তবে একথা বোঝা যেত যে, ঘটনার বিবরণ পেশ করাই আয়াতের উদ্দেশ্য। অথচ এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলের নাফরমানীর বিবরণ দেয়া, তারা যে সর্বদাই আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল একথার বিবরণ দেয়া, আর তারা যে আল্লাহর কালামের প্রতি ইতিপূর্বেও বিদ্রুপ করেছে এবং আল্লাহর হুকুম পালনে তাদের অনীহা যে নতুন নয় এবং তাদের অমার্জনীয় অপরাধ সমূহের ফিরিস্তি যে সুদীর্ঘ, তা প্রকাশ করাই হলো এ ঘটনা বর্ণনার লক্ষ্য।

গরু জবেহ করার ঘটনা

বণী ইসরাঈলে 'আমীল' নামক একজন ধনী ব্যক্তি ছিল, একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত তার আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিলনা, এক ভ্রাতঃষ্পুত্রই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর সে-ই হবে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু পিতৃব্যের মৃত্যুতে বিলম্ব হওয়ায় ভ্রাতষ্পুত্রের সহ্য হলোনা, তাই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো পিতৃব্যকে হত্যা করার এবং সমস্ত ধন-সম্পদ আত্মসাত করার। পরিকল্পনা মোতাবেক সে তার পিতৃব্যকে হত্যা করলো এবং লাশটি রাত্রিকালে অন্য গ্রামে নিয়ে রেখে এল। অথচ ঐ গ্রামবাসী এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। সকালে সে চিৎকার আরম্ভ করলো পিতৃব্যের খুনের বদলা নেয়ার জন্যে। গ্রামবাসী বললো, এ সম্পর্কে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, কিন্তু এ প্রতারক ঘাতকটি তার সহচরদেরকে নিয়ে সেই গ্রামবাসীর উপর হামলায় উদ্যত হলো, তখন তারা অসহায় হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হলো এবং সমস্ত ঘটনা তাকে জানিয়ে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে তাঁর নিকট আরয়ী পেশ করলো। তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন যেন প্রকৃত ঘাতকের পরিচয় জানানো হয়, তার জবাবে আল্লাহ পাক যা এরশাদ করলেন তার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এভাবে রয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً

নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন যেন তোমরা একটি গরু জবেহ কর (এ গরুর গোশ্তের কিছু অংশ কেটে মৃত ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে স্পর্শ করলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার ঘাতকের নাম নিজেই বলবে)। পরবর্তী রুকুতে আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ পাকের উপরোক্ত আদেশ শ্রবণ করে বণী ইসরাঈল বললো, আমরাতো আপনার নিকট ঘাতকের সন্ধান চাইছি, এর সাথে গরু জবেহের কি সম্পর্ক? তফসীরে মাজেদীতে রয়েছে যে, বণী ইসরাঈল তথা ইহুদী জাতির অন্তর "গো-মাতার" প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এত পরিপূর্ণ ছিল যে তারা একথা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে এ ঘটনায় গরু জবেহ করার হুকুম হবে, তাই তাদের ধারণা হলো যে, হযরত মূসা (আঃ) হয়তো ঠাট্টা-বিদ্রুপের স্থলে এমন কথা বলেছেন।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

"তারা বললো, "হে মুসা! আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন"? (হযরত) মূসা (আঃ) বললেনঃ "আমি আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে"।

অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের ব্যাপারে কোন প্রকার বিদ্রুপ বা উপহাস করা নিতান্ত মূর্খদের কাজ। অতএব, এমন কোন কাজ আল্লাহর নবীগণের শানের খেলাফ।

এ আয়াত দ্বারা তফসীরকারগণ এ মাসআলা প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের কোন ব্যাপার নিয়ে বিদ্রুপ বা উপহাস করা অত্যন্ত বড় গুনাহ বা মহা পাপ। আর এমন পাপী ব্যক্তির জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন. এতে প্রমাণিত হয় যে শরীয়তের কোন বিধানের ব্যাপারে উপহাস কঠোর শাস্তির কারণ হয়। একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এতে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তের কোন ব্যাপারে বিদ্রুপ করা মহা পাপ।[১]

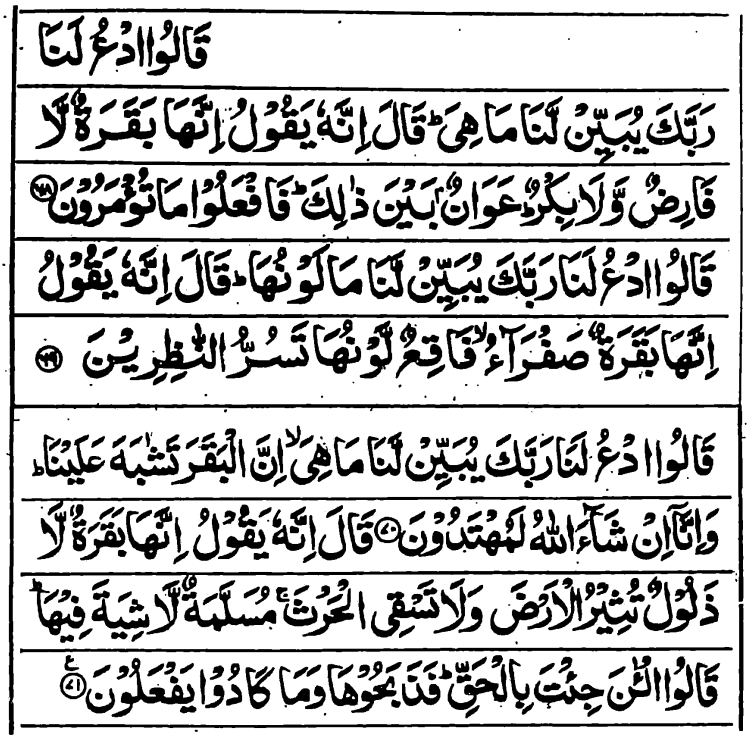
হযরত মূসা (আঃ)-এর মন্তব্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই, আমি আল্লাহর নিকট মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি কেননা, মূর্খ লোকেরাই শুধু শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে বিদ্রুপ বা উপহাস করতে পারে। তাই সাফাতুত তাফাসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছেঃ

"হযরত মূসা (আঃ)-এর জোরালো বাক্য দ্বারা তাদের ভুল ধারণার নিরসন হলো, তারা এ সত্য উপলব্ধি করলো, গরু জবেহ করে মৃত ব্যক্তির ঘাতকের সন্ধান করা আল্লাহ পাকেরই নির্দেশ"। তাই এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

"যখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমেই বলেছেন তখন তারা বললো, "হে মূসা! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট দোয়া করুন"।

বনী ইসরাঈল জাতি প্রথমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কথায় বিশ্বাসই করেনি, পরে বিশ্বাস করেছে ঠিকই কিন্তু তাদের হীন চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার বাদানুবাদ শুরু করে, যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৮
তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯
সাফওয়াতুত্ তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস পৃষ্ঠা-১৯


قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ
إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۚ
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۖ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ
قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

তরজমা

(৬৮) তারা বলেছিল, (হে মূসা!) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করে বল যেন আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে তিনি বলে দেন গাভীটি কিরূপ? তিনি (হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ নিশ্চয় সে গরু পূর্ণ বয়স্ক নয় এবং কম বয়স্কও নয়, উভয়ের মধ্যবর্তী, যৌবনে ভরপুর অতএব, যার জন্যে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তা পালন কর।

(৬৯) তারা বলেছিল, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তার বর্ণ আমাদের জন্যে বর্ণনা করেন। (হযরত) মূসা (আঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয় সে গরুর বর্ণ উজ্জ্বল হলুদ, তা দর্শকদেরকে আনন্দিত করবে।

(৭০) তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্যে তোমার প্রতিপালকের নিকট আরযী পেশ কর যেন তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে বলে দেন যে গরুটি ঠিক কি ধরনের হবে কেননা, এ সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হয়েছি, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে নিশ্চয় আমরা পথ পাব।

(৭১) মূসা (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ সে গরুটি এমন নিঃস্কলঙ্ক যাকে যমীন কর্ষণে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্যে ব্যবহার করা হয়নি, তা এমন নিখুঁত যাতে দোষ মাত্র নাই। তখন তারা বলছিল, এবার তুমি সত্য আনয়ন করেছ, তৎপর তারা গরুটি জবেহ করলো যা তাদের আদৌ অভিপ্রায় ছিলনা।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বনী ইসরাঈল জাতির নৈতিক অবনতির এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা এমন নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল যে, তাদের উপকারের বিষয়েও তারা অযথা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (যখন তাদের প্রতি গরু জবেহ করার হকুম হয়েছিল তখন) তারা যদি যে কোন একটি গরু জবেহ করে দিত তবে তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা বিষয়টিকে জটিল এবং কঠিন করে তুলেছিল, তাই তাদের প্রতিও কঠোর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

এজন্যেই আল্লাহ পাকের হুকুমের ব্যাপারে কোন প্রকার বিতর্কে লিপ্ত হওয়া তত্ত্বজ্ঞানীগণও অপছন্দ করতেন। এ পর্যায়ে এবনে জরীর হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) একটি বর্ণনাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -الاية

(অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে খানায়ে কা'বার হজ্জ মানুষের কর্তব্য।)

তখন অক্কাশা এবনে মহসিন (রাঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হজ্জ কি প্রতি বছর ফরজ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দানে বিরত রইলেন। সেই সাহাবী পুনরায় একই প্রশ্ন উত্থাপন করলেনঃ তখনও তিনি কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয় বার সেই সাহাবী একই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ প্রত্যেক বছর ফরজ নয়। এরপর আরও এরশাদ করলেনঃ যদি আমি তোমার কথায় হ্যাঁ সূচক জবাব দিতাম তবে প্রত্যেক বছরের জন্যে হজ্জ ফরজ হয়ে যেত, যা তোমাদের জন্যে সম্ভব হতো না, এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"তোমরা এমন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করোনা যা প্রকাশিত হলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে"।

কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহর নাফরমানীতে অভ্যস্ত ছিল। তাই আল্লাহ পাকের এ হুকুমটিও বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করতে রাজী হয়নি। তারা প্রথমে প্রশ্ন করলোঃ হে মূসা! আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট এই আরযী পেশ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেন যে, গরুটি কি ধরণের হবে, কি তার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ কি গুণ তার মধ্যে থাকতে হবে? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জবাব দিলেন যে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ গরুটি পূর্ণ বয়স্কও নয়, আবার একেবারে কম বয়স্কও নয় এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বয়সের হতে হবে।

عَوَانٌ শব্দটির অর্থ মধ্যবর্তী।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ শব্দ দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এজতেহাদ জায়েয বলে প্রমাণ করেছেন কেননা, গরুটি অধিক বয়স্কও নয়, কম বয়স্কও নয়, হতে হবে উভয়ের মধ্যবর্তী বয়সী আর উভয়ের মধ্যবর্তী বয়সী হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে মুক্ত চিন্তার প্রয়োজন যদ্বারা এজতেহাদের কথা প্রমাণিত হয়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا

বনী ইসরাঈল দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলো, হে মূসা! আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদেরকে একথাও বলে দেন যে, গরুটির রঙ কি হবে? মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ গরুটি হবে পীত বর্ণের, নিখুঁত, তার বর্ণ এত আকর্ষণীয় হবে যে, দর্শক মাত্রই তাকে দেখে আনন্দিত হবে।

বনী ইসরাঈল পুনরায় প্রশ্ন করলো হে মূসা! আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন গরুটির প্রকৃত অবস্থা আমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। কেননা, গরুটি সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি এবং ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই পথ পাব এবং আমাদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, গরুটি এমন হবে যাকে জমি চাষে অথবা জমিতে পানি দেয়ায় কখনও ব্যবহার করা হয়নি, গরুটি হবে সম্পূর্ণ নিখুঁত, নির্দোষ, নিদাগ। একথা শ্রবণ করে তারা বললো, এখন তুমি সঠিক বর্ণনা উপস্থাপন করেছ। অবশেষে তারা গরুটি জবেহ করে, অথচ তা করার আদৌ অভিপ্রায় তাদের ছিলনা।

এ ঘটনায় বনী ইসরাঈল জাতির নাফরমানীর নতুন প্রমাণ পাওয়া গেল। এতে একথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইসরাইল জাতি নিজেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার দাবী করতো এবং এ দাবীতে তারা নিজেদেরকে জান্নাতের অধিকারী এবং নাজাত প্রাপ্ত হওয়ার দম্ভোক্তি করতো। অথচ অবস্থা এই যে, আল্লাহর নবীর নির্দেশ মোতাবেক বিনা বাক্য ব্যয়ে একটি গরু পর্যন্ত জবেহ করা

তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শুধু স্বপ্নে ইঙ্গিত পেয়ে তাঁর প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।[১]

যে গরুটি অবশেষে তারা জবেহ করেছে তার মালিক ছিল এক এতিম বালক। এ বালকটি ছিল অত্যন্ত নেক, পিতা-মাতার অতি বাধ্য।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে এই এতিম বালক সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেনঃ

একবার যখন তার পিতা নিদ্রিত ছিলেন তখন একজন ব্যবসায়ী একটি সুন্দর হীরা নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে তাদের বাড়ীতে হাযির হলো, এ বালকটি সেই হীরা ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো এবং সত্তর হাজার মূল্য ঠিক হলো। বালকটি বললোঃ এখন আমার পিতা ঘুমিয়ে, অর্থ তার নিকট, আপনি অপেক্ষা করুন। ব্যবসায়ী বললোঃ তুমি তোমার পিতাকে জাগ্রত করে মূল্য এনে দাও, বালকটি বললো, না তা হবেনা, আমি আমার পিতার ঘুম ভাঙ্গাতে পারবো না। ব্যবসায়ী বললোঃ তুমি যদি এখনই তোমার পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়ে মূল্য এনে দিতে পার তবে আমি দশ হাজার কম নেব। বালকটি বললো, না আমার পিতার ঘুম ভাঙ্গানো আমার পক্ষ সম্ভব হবেনা, তবে আপনি যদি অপেক্ষা করেন তবে আপনাকে সত্তর এর পরিবর্তে আশি হাজার মূল্য দেব। ব্যবসায়ী অবশেষে একথাও বললো, যদি এখনই তুমি মূল্য এনে দিতে পার তবে আমি সত্তর এর পরিবর্তে ত্রিশ হাজার নেব। সে বললোঃ না, তা সম্ভব নয়; বরং আপনি যদি আমার পিতা জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, তবে আমি এ হীরাটির মূল্য একলক্ষ পর্যন্ত দেব।

কিন্তু ব্যবসায়ী রাজী হলো না, সে হীরা বিক্রি না করে চলে গেল। পিতা জাগ্রত হয়ে এ ঘটনা শ্রবণ করে পুত্রের জন্যে বিশেষ ভাবে দোয়া করলেন।[২]

এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিখ্যাত এ গরুটির মালিক এতিম বালকটি সম্পর্কে তফসীরে মাজহারীতে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ বালকের পিতা ছিলেন অত্যন্ত নেককার মানুষ। তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর গরুর বাছুরটি জঙ্গলে নিয়ে গেলেন এবং একথা বলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমানত করলেনঃ হে আল্লাহ! আমার পুত্র যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এ গরুর বাছুরটি আমি তোমার নিকট আমানত করলাম।

একথা বলে জঙ্গলে বাছুরটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। বাছুরটি জঙ্গলে বিচরণ করে বেড়াতো, কোন মানুষ দেখলে পলায়ন করতো।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯
তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩

যখন এ ছেলেটি যৌবনে পদার্পণ করলো, তখন তার মধ্যে অনেক গুণের বহিঃপ্রকাশ হলো, সে ছিল তার মাতার অত্যন্ত অনুগত, মাতার খেদমতের ব্রত সে গ্রহণ করেছিল। সে রাত্রিকে তিনভাগে বিভক্ত করতো। রাতের এক অংশে সে নিদ্রামগ্ন থাকত, দ্বিতীয় অংশে নামাজে রত থাকত। আর তৃতীয় অংশে সে তার মাতার শিয়রে বসে থাকত এবং সকাল বেলা জঙ্গলে গিয়ে জ্বালানী সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করতো এবং তার মূল্যকে তিনভাগে বিভক্ত করতো। একভাগ আল্লাহর রাহে দান করতো, আর একভাগ তার মাতার খেদমতে পেশ করতো, আর একভাগ দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণ করতো।

একদিন তার মাতা তাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আমার প্রাণাধিক পুত্র! তোমার পিতা তোমার জন্যে উত্তরাধিকার স্বরূপ একটি গরু রেখে গেছেন যা জঙ্গলে বিচরণ করে, তাকে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট আমানত রেখে গেছেন, তুমি জঙ্গলে যাও এবং একথা বলে ডাকঃ "হে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর উপাস্য! আমার জন্যে রক্ষিত সে গরুটি দান করুন"। সে গরুটির চিহ্ন হলো, "যখন তুমি তাকে দেখবে তখনই জানতে পারবে যে এটিই তোমার গরু। গরুটি এত সুন্দর যে সূর্যের ন্যায় তার দেহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে"। গরুটি সত্যি ভারী সুন্দর, পীতবর্ণ বিশিষ্ট। এজন্যে তাকে লোকেরা "সোনালী গরু" হিসেবে আখ্যায়িত করতো। সেই যুবক মায়ের নির্দেশ মোতাবেক জঙ্গলে গিয়ে গরুটিকে ডাকলে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুমে দ্রুতবেগে এটি তার নিকট হাযির হয়। যুবক তার গরুটির ঘাড়ে ধরে টানতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক গরুটিকে বাকশক্তি দান করলেন। সে বললো, "হে মায়ের খেদমত-গুজার সন্তান! তুমি আমার উপর আরোহন কর, আরাম পাবে"। যুবক বললোঃ "এটি আমার মাতার আদেশ। আমি যেন তোমার উপর আরোহন না করি"। তখন গরুটি বললোঃ "যে যুবক! যদি তুমি আমার কথা মোতাবেক আমার উপর আরোহন করতে, তবে আমি কোন অবস্থাতেই তোমার নিয়ন্ত্রণে আসতে রাজী হতাম না। তোমার মাতার প্রতি আনুগত্যের কারণে তুমি এমন মর্যাদা পেয়েছ, যদি তুমি পাহাড়কে আদেশ দাও তাহলে সে তোমার সঙ্গে চলতে থাকবে"।

যাহোক, সে গরুটিকে নিয়ে মায়ের নিকট হাযির হলো। মাতা তাঁকে বললেনঃ "বাবা! তুমি দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, জীবন তোমার দুর্বিষহ, তাই তুমি গরুটিকে বিক্রয় কর এবং তা দ্বারা তোমার প্রয়োজনের আয়োজন কর"। যুবক মাকে গরুটির মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেনঃ "মূল্য হবে তিন স্বর্ণমুদ্রা"। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেনঃ "বিক্রয় করার পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিও"। মায়ের নির্দেশ মোতাবেক সে গরুটি নিয়ে বাজারে হাযির হলো। এদিকে তাকে পরীক্ষা করার জন্যে

আল্লাহর তরফ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হলো, তিনি মানবরূপ ধারণ করে গরুটির মূল্য জিজ্ঞাসা করলেনঃ যুবক বললো, "মূল্য হবে তিন স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু শর্ত হলো আমি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করে নেব"। ফেরেশতা বললেনঃ "তুমি আমার কাছ থেকে ৬টি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাও এবং এখনই আমাকে দিয়ে দাও। মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই"। সে বললো, "যদি আমাকে এ গরুর সমান স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হয়, তবুও মায়ের অনুমতি ব্যতীত আমি বিক্রয় করবো না"। একথা বলে সে মায়ের নিকট হাযির হলো, প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলো। মা বললেনঃ "যাও, ছয়টি স্বর্ণমুদ্রা মূল্য হিসেবে দাবী কর, তবে বিক্রয় করার পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিও"। অতঃপর যুবকটি বাজারে গেল এবং ক্রেতা তাকে বললো, "তোমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করে এসেছ"? যুবকঃ "জ্বি, হ্যাঁ করেছি"। তবে তিনি বলেছেন, "বিক্রয় করার আগে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে নিও"। এ গায়বী ক্রেতা তাকে বললেন, "তুমি আমার কাছ থেকে বারটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নাও এবং মাকে জিজ্ঞাসা করোনা"। যুবক তাতে অস্বীকৃতি জানালো। এরপর সে মায়ের নিকট উপস্থিত হলো এবং তার নিকট পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। মা বললেন," ইনি একজন ফেরেশতা, তোমার পরীক্ষা নিচ্ছেন, যদি পুনরায় তাঁর সঙ্গে মোলাকাত হয়, তবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো আমরা গরুটি বিক্রয় করবো কি-না"? মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মানবরূপী সেই ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেনঃ "গরুটিকে এখন বিক্রয় করোনা। মূসা (আঃ) একজন নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এ গরুটি ক্রয় করবেন, তোমরা গরুটির চামড়ায় যত স্বর্ণ মুদ্রা আসে তার বিনিময়ে গরুটি বিক্রয় করবে"। তাই তারা গরুটি আর বিক্রয় করলেন না। এদিকে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির তকদীরে এমনি গরু জবেহ্ করা নির্দিষ্ট করে রাখলেন। আলোচ্য আয়াতে যে সব গুণের উল্লেখ রয়েছে তার সব কয়টি এ গরুটির মধ্যে পাওয়া গেল এবং তারা তা ক্রয় করে জবেহ করলো। আর গরুর চামড়ার মধ্যে যত স্বর্ণমুদ্রার সংকুলান হয় তা মূল্য হিসেবে যুবককে দান করলো। আর এটি হলো তার নেক নিয়ত ও পিতা-মাতার খেদমতের ফলশ্রুতি এবং তার পিতা আল্লাহ পাকের প্রতি যে ভরসা করে গেছেন তার শুভ-পরিণতি।

এখানে এমন প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট থেকে ঘাতকের নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে ঘোষণা করে দিতে পারতেন, এজন্যে গরু জবেহ করায় কি প্রযোজন ছিল?

এর জবাবে তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যেহেতু বনী ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর গরু বাছুর পূজার লিপ্ত হয়েছিল এবং গরুর প্রতি তাদের অন্তরে একটি বিশেষ সম্মানবোধ ছিল, তাই গরু জবেহ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেন তাদের অন্তর থেকে এ সম্মানবোধ দূর করা যায়।

এ ঘটনায় বনী ইসরাঈল জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, তারা কিভাবে ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগণের হুকুম অমান্য করতো; তার প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে, এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে কেননা, মদীনাবাসী ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত, তাদের পূর্ব পুরুষ কিভাবে পূর্বকালের নবীগণকে কষ্ট দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পেশ করে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, এ অভিশপ্ত জাতি ইতিপূর্বেও আল্লাহর নবীগণকে কষ্ট দিয়েছে, আর তাঁরা তাতে সবর অবলম্বন করেছিলেন, অতএব আপনিও এ ইহুদীদের ব্যাপারে সবরের নীতি অবলম্বন করুন। এতদ্ব্যতীত, এ ঘটনায় বনী ইসরাঈলের নাফরমানীর শোচণীয় পরিণতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম পাওয়ার পর অনতিবিলম্বে তার প্রতি আমল না করায় এবং তাতে বাদানুবাদ করার কারণে অনেক চড়া মূল্যে ঐ গরুটি ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে, অথচ তখন একটি গরুর মূল্য হতো তিন স্বর্ণমুদ্রা। তদুপরি সে গরুটির সন্ধান করতে হয়েছে ৪০ বছর যাবত। তাই ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

"তারা অবশেষে গরুটি জবেহ করেছ, তবে জবেহ করার অভিপ্রায় তাদের ছিলনা"।

তফসীরকারগণ এর কারণ উল্লেখ করেছেনঃ চড়া মূল্যের কারণে তারা তা ক্রয় করতে ইচ্ছুক ছিলনা,[১] এমনিভাবে সাফাতুত তাফাসীরে এর দুটি কারণ বর্ণিত হয়েছেঃ

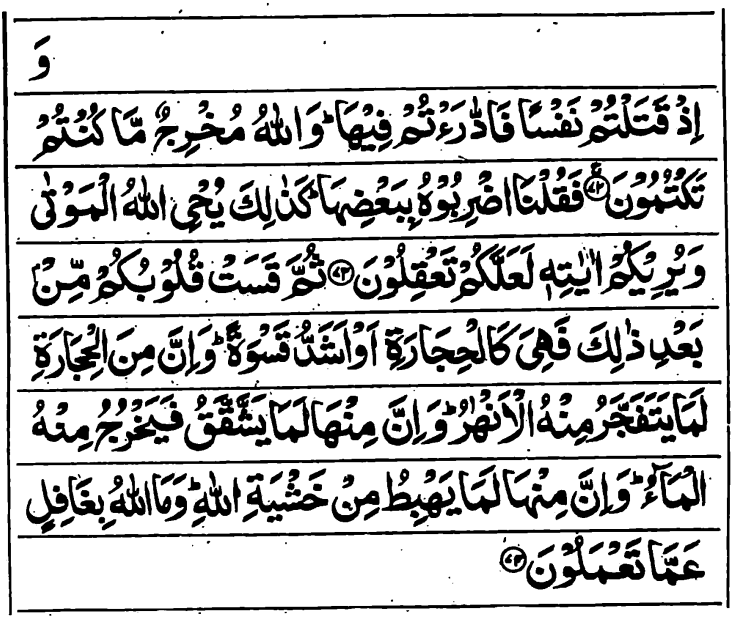
প্রথমতঃ চড়া মূল্যের কারণে অথবা অপমানিত হওয়ার ভয়ে গরু জবেহ করার সদিচ্ছা তাদের ছিলনা কেননা, তখন ৩ দীনারে সাধারণতঃ গরু ক্রয়-বিক্রয় হতো, অথচ এ গরুটির মূল্য দিতে হয়েছে তার চামড়াকে স্বর্ণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

দ্বিতীয়তঃ গরু জবেহ করে তার অংশ মৃত ব্যক্তির দেহের সাথে স্পর্শ করলে সত্য প্রকাশিত হবে এবং প্রকৃত ঘাতকের পরিচয় পাওয়া যাবে, তাতে রয়েছে তাদের অপমান, তাই তারা গরু জবেহ করতে ইচ্ছুক ছিলনা।

আ'মালুল কোরআন

যে ব্যক্তি কোন পোষাক-পরিচ্ছদ, বা জীব-জন্তু অথবা ফল-ফলারী ক্রয় করতে চায়, আর তা উত্তম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যদি মাল বাছাই করার সময় قَالُوا ادْعُ لَنَا থেকে لَمُهْتَدُونَ পর্যন্ত পাঠ করতে থাকে, তবে এর বরকতে ইনশাআল্লাহ কাঙ্ক্ষিত উত্তম বস্তুটি সে পাবে। (দুরারু ত্যানজীম)

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃঃ ৩৭১
সাফওয়াতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃঃ ৫৮



وَ
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۚ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى
وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْمَآءُ ۗ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৭২) এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, অতঃপর একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলে এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ পাক তা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন।

(৭৩) এজন্যে আমি আদেশ করেছিলাম, গরুর যে কোন একাংশ দ্বারা উক্ত মৃত ব্যক্তির দেহটিকে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ পাক মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তাঁর কুদরতের নিদর্শন সমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন, যেন তোমরা তা অনুধাবন করতে পার।

(৭৪) এ সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও তোমাদের অন্তর পুনরায় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হয়ে যায়, অথবা তার চেয়েও অধিকতর কঠিন, নিশ্চয় অনেক প্রস্তর এরূপ যে তা থেকে নহর প্রবাহিত হয়, নিশ্চয় তন্মধ্যে কোন কোন প্রস্তর এমনও আছে যা বিদীর্ণ হবার পর থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং নিশ্চয় প্রস্তরগুলোর মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর ভয়ে নিম্ন ভূমিতে পতিত হয় এবং আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে গাফেল নন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে ভ্রাতষ্পুত্র কর্তৃক পিতৃব্যকে হত্যা করার বিবরণ রয়েছে, হত্যাকারী যখন তার অপরাধ অস্বীকার করেছে তখন লোকেরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ

করেছে, ঐ অবস্থায় তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট হাযির হলে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে প্রকৃত ঘাতকের পরিচয় জানার জন্যে আরযী পেশ করলেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো, তোমরা একটি গরু জবেহ করে তার কোন অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ কর, অনেক বাক-বিতন্ডার পর বনী ইসরাঈল এ নির্দেশ পালন করলো, আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে, আল্লাহর নবীর বিশেষ মোযেজা স্বরূপ মৃতব্যক্তি জীবিত হলো এবং কে তাকে হত্যা করেছে তা বলে দিল, ফলে ঘাতক ভ্রাতষ্পুত্র শাস্তি ভোগ করলো, আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেনঃ

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যা গোপন করছিলে তা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিলেন।

এজন্যে হযরত মোসাব্বাব এবনে রাফে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সাতটি বন্ধ কক্ষের অভ্যন্তরে গিয়ে কোন সৎ কাজ করে, তা-ও আল্লাহ পাক প্রকাশ করেন আর এমনিভাবে সাতটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে গিয়ে যে অসৎ কাজ করে, তা-ও আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেন। কেননা, আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

"তারা কি জানেনা? আল্লাহ পাক জানেন যা কিছু তোমরা গোপন কর এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

"তিনি জানেন তোমাদের চোখের চুরি এবং তোমাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সমস্ত ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও তিনি সম্পূণ অবগত"।

মৃত ব্যক্তির দেহের সঙ্গে গরুটির কোন্ অংশ স্পর্শ করানো হয়েছিল সে সম্পর্কে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন গরুটির রসনা, কেউ বলেছেন গরুটির লেজ, কেউ কেউ অন্যান্য অঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ সম্পর্কে অতি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মৃতকে জীবিত করার জন্যে ঐ গরুর কোন্ অঙ্গটি ব্যবহার করা হয়েছে তার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে নেই এবং কোন সহীহ হাদীসেও নেই, অতএব এ সম্পর্কে অনুসন্ধান অথবা বিতর্ক নিঃস্প্রয়োজন।

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى

"এভাবেই আল্লাহ পাক মৃতদেরকে জীবিত করবেন"।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনে দুনিয়ার সমস্ত মৃত মানুষকে কিভাবে হাযির করানো হবে তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় এ ঘটনায়। যেভাবে আল্লাহ পাকের কুদরতে এ মৃত ব্যক্তিটি জীবিত হয়ে কথা বলেছে ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে জীবিত করবেন এবং প্রত্যেককে ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বিখ্যাত তফসীরকার হযরত মওলানা আবদুল হক্ব দেহলবী (রঃ) লিখেছেনঃ এ ঘটনার বর্ণনা দ্বারা-

১. পরকালীন জিন্দেগীর বাস্তবতা প্রমাণ করা হয়েছে,

২. বণী ইসরাঈলের নাফরমানী ও অবাধ্যতার শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

আর এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ হয়তো তোমরা বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করবে এবং সত্য উপলব্ধি করে পরকালীন জিন্দেগীর পরম সাফল্যের জন্যে সচেষ্ট হবে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ এমন বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা দেখার পরও হে বনী ইসরাঈল! তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করলে না এবং তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠোর, বরং তার চেয়েও অধিকতর কঠোর হয়ে গেছে কেননা, কোন কোন পাথর এমনও রয়েছে যা চৌচির হয়ে যায়, তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে। এতদ্ব্যতীত এমন পাথরও রয়েছে, যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উপর থেকে নীচে পড়ে যায়।

অর্থাৎ জড় পদার্থ পাথরের উপরও আল্লাহর ভয়ের এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, অথচ তোমাদের অন্তর এই পাথর থেকেও কঠিন যার উপর আল্লাহর ভয়ের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের এমন লীলা-খেলা দেখেও তোমাদের অন্তরে এতটুকু পরিবর্তন হয় না।

এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতিকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং তাদের জঘন্য চরিত্রের সমালোচনা করে এরশাদ হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার পর তাদের আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু না, তাদের সে তওফিক হয়নি, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি, তারা অন্যায় অনাচারের পথ বর্জন করেনি কেননা, তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও অধিকতর শক্ত, অতীব কঠিন। এজন্যেই অন্য আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

"মোমেনদের এখনও কি সে সময় আসেনি? যে তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে; আল্লাহর জিকরের জন্যে প্রস্তুত হবে"।

বস্তুতঃ কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কোন শিক্ষণীয় ঘটনা দেখলে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, সতর্কতা অবলম্বন করে, সংযম চর্চা করে নিজেকে কল্যাণের পথে ধাবিত করে।

যেভাবে পূর্ববর্তী যুগের বনী ইসরাঈলরা সর্বদা আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল ছিল, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন যখন নাযিল হয় তখনকার বনী ইসরাঈলরাও কঠোর অন্তর বিশিষ্ট ছিল, কারণ তাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাযিল হচ্ছিল, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নন, বে-খবরও নন, অতএব, শাস্তি অবধারিত।

জড় পদার্থও কি আল্লাহকে ভয় করে?

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে, প্রস্তর একটি জড় পদার্থ, তাতে আল্লাহর ভয় কি করে হবে? তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী বলেছেন, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ হলো, সমস্ত প্রাণহীন বস্তু বা জীব-জন্তু আল্লাহ পাকের মহান হুজুরে দোয়া করে এবং তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ করে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

অর্থাৎ "বস্তু মাত্রই আল্লাহ পাকের হাম্‌দের তসবীহ পাঠ করে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

অর্থাৎ "প্রত্যেকেই তার এবাদত এবং তসবীহ সম্পর্কে অবগত"।

আল্লামা বগভী (রঃ) আরও লিখেছেন, হিজরতের রাতে যখন কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবন করছিল তখন তিনি একটি পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন, সে পাহাড়কে ঐ সময় আল্লাহ পাক বাকশক্তি দান

করেছিলেন, সে পাহাড় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এভাবে কথা বলেছিলঃ "হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি এখান থেকে অবতরণ করুন। কেননা, আমার ভয় হয় হয়তো কাফেররা আপনার নিকট পৌঁছে আপনাকে কষ্ট দেবে, আর এজন্যে আল্লাহ পাক আমাকে শাস্তি দান করবেন"। পক্ষান্তরে সওর নামক পাহাড় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরযী পেশ করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি এখানে আগমন করুন, আমার নিকট আগমন করুন"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় পাহাড়েরও অনুভূতি আছে, সঠিক অবস্থার উপলব্ধি আছে, আছে বাকশক্তি।

মুসলিম শরীফে হযরত যাবের এবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সেই পাথরকে খুব ভাল করে চিনি, যে আমার নবুওয়্যত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করতো আর সে পাথরটি এখনও আমার পরিচিত"।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওহোদের পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেনঃ এটি সে পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি।

এমনিভাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একবার ফজরের নামাজের পর এক ব্যক্তি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, সুদীর্ঘ পথ হেঁটে চলার কারণে লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই সে গরুটির উপর আরোহন করলো এবং তাকে প্রহার করলো। তখনই গরুটি বললো, আমার উপর আরোহন করার জন্যে আমাকে সৃষ্টি করা হযনি, আমাকে তো কৃষিকার্যের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। গরুর কথা শ্রবণে অনেকেই তখন আশ্চর্যন্বিত হয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেনঃ আমি (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) এ ঘটনাকে সত্য মনে করি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেরা পাহাড়ে আগমন করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যোবাযের (রাঃ)। তখন একটি পাথরের কম্পন সৃষ্টি হলো। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাথরটিকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি থাম, তোমার উপর এখন একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম মুসলিম (রঃ)।

এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। যখনই মক্কা শরীফের বাইরে কোথাও যাওয়া হতো, কোন পাহাড় বা বৃক্ষের নিকটবর্তী হলে তারা এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাতোঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিম্বর তৈরী হওয়ার পূর্বে একটি খেজুর গাছের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে খোৎবা দিতেন, যখন মিম্বর তৈরী হলো এবং তিনি তাতে আরোহন করলেন তখন সেই খেজুর গাছের খুঁটিটি বিলাপ করে কান্না শুরু করলো এবং তার সেই কান্নার আওয়াজ মসজিদে উপস্থিত সমস্ত লোক শ্রবণ করলেন। ঐ অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের খুঁটিটির নিকট আগমন করলেন এবং তাকে আলিঙ্গন করে আদর করলেন। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকের স্পর্শ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদ হোক বা কোন জড় পদার্থ, অথবা প্রস্তর বা বৃক্ষ সব কিছুতেই আছে প্রাণ, সব কিছুতেই রয়েছে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য। অতএব, প্রস্তরের আল্লাহর ভয়ে পাহাড়ের উচ্চ চূড়া থেকে নিম্ন-দেশে নিক্ষিপ্ত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। এজন্যেই মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেনঃ

خاك وباد آب واتش بنده اند= بامن وتو مرده باحق زنده اند

"মাটি, বাতাস, আগুন, পানি সবই আল্লাহর বন্দা, তাঁর সৃষ্টি, আমার তোমার নিকট তারা মৃত, আল্লাহ পাকের দরবারে তারা জীবিত"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ বক্তব্যকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআনের কয়েকখানি আয়াত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রস্তর সমূহে রয়েছে পূর্ণ উপলব্ধি এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ

এমনিভাবে আসমান-যমীন সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا

"তাদেরকে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন, "তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়"।

তার জবাবে তারা বলেছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَتَآ اَتَيۡنَا طَآئِعِيۡنَ

"যমীন আসমান বললো, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুগত হয়ে হাযির হয়েছি"।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক একথাও এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا عَرَضۡنَا الۡاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَالۡجِبَالِ- الاية

"নিশ্চয় আমি এ আমানতকে পেশ করেছি আসমান যমীন এবং পাহাড়ের উপরে, তারা আমানতের দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে এবং ভয় করেছে"।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে সব বস্তুকে আমরা প্রাণহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো প্রাণহীন নয়, বরং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক খেতাবের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন এবং তারাও স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করতে পেরেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ যে তাকে ঈমানের সঙ্গে চুম্বন করবে, এ কৃষ্ণ পাথরটি কাল কেয়ামতের দিনে তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে।

অতএব, পাথর আদৌ প্রাণহীন নয় এবং আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নীচে পড়ে যাওয়া কোন অবস্থাতেই অস্বাভাবিক নয়।[১]

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেনঃ

"আমি একথা স্বীকার করিনা যে, পাথর জীবিত নয় এবং পাথরের মধ্যে বোধ শক্তি নেই; বরং আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে দান করেছেন প্রাণশক্তি, বুদ্ধি, উপলব্ধি, আর আল্লাহ্ পাকের জন্যে তা আদৌ কঠিন নয়"।[২]

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেনঃ

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيۡتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যদি আমি পবিত্র কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তবে (হে রসূল!) আপনি দেখতেন, পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ভীত, প্রকম্পিত হতো।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যত লাভ করার পর যখন সর্ব প্রথম তাঁর গৃহের দিকে রওয়ানা হন তখন পাথর এবং বৃক্ষরাজি তাঁকে একথা বলে সালাম পেশ করেছেঃ "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৩৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৬

পাথরের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের আরও একটি অর্থ

অবশ্য কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে পাথরের মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয়ের কথা প্রকৃত অর্থে নয়, বরং রূপক অর্থে আর পাথর আল্লাহকে ভয় করে, এর তাৎপর্য হলো আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ এ সমস্ত জড় পদার্থকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকাই হলো এদের আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় প্রদর্শন। তফসীরে মাদারেকে রয়েছেঃ

"পাথরের আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ হলো আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা"।

আর প্রায় এই একই কথা রয়েছে তফসীরে বয়যাভীতে, যা নিম্নরূপঃ

"এ আয়াতে আল্লাহর ভয়ের অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য"।

আর তফসীরে রুহুল মাআনীতেও এ বক্তব্যটির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, একদল লোক বলেছেন, এখানে আল্লাহর ভয় অর্থ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ।

তফসীরে মাজেদীতে বলা হয়েছে উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক কেননা, উভয় পক্ষই আহলে হক্ব এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ভুক্ত ওলামায়ে কেরাম।[১]

আলোচ্য আয়াতে পাথরের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ

অর্থাৎ পাথরের মধ্যে এমনও রয়েছে, যা থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হয়।

মানব জাতির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ পাকের নবী-রসূলগণ কেননা, অগণিত মানুষ তাঁদের ফয়েজ প্রাপ্ত হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করে তাঁদের হেদায়েত দ্বারা।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ

অর্থাৎ পাথরের মধ্যে এমনও রয়েছে, যা বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

মানব-সমাজে এই পাথর সমূহের দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর ওলীগণ, বুজুর্গানে দ্বীন কেননা, তাঁদের ফয়েজ ও বরকতে অনেক লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০

অর্থাৎ পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নীচে পড়ে যায়।

মানব সমাজে এ পাথর সমূহের দৃষ্টান্ত হলো সাধারণ নেককার মুসলমানদের, যারা অন্যকে হেদায়েত করতে সক্ষম না হলেও অন্ততঃ নিজের ঈমান রক্ষা করতে পারে এবং আল্লাহ পাকের বন্দা হিসেবে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

সূরার নামকরণের তাৎপর্য

যেহেতু বাকারাহ বা গরু জবেহ করার এ ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, এতে সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থানের বাস্তব প্রমাণ রয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে "বাকারাহ"। এতে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই.অনুমেয়।

আমালুল কোরআন

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ....تَعْمَلُونَ

কোন গাভী বা বকরীর দুধ কমে গেলে তামার তৈরী পাত্রে এ আয়াত লিপিবদ্ধ করে পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি গাভীকে পান করাতে হয়, ফলে আল্লাহ পাকের হুকুমে দুধ বৃদ্ধি হয়। এমনিভাবে, যদি কোন কূপ বা নহরের পানি কমে যায়, এ আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে তাতে ফেললে আল্লাহ পাকের হুকুমে পানি বৃদ্ধি হয়।

(দুরারু ত্যান্‌জীম)

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا
فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَ
مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ
لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

তরজমা

(৭৫) তোমরা কি আশা রাখ যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে এমনও একটি দল ছিল যারা আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী শ্রবণ করতো এবং তা বুঝবার পর তাকে বিকৃত করতো এবং তারা সকলেই জানতো।

(৭৬) এবং যখনই তারা মোমেনদের সঙ্গে সম্মিলিত হতো তখনই তারা বলতো, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখনই তারা একে অন্যের সাথে নিভৃতে একত্রিত হতো তখন তারা বলতো, তোমরা কি মানুষদেরকে জানিয়ে দিচ্ছ? যা আল্লাহ পাক তোমাদের উপর প্রকাশ করে দিয়েছেন? ফলে তারা তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমাদেরকে বিতর্কে পরাজিত করবে, একথা কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না?

(৭৭) তারা কি অবগত নয়? যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(৭৮) এবং তাদের মধ্যে অনেক মূর্খ লোক আছে যারা লেখা-পড়া জানেনা, ভিত্তিহীন আশা এবং মন ভোলানো কথা-বার্তা ভিন্ন তারা কিছুই বোঝেনা। তারা শুধু আকাশ-কুসুম ভাবে।

(৭৯) অতএব, কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে যারা নিজের হাতে কিতাব লিখে তা আল্লাহর তরফ থেকে বলে প্রকাশ করে নিতান্ত হীন, তুচ্ছ-বিনিময় লাভের লোভে, সুতরাং ধিক তাদের এ হাতের লেখায়, ধিক তাদের অর্থ অপহরণে।

তফসীরুল কোরআন

বনী ইসরাঈলের অব্যাহত নাফরমানী, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্বপূর্ণ ঘটনাবলী আলোচনার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ আয়াতে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, যে ইহুদীরা আল্লাহর নবীকে বিশ্বাস করার পরও তাঁর সাথে এত বেয়াদবী করে এমনকি, আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম শ্রবণের পরও তাতে পরিবর্তন করে, এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের ব্যাপারে তোমরা কি এই আশা কর যে তারা ঈমান আনবে?

আল্লাহ পাকের কালামকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে তফসীরকারগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তারা তৌরাত শ্রবণ করতো, তার মর্ম উপলব্ধি করতো, এরপর তৌরাতের শিক্ষার বরখেলাফ আমল করতো, তাতে পরিবর্তন করতো। কোন কোন আলেমের মতে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের তিরোধাণের পর ইহুদীরা তাদের হীন স্বার্থের বশীভূত হয়ে তৌরাতের বিধি-নিষেধে পরিবর্তন করতো। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পর্কে তৌরাতের যে সব খোশখবরী ছিল সেগুলো ইহুদীরা পরিবর্তন করে দেয় এমনকি, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তৌরাতের যে সব খোশখবরী ছিল তা-ও পরিবর্তন করে দেয়।

বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক তৌরাতে তিন জায়গায় দেখল, শত্রুতার কারণে সে তিনটি জায়গা ছিড়ে ফেলল কিন্তু পরদিন দেখে যে তিন নয়, ছয়টি স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম রয়েছে। তাই সে উক্ত স্থান সমূহ ছিড়ে ফেললো কিন্তু পরদিন সকালে আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। ছয়ের বদলে নয়টি স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক দেখা গেল। সে তৌরাতের এ নয়টি স্থানই ছিড়ে ফেলল। কিন্তু পরদিন সকালে সে যখন দেখল বারটি স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক রয়েছে তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাদের ধর্মীয় নেতার নিকট এ বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ দিল, তখন তাকে বলা হলো, খবরদার! তুমি আর এ কাজ করোনা কেননা, পরিণামে তৌরাতে এ নামটি ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, কেন এমন হবে? বলা হলো তিনি তো আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তখন লোকটি বললো, যদি তাই হয় তবে আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। আমিও মুসলমান হলাম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ পাকের কালামে ইহুদীদের দ্বারা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন বনী ইসরাঈলের ৭০ জন লোককে মনোনীত করে তূর পাহাড়ের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গেলেন, তারা আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণ করলো এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে যা শ্রবণ করেছিল তা শুনিয়ে দিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল তারা সবশেষে এ কথাও বললো, আমরা একথাও শ্রবণ করেছি যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "যদি তোমরা এ সমস্ত বিধি-নিষেধ পালনের শক্তি রাখ তবে পালন কর আর যদি মন না চায় তাহলে করোনা"।

এটিই ছিল আল্লাহর কালামে পরিবর্তনের এক জঘন্য দৃষ্টান্ত।

যেহেতু মদীনা মোনাওয়্যারায় উপস্থিত ইহুদীরা ইসলামের বিরোধিতা করতো। মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। সবার উপরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে মূসা (আঃ)-কে যে সম্প্রদায় কষ্ট দিয়েছে, বর্তমানে মদীনায় উপস্থিত ইহুদীরা তাদেরই বংশধর। (হে রসূল!) আপনাকে এ ইহুদীরা কষ্ট দেয়, অতএব কষ্ট পেয়ে যেভাবে মূসা (আঃ) সবর করেছেন, আপনিও সবর করুন। তাদের নাফরমানীর কারণে ব্যথিত হবেন না কেননা, ইতিপূর্বে তাদের পূর্বপুরুষ তার চেয়ে অধিকতর জঘন্য অপরাধ করতো। অতএব, তাদের ঈমান আনয়নের আশা সুদূর পরাহত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "হে মোমেনগণ! এ ইহুদীদের ঈমান আনয়নের কোন আশা নেই কেননা, তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীগণের শানে অনেক বেয়াদবী করেছে"।

এমনকি তারা আল্লাহর কালাম শ্রবণের পর তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বরং তারা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে দিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট যে তৌরাত নাযিল হয়েছে তাতে তো তারা অনেক পরিবর্তনই করেছে, সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার এই, তারা দরখাস্ত করেছিল সরাসরি আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণের জন্যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর বিনীত মোনাজাতের কারণে আল্লাহ পাক তাদের এ দরখাস্তও মঞ্জুর করেছিলেন। তারা আল্লাহ পাকের কালাম শ্রবণও করেছিল কিন্তু তাতেও তারা পরিবর্তন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সব গুণের উল্লেখ রয়েছে তৌরাতে, তারা সেগুলোকে গোপন করেছে, হীন স্বার্থের বশীভূত হয়ে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে। তারা উৎকোচের বিনিময়ে তৌরাতের বিভিন্ন নির্দেশের পরিবর্তন করেছে। কিন্তু যখন মুসলমানদের সঙ্গে তাদের

দেখা হতো তখন তারা বলতো, আপনাদের নবী সত্য নবী। আর যখন তারা পরস্পর একত্রিত হতো তখন একে অন্যকে বলতো, কেন মুসলমানের সঙ্গে একথা বলে তাদের হাতে হাতিয়ার তুলে দিচ্ছ? তারা তো এতদ্বারা তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে পরে লা-জবাব করে দেবে। এসব কথা যেহেতু তাদের মধ্যে গোপনে হতো তাই তারা মনে করতো যে, মুসলমানরা এসব কথার কোন খবরই পাবে না।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাদের এ গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ.....

"এ নির্বোধেরা একথাও জানেনা যে, আল্লাহ্ পাক তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনু কোরায়জা গোত্রের উপর আক্রমণ করার দিন ইহুদীদের দূর্গের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেছিলেন, "হে বানব এবং শুকর ও শয়তানের পুজকদের ভাইয়েরা"! এ সম্বোধন শুনে তারা পরস্পর বলতে লাগলো, ইনি আমাদের ঘরের গোপন কথা কি করে জানলেন? খবরদার! মুসলমানদের কাছে নিজেদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করোনা, অন্যথায় এসব কথা আল্লাহর দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা যা কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই তো আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রকাশ্য। অতএব, তোমাদের এ চাতুরী সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং তোমাদের শাস্তি অবধারিত।[১]

আর এদের মধ্যে কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে যারা তাদের নবীর নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ তৌরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা, তাদের নিকট শুধু ভিত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নেই।

امانى শব্দের বহুবচন হলো "উমনিয়া"। আর উমনিয়া বলা হয় এমন আকাঙ্ক্ষাকে যা মানুষ স্বীয় অন্তরে পোষণ করে থাকে, যা অলীক এবং ভিত্তিহীন, যার বাস্তবায়ন সাধারণতঃ হয় না। আয়াতে উল্লেখিত এ শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, ইহুদী ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের সেসব মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা, যা তারা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে বলে থাকে, যেমন পবিত্র কোরআনে এর উল্লেখ রয়েছেঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

"ইহুদী ও নাসারারা ব্যতীত কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৩৮

অথচ একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু এ ধরণের কথাই তারা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের বলে বুঝিয়ে রেখেছিল। এমনকি তারা এমন ভিত্তিহীন উক্তিও করেছিল যে, দোযখে সামান্য কয়েক দিনই কষ্ট ভোগ করতে হবে, যেমন পবিত্র কোরআনে তাদের কথার বিবরণ রয়েছেঃ

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

অর্থাৎ "দোযখের অগ্নি শুধু সামান্য কয়েক দিনই আমাদের স্পর্শ করবে"।

এমনি অলীক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন কথাবার্তা ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্ম-জ্ঞানীরা তাদের সাধারণ লোকদের শিখিয়ে রাখতো।

কোন কোন তফসীরকার امانى অর্থ মিথ্যা কথা বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ওসমান (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছেঃ

তিনি বলেছেনঃ

ما تمنيت منذ اسلمت

'আমি মুসলমান হওয়ার মুহূর্ত থেকে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই'।

হযরত ওসমান (রাঃ) এ বাক্যে "তামান্নাইতু" শব্দটি মিথ্যা অর্থে ব্যবহার করেছেন।[১]

পবিত্র কোরআন ইহুদীদের এসব ভিত্তিহীন বা মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদে শুধু একটি বাক্য ব্যবহার করেছেঃ

وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ

অর্থাৎ "এসব তাদের ভিত্তিহীন কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

কারণ এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন একাধিক স্থানে তার নীতি ঘোষণা করেছেঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُجْزَ بِهٖ

"যে মন্দ কাজ করবে তাকে অবশ্যই তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হবে"।

পবিত্র কোরআনে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۞ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১৪৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮২

"অতঃপর যে কণামাত্র সৎ কাজ করবে সে অবশ্যই তার শুভ-পরিণতি বা সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে সামান্যতম মন্দ কাজও করবে, তাকে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করতে হবে"।

পবিত্র কোরআনের এমনি সুস্পষ্ট ঘোষণার পর আহলে কিতাবদের সেই ভিত্তিহীন ও অলীক কল্পনার আদৌ কোন মূল্য থাকেনা, আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ

অর্থাৎ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি, যারা স্বহস্তে কিতাব লিপিবদ্ধ করে এরপর তারা বলে যে, এটি আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে, আর তারা এ অন্যায় কাজ এজন্যে করে যেন তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করতে পারে।

এ আয়াত ইহুদী আলেম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা দুনিয়ার লোভে তৌরাতের আয়াত সমূহে পরিবর্তন করতো।

"ওয়ায়ল" শব্দটি পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "ওয়ায়ল" অর্থ হলো কঠিন শাস্তি।

আর সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) বলেছেন, "ওয়ায়ল" জাহান্নামের একটি ময়দানের নাম। যদি তাতে কোন পাহাড়কে ফেলা হয় তবে তা বালুতে পরিণত হয়ে যাবে, অথবা জ্বলে পানির মত প্রবাহিত হয়ে যাবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'ওয়ায়ল' হলো দোযখের একটি ময়দানের নাম। কাফেররা তাতে ৪০ বছর যাবত নীচের দিকে যেতে থাকবে কিন্তু তবুও তার গভীরতা শেষ হবে না। আর صعود দোজখের একটি পাহাড়ের নাম। কাফেররা ৭০ বছর যাবত ঐ অগ্নির পাহাড়ে আরোহন করতে থাকবে, এরপর আরও সত্তর বছর যাবত নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।[১]

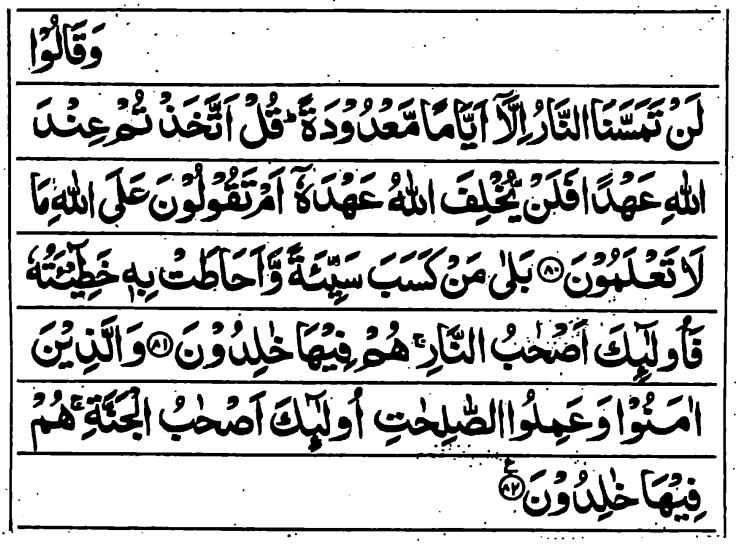
আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا

অর্থাৎ যেন তারা আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তনে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৯

"সামান্য মূল্য" কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে, তারা যে অন্যায় করেছে তার জন্যে তারা যে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে, সে হিসেবে এ মূল্য সত্যিই অত্যন্ত সামান্য। ইহুদীরা খুব ভালভাবেই জানতো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য নবী, তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তৌরাতে, কিন্তু এ বদনসীব সম্প্রদায়ের বিদ্বান লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর বর্ণনার পরিবর্তন করে দেয় যেন তাঁর প্রতি সাধারণ ইহুদীরা ঈমান না আনে, এ অপরাধের কারণে তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।


وَقَالُوا
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

তরজমা

(৮০) এবং ইহুদীরা বলেছিল যে, নির্দিষ্ট কয়েক দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। আপনি তাদেরকে বলুন যে, তোমরা কি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয়েছ, যার খেলাফ তিনি করবেন না অথবা আল্লাহ পাকের সম্বন্ধে এমন ভিত্তিহীন উক্তি করছো, যা তোমরা জান না।

(৮১) হ্যাঁ যে ব্যক্তি অন্যায় আচরণ করে এবং যাদেরকে অসংখ্য অন্যায় আচরণ পরিবেষ্টন করে থাকে, বস্তুতঃ তারাই নরকবাসী, তারা চিরদিন নরকে বাস করবে।

(৮২) পক্ষান্তরে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকার্যে মশগুল রয়েছে তারাই হবে বেহেশতের অধিবাসী, চির জীবন তারা তাতেই থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদীদের একটি অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করে এরশাদ করেছেনঃ ইহুদীরা বলে যে, দোজযখের অগ্নি আমাদেরকে সামান্য কয়েকদিনই স্পর্শ করবে, চিরকাল আমাদেরকে সেখানে থাকতে হবেনা, তাদের মধ্যে কেউ বলতো, মাত্র সাতদিনই তারা দোযখবাসী হবে। এরপর তারা মুক্তিলাভ করবে।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা বলতো দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর। প্রত্যেক হাজার বছরের বদলে একদিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।[১]

আর তাদের মধ্যে আর এক দলের বক্তব্য হলো, তারা যতদিন গো-বৎস পূজা করেছিল (অর্থাৎ চল্লিশ দিন) ততদিন মাত্র তারা দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের অন্য একটি দল বলতো, "তীহ" প্রান্তরে অবস্থানের পরিমাণ তথা চল্লিশ বছর যাবত তারা শাস্তি ভোগ করবে, এরপর তারা দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নাজাত পাবে।

একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, এসবই তাদের সুখ-স্বপ্ন এবং কল্পনা-প্রসূত অন্যায় আবদার কেননা, বেহেশত এবং দোযখে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যে রীতি-নীতি ঘোষণা করেছেন তারই অনুসরণ করা হবে, এতে কোন ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা নেই। এজন্যে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ "হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ পাকের সাথে এ সম্পর্কে কোন চুক্তি সম্পাদন করেছ? যে, তিনি সে চুক্তির খেলাফ করবেন না, অথবা তোমরা আল্লাহ পাকের সম্পর্কে এমন কথা বলছো যার কোন দলিল-প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাযির হয়ে একথা বলেছে, আমরা শুধু চল্লিশ দিন যাবত দোযখে থাকব, এরপর অন্য লোকেরা দোযখে আমাদের স্থান গ্রহণ করবে, অর্থাৎ আপনার উম্মত। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মাথায় হাত রেখে এরশাদ করলেনঃ "না, (একথা সত্য নয়) বরং তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, খায়বর বিজয়ের পর ইহুদীরা বকরীর গোশ্‌তে বিষ মিশিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলো। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ ইহুদীদেরকে আমার নিকট একত্রিত কর। এরপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের পিতা কে? তারা বললো 'অমুক'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা 'অমুক'। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি আরও কিছু প্রশ্ন করবো, তোমরা কি জবাবে সত্য কথা বলবে? তারা বললোঃ হ্যাঁ কেননা, আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলা চলবে না। তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ বল, কারা হবে দোযখবাসী? তখন তারা বললোঃ কিছুদিন আমরা দোযখে অবস্থান করবো, এরপর আপনার উম্মত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ "বেরিয়ে যাও", আমরা কোনদিন দোযখে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না"। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি আরও একটি প্রশ্ন করবো, তোমরা কি সঠিক উত্তর দেবে? তারা বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ কেন তোমরা এমন করলে? তারা বললো এজন্যে যে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা, আর যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তবে আমরা আপনার নিকট থেকে নাজাত পাবে। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বোখারী শরীফে এবং নেসায়ী শরীফে ও মসনদে আহমদে।[১]

بَلٰى مَنْ كَسَبَ

ইহুদীদের অন্যায় আবদার যে নিতান্ত কল্পনা-প্রসূত, পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথারই ঘোষণা ছিল। আর এ আয়াতে বেহেশত ও দোযখের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, বেহেশতবাসী হওয়া কোন বিশেষ বর্ণ ও বংশের উপর নির্ভর করে না; বরং বিষয়টির সিদ্ধান্ত হয় মানুষের কৃতকর্মের বিচারের মাধ্যমে। এজন্যেই কোন কবি বলেছেনঃ

بندگی باید پیغمبر زاد گی درکار نیست

"এখানে আল্লাহর বন্দেগীর মূল্য রয়েছে, পয়গম্বরের সন্তান হওয়ার প্রয়োজন নেই (হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা, হযরত লুত (আঃ) এর স্ত্রী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য, এরা সকলেই অমুসলিম ছিল। ঈমান তাদের নসীবে ছিল না)"।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১২

এজন্যেই কবি বলেছেনঃ

دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر + غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر

"মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করা এবং মসজিদকে মন্দিরে পরিবর্তন করা, পরকে আপন করা আপনাকে পর করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব"।

سب سے ربط آشنائی ہے اسے + دل میں ہر ایك کے رسائی ہے اسے

"সকলের সাথে রয়েছে তাঁর সম্পর্ক। সকলের অন্তরেই তিনি রয়েছেন বিরাজমান"।

زوجة فرعون ہووے طاهره + اهلية لوط کی هوا کافره

"কুখ্যাত ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন মুসলিম, পবিত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য! আল্লাহর নবী লুত (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল কাফের"।

ذادے اذر خلیل الله ہو + اور کنعان نوح کا گمراه ہو

کچه نہیں دم مارنے کا یه مقام + پنچے اس نکة کو کب فهم عوام

"এমনি বিস্ময়কর বিষয় হলো, মূর্তি প্রস্তুতকারক আজরের পুত্র ইব্রাহীম (আঃ) হলেন আল্লাহর বন্ধু। অথচ হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনআন হলো কাফের"।

"এখানে গর্ব করার কোন সুযোগ নেই, আর এ রহস্য সকলের বোধগম্যও হবার নয়"।

আল্লাহ্ পাকের প্রতি কে ঈমান আনবে এবং কে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে জীবন-সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করবে একথা শুধু তিনিই জানেন। এজন্যেই দেখা যায় আবু জেহেল গং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গোত্রীয় লোক হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, অথচ হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম দূর দূরান্ত থেকে হাযির হয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এবং ইসলাম কবুল করে জীবনকে ধন্য করেছেন। তাই মওলানা রুমী বলেছেনঃ

بلال از حبش صهیب از روم حسن ز بصری است

بو جهل که در مکه بود این چه بوالعجبیست

در ازل آنر ابهبودے نبود + در دیدن نبی سود ہے نبود

"কি আশ্চর্য! আবু জেহেল, আবু লাহাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করেও তাঁর নিকট থেকে বঞ্চিতই রইল। তারা হলো ভাগ্যাহত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নৈকট্য দ্বারা তারা উপকৃত হতে সক্ষম হলো না"।

অতএব, কারো এ দাবী করা যে, আমরা সামান্য কয়েকদিন দোযখে অবস্থানের পরই বেহেশতে প্রবেশ করবো, নিতান্ত বাগাড়ম্বর ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর কারণ হিসেবে মওলানা রুমী (রঃ) বলেছেন, এরা ছিল ভাগ্যাহত। এদের তকদীর বা ভাগ্য লিপিতে কল্যাণ লিপিবদ্ধ হয়নি। তারা তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।

কোরআনে করীম তাদের এ অবস্থাকে اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ বলে বর্ণনা করেছে। احاطت শব্দের আভিধাণিক অর্থ হলো পরিবেষ্টন করা, অর্থাৎ তারা যে শুধু পাপ পংকিলতায় লিপ্ত হয়েছে তাই নয়, বরং পাপ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে, যার তাৎপর্য হচ্ছে তাদের মাথার চুল থেকে পায়ের আংগুল পর্যন্ত শুধু পাপ আর পাপই রয়েছে, তাদের অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র পাপ ব্যতীত আর কিছুই নেই, তাদের শোচনীয় পরিণাম হলো চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করা। একথা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে এ পরিণাম শুধু কাফেরদেরই হবে। আহ্‌লে সুন্নাতে ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের এটিই ঐক্যবদ্ধ অভিমত, পক্ষান্তরে মোমেন শত পাপকার্যে লিপ্ত হলেও চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করবেনা, বরং পাপাচারের কারণে কিছু দিন দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর ঈমানের কারণে শাস্তি থেকে নাজাত পাবে।[১]

مَنْ كَسَبَ

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, اشرك بالله (অর্থাৎ সে আল্লাহ সাথে শেরক করেছে) অর্থাৎ শেরক অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে, আর এমন ব্যক্তি চিরদিন দোযখে থাকবে।[২]

এ আয়াতের তফসীরে হাকীমূল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বয়ানুল কোরআনে লিখেছেন, এ আয়াত শুধু কাফেরদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য কারণ, কাফের হওয়ার কারণে তাদের কোন সৎ কাজই দরবারে এলাহীতে কবুল হয়না, এমনকি কাফের হওয়ার পূর্বে যদি কোন সৎ কাজও করে থাকে তা-ও বাতিল হয়ে যায় ফলে, কাফেরদের আমলনামায় কোন সৎ কাজের চিহ্ন মাত্রও থাকেনা।

পক্ষান্তরে, মোমেনদের অবস্থা এই, তাদের আমলনামায় সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ কাজ ঈমান থাকে, এতদ্ব্যতীত আরও কিছু নেক আমলও থাকে।

এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের অন্যায় দাবীর প্রতিবাদ করা হলো কেননা, তারা দাবী করেছিল শুধু অল্প কয়দিনই তারা দোযখের শাস্তি ভোগ করবে, অথচ বাস্তব অবস্থা

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১২

এই, যেহেতু তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তাই তারা কাফের আর কাফেরদেরকে চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করবেন না, শেরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করবেন"।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে মানেনা সে আল্লাহ পাককেও মানেনা, যে তাঁকে মানে সে আল্লাহকেও মানে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত হয় সে আল্লাহ পাকেরও অনুগত হয়"।

অতএব, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার কারণেই আল্লাহর নাফরমান হয়েছে আর অপরাধীদেরকে চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আর যারা ঈমান আনবে এবং সে ঈমান অনুযায়ী সৎ কাজ করবে, তারা হবে বেহেশতবাসী আর তারা চিরকাল বেহেশতে বাস করবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾
ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَإِنْ
يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٦﴾

তরজমা

(৮৩) এবং যখন বনী ইসরাঈল থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও বন্দেগী করোনা এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীনদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, এবং মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলবে, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, কিন্তু তবুও তোমাদের মধ্যে

অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে সে অঙ্গীকার থেকে বিমুখ হলে, আর অঙ্গীকার করে ফিরে যাওয়া তোমাদের চিরন্তন নীতি।

(৮৪) এবং যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, তোমরা একে অন্যের রক্তপাত করবে না, এবং আপনজনদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না, অতঃপর তোমরা স্বীকার করেছিলে ও তোমরাই তার সাক্ষী ছিলে।

(৮৫) পুনরায় তোমরা একে অন্যকে হত্যা কর এবং আপনজনদের মধ্যেই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার কর, তাদের প্রতি পাপ এবং অন্যায়ের কারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। যদি তোমাদের নিকট তারা বন্দী হয়ে আসে তবে তোমরা মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করে থাক, অথচ তাদেরকে বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। তবে কি তোমরা এই পবিত্র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? অতএব, যারা তোমাদের মধ্যে এমন কাজ করে তাদের জন্যে পার্থিব জীবনে অপমান এবং কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক অসতর্ক নন।

(৮৬) তারাই সে সব লোক, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করেছে, অতএব তাদের শাস্তি লঘু হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর উল্লেখ করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা সে সময়কে স্মরণ কর যখন আমি এ মর্মে বনী ইসরাঈল জাতির অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারও এবাদত করোনা। আর এ আদেশ শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের প্রতিই হয়নি, বরং হয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি। যেমন পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এ ঘোষণাঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার পূর্বে যত রসূল এসেছে, সকলের প্রতিই একথা ঘোষণা করার নির্দেশ রয়েছে যে, আমি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, সকলে যেন শুধু আমারই এবাদত করে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪১

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতে রসূল প্রেরণ করেছি এ ঘোষণা নিয়ে যে, এক আল্লাহর এবাদত কর, আল্লাহ পাক ব্যতীত সকল বাতিল উপাস্যদের থেকে দূরে থাক।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, তাঁর দয়া-মায়ার মহাসমুদ্রে আমরা নিমজ্জমান। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এমনি ঘোষণা। এরশাদ হয়েছেঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

(সূরা দাহর)

অর্থাৎ মানুষের এমন সময় কি ছিল না? যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

অর্থাৎ কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, পুনরায় তোমাদেরকে তিনি জীবিত করবেন। পরে তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।

ما نبوديم وتقاضائے ما نبود + لطف تو نا گفته ما می شنود

অর্থাৎ আমরা ছিলাম না, আমাদের এ পৃথিবীতে আগমনের আকাঙক্ষাও ছিলনা, হে আল্লাহ! তোমার অনন্ত অসীম দয়া আমাদের না বলা কথাও শ্রবণ করে।

মূলতঃ এজন্যে মানুষের উপর সর্বাধিক হক্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের। এ হক্ব বা অধিকারের কারণেই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা। আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো সম্মুখে মাথা নত না করা।

আলোচ্য আয়াতে এ কর্তব্য পালনের আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কারও বন্দেগী করোনা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় যে সব বনী ইসরাঈল বর্তমান ছিল তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের

পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারও বন্দেগী করোনা।

এ আয়াতে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি হক্ব আদায়ের তাগিদের পর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের তা'লিম দেয়া হয়েছে। সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক অধিকার হলো পিতা-মাতার। এজন্যেই আল্লাহ পাকের বন্দেগীর পরই পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থাৎ "এবং পিতা-মাতার প্রতি এহসান কর, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর"।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

رضا الرب فى رضا الوالدين

"আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের কি হক্ব রয়েছে? তারা বললেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই তা জানেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের হক্ব হলো তারা যেন শুধু আল্লাহর বন্দেগী করে, তাঁর সাথে শেরক না করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ যদি আল্লাহর বন্দারা আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করে তবে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের কি হক্ব রয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই তা ভালো জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর বন্দাদেরকে মাগফেরাত দান করা এবং তাদেরকে আযাব না দেয়া।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ করেছেনঃ পিতা-মাতার পদতলে সন্তানের জান্নাত।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, সন্তান-সন্ততির উপর পিতা-মাতার কি প্রকার অধিকার রয়েছে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পিতা-মাতা তোমার জান্নাত ও দোযখ। (এবনে মাজা) অর্থাৎ পিতা-মাতাকে সদয় ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। পক্ষান্তরে, পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করলে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এমন উত্তম কাজ কোন্‌টি? প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। উক্ত সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরপর কোন্ আমল? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করা। সাহাবী পুনরায় আরজ করলেনঃ এরপর কোন্ আমল? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করা। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জেহাদে গমনের অনুমতি চাইলে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সাহাবী আরজ করলেন, জ্বী হ্যাঁ, জীবিত আছেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তাঁদের খেদমতের মধ্যেই জেহাদের সওয়াব নিহিত রয়েছে। এমনি আরও বহু হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার তাগিদ করেছেন। এরপর এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার তাগিদ রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এ আশা করে যে, তার মৃত্যু মন্দ অবস্থায় না হয়, হায়াত বৃদ্ধি পায় এবং রিয্কের পথ প্রশস্ত হয়, তবে আল্লাহর প্রতি ভয় রাখা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

অর্থাৎ এবং মানুষের সাথে ভালভাবে তথা ভদ্রভাবে কথা বল।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং সাঈদ এবনে মোসায়্যেব (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো, ইহুদীদের প্রতি এ নির্দেশ হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবা এবং গুণাবলী সম্পর্কে তোমরা সত্য বিবরণ দাও।[১]

আর সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো মানুষকে ভাল কথা বলতে থাক, মন্দ কথা থেকে বিরত রাখ, পরস্পর বিনম্র ব্যবহার কর, বিনম্র ভাষায় কথা বল।[২]

অথবা এর অর্থ হলো এমন কথা বল যা-দ্বারা সওয়াব হয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, (১) মানুষকে অবশ্যই ভাল কথা বলতে হবে। (২) আর ভাল কথাও ভালভাবে বলতে হবে। (৩) ভাল কথা ভাল উদ্দেশ্যে বলতে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮৯
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১২

হবে। (৪) ভাল কথা বিনম্র ভাষায় বলতে হবে। কেননা, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে যখন ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

অর্থাৎ তোমরা উভয়েই ফেরাউনের সাথে বিনম্রভাবে কথা বলবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুফতী শফী সাহেব (রঃ) তাঁর রচিত তফসীরে একটি অতি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বর্তমানে যারা অন্যের সাথে কথা বলে তারাও ফেরাউনের চেয়ে অধিকতর মন্দ নয়, অতএব সবার সঙ্গে হাসিমুখে বিনম্রভাবে কথা বলা সকলেরই কর্তব্য।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর তথা যথা নিয়মে, সঠিকভাবে নামাজ আদায় কর এবং যাকাত আদায় কর, এরপর তোমাদের সামান্য কয়েকজন ব্যতীত তোমরা সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিলে, আল্লাহর আবাধ্য হলে, তোমাদের এ অবাধ্যতা মজ্জাগত।

اِلَّا قَلِيْلًا

সামান্য কয়েকজন ব্যতীত, অর্থাৎ যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য ইহুদীরা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত তাদের পূর্ব পুরুষদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কতকগুলো বিষয় পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহে যেমন ছিল তেমনি বর্তমান শরীয়তেও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন, এতীম-মিসকীনের হক্ব আদায় করা, দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করা, সকল মানুষের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলা, নামাজ কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা প্রভৃতি।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ

আর (সে সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করবে না, নিজেদের লোকদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। এরপর তোমরা অঙ্গীকার করলে আর অঙ্গীকারও এরূপ সুদৃঢ় যেন তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ। এরপর তোমরা নিজেদের মধ্যে খুন-খারাবী কর, একদল আরেক দলকে দেশ থেকে বহিস্কার কর, ঐ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে পাপ ও অত্যাচারমূলক কার্যে সহযোগিতা কর, পুনরায় তারাই যদি কারও

বন্দীরূপে তোমাদের নিকট হাযির হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে রেহাই দাও। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম, তবে কি তোমরা কিতাবের কোন অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর কোন অংশকে অবিশ্বাস এবং অমান্য কর?

তৌরাতে এ পর্যায়ে বনী ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়ঃ (১) পরস্পর রক্তারক্তি না করা, (২) কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য না করা, (৩) আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ যদি কারও হাতে বন্দী হয় তবে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু চির অভিশপ্ত বনী ইসরাঈল জাতি প্রথম দু'টি নির্দেশ অমান্য করে এবং তৃতীয় নির্দেশটি পালন করে। আর শুধু পালনই করেনা; বরং এর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। তদানীন্তন মদীনা শরীফে দুটি মুশরেক গোত্র ছিল, একটি আওস, অপরটি খাজরাজ। এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল। এমনিভাবে মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বসবাসকারী দু'টি ইহুদী সম্প্রদায় বনু কোরায়জা এবং বনু নজীরের মধ্যেও কলহ দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ ছিল চির-বর্তমান। আওস নামক যে মুশরেক গোত্রটি ছিল, তারা ইহুদী কোরায়জা সম্প্রদায়ের মিত্র ছিল, এমনিভাবে খাজরাজ নামক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মিত্র ছিল বনু নজীর নামক ইহুদী গোত্র। আওস এবং খাজরাজের মধ্যে যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন আওস বনু কোরায়জার সাহায্যে এগিয়ে আসত আর খাজরাজ সম্প্রদায় এবং বনু নজীর একে অন্যের সাহায্য-সহায়তায় তৎপর হতো। যুদ্ধে জয়লাভের পর প্রতিপক্ষের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে তাদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দেয়া হতো। এতে আওস ও খাজরাজের যেমন ক্ষতি হতো, লোকজন নিহত হতো, ঘরবাড়ী বিনষ্ট করা হতো, তেমনি তাদের মিত্র বনু কোরায়জা এবং বনু-নজীরেরও ক্ষতি হতো। বনু-নজীর ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মিত্রদের সাহায্য-কল্পে বনু কোরায়জা নামক অপর ইহুদী গোত্রের হত্যা ও বহিস্কারে সমভাবে অংশ গ্রহণ করতো। এমনিভাবে বনু কোরায়জাও তাদের মিত্রপক্ষের সাহায্যের খাতিরে ইহুদী সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও বনু নজীরের হত্যা ও ভিটা-মাটি থেকে উৎখাত করার ব্যাপারে আদৌ দ্বিধা বোধ করতো না।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, ইহুদীদের উভয় গোত্রের কেউ যদি আওস অথবা খাজরাজ নামক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের হাতে বন্দী হয়ে আসতো, তখন তারা সকলে মিলে মিশে অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিপণ আদায় করে তাদের মুক্ত করতো। একদিকে নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করতে বা তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার-উৎপীড়নে এবং তাদের ভিটা-মাটি থেকে উৎখাত করতে বিন্দু-মাত্রও দ্বিধা বোধ করতো না, অন্যদিকে তাদের কেউ অন্যেরর হাতে বন্দী হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হতো এবং মুক্তিপণ আদায় করে

তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতো। পবিত্র কোরআন এ বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করেছেঃ

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের লোকদেরকে হত্যা কর এবং নিজেদের একদলকে তাদের আবাসস্থল থেকে বহিস্কার কর অন্যায়ের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতার কারণে, অথচ এ কাজটি ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আলোচ্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অমান্য করার পর তৃতীয় নির্দেশটি অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করে তোমরা তার উপর আমল করতে সচেষ্ট হও (অর্থাৎ নিজেদের কেউ বন্দী হয়ে আসলে তাকে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্ত কর)।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের প্রতি বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? মূলতঃ ঈমান কোন অবস্থাতেই বিভাজ্য হয়না। একটি নির্দেশ মানবো, আরেকটি মানবো না– এ কাজকে আদৌ ঈমান বলা যাবেনা। ইসলামের যে নির্দেশ কোন প্রকার স্বার্থ-বিরোধী হবে না, তাকে মানা আর যা আপাতঃদৃষ্টিতে স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে হবে তাকে অমান্য করা সম্পূর্ণ ঈমান বিরোধী কাজ। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

"হে মোমেনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো"।

কেননা আংশিক বা সাময়িক ঈমান আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এভাবেঃ

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ যারা এমন অন্যায় কাজ করবে তাদের জন্যে এ ক্ষণস্থায়ী জগতে অপমান এবং কেয়ামতের দিনে কঠিনতর শাস্তি অবধারিত।

এ আয়াতে দুনিয়াতে তাদের অপমানের যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্বর্ণযুগেই, যদিও তারা জ্ঞানে-গুণে, অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধশালী ছিল কিন্তু তাদের অন্যায় আচরণ, আল্লাহর অবাধ্যতা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

এদের এ শাস্তির কারণ স্বরূপ আরও এরশাদ হয়েছে যে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে ইহকালীন ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্রয় করেছে, অর্থাৎ এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভ-লোকসান, মায়া মোহে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে এমন অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে যদ্বারা তাদের আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ

'এরাই সেসব লোক, যারা পরকালের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্রয় করেছে। অতএব, তাদের শাস্তি আদৌ লঘু হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবেনা'।

وَ
لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۖ
وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ
اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ
فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ
بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا
جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮৭) এবং অবশ্যই আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব প্রদান করেছি এবং পর পর আমরা রসূলগণকে প্রেরণ করেছি এবং প্রদান করেছি মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে প্রকাশ্য দলিল সমূহ এবং জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি, কিন্তু পরে যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু নিয়ে এসেছে, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, অনন্তর তোমরা এক দলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং অন্য দলকে হত্যা করেছ।

(৮৮) এবং ইহুদীরা বলে, আমাদের অন্তর সমূহ আচ্ছাদিত এবং তাদের অবিশ্বাসের কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে লা'নত করেছেন, ফলে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাসী।

(৮৯) এবং যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের নিকট কিতাব আসে যা তাদের নিকট বর্তমান কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করে এবং পূর্ব থেকে তারা যার দোহাই দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতো, এরপর যখন সেই পরিচিত কিতাব তাদের নিকট আসল, তারা অবিশ্বাস করে বসল, অতএব, সেই কাফেরদের উপর আল্লাহ পাকের অভিশাপ।

তফসীরুল কোরআন

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ

এ আয়াতেও বনী ইসরাঈল জাতির ঔদ্ধ্যত্ব, অহংকার এবং নাফরমানীর বিবরণ রয়েছে। মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক দু'টি শক্তি রেখে দিয়েছেন, একটি শক্তি জ্ঞান ভিত্তিক, অপরটি কর্ম ভিত্তিক। এ দু'টি শক্তির সঠিক ব্যবহার হলে মানুষের এ জীবন ও পরজীবন সাফল্যমন্ডিত হয়। পক্ষান্তরে এ দুটি শক্তির প্রয়োগ না হলে মানুষ হয় বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত। জ্ঞান ভিত্তিক শক্তির সঠিক ব্যবহারের পথ হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া এক কথায় সঠিক আকীদা ও বিশ্বাসের অধিকারী হওয়া।

আর কর্ম ভিত্তিক শক্তির সদ্ব্যবহার হলো যাবতীয় সৎ কাজে অংশ গ্রহণ করা এবং সকল মন্দ ও ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত থাকা।

কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতির উভয় শক্তিই অকেজো হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ একদিকে তাদের আকীদা ও বিশ্বাস সঠিক ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ তারা যাবতীয় মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল, ফলে ইতিপূর্বে যে নবী রসূলগণ তাদের নিকট আগমন করেছেন তাঁদের হেদায়েত তারা কবুল করেনি, এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ গ্রহণে তারা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে বহু আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ (হে বনী ইসরাঈল!) আমি তোমাদের হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, হযরত মূসা (আঃ)-কে কিতাব প্রদান করেছি, এরপর পর্যায়ক্রমে একের পর এক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ তৌরাত একই সঙ্গে নাযিল হয়। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন তৌরাতকে বহন

করতে কিন্তু তিনি তাতে অক্ষম হলেন, এরপর আল্লাহ পাক প্রত্যেক অক্ষরের জন্যে একজন করে ফেরেশতা প্রেরণ করলেন, কিন্তু তারাও তৌরাতের অক্ষর সমূহ বহন করতে সক্ষম হলেন না, তখন আল্লাহ পাক দয়া করে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে তৌরাতকে হালকা করলে, তিনি তা বহন করতে সক্ষম হন।

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

"এবং ঈসা (আঃ)-কে দান করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণ"।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয় বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি প্রকোষ্ঠে। ঈসা এবনে মরয়ম অর্থাৎ মরয়মের পুত্র ঈসা বলে তাঁর সম্পর্কে যে সব আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা তিনি মানুষ, আল্লাহর বন্দা, আল্লাহর নবী, তিনি মরয়ম নামক মহিলার পুত্র, অতএব, তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলা (নাউজুবিল্লাহে মিন যালিক) ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।[১]

الْبَيِّنٰتِ

(সুস্পষ্ট দলিল সমূহ)

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোজেযা সমূহ, যেমন তিনি জন্মান্ধকে ফুঁক দিলে সে চক্ষুস্মান হতো, শ্বেত-রুগী আরোগ্য লাভ করতো এমনকি, আল্লাহ পাক তাঁকে অলৌকিক শক্তি দিয়েছিলেন, মৃতকে "কুম বিইজনিল্লাহ" বললে সে জীবিত হতো, এসব মোজেযা তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতার দলিল হিসেবে আল্লাহ পাক দান করেছিলেন।

কোন কোন তফসীরকারের মতে, "বায়্যেনাত" শব্দ দ্বারা ইঞ্জিল কিতাব বোঝানো হয়েছে।

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

"এবং আমি জিব্রাঈল (আঃ) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি"।

এ সাহায্য কয়েক প্রকারঃ

১. হযরত জিব্রাইলের (আঃ) ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের হুকুমে মরয়ম (আঃ) ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ করেছেন।

২. জন্ম গ্রহণের সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর সাহায্যে শয়তানের স্পর্শ থেকে ঈসা (আঃ)-এর হেফাজত করা হয়।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪৪

হরত আবু হোরায়য়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আদম সন্তান মাত্রকে তার জন্ম-লগ্নে শয়তান স্পর্শ করে, কিন্তু মরয়ম এবং তাঁর পুত্র শয়তানের স্পর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকে। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর জন্ম হয়েছে আল্লাহ পাকের খাছ কুদরতে এবং হেকমতে, সাধারণ নিয়মে নয়, বরং অসাধারণ ভাবে। কেননা, তিনি কারো ঔরষজাত সন্তান নন।

৩. বণী ইসরাঈলের বহু লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুশমন ছিল। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশে হেফাজতের জন্যে তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

রুহুল কুদুস

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), এবনে মাসউদ (রাঃ), মোহাম্মদ এবনে কা'ব, ইসমাঈল এবনে খালেদ এবং কাতাদা (রঃ)-এর মতে রুহুল কুদুস অর্থ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। পবিত্র কোরআনেই রয়েছেঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

অর্থাৎ "পবিত্র কোরআন নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করেন"।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত হাস্‌সানের (রঃ) জন্যে (যিনি কবি ছিলেন) মসজিদে মিম্বরের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কাফেরদের সমালোচনার প্রতি-উত্তর দিতেন কাব্যের মাধ্যেমে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করতেন এভাবে, "হে আল্লাহ্! হাসসানের সাহায্য কর "রুহুল কুদুস" দ্বারা কেননা, সে তোমার নবীর তরফ থেকে জবাব দিয়ে থাকে"।

এতদ্ব্যতীত, হযরত হাস্‌সানের (রাঃ) কবিতায়ও হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে রুহুল কুদুস বলা হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন, এখানে "রুহুল কুদুস" অর্থ জিব্রাঈল (আঃ)। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যমানা পর্যন্ত বনী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে চার হাজার নবী প্রেরিত হন।

অন্য একটি মত হলো, ৭০ হাজার নবী এ সময় আগমন করেন। অবশ্য সকলেই হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন

হযরত ইউশা (আঃ), হযরত শিমভীল (আঃ), হযরত শামউন (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত হিজকীল (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহয়া (আঃ) এবং আরও অনেকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধ্যত্ব ও নাফরমানীর অবসান হলোনা; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো, আল্লাহ পাকের নবীগণের ক্রমান্বয়ে আগমন, তাঁদের হেদায়েত বা পথ প্রদর্শন, তাঁদের আলৌকিক ঘটনাবলীর উপস্থাপনা কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তাদের নিকট প্রেরিত গ্রন্থ সমূহ তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিলকে তারা বিকৃত করলো। অমান্য করলো আসমানী কিতাবের বিধি-নিষেধ।

মুলতঃ যখনই কোন রসূল তাদের নিকট এসেছেন এবং তাদের মন-মেজাজ বিরোধী কোন কথা বলেছেন তখনই তারা নবী রসূলগণের সাথে দুশমনি করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধ্যত্ব এবং অহংকার প্রদর্শন করেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

অর্থাৎ যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু নিয়ে এসেছেন তখনই তোমরা চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক অহংকার করেছ, তাদেরকে মিথ্যা-জ্ঞান করেছ। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে তোমরা শত্রতা করেছ, এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল নবীয়ে করীম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথেও তোমরা অমানবিক আচরণ করেছ, আর কোন কোন নবীকে তোমরা হত্যা পর্যন্ত করেছ, যেমন হযরত ইয়াহয়া (আঃ) এবং হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে তারা হত্যা করেছে। এমনকি বনী ইসরাঈলের এ দুর্বৃত্তরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাদু করা হয়, তখন তাঁর অবস্থা এমন হতো কোন কাজ তাঁর ধারণা মোতাবেক তিনি করে ফেলেছেন, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, কাজটি তিনি করেননি। কয়েকদিন এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। এরপর তিনি এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মুনাজাত করলেন। এরপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আয়েশা! তুমি কি জান? যে বিষয় অবগত হওয়ার জন্যে আমি দরবারে এলাহীতে মুনাজাত করেছিলাম সে বিষয় অবগত হয়েছি, দু' ব্যক্তি আমার নিকট এসে একজন আমার শিয়রে, আর একজন আমার পায়ের কাছে বসেছিল, একজন জিজ্ঞাসা করলো তাঁর কি রোগ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি

জিজ্ঞাসা করলো কে যাদু করেছে? সে বললো, লবিদ এবনে আসেম ইহুদী। এরপর প্রশ্ন করলেনঃ কিন্তু কি বস্তু দ্বারা যাদু করা হয়েছে? তখন জবাব দিলেন একটি চিরুণী, কিছু চুল এবং গেলাফের মাধ্যমে। পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ এ জিনিসগুলো এখন কোথায় আছে? উত্তর দিলেন জারওয়ান নামক কূপে আছে।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে সে কূপের নিকট গমন করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ এটিই সে কূপ যার অবস্থান, আকৃতি এবং পানি আমাকে দেখানো হয়েছে।

খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার ঘটনা ঘটেছিল সপ্তম হিজরীতে খায়বরের যুদ্ধের সময়। হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, খায়বরের একজন ইহুদী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশ্‌ত হাদিয়া পেশ করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ আহার করতে লাগলেন। এমন সময় তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা আহার করা থেকে বিরত থাক এবং স্ত্রীলোকটিকে হাযির কর। সঙ্গে সঙ্গে হাযির করা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ গোশ্‌তে বিষ কেন মিশ্রিত করেছ? সে বললো, আপনাকে খবর কে দিল? তিনি তাঁর হাতে রাখা গোশ্‌তের টুকরাটির প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ এ গোশ্‌তের টুকরাটিই আমাকে খবর দিয়েছে, তখন সে অপরাধ স্বীকার করে বললো, আমি এজন্যে বিষ মিশ্রিত গোশ্‌ত আপনাকে দিয়েছি, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। আর যদি আপনি সত্য নবী না হন, তবে আমরা আপনার নিকট থেকে নাজাত পাব।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন মহান, তিনি ছিলেন দয়া মায়ার সাগর। ক্ষমা ও ঔদার্য্য ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাই তিনি এ প্রাণের শত্রুকে মাফ করে দিলেন।

وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

কোন কোন তফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, একথাটি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হয়েছে কেননা, অভিশপ্ত ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র করেছে।[১]

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

যেহেতু কোরআনে করীম ইহুদীদের সকল ভিত্তিহীন কথা-বার্তার সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে দিয়েছে, ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ না করার কোন কারণ দর্শাতে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৫

অক্ষম হয়, তখন তারা একথা বলে, "আমাদের অন্তর সুরক্ষিত বা আমাদের অন্তর গেলাফে ঢাকা"। অতএব, আমাদের অন্তরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার কোন অবকাশ নেই। আমরা আপনার কথায় মুগ্ধ হতে পারবো না, অন্তরে কারো কথা প্রবেশ করবে না, আমাদের মনে কোন কথা দাগ কাটবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন, ইহুদীরা বলেছে আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার জ্ঞান বা কথার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এর একটি অর্থ হলো, আমারে অন্তর পর্দায় আবৃত। অতএব, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার দাওয়াতের কোন আবেদন আমাদের নিকট হবে না, আমরা ইসলামের দাওয়াত কবুল করবো না।

এ বাক্যটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমাদের অন্তর জ্ঞান ভান্ডার, হেকমত এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। অতএব, শরীয়তে মোহাম্মদীর কোন প্রয়োজনই আমাদের নেই।

ইহদীদের কথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ

অর্থাৎ ইহুদীদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, তাদের অন্তর সুরক্ষিত বা আবৃত, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহুদীদের নাফরমানী, অবাধ্যতা এবং অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন, অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে চির বঞ্চিত করে দিয়েছেন, ফলে তারা হেদায়েতের পথ থেকে বঞ্চিত, সত্য গ্রহণে অক্ষম, সত্যের পয়গাম তাদের মর্মে পৌছেনা, যা চিরন্তন সত্য, যা নাজাতের একমাত্র পথ, যা চির শান্তি চির মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়, তথা ইসলামের নেয়ামত থেকে তারা মাহরুম।

فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ

"অতএব, তাদের সামান্য সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে"।

ইমাম কাতাদা, আবু মুসলিম এ ব্যাখ্যা পছন্দ করেছেন।

তফসীরে এবনে জরীরেও এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনবে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৬

ইমাম রাজী (রঃ) এর দ্বিতীয় অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা খুব কম বিষয়ের উপরেই ঈমান আনবে, যেমন তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস করে কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, ফলে তারা মোমেন হতে পারেনা।

ঈমান রাজী (রঃ) এ বাক্যটির তৃতীয় অর্থ লিখেছেন, তারা আদৌ ঈমান আনবেনা, এখানে কম-বেশীর কোন প্রশ্ন ওঠেনা। এটা শুধু বর্ণনাভঙ্গী, যেমন আমাদের ভাষায়ও রয়েছে, "আমি এমন খুব কমই দেখেছি," এর অর্থ হলো আমি এমনটি আদৌ দেখিনি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)-ও বাক্যটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।[১]

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

ইহুদীদের ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন না করার তথা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে একটি শব্দেঃ بِكُفْرِهِمْ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যখন তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কিতাব আসল তথা পবিত্র কোরআন নাযিল হলো, আর এই কিতাব তৌরাতের সত্যতা বর্ণনাকারী যা তাদের নিকট রয়েছে, আর অবস্থা এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তারা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাঁর উসিলায় বিজয় কামনা করতো। কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তারাও তাঁর সঠিক পরিচয় পেল তখন তারা অস্বীকার করে বসলো।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মদীনা শরীফের অধিবাসী ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জা ও বনু নজীর সম্পর্কে। তারা আওস ও খাজরাজ কবিলার সঙ্গে যুদ্ধরত হলে বলতো, অদূর ভবিষ্যতে সর্বশেষ নবীর আগমন হবে। তিনি আমাদের সত্যতা ঘোষণা করবেন। এরপর আমরা তাঁর সাথী হয়ে তোমাদেরকে এভাবে ধ্বংস করবো, যেভাবে আদ ও সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছে। এই সঙ্গে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতো, যা তৌরাতে রয়েছে। তারা এই বলে দোয়া করতোঃ হে আল্লাহ! শেষ যমানায় প্রেরিত নবীর দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করো।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে আরও একটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যে, এ আয়াতখানি ইহুদী ধর্মযাজকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

"অতএব, আল্লাহর লা'নত এ কাফেরদের প্রতি"।

ইহুদীরা ইতিপূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিল অথচ পরে এত বিরোধিতা কেন করলো?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, দু'টি কারণে তারা এ অন্যায় কাজ করেছে (১) এ জেদের বশবর্তী হয়ে যে, সর্বশেষ নবী ইহুদীদের মধ্য থেকে কেন হলোনা? (২) অর্থ সম্পদের লোভ এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا
نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۭ وَهُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ
اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ
مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

তরজমা

(৯০) তারা স্বীয় জীবনের বিনিময়ে বা ক্রয় করেছে তা অত্যন্ত জঘন্য, আর তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁর অনুগ্রহ অবতীর্ণ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২

করেছেন, অতঃপর তারা ক্রোধের পর ক্রোধ সঞ্চয় করেছে এবং কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(৯১) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর সেই কিতাবের উপর যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং এতদ্ব্যতীত যা রয়েছে তারা তাকে অবিশ্বাস করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে এই কিতাব তারও সত্যতা প্রমাণকারী (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে, তবে কেন পূর্বে আল্লাহর নবীগণকে হত্যা করেছিলে?

(৯২) নিশ্চয় (হযরত) মূসা (আঃ) সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সমূহ সহ তোমাদের নিকট এসেছিলেন, এরপরও তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করেছিলে, অনন্তর তোমরা ছিলে অত্যাচারী।

তফসীরুল কোরআন

ইহুদীরা তাদের চিরাচরিত অহংকার, ঔদ্ধ্যত্ব, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্থলে অবিশ্বাস করেছে, পবিত্র কোরআনকে করেছে অমান্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ হিংসা ও শত্রুতার কারণে তারা আল্লাহ পাকের যে গজবের উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে, তা অত্যন্ত মন্দ। এজন্যেই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, "অত্যন্ত মন্দ সেই বস্তু যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে"। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এ নাফরমানীর শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর এবং পরিণাম হবে অত্যন্ত মন্দ এবং ভয়াবহ। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাঁকে নবী মনোনীত করেন, নাযিল করেন তাঁর মহান বাণী, এটি নিতান্ত তাঁর মর্জির ব্যাপার।

কিন্তু অভিশপ্ত ইহুদী জাতি এ সত্যকে মেনে নিতে পারলো না, তাই তারা শত্রুতা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। ফলে তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের "আল এশতের" শব্দটি ক্রয়-বিক্রয় দু' অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে এখানে বিক্রয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তফসীরে মায়ালেমুত্ তানজীলে রয়েছে, "আল এশতেরা" শব্দটি এখানে বিক্রয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে বয়যাভী শরীফে রয়েছে, এর অর্থ হলো বিক্রয় করেছে।

অতএব, একথার তাৎপর্য হলো ইহুদীরা যে পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পেতে চায়, তা অত্যন্ত মন্দ কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবিশ্বাসের পরিণতি হলো অত্যন্ত ভয়াবহ, তাদের এ অবিশ্বাসের

কারণ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের হিংসা। আর হিংসার কারণ সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তফসীরে কবীরে বলেছেনঃ

ইহুদীরা মনে করতো, তারা ওয়ারিশ সূত্রে নবুওয়্যতের উত্তরাধিকারী, যখন তারা দেখল বনী ইসরাঈলের স্থলে বনী ইসমাঈলকে নবুওয়্যতের জন্যে পছন্দ করা হয়েছে তখন তারা বিদ্রোহ করতে লাগল। ফলে কোপগ্রস্ত হলো, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ

অর্থাৎ তারা (তাদের এ সমস্ত অন্যায়ের কারণে) উপর্যুপরি গজবের পর গজবে নিপতিত হলো।[১]

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু তারা ইতিপূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলকেও তারা অমান্য করেছে, তদুপরি হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ তৌরাতের উপর আমল করেনি এবং গো-বৎসের পূজা করেছে এবং শনিবার দিনের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ অমান্য করেছে, এজন্যে আল্লাহ পাকের গজবে নিপতিত হয়েছে। অধিকন্তু তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ তারা গজবের পর গজবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[২]

এ আয়াতে তফসীরে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে দু'বার ইহুদীদের সম্পর্কে "গজব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমবার এজন্যে যে তারা গো-বৎসের পূজা করেছিল। দ্বিতীয় বার এজন্যে যে, তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছে।

আর ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমবার "গজব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু তারা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলকে অস্বীকার করেছে আর দ্বিতীয়বার এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেহেতু তারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪০৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৩

আর কেউ কেউ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইহুদীরা যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছে, তাই পর পর দু'বার তাদের সম্পর্কে গজবের ঘোষণা করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, যেহেতু তারা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলেছে (নাউজুবিল্লাহে মিন যালেক), এমনি আরও বহু নাফরমানীতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, তাই তাদের সম্পর্কে পর পর দু'বার গজবের ঘোষণা করা হয়েছে।

ইহুদীরা যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছে তার কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে আর তা এই, তারা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করতো, এ হিংসা ছিল তাদের অহংকার-প্রসূত। আর এ অহংকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ "যারা আমার এবাদতের ব্যাপারে অহংকারী হবে তারা দোযখে প্রবেশ করবে অপমানিত হয়ে"।

এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন অহংকারী লোকেরা পিপীলিকার মত হবে, তবে তাদের আকৃতি হবে মানুষের। সকলেই তাদেরকে পদদলিত করবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের 'বুস' নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। দোযখের এ স্থানটির অগ্নি অন্য স্থানের অগ্নি থেকে তীব্রতর হবে এবং দোযখীদের রক্ত ও পূজ তাদেরকে পান করানো হবে।[১]

এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

অর্থাৎ "কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক তথা লাঞ্ছনাময় কঠিন শাস্তি"।

مهين শব্দটি সংযোজনের কারণে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ শাস্তি শুধু কাফেরদের জন্যেই। কেননা, কাফেরদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যাতে থাকবে অপমান এবং লাঞ্ছনা। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণকে যে শাস্তি দেয়া হবে তা আদৌ লাঞ্ছনাময় ও অপমানজনক হবেনা; বরং তার উদ্দেশ্য হবে পাপ থেকে মুক্ত করা।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৩

অর্থাৎ যখন ইহুদীদেরকে বলা হতো তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখনই তারা বলতোঃ আমাদের নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে. তার প্রতিই আমরা বিশ্বাস করি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কিতাবের প্রতি আমরা বিশ্বাস করিনা।

ইহুদীরা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো যে, নবুওয়্যত তাদের বংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[১] কিন্তু বনী ইসমাঈলে যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন হয়েছে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, তখন তারা হিংসানলে দগ্ধ হলো, তাদের সে হিংসা এবং জেদের কারণেই তারা সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার একাধিক জবাব প্রদান করেছেন।

وَهُوَ الْحَقُّ

প্রথমতঃ পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সত্য গ্রন্থ। অতএব, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কোরআন শুধু যে সত্য কিতাব তাই নয়; বরং مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ অর্থাৎ তাদের নিকট যে তৌরাত রয়েছে তারও সত্যতা ঘোষণাকারী হলো পবিত্র কোরআন। যদি ইহুদীরা তৌরাতকে বিশ্বাস করে তবে অবশ্যই পবিত্র কোরআনের প্রতিও তাদের বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু যদি তারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে, তবে তৌরাতের প্রতিও তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ যদি তারা সত্যিই তৌরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে তবে আল্লাহর নবীগণকে তারা কেন নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তারা তো তৌরাতের সত্যতা বর্ণনাকারী ছিলেন। কেন তারা হযরত জাকারিয়া (আঃ) ও হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-এর রক্ত দ্বারা তাদের হস্ত রঞ্জিত করেছিল? তাঁরা তো তৌরাতেরই প্রবক্তা ছিলেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ ইহুদীরা শুধু যে পবিত্র কোরআন মানেনা তাই নয়, বরং তারা তৌরাতও মানে না।

অথচ তৌরাতসহ অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উল্লেখও রয়েছে শুধু তাই নয়; বরং ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিল, যেমন পবিত্র কোরআনেও এ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪৬

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

"আহলে কিতাবরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এভাবে অবগত ছিল, যেভাবে তারা তাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে রয়েছে জ্ঞাত"।

অর্থাৎ তাঁর সত্যতা তাদের নিকট ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত।[১] কিন্তু তাদের ঔদ্ধ্যত্ব, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে।

তৃতীয়তঃ ইহুদীদের নিকট হযরত মূসা (আঃ) অনেক সুস্পষ্ট দলিল তথা মোযেজা নিয়ে এসেছিলেন, মূসা (আঃ)-এর ছড়ি আল্লাহর হুকুমে বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হয়, তাঁর হস্ত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হওয়া, সমুদ্র-বক্ষে চলার পথ প্রস্তুত করা, পানিকে পাথরের মত শক্ত করে দেয়া, আসমানী খাদ্য মান্না সালওয়া নাযিল হওয়া, পাথর থেকে নহর প্রবাহিত হওয়া প্রভৃতি। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর এত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরও যখন হযরত মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে গমন করেছিলেন, তখন তোমরা কেন গো-বৎসের পূজা করেছিলে?

অতএব, একথাই সত্য যেভাবে ইহুদীরা ইঞ্জিল তৌরাতকে অস্বীকার করেছে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে অবিশ্বাস করেছে, এমনকি আল্লাহ পাকের কয়েকজন নবীকে হত্যাও করেছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর অনেক বিস্ময়কর দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরও তারা গো-বৎসের পূজা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, এমনি অবস্থায় যদি তারা পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে, তাতে আদৌ বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪৬

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا ۚ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَ
لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۛ وَ
مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۛ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَ
مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

তরজমা

(৯৩) সে সময়কে স্মরণ কর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ও তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম, আমি যা তোমাদেরকে দিলাম তা যেন তোমরা দৃঢ়ভাবে ধর ও শ্রবণ কর। তারা উত্তরে বললো, আমরা শুনলাম এবং অবাধ্য হলাম। (আর প্রকৃত অবস্থা এই যে) অবিশ্বাসের কারণে তাদের হৃদয় গো-বৎসের প্রেম সুরা পান করেছিল। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, তোমাদের বিশ্বাস তোমাদেরকে অত্যন্ত জঘন্য কাজের হুকুম করছে, যদি তোমরা মোমেন হও।

(৯৪) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি পরকালের সুখ শান্তি অন্য লোক ব্যতীত শুধু তোমাদেরই জন্যে নিদৃষ্ট হয়ে থাকে তবে তোমরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(৯৫) এবং তারা অতীত দুষ্কর্মের ফলে, কখনও এ প্রকার আকাঙ্ক্ষা করবেনা, আল্লাহ তায়ালা এ অত্যাচারীদের খুব ভালভাবে জানেন।

(৯৬) আপনি তাদেকে দেখবেন, তারা জীবনের প্রতি সকলের চেয়ে অধিক এমনকি মুশরেকদের চেয়েও অধিকতর লোভী। তারা প্রত্যেকেই এ আকাঙ্ক্ষা করে যেন হাজার হাজার বছর বয়স পায়, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, এরূপ আয়ু প্রাপ্তি শাস্তি থেকে তাদের আদৌ রক্ষা করতে পারবেনা, আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারার অধিবাসী ইহুদীদেরকে যখন তাঁর প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান তখন তারা বলে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি সেই কিতাবের প্রতি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে", অর্থাৎ তৌরাত।

ইহুদীদের একথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন তারই বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ এবং স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করি এবং তূর নামক পর্বতটি তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরি যে, তৌরাতে বর্ণিত নির্দেশ সমূহকে তোমরা নিষ্ঠা সহকারে পালন কর। তখন তোমরা উপলব্ধি করলে, এ মুহূর্তে অবাধ্য হলে তূর পর্বত তোমাদের উপর পতিত হবে এবং তোমরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, তাই নিতান্ত বাধ্য হয়ে তোমরা বলেছিলে আমরা শুনলাম, কিন্তু পরে যখন তূর পর্বতের বিপদ কেটে গেল তখন তোমরা বললে, আমরা তৌরাতের নির্দেশ মানিনা।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন, ইহুদীরা মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেছে কিন্তু পরে যখন তারা অবাধ্য হয় তখন প্রমাণিত হয় যে, এতে তাদের স্বীকৃতি ছিলনা, তারা মুখে বলে, "শুনলাম" কিন্তু অন্তরে ছিল "মানিনা"।

অতএব, একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা তৌরাতের প্রতিও বিশ্বাসী নয়। এর কারণ এই যে, তাদের অন্তরে গো-বৎস পূজা তথা মূর্তি পূজার আসক্তি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। তাই তারা অবাধ্য, তাদের নাফরমানী অব্যাহত। যদিও হযরত মূসা (আঃ) তাদের গো-বৎস পূজার পর সে গো-বৎসকে আগুনে পুড়িয়ে বাতাসে উড়িয়ে সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু সেই পানি বনী ইসরাঈল পান করেছিল, ফলে তাদের অন্তরে গো-বৎস পূজার আসক্তি সুদৃঢ় হয়েছে। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

"বণী ইসরাঈলের কুফর বা নাফরমানীর কারণে তাদেরকে গো-বৎসর প্রেম পান করিয়ে দেয়া হয়েছে"।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ

"(হে রসূল!) আপনি বলে দিন (তৌরাতের প্রতি) তোমাদের ঈমানের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের ঈমান অত্যন্ত মন্দ বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছে তোমাদেরকে"। কেননা, তৌরাতে গো-বৎস পূজার নির্দেশ নেই।[১]

একথার দৃষ্টান্ত এরকম, যেমন কোন দুষ্ট ছেলে যখন মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে বলা হয়, "তোমার ওস্তাদ কি তোমাকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন"? মূলতঃ তৌরাতের প্রতি তাদের ঈমানের দাবী যে সম্পূর্ণ অসত্য এবং বাতিল তারই ঘোষণা রয়েছে এ বাক্যে। একথাই লিখেছেন বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা আলুসী (রঃ)।

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হও আর একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তারা আদৌ মোমেন নয়।

আ'মালুল কোরআন

কোন ব্যক্তি যদি তার অসাধারণ মেধা-শক্তির কারণে জুলুমের নতুন পন্থা আবিস্কার করে মানুষকে কষ্ট দিতে থাকে তবে-

وَاِذْ اَخَذْنَا.....مُؤْمِنِيْنَ

এ পর্যন্ত আয়াত খানি কোন মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যে লিপিবদ্ধ করে তাকে অতি প্রত্যুষে খাওয়ানো হলে মানুষ তার অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। (দুরারুত তানজীম)

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ - الاية

কোন কোন ইহুদী মিথ্যা দাবী করতো যে, আখেরাতের সমস্ত নেয়ামতের একমাত্র অধিকারী হবে ইহুদীরা, শুধু তারাই ভোগ করবে আখেরাতের নেয়ামত। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

"এবং তারা বলে, একমাত্র ইহুদী বা নাসারারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর কেউ নয়"।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১০

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً

"তারা বলে, দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবেনা, তবে সামান্য কয়েক দিন মাত্র"।

ইহুদীদের এ সমস্ত ভিত্তিহীন অমূলক অন্যায় আবদার অগ্রাহ্য করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের এ দাবী সত্য হয় যে, আখেরাতের সকল নেয়ামত তোমাদের প্রাপ্য, তাহলে তোমরা এ দাবীর প্রমাণ স্বরূপ নিজেদের মৃত্যু কামনা করে দেখাও কেননা, মৃত্যুর পথ ধরেই বেহেশতে প্রবেশ করা যায়। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ

এ ইহুদীরা অবশ্যই কখনও মৃত্যু কামনা করবেনা কেননা, তারা ভালভাবেই জানে, তাদের সারা জীবনের কৃত পাপাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো চির-শাস্তি তথা দোযখবাসী হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাকের এ নির্দেশ মোতাবেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে ইহুদীদের এ আহ্বান জানানো হয়। যদি তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হও তবে এস মোকাবেলা করি, তোমরা এবং আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাকের দরবারে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে তাকে যেন আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইহুদীরা কোন অবস্থাতেই এ মোকাবেলায় আসবে না। অবশেষে তাঁর একথার সত্যতা প্রমাণিত হলো, তারা মোকাবেলায় আসলো না।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি ইহুদীরা এ মোকাবেলায় আসতো, মিথ্যুকের মৃত্যু কামনা করতো তবে এদের সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো এবং দোযখে তাদের নিদৃষ্ট স্থান দেখে নিত।[১]

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি এ ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতো তবে তাদের সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। এ পৃথিবীর বুকে একজন ইহুদীও বেঁচে থাকত না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৭

মাসায়েলুল কোরআন

মৃত্যু কামনা কি বৈধ

এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে যে, মৃত্যু কামনা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নাকি অবৈধ? এ প্রশ্নের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোন আর্থিক অথবা শারীরিক বিপদের কারণে অথবা সন্তান-সন্ততির মৃত্যুর কারণে মৃত্যু কামনা করা বৈধ নয়।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কোন বিপদের কারণেই কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করোনা। যদি একান্ত এর আকাঙ্ক্ষা করতেই হয় এবং এতদ্ব্যতীত কোন গত্যন্তর না থাকে তবে এতটুকু বলবে, হে আল্লাহ! যতদিন আমার জীবন উত্তম হয় ততদিন জীবিত রাখ, আর যখন মৃত্যু উত্তম হয় তখন মৃত্যুমুখে পতিত কর। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

এমনিভাবে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবেনা আর মৃত্যুর পূর্বে তজ্জন্যে দোয়াও করবেনা কেননা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। আর মোমেনের জীবন কল্যাণ বা নেকীই বৃদ্ধি করে। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে।

এমনি আরো বহু হাদীসে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মৌখিক মৃত্যুর কামনা করা হাদীসে নিষিদ্ধ রয়েছে কিন্তু কারো অন্তরে যদি এমন ভাবের উদয় হয় আর তা প্রকাশ করা না হয়, তবে তা একটি সাধ্যাতীত ব্যাপার। কোন ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ফেৎনার কারণে মৃত্যু কামনা করে তবে তা নিষিদ্ধ নয়, হযরত সওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের দোয়ায় একথা বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনি যখন মানুষকে ফেৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করেন তখন আমাকে সে ফেতনা থেকে হেফাজত করে নিজের কাছে ডেকে নিন"।

ইমাম মালেক (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ) নিজের দোয়ায় একথা বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার শক্তি কমে গেছে, আমার বয়স বেড়ে গেছে, এবং আমার ক্ষমতার এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে, হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদে কারও হক্ব নষ্ট না করিয়ে আপনার কাছে ডেকে নিন"।

এ দোয়ার এক মাসের মধ্যেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর এন্তেকাল হয়।

আর তেবরানী আমর এবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। হ্যাঁ, তবে যদি মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকায় আত্মবিশ্বাস না থাকে (যদি মন্দ কাজ হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে) তবে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা বৈধ।

ইমাম তেবরানী বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মৃত্যুর জন্যে যখন হযরত আজরাঈল (আঃ) উপস্থিত হন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, এমন কি হয় যে, বন্ধু বন্ধুর মৃত্যু কামনা করে, মালাকুল মওত আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর একথা পেশ করলে, আল্লাহ পাক আজরাঈলকে (আঃ) বললেন, তুমি ইব্রাহীম (আঃ)-কে বল, বন্ধু কি বন্ধুর কাছে আসতে আপত্তি জানায়? একথা শ্রবণ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন হে আজরাইল! এখনই আমার রুহ কবয কর।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত করো এবং তোমার নেককার বন্দাগণের সঙ্গে একত্রিত করো।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওয়াজ করলেন, তা আমাদের অন্তর সমূহকে বিনম্র করলো, হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এ ওয়াজ শুনে ক্রন্দন করলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বললেন, আফসোস, যদি আমার মৃত্যু হতো! হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "হে সা'দ! আমার কাছে থেকেও মৃত্যু কামনা কর"? আর একথাটি তিনি তিনবার বললেন, এরপর পুনরায় এরশাদ করলেনঃ "হে সা'দ! যদি তোমাকে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং তোমার বয়স সুদীর্ঘ হয় আর তোমার আমল ভাল হয় তবে তা তোমার জন্যে উত্তম"।

অতএব, এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সর্বাবস্থায়ই মৃত্যু কামনা শরীয়ত বিরোধী কাজ কেননা, হযরত সা'দ (রাঃ) আর্থিক বা শারীরিক কোন বিপদের জন্যে মৃত্যু কামনা করেননি; বরং আল্লাহর আযাবের ভয়েই তিনি তা করেছিলেন।[১]

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

"এবং আল্লাহ পাক জালেমদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত"।

এ আয়াতে ইহুদীদের সম্পর্কে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী কেননা, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে গো-বৎসের পূজা করেছে। তৌরাতকে মেনে চলার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৪৭

জন্যে যখন তূর পর্বত তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রাণের মায়ায় তৌরাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মেনে চলার অঙ্গীকার করে। কিন্তু সংকট কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসে। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে তারা অস্বীকৃতি জানায়, মুসলমানদের সাথে সর্বদা শত্রুতা করে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক এ জালেমদেরকে ভাল ভাবেই জানেন, অতএব তাদের জন্যে নিদৃষ্ট শাস্তি থেকে রেহাই পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ

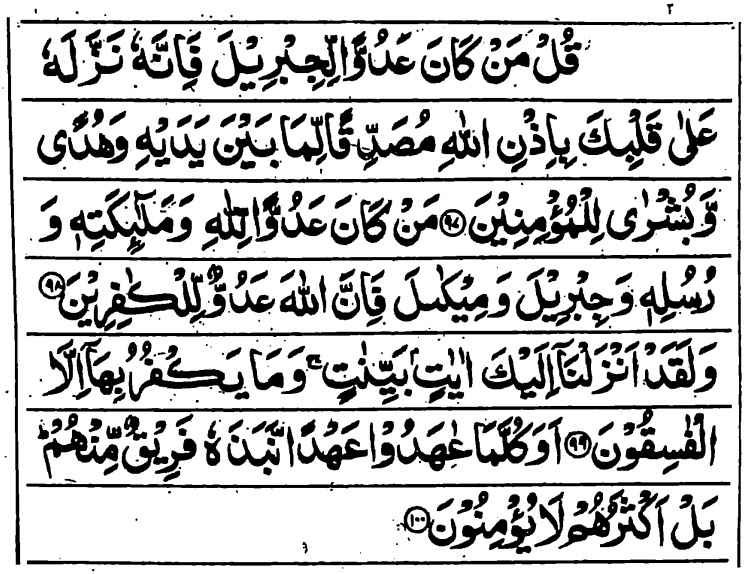
এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) যদিও ইহুদীরা বলে থাকে যে, তারাই চিরশান্তি-নিকেতন বেহেশতের একমাত্র অধিবাসী হবে। কিন্তু এটি শুধু তাদের বাগাড়ম্বর মাত্র, প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারাও জানে যে মৃত্যুর পর চিরশান্তি তাদের জন্যে অবধারিত। এজন্যেই তারা শুধু নিজেদের মৃত্যু কামনা করবেনা তাই নয়, বরং (হে রসূল!) আপনি দেখতে পাবেন, এই ইহুদীরা জীবনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী লোভী। এমনকি যে পৌত্তলিকরা আখেরাতের প্রতি আদৌ বিশ্বাস করেনা তাদের চেয়েও অধিকতর লোভী এই ইহুদীরা, এদের প্রত্যেকের একান্ত কামনা হলো তারা যেন হাজার বছর জীবিত থাকে।

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ

অথচ হাজার বছর বা তার চেয়ে অধিক আয়ু বৃদ্ধি করা হলেও তাদের ভয়াবহ পরিণামের ব্যাপারে আদৌ কোন পরিবর্তন হবে না; বরং তাদের শাস্তি অবধারিত থাকবে।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখছেন। তাদের সকল অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীকে গোপন করা, তাঁর রেসালতের সত্যতাকে অস্বীকার করা, এসব কিছুই আল্লাহ পাক দেখছেন। অতএব, যথা সময়ে তারা স্বীয় কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কঠোর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।


قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ
رُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

তরজমা

(৯৭) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যে ব্যক্তি দুশমন হয় জিব্রাঈলের এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাকের আদেশ ক্রমে সে আপনার অন্তরে পবিত্র কোরআনকে অবতীর্ণ করেছে, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা স্বীকারকারী এবং পথ প্রদর্শক ও মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ দাতা।

(৯৮) যে ব্যক্তি দুশমন হবে আল্লাহ্ পাকের এবং ফেরেশতাগণের এবং রসূলগণের এবং জিব্রাঈল ও মিকাঈলের; অনন্তর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কাফেরদের দুশমন।

(৯৯) এবং নিশ্চয় আমি আপনার নিকট (হে রসূল!) সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি এবং দুর্বৃত্ত লোক ব্যতীত কেউই তা অমান্য করেনা।

(১০০) এবং যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করে তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করেনা।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি ইহুদীদের নিকট গমন করতেন, তৌরাত শ্রবণ করে খুশী হতেন এবং বিস্মিত হতেন কেননা, তৌরাত পবিত্র কোরআনের সত্যতা ঘোষণা করে।

একদিন ইহুদীরা তৌরাত পাঠ করছিল, এমন সময় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিকে তশরীফ নিলেন, তখন হযরত ওমর (রাঃ) ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের নামের শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা সত্য কথা বল, তোমরা কি জান হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। ইহুদীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত বা আলেম ছিল তারা বললো, হ্যাঁ আমরা জানি তিনি আল্লাহর রসূল। হযরত ওমর (রাঃ) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমরা তাঁর অনুসারী হওনা কেন? তারা বললো, এজন্যে যে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার নিকট আল্লাহর তরফ থেকে ওহী কে বহন করে আনে? তখন আমরা জানতে পারলাম জিব্রাঈল (আঃ) হলেন ওহী বাহক। অথচ তিনি আমাদের দুশমন, তিনিই আমাদের জন্যে ধ্বংস এবং আযাব নিয়ে আসতেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ফেরেশতাগণের মধ্যে কার সাথে তোমাদের সম্পর্ক উত্তম? তারা বললো, মিকাঈল (আঃ)-এর সাথে কেননা, তিনি বৃষ্টি এবং রহমত বহন করে আনেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ পাকের দরবারে এ দু'জনের মর্তবা কি? তারা বললো, একজন আল্লাহর ডান দিকে আর একজন বাম দিকে, আমি বললাম, যখন তাঁর নৈকট্যের এই অবস্থা তখন জিব্রাঈল (আঃ) এর জন্যে মিকাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা রাখা আদৌ বৈধ নয়, আর মিকাঈলের (আঃ) জন্যে বৈধ নয় যে, জিব্রাঈলের (আঃ) দুশমনদের সঙ্গে সে সন্ধি করে, আর আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ পাক এবং জিব্রাঈল (আঃ) ও মিকাঈলের (আঃ) সঙ্গে যে সন্ধি রাখে, তিনিও তার সঙ্গে সন্ধি করেন। আর যে তাদের সঙ্গে দুশমনী রাখে এরাও তাঁর দুশমন। এরপর আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হই, আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে এ ঘটনার বিবরণ পেশ করবো। কিন্তু কিছু বর্ণনা করার পূর্বেই তিনি এরশাদ করলেনঃ হে ওমর! আজ যে আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে কি তোমাকে অবগত করবো না? একথা বলেই তিনি তেলাওয়াত করতে লাগলেন এ আয়াতখানিঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ

অর্থাৎ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যে জিব্রাঈলের সঙ্গে দুশমনী রাখে (তা রাখুক), নিশ্চয় জিব্রাঈল আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর বাণী আপনার অন্তঃকরণে পৌঁছে দিয়েছে, অবস্থা এই যে, পবিত্র কোরআন পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ বহনকারী।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত শ্রবণ করে আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি এই মাত্র ইহুদীদের নিকট

থেকে এসেছি, এখনি এ ঘটনা ঘটেছে, আমার ইচ্ছা ছিল যে আপনার সমীপে এ ঘটনার বিবরণ পেশ করি কিন্তু আমি দেখছি আল্লাহ্ পাক তার পূর্বেই আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন।

ইমাম তবরী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ ঘটনা ছাড়া আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

(১) যখন ইহুদীরা জিব্রাঈল (আঃ)-কে তাদের দুশমন এবং হযরত মিকাঈলকে (আঃ) তাদের বন্ধু বলে প্রকাশ করে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

(২) কোন কোন তফসীরকারের মতে, নবুওয়্যত সম্পর্কে ইহুদী ধর্মযাজকদের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে কথা-বার্তা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়ে।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকতেন। এমন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত হলেন এবং তাঁর সমীপে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ আমি আপনার নিকট তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করবো, যার জবাব নবী ব্যতীত আর কেউ জানে না।

(১) কেয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম আলামত কোন্‌টি?

(২) বেহেশতবাসীদের প্রথম খাবার কি হবে?

(৩) সন্তান কখনো পিতার ন্যায় হয়, কখনো মাতার ন্যায়, এর কারণ কি?

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমাকে এই মাত্র জিব্রাঈল (আঃ) এ প্রশ্ন সমূহের জবাব জানিয়ে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ এবনে সালাম জিব্রাঈল (আঃ)-এর নাম শ্রবণ করে বললোঃ ফেরেশতাদের মধ্যে জিব্রাঈল (আঃ) হলো ইহুদীদের দুশমন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১]

ইমাম তিরমিজী এবং ইমাম নেসায়ী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস সংকলন করেছেন যে, ইহুদীদের এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললোঃ হে আবুল কাসেম! আমরা আপনার নিকট পাঁচটি প্রশ্ন করবো, যদি আপনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন তবে আমরা মনে করবো নিঃসন্দেহে আপনি সত্য নবী।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৫১

(১) হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজের জন্যে কি জিনিস হারাম করে নিয়েছিলেন?

(২) পয়গম্বরের আলামত বা নিদর্শন কি?

(৩) রা'আদ এবং তার বজ্রধ্বনির তাৎপর্য কি?

(৪) এমন কেন হয় যে, কোন সময় ছেলে জন্মগ্রহণ করে কোন সময় মেয়ে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়ার পর ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করলোঃ

(৫) আপনার নিকট আসমানী খবর নিয়ে কে আসে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ জিব্রাঈল। জিব্রাঈলের (আঃ) নাম শ্রবণ করা মাত্র তারা বললো, তিনি তো আমাদের নিকট আযাব নিয়ে আসতেন, তিনি তো আমাদের দুশমন, যদি আপনি মিকাঈলের (আঃ) নাম বলতেন, যিনি আসমান থেকে রহমত এবং বৃষ্টি নিয়ে আসেন তবে ভাল হতো।[১]

এ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'ফুদুক' নামক স্থানের অধিবাসী আবদুল্লাহ এবনে সুরিয়া ইহুদী আলেমদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার দলবল নিয়ে হাযির হয়ে কতকগুলো এমন প্রশ্ন করলো, যার জবাব প্রদান নবী রসূল ব্যতীত আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্ন সমূহের জবাব দিলেন তখন সে বললো, আপনি সঠিক জবাব দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, যদি তাই হয় তবে তোমরা আমার প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন কর না? এর জবাবে তারা বললো, ঈমান না আনার কারণ এই যে, আপনার নিকট জিব্রাঈল ফেরেশতা ওহী বহন করে আনে, তিনি আমাদের চিরশত্রু, তাঁর দ্বারা আমাদের পূর্ব পুরুষগণ বহুবার কোপগ্রস্ত হয়েছে।[২]

ইহুদীদের এর্কথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ

(হে রসূল!) জিব্রাঈল তো আল্লাহর হুকুমেই আপনার অন্তরে পবিত্র কোরআন পৌঁছিয়েছে। জিব্রাঈল বা কোন ফেরেশতা নিজের ইচ্ছায় কিছুই করেনা; বরং যা কিছু করে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই করে। অতএব, যে জিব্রাঈলকে শত্রু মনে করবে সে আল্লাহরই শত্রু হবে কেননা, জিব্রাঈল আল্লাহর দূত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৫-৭৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৬
তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪১৪
তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৫

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন যা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তার তিনটি বৈশিষ্ট্য এ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে (১) পবিত্র কোরআন তার পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহের সত্যতা বর্ণনাকারী, পবিত্র কোরআন তওহীদের পয়গাম বহনকারী যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহেরও মূল বক্তব্য ছিল। (২) পবিত্র কোরআন মানব জাতির জন্যে হেদায়েতের মূর্ত প্রতীক। (৩) পবিত্র কোরআন মোমেনদের জন্যে বেহেশতের সুখবর আনয়নকারী।[১]

বোখারী শরীফে এ সম্পর্কে আরেকটি বিবরণ স্থান পেয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায়ে মোনাওয়্যারায় আগমন করেন তখন আবদুল্লাহ এবনে সালাম, যিনি ইহুদীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঠিক জবাব দিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয় করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ইহুদীরা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর শ্রবণ করে তবে তারা আমাকে মন্দ বলবে এবং ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাই আমাকে একটু আড়াল করে রাখুন এবং ইহুদীদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। পরামর্শ মোতাবেক হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) মজলিস থেকে আড়াল হয়ে রইলেন, তাঁর সঙ্গী ইহুদীদের হাযির করা হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবদুল্লাহ এবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা জবাব দিল তিনি বড় আলেম, বুজুর্গ, অত্যন্ত ভাল মানুষ এবং বুজুর্গদের বংশধর, তিনি আমাদের নেতা এবং নেতাদের বংশধর, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ইসলাম কবুল করে তবে তোমাদের মুসলমান হতে কোন আপত্তি থাকবে কি? তারা বললো তিনি কেন মুসলমান হতে যাবেন? ঠিক সে মুহূর্তে হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং উচ্চস্বরে কলেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতে লাগলেন, তখন ইহুদীরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি মন্দ এবং তার পূর্ব পুরুষও মন্দ, অত্যন্ত নীচু জাতের লোক। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি তাদের এ আচরণ সম্পর্কেই ভয় করছিলাম।[২]

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৮

ইহুদীদের ঔদ্ধত্য, হঠকারীতা এবং নাফরমানীর কথা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ

অর্থাৎ যে দুশমন হবে জিব্রাইল এবং মিকাঈলের (তাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে) আল্লাহ পাক এমন কাফেরদের দুশমন আর স্বয়ং আল্লাহ পাক যার দুশমন হয় তার পরিণাম কত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইহুদীরা জেনে শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করছিল।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর ফেরেশতা বা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করা, আল্লাহ পাককে অস্বীকার করার নামান্তর। এমনিভাবে আল্লাহর ফেরেশতাগণকে শত্রু মনে করা, আল্লাহ পাকের সাথেই শত্রুতা করা।

তৃতীয়তঃ খোলাফায়ে রাশেদ্বীন এবং সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করা বা তাদেরকে মন্দ বলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারেজ হওয়ার কারণ হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ এবনে ছুরীয়া নামক ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল যে, আপনার নবুওয়্যতের কোন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করলে আমরা আপনার সত্যতার প্রমাণ পেতাম, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ নাযিল করেছি, যারা আল্লাহর অবাধ্য নাফরমান তারা ব্যতীত আর কেউ এ আয়াত সমূহ অস্বীকার করবে না"।

এতেও একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ইহুদীরা আল্লাহর অবাধ্য, নাফরমান।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মালেক এবনে হানিফ নামক ইহুদীকে বলেছিলেন, দ্বীনে মোহাম্মদী সম্পর্কে তোমাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, যখন এ দ্বীনের প্রকাশ ঘটে তখন তোমরা অবশ্যই এর অনুসরণ করো। কিন্তু মালেক এবনে হানিফ অঙ্গীকারের কথা অস্বীকার করে বললো, আমাদের নিকট থেকে এমন কোন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়নি। আল্লাহ পাক তার মিথ্যাবাদীতার কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩২৩

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا- الاية

অর্থাৎ যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করে তখনই তাদের একদল তা প্রত্যাখ্যান করে, বরং তাদের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাসী নয় অথচ তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে কেননা, তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল কাফের। তারা শুধু পবিত্র কোরআনকেই অবিশ্বাস করেনি; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ তৌরাতের প্রতিও বিশ্বাসী ছিলনা।

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾
وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا
لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۣ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

তরজমা

(১০১) এবং যখনই তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কোন রসূল আগমন করেন, যিনি তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, তখনই কিতাব ধারণকারীদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহ পাকের পবিত্র গ্রন্থকে তাদের পশ্চাৎ দিকে ঠেলে দেয়, যেন তারা কিছুই জানেনা।

(১০২) এবং (হযরত) সোলায়মানের সময় শয়তানরা যা পাঠ করতো, তারা তারই অনুসরণ করলো, অথচ সোলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কাফের হয়েছিল, তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত আর যা বাবিল শহরে হারুত মারুত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা সে বিদ্যাও অর্জন করতো। আর ফেরেশতাদের সেই যাদু বিদ্যা কোন লোককে শিক্ষা দিতনা, যে পর্যন্ত না তারা বলতোঃ আমরা শুধু পরীক্ষার জন্যে, অতএব তুমি কখনও কাফের হয়োনা। কিন্তু তবুও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট এমন যাদু বিদ্যা শিখত, যদ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। মূলতঃ আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তারা এতদ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারেনা, এবং তারা এরূপ বিষয় শিক্ষা করতো যা তাদের জন্যে ছিল অনিষ্টকর এবং যা তাদের জন্যে আদৌ উপকারী ছিলনা। অথচ তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করলে পরকালে তাদের কোন প্রাপ্যই নেই এবং তা অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করে ফেলেছে। হায়! যদি তারা তা বুঝতে পারত।

(১০৩) এবং যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করতো, তবে তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান লাভ করতো, হায়! যদি তারা বুঝতে পারত।

তফসীরুল কোরআন

وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রূপে। ইতিপূর্বে যে সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সেগুলোর সত্যতা বর্ণনা করেছেন তিনি, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি ঈমান আনা ছিল সকলের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু ইহুদীদের বদনসিবী হলো, তারা তৌরাতের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। হতভাগা ইহুদীদের এ অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখনই মহান রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন তখন ইহুদীরা

আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ফেলে দিয়েছে, যেন তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তৌরাতের প্রতি আমল করারই নামান্তর ছিল কেননা, তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ ছিল। আর তৌরাতকে তারাও আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করতো।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, বনী ইসরাঈল জাতি যখন মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে যখন তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, গোলামীর জিঞ্জিরে যখন তারা আবদ্ধ, জাগতিক ও নৈতিক অবনতির চরম পর্যায়ে যখন তারা নিপতিত, তখন তাদের নিকট সত্য ও ন্যায়ের আহ্বান ছিল নিরর্থক কেননা, সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করে নেয়ার যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই তারা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের প্রতীক প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য মানব জাতির সঠিক কল্যাণের মহাসনদ পবিত্র কোরআনের আহবানে তারা সাড়া দিতে পারেনি। এমনকি তাদের নিকট যে আসমানী গ্রন্থ রয়েছে তথা তৌরাত, তার প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখতে পারেনি। তাই তৌরাতের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তারা যাদু বিদ্যা অর্জনে আত্মনিয়োগ করে। যা সত্য, যা সঠিক, যা সুন্দর তা পরিত্যাগ করে, আর যাদু বা ইন্দ্রজালের মাধ্যমে জীবনের মকসুদ হাসিল করতে সচেষ্ট হয়। একটা জাতির যখন চরম দুর্দিন আসে, সে জাতি যখন অধঃপতনের সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তার এ অবস্থাই হয়, তাই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ

অর্থাৎ ইহুদীরা স্বীয় দ্বীন এবং কিতাবের এলম পরিত্যাগ করলো এবং যাদু বিদ্যা অর্জনে আত্মনিয়োগ করলো। অথচ তাদের কর্তব্য ছিল তাদের নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ তৌরাতের উপর আমল করা এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করা। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে যাদু বিদ্যার অন্বেষণে ছুটল। অথচ যাদু বিদ্যা হলো আল্লাহর নাফরমানী বা কুফর।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদু বিদ্যা দু' পন্থায় মানুষের কাছে এসেছে (১) হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যমানার জ্বীন ও মানুষ এক সঙ্গে মিলে-মিশে চলাফেরা করতো। জ্বীন শয়তানরা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত[১] (২)

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৫৭

হারুত মারুত ফেরেশতাদের দ্বারা ইহুদীরা এ মিথ্যা কথা বলে বেড়াত যে, আমরা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট থেকে এ যাদু বিদ্যার দীক্ষা পেয়েছি এবং এ যাদু বিদ্যার কারণেই মানুষ ও জ্বীন জাতি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু একথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তার ঘোষণা রয়েছে পবিত্র কোরআনের এ আয়াতেঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

অর্থাৎ সোলায়মান (আঃ) কুফরী করেননি, বরঞ্চ শয়তানরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।

হযরত সোলায়মান (আঃ)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে এ পর্যায়ে আরও কিছু তথ্য পেশ করা সমীচিন মনে হয়, যা কোরআনে করীমের অন্যান্য স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ১৬টি স্থানে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নাম রয়েছে। তিনি ছিলেন হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্র। যেভাবে হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক নবুওয়্যত ও রাজত্ব দান করেছিলেন, তেমনি হযরত সোলায়মান (আঃ)-কেও এ দু'টি নেয়ামত দান করেছিলেন। তদুপরি আল্লাহ পাক তাঁকে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যার উল্লেখ কোরআনে করীমে রয়েছে। আর তাঁকে বিশেষ এলম দান করা হয়েছিল একথারও উল্লেখ কোরআনে করীমে আছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

(সূরা আল আম্বিয়া)

"(এবং দাউদ ও সোলায়মান) প্রত্যেককে আমি হুকুমত ও এলম দান করেছি"। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

"এবং নিশ্চয় আমি দাউদ ও সোলায়মানকে এলম দান করেছি"।

পশু পক্ষীর ভাষা জ্ঞান

আর এমনিভাবে আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে পশু-পক্ষীর কথা বুঝবার শক্তি দিয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে বিশেষ নেয়ামত দানে ধন্য করেছিলেন, সেজন্যে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, তারও উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কোরআনে।

এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا....اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

(সূরা নমলঃ ১৫-১৬)

"নিশ্চয় আমি দাউদ ও সোলায়মানকে এলম দান করেছি এবং তাঁরা বলেছে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের যিনি আমাদেরকে তাঁর মোমেন বন্দাদের অনেকের উপর ফজিলত দান করেছেন। আর সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছে এবং সে বলেছে, আমাকে পশু-পক্ষীর ভাষা জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর আমাকে সবকিছু দান করা হয়েছে। নিশ্চয় এটি আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট মহান দান"।

বায়ু নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

আল্লাহ্ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে অন্যান্য নেয়ামতের ন্যায় আরো একটি নেয়ামত দান করেছেন তা হলো বায়ু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বায়ুকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কোরআনে করীমেই রয়েছে তার ঘোষণা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ

"এবং প্রবল বায়ুকে সোলায়মানের জন্যে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছি যা তার আদেশ ক্রমেই প্রবাহিত হতো সেই যমীনে যাকে আমি বরকত দান করেছি আর আমি সব বিষয়ে অবগত"।

একজন অশ্বারোহী বিরতিহীন ভাবে সুদীর্ঘ একমাস যাবত ভ্রমণ করলে যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর ইঞ্জিনবিহীন কুদরতী জাহাজে ততখানি দূরত্ব সকালে বিকালে সফর করতেন। এতে জ্বালানীর প্রয়োজন হতো না এবং দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও থাকতো না। কোরআনে করীমেই রয়েছে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আর আমি বাতাসকে সোলায়মানের অনুগত করে দেই, যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায়ও এক মাসের দূরত্বে পৌঁছে যেত"।

জীন ও অন্যান্য জীব-জন্তুর নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ্ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে শুধু যে বায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাই নয়, এবং শুধু যে মানুষকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন তা-ও

নয়; বরং দুর্ধর্ষ জ্বীন জাতি ও অন্যান্য জীব-জন্তুকেও তাঁর কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এটিই ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। কেননা, হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْلِىْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মাফ করে দিও এবং আমাকে এমন ক্ষমতা দান কর যা আমার পরে আর কারো জন্যে না হয়, নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত বড় দাতা"।

আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এ দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যা ইতিপূর্বে বা পরে কেউই লাভ করেনি। এখানে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন এরশাদ করেছেনঃ গতরাতে এক দূরাত্মা জ্বীন হঠাৎ আমার নামাজ বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করে, আমাকে আল্লাহ পাক তাকে কাবু করার শক্তি দান করেন, আমি তাকে পাকড়াও করি, এরপর আমি ইচ্ছা করলাম মসজিদের খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখব, যাতে করে তোমরা দিনের বেলায় তাকে দেখতে পাও, কিন্তু ঐ সময় আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়ার কথা মনে পড়ল, "হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মাফ করে দিও এবং আমাকে এমন ক্ষমতা দান কর যা আমার পরে আর কারো জন্যে না হয়"। পরে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার তাৎপর্য হলো, যদিও আল্লাহ পাক আমাকে সমস্ত নবীগণের বৈশিষ্ট্য ও মোজেযা দান করেছেন এবং জ্বীন জাতির উপরও আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দোয়ার কথা মনে করে তাকে আমি ছেড়ে দেই।[১]

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্পর্কে আরও বহু কথা উল্লেখিত আছে। অতএব, যে নবীকে আল্লাহ পাক এত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তাঁর সম্পর্কে ইহুদীদের একথা বলা যে, তিনি যাদুর মাধ্যমে মানুষকে অনুগত করে রাখতেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা। মূলতঃ এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্পর্কে এ ঘোষণা কেন?

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে এ ঘোষণা কেন করলেন? কেননা যাদু বিদ্যা যে কুফর একথা সর্বজন বিদিত

১। বোখারী শরীফ, কেতাবুল আম্বিয়া, ফতহুল আম্বিয়া, কাসাসুল কোরআন, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৬-১০৬

আর কোন নবীর সম্পর্কে এমন গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, এ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত বেশী কেননা, ইহুদীরা এ অপপ্রচার করতো যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) যাদুকর ছিলেন, নবী ছিলেন না। (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)।

আল্লামা এবনে জরীর তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে ইহুদীদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি এভাবে দিয়েছেন, "ইহুদী পন্ডিতরা বলতো, (হযরত) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মনে করেন দাউদ (আঃ) পুত্র সোলায়মান (আঃ) নবী ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন যাদুকর"।

আল্লাহ পাক তাদের এ কথার প্রতিবাদে নাযিল করেছেন আলোচ্য আয়াতঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রমাণ

এভাবে বাইবেলে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্পর্কে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে, যা একজন নবীর শানের বরখেলাফ। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার অব্যাহত ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তথা পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর এ সত্য ঘোষিত হলো যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) যাদুবিদ্যায় সহায়তা করেননি; বরং তাঁর যমানার শয়তানরা মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। চৌদ্দশ' বছর পর খৃষ্টান বিদ্বানরা পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করেছে এবং বাইবেলে হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্বন্ধে যে অপপ্রচার রয়েছে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার সর্বশেষ সংস্করণে হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্পর্কে যে প্রবন্ধ রয়েছে তাতে তারা বলেছে, সোলায়মান (আঃ) ছিলেন এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আন্তরিকভাবে তাঁর এবাদত গুজার। আর একথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) সম্পর্কে বাইবেলে যে অপপ্রচার স্থান পেয়েছে তা পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে, খুষ্টান পন্ডিতগণ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দ্বারা তওহীদ বিরোধী কোন কাজ কখনোই হয়নি।

খৃষ্টান পন্ডিতদের এ ঘোষণা নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের তফসীরে জোহরা নাম্নী এক নারীর যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। সেজন্যে এ ঘটনার উল্লেখ নিঃপ্রয়োজন।

১। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯ (চতুর্দশ সংস্করণ)

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, এ আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্যে ঐ কাহিনীর আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

আল্লামা বগভী বলেনঃ পূর্ববর্তী যুগে শয়তান আসমানে পৌঁছতো এবং ফেরেশতারা পৃথিবীতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনা সম্পর্কে পরস্পর যে সব আলোচনা করতেন, শয়তান তা শ্রবণ করে পৃথিবীতে ফিরে নিজেরা অনেক মিথ্যা ঐসব কথার সঙ্গে মিশ্রিত করে জ্যোতিষীদের কাছে প্রকাশ করতো। জ্যোতিষীরা নিজেদের চাতুর্য প্রকাশার্থে সাধারণ মানুষের নিকট ঐসব কথা বলে বেড়াতো, আর সাধারণ লোকেরা তা লিখে রাখতো। এভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ মিথ্যা কথাটি প্রচলিত হয়ে গেল যে "জ্বীনরা গায়েব জানে"।

হযরত সোলায়মান (আঃ) এসব কথা জানতে পেরে জ্যোতিষীদের ঐ সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করে একটি বাক্সে পুরে তার সিংহাসনের নিম্নদেশে পূতে রাখলেন এবং এক ফরমান জারী করলেনঃ "এরপর যদি কেউ "জ্বীনেরা গায়েব জানে" বলে প্রচার করে, তবে তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড"।

পরবর্তীতে হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী আলেমগণের এন্তেকালের পর শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে বণী ইসরাঈলের কয়েক ব্যক্তির নিকট এসে উপস্থিত হয়ে বলে, আমি তোমাদের এমন একটি ভান্ডারের সন্ধান দিচ্ছি যা তোমরা সারা জীবন ভোগ করে শেষ করতে পারবে না। ঐ ধন-ভান্ডার হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের নীচে পূঁতে রাখা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ সিংহাসনের নিম্নে খনন কাজ শুরু হলো। শয়তান একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল, কারণ হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সিংহাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কোন শয়তান তার সন্নিকটে পৌঁছলেই সে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত। তাই সে দূর থেকে খনন কাজ দেখছিল।

কিছুদূর খনন করার পরই একটি বাক্স বের হলো এবং সে বাক্স খুলে কতকগুলো পুরাতন পুস্তক পাওয়া গেল। শয়তান বললোঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) এ পুস্তকের জ্ঞান দ্বারাই জ্বীন-ইনসান, পশু-পক্ষী তথা সবকিছুকে অধীন করে রেখেছিলেন, তাঁর এ বিশাল রাজত্ব ও শক্তির মূল উৎস ছিল এ পুস্তক। একথাটি বলেই শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তখন থেকেই প্রচারিত হতে লাগলো যে হযরত সোলায়মান (আঃ) ছিলেন যাদুকর (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)। বনী ইসরাঈলরাই সমস্ত পুস্তক নিয়ে সংরক্ষণ করলো এবং যাদুবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলো। এজন্যেই ইহুদীদের অনেকেই যাদুকর ছিল।

কিন্তু আখেরী নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ পাক ওহী নাযিলের মাধ্যমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ

"আর সোলায়মান কুফরী করেননি"।

দৃশ্যতঃ মনে হয় সোলায়মান (আঃ) যাদুবিদ্যাকে গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করেই মাটিতে পূঁতে রেখেছিলেন। শয়তান আসমানে পৌঁছে ফেরেশতাগণের আলাপ-আলোচনা থেকে পৃথিবীতে ঘটিতব্য ঘটনা প্রবাহের যে সব কথা জ্যোতিষীদের নিকট বলতো সেসব কথা তাতে ছিলনা। কেননা, বহু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর ঐসব কথার কোন কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকেনি।

আল্লামা কালবী (রঃ) বলেন, শয়তান যাদুবিদ্যার পুস্তক "আসেফ বিন বরখিয়া" দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়ে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর অজান্তেই তার জায়নামাজের নীচে মাটিতে পুঁতে রেখেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর বহু লোকের উপস্থিতিতে ঐসব পুস্তক উত্তোলন করে বলেছিল যে, সোলায়মান (আঃ) এসবের দ্বারাই তোমাদেরকে অধীন করে রাখতেন।

মানুষের বেশধারী শয়তানের এসব কথা শ্রবণ করে সে যুগের আলেম ও নেককার ব্যক্তিগণ তা অবিশ্বাস করে বললেন, এসব কখনো সোলায়মান (আঃ)-এর শিক্ষা হতে পারেনা, কিন্তু মূর্খ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তা বিশ্বাস করলো এবং সোলায়মান (আঃ)-কে তারা একজন যাদুকর রূপে প্রচার করতে লাগলো। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ পাক কোরআন পাকে এভাবে হযরত সোলামান (আঃ)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করলেনঃ

وَمَا كَفَرَسُلَيْمٰنُ

অর্থাৎ "সোলায়মান (আঃ) কুফরী করেননি", কেননা, যাদুর চর্চা কুফরী। কোন নবী ও রসূল এ কাজ করতেই পারেন না, তাঁরা এসব পাপকার্য থেকে সম্পূর্ণ মাসুম, নিরাপদ, পবিত্র। কিন্তু وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا (শয়তানেরা কুফরী করেছিল) يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে যাদুবিদ্যার বই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসন ও জায়নামাজের নীচে মাটিতে পূঁতে রেখে পরবর্তীতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এন্তেকালের পর ঐসব পুস্তক উত্তোলন করে। ঐসব শয়তানরাই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিয়ে বলেছে, তিনি এসব বিদ্যা দ্বারা রাজত্ব করেছেন এবং সকলকে অধীন করে রেখেছেন। শয়তানদের এসব অপপ্রচারে অশিক্ষিত মূর্খ লোকরা জাগতিক সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে যাদু শিখতে উৎসাহী হয়, তাদের এমন সমস্ত যাদু শিক্ষা দেয়া হয় যাতে তাদের ঈমান বিনষ্ট হয় এবং তারা কাফের হয়ে যায়।

মানুষকে এসব কুফরী শিক্ষা দানের মাধ্যমে শয়তান কুফরী করেছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) নিজে কখনো যাদু শিক্ষা করেননি এবং অপরকে শিক্ষা দান করেননি।

যাদু বিদ্যা

যাদু একটি অনিষ্টকর মন্ত্রবিদ্যা। এ বিদ্যা পৃথিবীতে শয়তান ও জ্বীনদের দ্বারাই সর্ব প্রথম প্রবতিত হয়। আল্লাহর দ্বীন, আসমানী কিতাব ও নবী রসূলগণের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করে কুফরীতে লিপ্ত করানোর উদ্দেশ্যেই শয়তান এ বিদ্যাটির প্রবর্তন করে। প্রথমতঃ জ্বীনদের দ্বারা এর প্রচার ও প্রসার করা হয় এবং পরে মানুষকে জাগতিক বিভিন্ন প্রলোভনে যাদু শিক্ষা দিয়ে শয়তান আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে মাহরুম করে।

যাদুকে আপাতঃদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হলেও তা আদৌ অলৌকিক নয়। মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন হয়, এজন্যে তাকে অলৌকিক মনে হয়। যাদুর মন্ত্র বা ক্রিয়া বা বিশ্বাস এমনভাবে নিরূপন করা হয়েছে যাতে শয়তান খুশী হয়, জ্বীন অধীন হয় এবং জ্বীন দ্বারা অস্বাভাবিক কার্য সম্পাদন করানো হয়।

যাদুর ঐ সমস্ত মন্ত্র মানব মনে ও দেহে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন মনকে পরাভূত করা, দেহে বিভিন্ন প্রকারের রোগ সৃষ্টি করা, মস্তিষ্ক বিকৃত করা এমনকি প্রাণ পর্যন্ত নাশ করানো যায়। দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটানো যায়। যেমন ফেরাউনের যাদুকররা রজ্জুকে দর্শকদের দৃষ্টিতে সর্প ও বিচ্ছুতে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছিল।

যাদু কখনো কুফরী মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে কখনো নক্ষত্রের পূজা করার মাধ্যমে এবং কখনো সর্বদা অপবিত্র থাকা ও পাপাচারের মাধ্যমেও শয়তানের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে করা হয়।

বস্তুতঃ যাদুর প্রতিক্রিয়াও আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি। তবে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ পাক ঐসব কথা ও কাজের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দেন।

যাদু সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিকট যাদুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। তবে তার চর্চা করা কুফরী।

শেখ আবুল মনসুর মাতুরুদী বলেছেন, যাদুর মূল বিষয়ের মধ্যে যদি ইসলামী শরীয়তের কোন বিধানের খন্ডন বা প্রতিবাদ করা হয়, তবে অবশ্যই কুফরী অন্যথায় কুফরী নয়, কিন্তু অবশ্যই হারাম কার্য।

"মাদারেক" নামক প্রখ্যাত তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুফরী জাতীয় যাদু যারা শিক্ষা করবে তাদেরকে মুরতাদের মত হত্যা করা হবে আর হারাম জাতীয় যাদু বিদ্যা শিক্ষা করলে তাকে শরীয়তে ডাকাতের যে শাস্তির বিধান রয়েছে তা প্রদান করা হবে। যাদুকর যদি যাদুবিদ্যা পরিত্যাগ করে তওবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে তাকে সুযোগ প্রদান করতে হবে ও তার তওবা গ্রহণীয় হবে।[১]

وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করেছেন। একাধিক অর্থ ও ব্যাখ্যার মূল কারণ হলো, উল্লেখিত আয়াতের বিভিন্ন অক্ষর ও শব্দের একাধিক পাঠপদ্ধতি। (ما) অক্ষরটি কোন কোন তফসীরকার "মউসূলা" রূপে গ্রহণ করে (ملكين) শব্দটির "লাম" অক্ষরকে "যবর" দিয়ে পাঠ করেছেন। আবার কোন কোন তফসীরকার (ما) অক্ষরটি নিষেধ মূলক গ্রহণ করে (ملكين) শব্দটির "লাম" অক্ষরকে "যের" দিয়ে পাঠ করেছেন। শব্দটিকে বিভিন্ন ভাবে পাঠ করার কারণে তার অর্থ বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। (ملكين) প্রথম প্রকারের অর্থ দু'জন ফেরেশতা, (ملكين) এর অন্য অর্থ হচ্ছে দু'জন সর্দার ব্যক্তি, উভয় প্রকারে পাঠ করা ও উভয় প্রকার অর্থ গ্রহণ করা বৈধ ও স্বীকৃত।

যে সমস্ত তফসীরকার (ما) অক্ষরকে "মউসূলা" ও (ملكين) শব্দের "লাম" অক্ষরকে "যবর" দিয়ে পাঠ করে "দু'জন ফেরেশতা" এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, আল্লাহ পাক "হারুত মারুত" নামক দু'জন ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করেছেন, বাবিল নগরের অধিবাসীরা তারই অনুসরণ করলো।

বাবিল

"বাবিল" ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরের প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি মনোরম নগরীর নাম। ইতিহাস এ শহরটিকে বেবিলন সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র বলে স্মরণ করে। ফোরাত নদী এ নগরীর মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অত্যন্ত সবুজ শ্যামল এলাকা। বাবিল (বেবিলন) নগরীর অধিবাসীগণ শিক্ষা ও জ্ঞানে, ভদ্রতা ও সভ্যতায় সর্বদাই উন্নত ছিল। পূর্ববর্তী কালে এ নগরীই ছিল ইরাকের রাজধানী। এজন্যে এখনো এখানে সরকারী অফিস-আদালত, আকাশচুম্বী ইমারত এবং সামরিক দুর্গের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বেও নগরীটি সর্বাধিক উন্নত ছিল। যাদু বিদ্যা, টোনা-টোটকা, মন্ত্র এসব হীন

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৮

ও নিকৃষ্ট আমল তদবীরের জন্যেই নগরীটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বহু গ্রন্থে বাবিল শহরের উত্থান-পতনের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

যেমন বাইবেলে রয়েছে "তোমার ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা জগদ্বিখ্যাত, সম্পদশালী, তোমার যাদু বিদ্যায় পৃথিবীর সকল জাতিই বিভ্রান্তি হলো। নবী ওলী ও মহান মহৎ ব্যক্তিদের রক্তে তোমার মাটি রক্তিম হলো (মোকাশাফা)"।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, যাদুভক্ত এ জাতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের প্রায় ৫৩৮ বছর পূর্বে সে যুগের ইরানের শাহের হাতে পরাস্ত হয়। এরপর তারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বিভিন্ন দেশে পলায়ন করে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় এই, পলায়ন কালে তারা সকলে নিজ নিজ যাদু বিদ্যার পুঁথি-পুস্তক সঙ্গে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়েও তারা যাদু চর্চা অব্যাহত রাখে এবং দুর্বল বিশ্বাসের লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে।

হারুত মারুত

দু'জন ফেরেশতার নাম। ফেরেশতা হিসেবেই তাঁরা এসেছেন। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষদের মধ্যে কিছুদিন অবস্থানের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। এজন্যে মানুষেরই আকৃতি, আচার-আচরণ দিয়ে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানব রূপেই তাদেরকে প্রেরণ করা হয়।

হারুত মারুত কেন এসেছেন

সে যুগের মানুষ যখন যাদু বিদ্যার প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, আম্বিয়া কেরামের মোজেযা বা আল্লাহর ওলীদের কারামত আর যাদুকরের যাদুকরীকে একই বিষয় মনে করতে থাকে, হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য উপলব্ধি করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহ পাক মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়ার জন্যে ফেরেশতাদ্বয়কে মানব রূপে প্রেরণ করলেন।

মূলতঃ হারুত মারুত ফেরেশতা মানুষকে নবীর মোজেযা ও যাদু বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই এসেছিলেন, মোজেযা দ্বারা যেমন আলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশিত হয় তেমনি যাদুবিদ্যার মাধ্যমেও অস্বাভাবিক অনেক কিছু হয়, যেমন বিষপানে নীলকণ্ঠ হতে হয়, তেমনি যাদুর মাধ্যমেও অনেক ক্ষতিকর কাজ হয়। যেহেতু এতে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর আরাধনা করা হয়, এতে কুফরী কলেমা থাকে, তাই যাদুবিদ্যা হারাম ও অবৈধ।

যাদু বিদ্যার শিক্ষা কেন দিলেন

এখন প্রশ্ন হলো তারা ফেরেশতা হয়ে যাদুর মত হারাম বিষয়ের শিক্ষা কেন দিলেন?

এ প্রশ্নের জবাবে আধুনিক কালের একজন ভাষ্যকার অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেনঃ

বর্তমান যুগে যেভাবে দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্মকর্তাগণ ঘুষখোরী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘুষখোর কর্মকর্তাদেরকে টাকার মধ্যে বিশেষ নম্বর দিয়ে ঘুষ হিসেবে প্রদান করেন এবং পরে অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করেন।

ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাকের ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মানুষের মধ্যে আগমন করেন, যাতে করে যাদু টোনা, টোটকা প্রভৃতি মন্দ জিনিষের প্রতি যে আসক্তি সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা যায় এবং নবীগণের মহান শিক্ষা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং নবীগণের মোজেযা ও যাদুকরদের যাদুর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দেয়া যায়।

মোজেযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য

যদিও অস্বাভাবিক হওয়ার কারণে মোজেযা এবং যাদুর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আসমান যমীনের। যাদু মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফল বিভিন্ন কারণ ও উপকরণের সমষ্টির অস্বাভাবিক ফলশ্রুতি এবং যাদুকরের সাধনার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু মোজেযা আদৌ মানুষের কোন প্রকার কর্মফল নয়; বরং তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। কোন নবীর মোজেযায় তার নিজের কোন শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়না; বরং তাতে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিই কার্যকর হয়।

আল্লাহ্ পাক নবী ও রসূল প্রেরণ এবং নবীর নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ মোজেযা দান করেন, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সরাসরি অগ্নিকে নির্দেশ দিলেনঃ শীতল হও এবং ইব্রাহীমের জন্যে শান্তিদায়ক হও। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ আমি বললাম "হে আগুন! তুমি শীতল হও এবং ইব্রাহীমের জন্যে শান্তিদায়ক হও"। অগ্নিকুন্ড গুলবাগে পরিণত হওয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোজেযা কিন্তু এটি তাঁর কাজ নয়, কাজ হলো স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের।

এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে সমুদ্রকে ফাঁক করে দিয়ে পানিকে সরিয়ে তাদের জন্যে পথ তৈরী করে দিয়েছেন, তারা পার হয়ে যাওয়ার পর এ পথে

যখন ফেরাউন আসে তখন তার ও তার সঙ্গীদের সলিল সমাধি ঘটে, এ কাজটি ছিল আল্লাহ পাকের, আর মোজেযা ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর।

এক যাদুকরের মোকাবেলা আর এক যাদুকর করতে পারে, কিন্তু নবীর মোজেযার মোকাবেলা করা কারও পক্ষে সম্ভব হয়না। হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় ফেরাউন যাদুকরদের একত্রিত করলো, তারা যাদু বিদ্যা প্রদর্শন স্বরূপ হাজার হাজার সর্প ছেড়ে দিলো। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ দিলেন ভীত হয়োনা, তোমার হাতের লাঠি ছেড়ে দাও। তিনি তাই করলেন। আল্লাহ পাকের কুদরতে সেই লাঠি অজগর সর্পে পরিণত হলো এবং যাদুকরদের প্রেরিত সমস্ত সর্পকে এক মুহূর্তের মধ্যে খেয়ে ফেললো। যাদুকররা যাদুকরী এবং মোজেযার পার্থক্য উপলব্ধি করলো এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নবওয়্যতের সত্যতার প্রতি তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করে বললোঃ

اٰمَنَّا بِرَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

"আমরা মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) এর প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করলাম"।

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط -الاية

ইহুদীরা সর্বনাশা যাদুবিদ্যা সম্পর্কে সবকিছু জানা সত্ত্বেও এ কু-শাস্ত্র শিক্ষা করতো, যদ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত অথচ অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত তারা এর দ্বারা কারও ক্ষতি সাধন করতে পারতনা, তবুও তারা এমন সব বিষয় শেখে যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর বৈ আর কিছুই নয়। তারা একথাও জানতো, যে ব্যক্তি যাদুবিদ্যা গ্রহণ করলো আখেরাতে তার কোন প্রাপ্য নেই। মূলতঃ তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিষয়ের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করে দিয়েছে। হায়! যদি তারা জানতো।

এ আয়াতের শুরুতে وَلَقَدْ عَلِمُوْا শব্দটি রয়েছে অর্থাৎ নিশ্চয় তারা জেনেছে আর আয়াতের শেষে রয়েছে, لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হায়! যদি তারা জানতো। এ দু'টি বাক্য প্রকাশ্য দৃষ্টিতে স্ব-বিরোধী মনে হয়। তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেনঃ যেহেতু সর্বনাশা যাদু বিদ্যা সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনে সচেষ্ট হতো, এ অন্যায় কার্যে লিপ্ত হতো, এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেন যাদুবিদ্যা সম্পর্কে কিছুই জানে নাই।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এলম দু' প্রকার (এক) সাধারণ ভাবে কোন জিনিস জানা যা মানুষের অন্তরে রেখাপাত না করে (দুই) যে এলম মানুষের গোপনতম প্রকোষ্ঠে প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনকে আলোকিত করে। আয়াতে

উল্লেখিত ইহুদীদের এলম হলো প্রথম প্রকারের কেননা, সে এলম তাদের জন্যে ফলপ্রসূ হয়নি। আর দ্বিতীয় প্রকারের এলম হলো, যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"যারা প্রকৃত অর্থে আলেম তারাই আল্লাহকে ভয় করে"।

আর এমন আলেমদের সম্পর্কেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী। আসমানের অধিবাসীরা আলেমগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, আর যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সমুদ্রের মাছেরা তাদের জন্যে দোয়া করে।[১]

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا

আর যদি এ ইহুদীরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনত আর আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করে চলতো, তবে তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্তম প্রতিদান লাভ করতো। হায়! যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারত।

বনী ইসরাঈল জাতির বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা বর্ণনা করার পর তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, যদি তারা অন্যায় অসুন্দর পথ পরিত্যাগ করতো, যদি তারা অসত্য অকল্যাণ এবং অনাচারের পন্থা বর্জন করতো এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করতো, তবে তা হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর। তারা আল্লাহর নেয়ামতের অংশীদার হতো। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ জীবনে বা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতিকে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হয়। পক্ষান্তরে, নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হলে মানুষ সুখ শান্তি এক কথায় সার্বিক কল্যাণের অধিকারী হয়।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

বিগত কয়েক রুকুতে পবিত্র কোরআন বনী ইসরাঈল জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করেছে। কুফর, শেরক, আল্লাহর আয়াত সমূহের ব্যবসা তথা তৌরাতের বিধান পরিবর্তনের বিনিময়ে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা, সত্যকে গোপন করা, আত্মবিস্মৃত হওয়া, জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অনাচার, ফেৎনা-ফাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, ধোঁকাবাজী, ধড়িবাজি, প্রতারণা, নিজের কথা আল্লাহর নামে প্রচার করা,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৮

বংশীয় আভিজাত্যের অহংকার, মিথ্যা দাবী, খুন-খারাবী, পরস্পরের শত্রুতা, নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করা, তাঁদেরকে হত্যা করা, যাদুকরী বা তাবীয-টোটকা দ্বারা মানুষের ক্ষতিসাধন করা, এমনি যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ছিল বনী ইসরাঈল জাতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, যদি তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতো, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতো, পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলতো এবং যাবতীয় চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করে নৈতিক অবক্ষয় থেকে আত্মরক্ষা করে তথা পরহেযগারী অবলম্বন করতো, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতো তবে তারা কি লাভ করতো? পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ

"তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে উত্তম বিনিময় লাভ করতো"।

আল্লাহু আকবর! দয়াময় করুণাময় আল্লাহ পাকের দয়া-মায়ার কোন শেষ নেই, নেই কোন সীমান্ত। বনী ইসরাঈল জাতির এত অন্যায় এত অনাচারের পরও তাদেরকে রহমত ও মেহেরবানীর খোশখবরী প্রদান করা হয়েছে। যদি তারা রহমতুল্লিল আলামীনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাঁর অনুসারী হয় এবং আত্ম-সংশোধন করে আত্মোন্নতি লাভে সচেষ্ট হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ
قُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

তরজমা

(১০৪) হে মোমেনগণ! তোমরা "রায়েনা" বলোনা, বরং "উনজুরনা" বলো, এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি।

(১০৫) যারা কাফের, আহলে-কিতাবই হোক বা মুশরেকই হোক, তারা আদৌ পছন্দ করেনা যে, তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি কোন

কল্যাণ নাযিল হোক, অথচ (অবস্থা এই যে) আল্লাহ পাক যার সম্পর্কে মর্জি করেন, তাকে স্বীয় রহমতে বিশেষিত করেন, আল্লাহ পাক মহান করুণাময়।

তফসীরুল কোরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াত সমূহে ইহুদীদের সেসব অপকর্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তারা করেছিল। আর এ আয়াতে তাদের সেই অন্যায় আচরণ, অপকর্ম, ষড়যন্ত্র, ঔদ্ধ্যত্ব এবং বে-আদবী ও শয়তানী কাজের উল্লেখ রয়েছে, যা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পরে করেছে।[১]

মোমেনগণের উচ্চ মর্যাদা

আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে "হে ঈমানদারগণ!" বলে সম্বোধন করে মোমেনদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, এতদ্বারা ঈমানের মাহাত্ম এবং ফজিলত প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র পবিত্র কোরআনে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ!) খেতাব ৮৮ বার রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ তৌরাতে ইহুদীদেরকে আল্লাহ পাক يايها المسكين (হে মেসকীন ও কাঙ্গালরা!) বলে সম্বোধন করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে প্রথমেই "মেসকীন" বলে সম্বোধন করেছেন তখন তাদের ভাগ্য-লিপিতে শেষ পর্যন্ত মেসকীনিই লিপিবদ্ধ হযে রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনেই তার ঘোষণা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

"এবং তাদের উপর অপমান ও দারিদ্র নিপতিত হলো"।

এর পাশাপাশি উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে যখন "হে মোমেনগণ!" বলে খেতাব করেছেন, এতদ্বারা একথা আশা করা যায় যে, আল্লাহ পাক মোমেনগণকে কেয়ামতের দিন দোযখের অগ্নি থেকে নাজাত দান করবেন। এতদ্ব্যতীত, মোমেন নামটি যেমন নাম সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম, তেমনি আশা করা যায় কেয়ামতের কঠিন দিনে মোমেনদের সাথে আল্লাহ পাকের ব্যবহারও হবে সর্বোত্তম। তথা তিনি তাঁর রহমতে ধন্য করবেন ঈমানদারগণকে।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৩১

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি করার অসৎ উদ্দেশ্যে راعنا শব্দটি ব্যবহার করতো। "রায়েনা" শব্দটির একটি অর্থ হলো, "আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন", কিন্তু এ অর্থে তারা ব্যবহার করতো না; বরং এ শব্দটি তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করার অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতো কেননা, শব্দটির আরো দু'টি অর্থ রয়েছে। কোন মানুষকে যখন নির্বোধ বলে সম্বোধন করার ইচ্ছা হতো তখন "রায়েনা" ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ "হে নির্বোধ!" আর কখনো "রায়েনা"কে একটু টেনে "রায়িনা" বলতো। যার অর্থ হতো, "হে আমাদের রাখাল!" ইহুদীদের এ শব্দ ব্যবহারের পর তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হয়ে ভাল অর্থ চিন্তা করে মুসলমানগণও এ শব্দটি ব্যবহার করতে লাগলেন। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করার হীন উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহার করে, তখন তিনি তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর দুশমনরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক", সেই আল্লাহ পাকের শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। এরপর যদি কাউকে এ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখি তবে আমি তাকে হত্যা করবো"।[১]

বস্তুতঃ এ বদনসীব ইহুদী জাতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বদা নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করতো।

আল্লাম এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদীরা যখন সালাম করতো তখন তারা "আসসালামু আলাইকুম" এর স্থলে "আসসামু আলাইকুম" বলতো। "আসসালামু" অর্থ হলো "শান্তি"। আর "আসসামু" অর্থ মৃত্যু। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করেন, তারা এমন শব্দ ব্যবহার করলে তোমরা শুধু বলবে "ওয়া আলাইকুম" (অর্থাৎ মৃত্যু তোমাদের প্রতি হোক), আমাদের দোয়া তাদের জন্যে কবুল হবে, আর তাদের বদ দোয়া আমাদের জন্যে কবুল হবেনা।

অমুসলিমদের অনুসরণ অবৈধ

অতএব, কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন, ইহুদী, খৃষ্টান এক কথায় কোন অমুসলিমের অনুসরণই বৈধ নয়। এ আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে এ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৮

বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীস রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় তলোয়ার সহ প্রেরিত হয়েছি। আমার রুজী আল্লাহ পাক বর্ষার নিম্ন-দেশে রেখেছেন। অবমাননা এবং অবনতি শুধু সে ব্যক্তির জন্যে যে আমার বিধি-নিষেধের বিরোধিতা করে। আর যে কোন অমুসলিমের অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী

এ আয়াতে যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বনী ইসরাঈলের বেয়াদবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বর্ণনা-শৈলীতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইতিপূর্বে তাদেরকে সম্বোধন করে আয়াত নাযিল হয়েছে কিন্তু যেহেতু তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করেছে তাই তাদেরকে খেতাবের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়নি, মোমেনগণকে সম্বোধন করে তাদের অনুসরণ থেকে এবং তাদের কথাবার্তা থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে।

আরও এরশাদ হয়েছে, তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো, যেন পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোন প্রয়োজন না হয়। আর যদি এমন প্রয়োজনই হয় তবে راعنا এর স্থলে انظرنا শব্দটি ব্যবহার কর। কেননা, এ শব্দে মন্দ অর্থ নেই। এতে দুশমনদের অনুকরণ হয় না।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

এ আয়াতে কাফের বলতে সে কাফেরদের বোঝানো হয়েছে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এমন কোন শব্দ বা বাক্য যা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে কোন প্রকার বেয়াদবীর ভাব প্রকাশিত হয়, তা ব্যবহার থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

আল্লামা আবুবকর এবনে আরবী, ইমাম কুরতবী, ইমাম এবনে তাইমিয়া প্রমুখ মনীষীবৃন্দ বলেছেন, এমন কোন কথা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীর ভাব প্রকাশ পায়, তা যে বলবে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৬২

এ আয়াত দ্বারা আল্লামা কুরতবী (রঃ) ইসলামী সংবিধানের একটি ধারা প্রমাণ করেছেন। এ সাংবিধানিক ধারা হলোঃ কোন বৈধ কাজের দ্বারা যদি অন্যরা অবৈধ কাজের সুযোগ পেয়ে যায় তবে সে বৈধ কাজটিও অবৈধ হয়ে যায়। ইসলামী শরীয়তে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই হাদীস হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ গোমরাহীর যুগে যখন কোরায়েশরা কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণ করে, তাতে তখন এমন কয়েকটি কার্য সম্পাদিত হয়, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রচিত ভিত্তির সাথে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখেনা। আমার ইচ্ছা হয় যে, এই ঘরকে ভেঙ্গে পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির ন্যায় করে দেই। কিন্তু কাবাগৃহ ভেঙ্গে ফেললে মূর্খ মানুষের গোমরাহ হওয়ার ভয় রয়েছে। এজন্যে আমি আমার ইচ্ছা কার্যকর করছি না। এই হাদীস দ্বারা যে বিধান পাওয়া গেল তা ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ সবার নিকটই গ্রহণীয় এবং বরণীয়। এ পর্যায়ে আরও একটি কথা হলো, ইসলাম যদি কারো প্রতি কোন দায়িত্ব অর্পণ করে তবে সে দায়িত্ব পালনের যাবতীয় উপকরণ সমূহকেও জরুরী মনে করা হবে। পক্ষান্তরে, ইসলাম যদি কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তবে সে নিষিদ্ধ কাজে যা কিছু সাহায্যকারী হবে তাও নিষিদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী মাজহাবের ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে একথা প্রকাশ করছে যে, যেহেতু "রায়েনা" শব্দটির ব্যবহার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লারে শানে বেয়াদবীর কারণ হয়। এজন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ শব্দটির ব্যবহার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম কুরতবীর মতে, কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান মোবারকে বেয়াদবীর পথ বন্ধ করার জন্যেই আল্লাহ পাক "রায়েনা" শব্দটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[১]

আর আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক মোমেনদের জন্যে কথায় এবং কাজে কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

আর হাফেজ এবনে জরীর লিখেছেন, সত্যকথা হলোঃ আল্লাহ পাক মোমেনদের সম্পর্কে "রায়েনা" শব্দটি এজন্যে নিষিদ্ধ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে কোন প্রকার বেয়াদবী আদৌ সহনীয় নয়।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৯

আর আল্লামা আবু হাইয়ান লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক "রায়েনা" শব্দটির ব্যবহার এজন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে, এতে রয়েছে এক বিরাট ফেৎনা আর সে ফেৎনা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লারে শানে বেয়াদবী।

মূলতঃ যে নবীর শান এত উচ্চে যে তাঁর সম্মুখে উচ্চ স্বরে কথা বললে সারা জীবনের সমস্ত আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ এতে তোমাদের যাবতীয় সৎ কাজ বাতিল হয়ে যাবে অথচ তোমরা কিছুই জানতে পারবেনা।

সেই নবীর শানে বেয়াদবীর পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই "রায়েনা" শব্দটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী মূলতঃ দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও অনুরক্তি দ্বীন ইসলামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পক্ষান্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী দ্বীন ইসলামের ইমারতকে ভেঙ্গে চুরে নিশ্চিহ্ন করার নামান্তর। তাই যার অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও মহব্বত নেই, তার মধ্যে দ্বীন ইসলামও নেই। হাফেজ এবনে তাইমিয়ার মতে, ইবলিস আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আদম (আঃ)-কে সম্মান সূচক সেজদা প্রদান না করে যে অপরাধ করেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী তার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। পবিত্র কোরআনে এ জঘন্যতম অপরাধ বন্ধ করার লক্ষ্যেই "রায়েনা" শব্দটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলতঃ এ কারণেই কাদিয়ানী এবং শিয়া ফেরকার লোকদেরকে মুসলমান হিসেবে গ্রহণ করা হয়না কেননা, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করার ধৃষ্টতা দেখায়। আলোচ্য বিষয়ে আল্লামা এবনুল কইয়্যেম (রঃ) যা লিখেছেন তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন উদ্দেশ্য সফল করতে হলে যে পন্থা অবলম্বন করতে হয় তা-ও উদ্দেশ্যের ন্যায়ই অতীব জরুরী বলে বিবেচিত হয়। বাস্তব জীবন তার দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ফেৎনা-ফাসাদের যুগে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কেননা, তা দ্বারা ফেৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফেৎনা-ফাসাদ যখন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে তখন তার উপকরণও অবৈধ হবে, এটিই স্বাভাবিক। এ মৌলিক নীতির আলোকে ইমাম আহমদ (রঃ) এ

ফতোয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকে, আর পানাহারের দ্রব্য তার প্রতিবেশীর নিকট থাকা সত্ত্বেও তাকে না দেয়, আর এ অবস্থায় লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সেই প্রতিবেশীকে এ ক্ষুধার্ত মৃত ব্যক্তির খুনের বদলা দিতে হবে। কেননা, তার মজুদ্দারীই এ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

অতএব, যেহেতু "রায়েনা" শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করতো, তাই এ শব্দটির ব্যবহার মুসলমানদের জন্যে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর ইহুদীদের জন্যে ঘোষিত হয়েছে কঠিন কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ইহুদীদের ব্যবহারের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন মুসলমানদের সাথে তাদের আচরণের কথা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে যারা অমান্য করেছে তদানীন্তন কালে তাদের দু'টি দল ছিল।

১. আহলে কিতাব, অর্থাৎ যারা তৌরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাসী বলে দাবী করতো কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লারে নবুওয়্যতকে অমান্য করতো। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করার কারণে তারা ছিল কাফের।

২. মুশরেক বা পৌত্তলিক, তারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা। এদের উভয়েই পছন্দ করেনা যে, মুসলমানদের উপরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আয়াতে خير শব্দটি সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন, এতদ্বারা আল্লাহর ওহীকে বোঝানো হয়েছে কেননা, ওহীর মাধ্যমেই এসেছে যাবতীয় কল্যাণ, উম্মুক্ত হয়েছে আল্লাহর রহমতের দ্বার, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে মুসলিম জাতির। ইতিপূর্বে দু' হাজার বছর যাবত বনী ইসরাঈলের মধ্যে চার হাজার নবী আগমন করেছিলেন। এজন্যে বনী ইসরাঈল আশা করছিল সর্বশেষ নবীও তাদের মধ্য থেকেই আগমন করবেন। কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর দানে ধন্য করেন। তাই বনী ইসরাঈলের স্থলে বণী ইসমাঈলে নবুওয়্যত দান করলেন, আবির্ভাব হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের, ফলে বনী ইসরাঈল হিংসানলে জ্বলতে লাগল, প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে তারা বাধা দিতে লাগলো, এমনকি বনী ইসরাঈল তথা ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যাদুটোনা করলো, তাঁর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। এমনিভাবে পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

নবুওয়্যতকে মেনে নিতে পারলনা এজন্যে যে, এতদ্বারা তাদের নেতৃত্বের অবসান ঘটে। ফলে, পৌত্তলিক হোক কি আহলে কিতাব- উভয়েই তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং মুসলমানদের কোন প্রকার কল্যাণ হোক তা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্যে সহনীয় ছিলনা। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আহলে কিতাব হোক কি মুশরেক, উভয়েই মুসলমানদের শত্রুতায় ঐক্যবদ্ধ। (হে মোমেনগণ!) তোমাদের প্রতি কোন প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তা তাদের কাম্য নয়, বরং এমন অবস্থায় তাদের গাত্রদাহ হয় অথচ তারা জানেনা নবুওয়্যত বা যে কোন প্রকার কল্যাণ তা নিছক আল্লাহর দান, এতে কারো কোন প্রকার বক্তব্য থাকেনা। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে এ সৌভাগ্য দান করেন। আল্লাহ পাকের এ অমোঘ বিধান মোতাবেকই আরবের বুকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে যিনি শুধু নবী ও রসূল নন; বরং সকল নবী রসূলগণের দলপতি। অতএব তাঁর প্রতি বা তাঁর অনুসারীদের প্রতি হিংসা অথবা বিরোধিতা সর্বক্ষেত্রেই অকেজো বলে প্রমাণিত হয় কেননা, দান শুধু আল্লাহ পাকের হাতে, এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মহান দাতা, তিনি করুণাময়, তাঁরই হাতে রয়েছে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ। তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আস্থা, অনুরক্তি ও অনুসরণেই রয়েছে বিশ্ব মানবের পরিত্রাণ।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ
تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا
سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

তরজমা

(১০৬) আমি যদি কোন আয়াতকে রহিত করি, বা যা আমি ভুলিয়ে দেই তার চেয়ে উত্তম বা তার অনুরূপ আয়াত প্রেরণ করে থাকি (হে রসূল!) আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান।

(১০৭) আপনি কি জানেন না? যে, নভোমন্ডলও ভূমন্ডলের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এবং তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাক ভিন্ন কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী নাই।

(১০৮) (হে মোমেনগণ!) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তদ্রুপ প্রশ্ন করতে চাও? যেরূপ ইতিপূর্বে (হযরত) মূসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে? আর যে ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে অবলম্বন করলো সে সরল পথ ছেড়ে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হলো।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে যখন পৌত্তলিক বা ইহুদীরা কটাক্ষ করে বলেছে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আজকে এক কথা বলেন কাল আরেক কথা বলেন, আর কোরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হতো, তবে তাতে এতো পরিবর্তন হয় কেন? আর কোরআনের আদেশ রহিত হয় কেন?[১]

এর জবাবেই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।

আল্লাহ পাক সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, পৃথিবীর সবকিছু তাঁর সম্মুখে সুস্পষ্ট, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। মানুষের অবস্থা, তার প্রয়োজন, তার পরিবেশ, যোগ্যতা, উন্নতি-অবনতি এক কথায় সবকিছুই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে। তিনি সব কিছুই দেখেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"এবং আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখছেন"।

তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে এবং নিছক তাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ পাক তাঁর কোন আদেশকে রহিত করেন। যাকে আরবী ভাষায় "নস্‌খ" বলা হয়। আর কোন আদেশকে আল্লাহ পাক মানব-অন্তর থেকে বিস্মৃত করিয়ে দেন, যাকে কোরআনের ভাষায় ننسى বলা হয়েছে। দূরাত্মা ইহুদীরা এ বিষয়ের উপরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এবং আপত্তিকর মন্তব্য করেছে।

আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদের হীন ও নিন্দনীয় উক্তির জবাব প্রদান করেছেন।

ইহুদীরা বলেছে, যদি কোরআন সত্যিই আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে পবিত্র কোরআনের কোন হুকুম রহিত কেন হবে? তাতে পরিবর্তন কেন হবে?

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫১

তত্ত্বজ্ঞানী ও তথ্যানুসন্ধানী তফসীরকারগণ এসব ভিত্তিহীন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের যাবতীয় নির্দেশের মূল লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ সাধন করা, মানুষকে আত্মশুদ্ধি লাভের পথ প্রদর্শন করা। কেননা, আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই আত্মোন্নতি লাভ করা যায়।

অতএব, পবিত্র কোরআনের কাজ হলো একজন চিকিৎসকের কাজের অনুরূপ। যেভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের তালিকায়ও পরিবর্তন করে থাকে, তেমনি কল্যাণকামী মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাঁর সংশোধনের ধারায়ও পরিবর্তন সাধন করেন। তাই কোন আয়াত মনসুখ করা হয়, আর কোন আয়াত মানুষের মন থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়। আর এটি আদৌ অযৌক্তিক নয়।

যারা এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদের জানা উচিত, যদি আল্লাহ পাকের আদেশে পরিবর্তন অযৌক্তিক মনে হয়, তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় মানব জীবনে সর্বদা যে পরিবর্তন হতে থাকে তা-ও অযৌক্তিক হবে (নাউজুবিল্লাহে মিন যালিক)। অথচ রাত ও দিনের পরিবর্তন, শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্তন, জীবন ও মৃত্যু, সুস্বাস্থ্য ও রুগ্নাবস্থা, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য এক কথায় এসব কিছু এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতে হয়। আর এসব কিছু একমাত্র আল্লাহ পাকের কুদরতে হেকমতের বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেভাবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, মর্জি ও কুদরতের পরিবর্তনকে অযৌক্তিক বলা হয় না, তেমনি আল্লাহ পাকের হুকুমের ব্যাপারে যে পরিবর্তন হয় তাকেও অযৌক্তিক বলা যায় না। বিশেষ হেকমত এবং মোসলেহাতের কারণে তথা বন্দাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ পাক তাঁর হুকুম পরিবর্তন করেন।

এ সম্পর্কে হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীন 'নস্‌খ' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতেন, যেমনঃ

(ক) আয়াতের আদেশের সময় শেষ হয়ে যাওয়া,

(খ) আয়াতের বিখ্যাত অর্থকে বাদ দিযে অবিখ্যাত অর্থ গ্রহণ করা, প্রভৃতি।

শাহ সাহেব (রঃ) আরও বলেছেনঃ ইসলামী বিধানে "নসখ" দু' প্রকার।

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ইসলামী বিধানের দফা পেশ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তা পরিবর্তন করে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বা জিব্রাইল (আঃ)-এর মারফত হাদীসে কুদসী রূপে বিকল্প কোন দফা এরশাদ করেছেন।

২. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে হয়তো একটি আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। সে প্রেক্ষিতে আদেশের মধ্যেও পরিবর্তন করতে হয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন সারা আরব থেকে যখন মুসলমানগণ মজলুম অবস্থায় মদীনা মোনাওয়্যারায় সমবেত হতে লাগলেন তখন এ মোহাজেরদের পুনর্বাসন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। এ সমস্যার সমাধান-কল্পে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহাজের এবং আনসারদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক "মোয়াখাত" সৃষ্টি করলেন। এর ফলে মদীনাবাসী মুসলমানগণ মোহাজেরগণকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট প্রভৃতির অংশ পেশ করলেন। তখন উত্তরাধিকারীত্বের বুনিয়াদও হলো এই "মোয়াখাত"।

কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হলো, মোহাজেরদের আত্মীয়-স্বজন এসে একত্রিত হলো তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো সম্পূর্ণভাবে। তখন উত্তরাধিকারীত্বের ভিত্তি "মোয়াখাত" বা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রইলনা; বরং আত্মীয়তার বন্ধনের উপরই এর ভিত্তি হলো। এভাবে একটি আদেশের পরিবর্তন হলো।

মক্কী জীবনে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়াই নবুওয়্যতের কাজ ছিল। কিন্তু মদনী জীবনে ইসলাম আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক বিধানের রূপ ধারণ করে। তখন অন্যান্য নবীগণের শরীয়তের খেলাফ গণিমতের মালকে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়। আর এ রাজনৈতিক বিধানের অংশ স্বরূপ প্রয়োজনের তাগিদেই সামরিক তৎপরতার অনুমতি প্রদান করা হয়।

মক্কী জীবনে আদেশ হয়েছিল كفوا ايديكم "তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় নিজেদেরকে বিরত রাখ" আর মদনী জীবনে তার পরিবর্তে এরশাদ হয়েছেঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

এ আয়াত দ্বারা মুসলমানগণকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হলো। এভাবে মানুষের কল্যাণার্থেই পবিত্র কোরআনের কয়েকটি হুকুমকে মনছুখ করা হয়। এমনিভাবে কোন কোন আয়াতকে ভুলিয়ে দেয়া হয় আর তা একই উদ্দেশ্য করা হয় যেমন, আবু উমামা এবনে সাহেল এবনে হানিফ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ কয়েকজন সাহাবী একরাত্রে নামাজের জন্যে দন্ডায়মান হন এবং একখানি সূরা পাঠ করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সূরাটির শব্দও স্মরণ হলোনা, শুধু বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করা সম্ভব হলো এবং সূরাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো। সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে

ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি এরশাদ করলেনঃ এ সূরার তেলাওয়াত এবং হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।[১]

প্রশ্ন হলো, এমনটি কেন হয়েছে? তার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا

অর্থাৎ যদি কোন আয়াত মনছুখ করা হয় অথবা ভুলিয়ে দেয়া হয় তবে তা মানুষের অধিকতর কল্যাণের লক্ষ্যে অথবা অধিকতর সওয়াব লাভের আশায়ই বা আমলকে সহজতর করার ব্যাপারে তার চেয়ে উত্তম কোন আয়াত পেশ করা হয়। আর কোন্ নির্দেশ মানুষের জন্যে অধিকতর উপকারী তা আল্লাহ পাকই জানেন এবং সর্বত্র তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ "আপনি কি জানেন না? নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

ইহুদীরা বলতো, পবিত্র কোরআনের কয়েকখানি আয়াত রহিত হয়েছে। যদি এই কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে হতো তবে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে এ বিষয়ে জানতেন না যে, এ আয়াত সমূহে কোন প্রকার ত্রুটি রয়েছে। ইহুদীদের এ মিথ্যা উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "ত্রুটি পূর্বের আয়াতেও ছিল না, এ আয়াতেও নেই"। কিন্তু আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা আদেশ করেন, ইতিপূর্বে যা সমীচিন মনে করেছেন তারই আদেশ দিয়েছেন।[২]

মূলতঃ রদবদল করা বা কোন নির্দেশকে রহিত করা- সবকিছুই আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন। কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার বাইরে নয়। যিনি হুকুম দিতে পারেন তিনি হুকুম বদলাতেও পারেন। অতএব, কোরআনে করীমের কোন আয়াতকে রহিত করার উপর প্রশ্ন করার অর্থ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির উপর প্রশ্ন করা। যারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক সব বিষযে সর্বোপরি সর্বশক্তিমান, তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, কোন আয়াতকে নস্‌খ (রহিত) করা নিতান্ত আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আপনি কি জানেন না যে, আসমান যমীনের সাম্রাজ্য একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩
২। টীকাঃ শেয়খুল হিন্দ (রঃ), পৃষ্ঠা-২০

তাঁরই একচ্ছত্র ক্ষমতা সর্বত্র বিদ্যমান। মানুষ তাঁরই সৃষ্টি, পথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধি মানুষের প্রতি তাঁর দান ও দরদ সর্বাপেক্ষা বেশী। আর মানুষের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানই সর্বাধিক। অতএব, মানুষের জন্যে যখন যা নির্দেশ প্রদান তিনি জরুরী মনে করেন বা যে আদেশ রহিত করা পছন্দ করেন তা তিনি করেন। কেননা, দ্যুলোক ভ্যুলোকে যা কিছু আছে সবই তাঁর, প্রতিটি অনু-পরমাণুর তিনিই একমাত্র মালিক। অতএব, তাঁর ক্ষমতাই সর্বত্র বিদ্যমান। তওহীদের এ আকীদার প্রতি যাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে তাদের অন্তরে কোনদিন এমন প্রশ্ন উত্থিত হবে না যে, আল্লাহ পাক কোন আয়াত কেন রহিত করেছেন আর কোন আয়াত কেন ভুলিয়ে দিয়েছেন। হে মুসলমানগণ! যে ইহুদীরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়, তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক এবং মনে রেখঃ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

তওহীদের প্রতি বিশ্বাসের তাৎপর্য

আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নেই, নেই কোন সাহায্যকারী। অতএব, তোমাদের প্রতি যদি কেউ দরদ প্রকাশ করে তাতে তোমরা বিভ্রান্ত হয়োনা। এক আল্লাহর প্রতি তোমরা বিশ্বাস করেছ, হয়েছ তওহীদের পতাকাবাহী, অতএব তাঁর প্রতিই ভরষা রাখ, আর তিনি ভিন্ন তোমাদের যে কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই একথা মনে রেখ। এটিই তওহীদের প্রতি বিশ্বাসের তাৎপর্য।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ

(হে মুসলমানগণ!) যেভাবে দূরাত্মা ইহুদীরা মূসা (আঃ) কে অবান্তর প্রশ্ন করে বিরক্ত করেছে, তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে এভাবে প্রশ্ন করতে চাও? মনে রেখ, যে কেউ ঈমানের নেয়ামত লাভের পরও সে নেয়ামতকে কুফরের সঙ্গে বদল করবে, সে অবশ্যই সঠিক পথ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হবে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন, ইহুদীরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলেছিল, যেভাবে মূসা (আঃ) তৌরাত এনেছিলেন ঠিক তেমনি আপনি পবিত্র কোরআন আসমান থেকে একবারেই নিয়ে আসুন। তাদের এ কথার জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যখন পৌত্তলিকরা বলেছিল যে পর্যন্ত আপনি আসমানে আরোহণ না করবেন আর যে পর্যন্ত আমরা আপনার আসমানে আরোহণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করবো আর যে পর্যন্ত আপনি আসমান থেকে কিতাব নিয়ে না আসবেন এবং তা আমরা পড়ে না নেব, সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না।

তাদের এ সমস্ত উদ্ভট উক্তির জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এবনে জরীর (রঃ) মুজাহেদ থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কোরায়েশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ দাবী পেশ করলো যে, আপনি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন, তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ এ পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা সম্ভব কিন্তু একথা মনে রেখ, যদি (তোমাদের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক) সাফা পাহাড়কে স্বর্ণের পাহাড় বানানো হয় কিন্তু তারপরও তোমরা নাফরমানী কর, তবে তোমাদের পরিণতি বনী ইসরাঈলের পরিণতির অনুরূপই হবে। তাদের দরখাস্ত মোতাবেক যখন আসমান থেকে "খাবার" আসলো, তারপরও তারা কুফরী করলো তখন তাদেরকে শুকর বানানো হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আদব

ইতিপূর্বের কয়েকখানি আয়াতে ইহুদীদের অন্যায় আচরণের বিবরণ স্থান পেয়েছে, দুরাত্মা ইহুদীদের সীমাহীন বেয়াদবীর কারণে তাদেরকে সম্বোধন না করে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব শিক্ষা দিয়েছেন। এ আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ تُرِيدُونَ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা কি তোমাদের রসূলের দরবারে এমনভাবে প্রশ্ন করতে চাও, যেভাবে ইতিপূর্বে মূসা (আঃ)-কে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয়েছে।

এ পর্যায়ের প্রথম আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারের আদর এভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

১. নবীর দরবারে আদবের সঙ্গে থাক।

২. যা তিনি এরশাদ করেন, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

৩. কথা-বার্তায় ভাব ভঙ্গিতে এমন কোন আচরণ যেন না হয়, যাতে বেয়াদবীর লেশমাত্রও থাকে। এমনকি কাফেররা যে শব্দ ব্যবহার করে তোমরা তা পরিহার কর।

৪. তোমাদের নিকট যা কিছু কল্যাণ আসছে তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে আসছে। যদি তোমরা তাঁর অনুসারী হও, তবে আল্লাহ পাকের অনন্ত রহমত এবং অসীম দয়া তোমাদের জন্যেই রয়েছে।

৫. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের কারণে বিশ্বের নেতৃত্ব বনী ইসরাঈল থেকে সরিয়ে তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

৬. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী প্রশ্ন করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়।

ইহুদীদের ঔদ্ধত্যের ইতিহাস, তাদের অন্যায় আচরণ, জেদ এবং দরবারে নববীতে তাদের বেয়াদবী, এসব কিছুর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ তাদের কোপগ্রস্ত হওয়া- এসবই তোমাদের জানা। অতএব, নবীর দরবারে আদব রক্ষা কর। একথা মনে রেখঃ

وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ

"যে ঈমান লাভের পরও ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, ঈমান লাভের পর যদি কেউ কাফেরদের অনুকরণ করে তবে সে সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে বঞ্চিত হয়ে মূর্খতা এবং গোমরাহীর অন্ধকারে পতিত হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে আরও বলেছেন, অধিক পরিমাণে প্রশ্ন করা অত্যন্ত মন্দ অভ্যাস, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ-الاية

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে মন্দ মনে হবে।

বস্তুতঃ কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার সময় কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বে যদি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে এতে ভয় থাকে যে, ঐ জিজ্ঞাসার কারণে সেই জিনিসটি হারাম না হয়ে যায়। একখানি হাদীসে রয়েছে, মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যা হারাম ছিলনা, কিন্তু তার জিজ্ঞাসার কারণে হারাম হয়ে গেছে।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন আমাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, তখন আমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হই এবং আশা করি, কোন গ্রাম্য লোক যদি প্রশ্ন করতো, তবে আমরা শ্রবণ করতাম। কোরআনে করীমের এ আয়াতের প্রতি সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে আমল করেছেন এবং আল্লাহর নবীর দরবারের আদব কিভাবে রক্ষা করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। সাহাবী হযরত বরা এবনে আযেবের (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি কোন বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইতাম কিন্তু এক বছর অতিবাহিত হয়ে যেত, তবুও সাহস হতোনা তাঁর দরবারে কোন প্রশ্ন করতে, তখন আশা করতাম, যদি কোন গ্রাম্য ব্যক্তি আসতো আর সে প্রশ্ন করতো, তখন আমি শুনতে পারতাম।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৬৫

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمٰنِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِندِ
أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا
أَوْ نَصٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ
صٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ
أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

তরজমা

(১০৯) আহলে কিতাবদের অনেকেই মুসলমান হবার পরও কোন প্রকারে তোমাদেরকে কাফের রূপে দেখতে চায়, তাদের সম্মুখে সত্য উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অর্ন্তনিহিত হিংসাবশতঃ অতএব তোমরা ক্ষমা করতে থাক, এবং যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ পাক আদেশ জারী করেন সে পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব শক্তিমান।

(১১০) এবং নামাজ কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর, আর তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু কর্মফল প্রেরণ করবে, আল্লাহ্ পাকের নিকট তা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন।

(১১১) এবং তারা বলে, ইহুদী অথবা খৃষ্টান ব্যতীত কেউই স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করতে পারবেনা, এটি তাদের মন ভোলানো কল্পনা মাত্র। (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন কর।

(১১২) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎ কাজ করে, তবে তার জন্যে তার প্রতিপালকের নিকট পূর্ণ প্রতিদান সুনিশ্চিত রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা কোনদিন চিন্তিতও হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেনঃ ওহুদের যুদ্ধের ঘটনার পর ইহুদীরা হযরত হোজায়ফা এবনুল ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত এবনে ইয়াসের (রাঃ)-কে বলেছিল, যদি তোমরা সত্যের উপর থাকতে, তবে অবশ্যই পরাজিত হতে না। অতএব তোমাদের উচিত হলো আমাদের ধর্মে চলে আসা কেননা, এটিই হেদায়েতের পথ। এ ঘটনার পরই এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হাই এবনে আখতাব এবং আবু ইয়াসের এবনে আখতার– এ দু'জন কুখ্যাত ইহুদী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল। এরা সর্বদা মুসলমানদের উন্নতির কারণে হিংসানলে জ্বলতো এবং তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করতো ইসলামকে প্রতিরোধ করতে, মুসলমানদেরকে পুনরায় কাফের রূপে দেখতে চাইত। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[২]

মুসলমানদেরকে কাফের বানাবার অপচেষ্টা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করার পর ইসলাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নতি করতে থাকে। প্রথম যুদ্ধ বদরের রণাঙ্গণে পৌত্তলিক শক্তি মুসলমানদের নিকট পরাজিত হলো, তৃতীয় হিজরীতে পুনরায় ওহুদের রণাঙ্গনে যুদ্ধ হলো। এতেও মুসলমানদের ধ্বংস করা সম্ভব হলোনা, দিনে দিনে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইসলামের প্রচার-প্রসার উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। এমন অবস্থায় মদীনায়ে তৈয়্যেবার অধিবাসী ইহুদীরা হিংসায় আত্মহারা হয়ে উঠল, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। অথচ তাদের নিকট যে তৌরাত রয়েছে তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভূয়সী প্রশংসা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ দূরাত্মা ইহুদীরা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো এবং মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় মেতে উঠত। এমনকি মুসলমানদেরকে পুনরায় তারা কাফের রূপে দেখতে চাইত। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ "হে মোমেনগণ! তোমরা মনে রেখ এবং সতর্কতা অবলম্বন কর যে, আহলে কিতাব

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৬
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৬৬

তথা দূরাত্মা ইহুদীদের একান্ত আকাংক্ষা এই, কোন প্রকারে আবার তোমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করে। অথচ পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা তাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং উদ্ভাসিত। এ সম্পর্কে তাদের আদৌ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তারই কারণে তারা এমনি অন্যায় আচরণে লিপ্ত। অতএব, হে মুসলমানগণ! এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা তাদের এ অন্যায় আচরণ সহ্য করতে থাক, তাদেরকে মাফ করতে থাক, আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ পাক সর্ব শক্তিমান। তিনি যে কোন সময় তাদের শাস্তি বিধান করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কোন কাজ হেকমত ব্যতীত হয়না।

মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার অপচেষ্টা অব্যাহত

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন, যেন তারা কাফেরদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। কেননা, তারা মুসলমানদের অন্তরে নতুন নতুন প্রশ্নের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করার অপচেষ্টা করতো, যাতে করে মুসলমানগণ সন্দিহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং কাফেরে পরিণত হয়। কাফেরদের এ অপচেষ্টা শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং যুগে যুগে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলেছে। এমনকি, আজও সে ষড়যন্ত্র আরও আধুনিকতম উপায়ে অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ দরিদ্র মুসলিম দেশ সমূহে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে গোমরাহ করার অপচেষ্টা করছে। এতদ্ব্যতীত, তাদের পন্ডিতরা ইসলাম সম্পর্কে বই-পুস্তক রচনা করে ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে আক্রমণ করে চলেছে। তারা ওহী, নবুওয়্যত, এবং ইসলামের উপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারা ইসলামের ইতিহাস, পবিত্র কোরআনের তফসীর, হাদীস, ফেকাহ, ইসলামী ফেকাহর ক্রমবিকাশ এক কথায় সব বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচনা করে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াসী হচ্ছে, এজন্যে তারা কয়েক প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেঃ

(১) তাদের রচিত গ্রন্থ সমূহ দ্বারা নবুওয়্যত, ওহী, কোরআন, হাদীস সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

(২) মুসলমানদেরকে তাদের অতীত সম্পর্কে নিরাশ করা।

(৩) ইসলামের জ্ঞান ভান্ডার থেকে মুসলমানদের আস্থা এবং বিশ্বাস বিনষ্ট করা।

(৪) মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব ভাব এবং মমত্ববোধকে দুর্বল করা এমনকি, পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা। এসবই তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মওলানা আবদুল হক সাহেব (রঃ) তাঁর তফসীরে হাক্কানীতে লিখেছেনঃ

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে সব কথা শ্রবণ করলে ইসলামী আকায়েদ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেগুলো শ্রবণ করাও হারাম। এজন্যে পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করা বা তাতে চাকুরী করা, বা তাদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে সহযোগিতা করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম বা অবৈধ। এমনিভাবে অন্যান্য বাতিল ফেরকার লোকদের সঙ্গে তাদের ইসলামী আকীদা বিরোধী কার্যাবলীতে সহযোগিতা করা বা সমর্থন করা সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম কাজ।[১]

যেমন কাদিয়ানী এবং শিয়া ফেরকার লোকেরা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত থাকে, এদের থেকেও দূরে থাকা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

এ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্বের আয়াতের فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا এর সাথে। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! এ কাফেরদেরকে ছেড়ে দাও, মাফ কর, এদের সঙ্গে বিতর্কে গিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট করোনা, অপেক্ষা কর আল্লাহ পাকের হুকমের, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি সিদ্ধান্ত করেন এবং তোমাদের বিজয়ের জন্যে তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখ। ঈমানী শক্তি অজনে সচেষ্ট থাক।

ঈমানী শক্তির মূল উৎস

এজন্যেই এরশাদ হয়েছে, তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর কেননা, নামাজ ও যাকাতই হলো ঈমানী শক্তির মূল উৎস। নামাজের জামাআতের মাধ্যমে মুসলমানদের সমন্বিত এবং সম্মিলিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়। দৈহিক এবাদত হয় নামাজের মাধ্যমে, আর আর্থিক এবাদত হয় যাকাতের মাধ্যমে এবং নামাজ ও যাকাত উভয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়। এজন্যে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু হলো সর্ব শক্তিমান, সর্বগুণাকর, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত এবং করুণাময় মহিমময় আল্লাহ পাকের এবাদত।

এ সম্পর্কে হযরত মওলানা কাসেম নানুতবী (রঃ)-এর একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ যেভাবে রৌদ্রের তাপ তার স্থায়ীত্বের জন্যে সর্বক্ষণ সূর্যের মুখাপেক্ষী, সূর্যের সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন হলে তাপ তো দূরের কথা আলোর অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়না, ঠিক তেমনি মানুষকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে, বিশ্ব মানবকে সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে হলে, সর্বক্ষণ স্রষ্টা ও পালনকর্তা

১। তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭৪

আল্লাহ পাকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সর্বদা তাঁর মহান দরবারে মিনতি জানাতে হবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতে হবে, এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

كان يذكر الله فى كل احيانه

অর্থাৎ তিনি সর্বদা আল্লাহ পাকের স্মরণ করতেন।

তাই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অর্থাৎ আমার স্মরণের জন্যে নামাজ কায়েম কর।

আর পবিত্র কোরআনে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছেঃ তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো, আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, শোকর গুজাব হও, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক যাকে স্মরণ করবেন তার মর্যাদা হবে সর্বোচ্চে, তার শক্তি হবে সর্বাধিক। মূলতঃ এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে আদেশ হয়েছেঃ

وَاَقِيمِ الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

নামাজ কাযেম কর, যাকাত আদায় কর, আর

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

যা কিছু কল্যাণকর কাজ তোমরা নিজেদের উপকারার্থে করে পাঠাচ্ছ আল্লাহ পাকের নিকট, তার বিনিময় অবশ্যই পাবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"তিনি কারো সাধনা ব্যর্থ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না"।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে خير শব্দটি নামাজ যাকাত প্রভৃতি সৎ কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, সৎ কাজের যা কিছু পুঁজি তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রেরণ করবে তা আদৌ বেকার যাবে না; বরং ইহকালীন ও

পরকালীন জিন্দেগীর কামিয়াবীর উপকারণ হবে। কেননা, ইসলামের বিধান দু'টি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর কায়েম হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক এবং অপরটি জাগতিক। ইসলামের আধ্যাত্মিক ভিত্তি হলো নামাজ। আর জাগতিক ভিত্তি হলো যাকাত। এজন্যে পবিত্র কোরআনে নামাজ এবং যাকাতের তাগিদ রয়েছে শতাধিক আয়াতে। যদিও خير শব্দটির ব্যবহার এখানে নামাজ ও যাকাত উভয় সৎ কাজের জন্যেই হয়েছে, কিন্তু কোরআনে করীমের এ শব্দটি ধন-দৌলত বা টাকা পয়সার অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرَاْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ

এ সমস্ত আয়াতে এ শব্দটি অর্থ সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এতদ্বারা একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতে সে সব নেক কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যা অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে অর্থ-সম্পদের মূল মালিক স্বয়ং আল্লাহ পাক। মানুষের নিকট সে সম্পদ রয়েছে আমানত স্বরূপ, এজন্যে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করা এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর এ কর্তব্য যথাযথ ভাবে কে পালন করছে, আর কে পালন করেনা, তা প্রত্যেক্ষ করছেন স্বযং আল্লাহ পাক। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন"।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى- الاية

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন নাজরান নামক স্থান থেকে খৃষ্টানদের এক বিরাট প্রতিনিধি দল হাযির হয়, তখন তারা বলে খৃষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এদিকে ইহুদীরা দাবী করে ইহুদী ব্যতীত আর সকলের জন্যে জান্নাতের দ্বার রুদ্ধ।[১]

১। মোয়ালেমুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫০৩

নাজাতের একমাত্র পন্থা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ মিথ্যা দাবীর বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বকালের মানুষের জন্যে এ চিরন্তন ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, বেহেশত কারও ব্যক্তিগত, সমাজগত বা গোত্রীয় সম্পত্তি নয়, বরং বেহেশত আল্লাহর নেয়ামত। যে বা যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে, তাদের জন্যেই রয়েছে বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামত।

যারা দাবী করেছে ইহুদী ও খৃষ্টানদের জন্যেই বেহেশত সংরক্ষিত রয়েছে, তাদের এ দাবী যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কল্পনা-প্রসূত একথা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াতে। দ্বিতীয়তঃ একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, নাজাতের একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য। ঈমানের সম্পদ লাভ হলে সেই ঈমান মোতাবেক নেক আমল করার তওফিক পাওয়া যায়। ঈমান ব্যতীত নেক আমলের কথা চিন্তাও করা যায় না, আর নেক আমল ব্যতীত ঈমান অপূর্ণ। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহ পাকের দরবারে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেবে, আত্মসমর্পণ করবে, আর সে নেককারও হবে, তবে তার জন্যে চির শান্তি নিকেতন বেহেশত সংরক্ষিত রয়েছে। আর এজন্যেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"তাদের কোন ভয়ও নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى
لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۗ
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَ
اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾

তরজমা

(১১৩) এবং ইহুদীরা বলে যে, খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই নয় এবং খৃষ্টানরা বলে যে, ইহুদীদের ধর্ম কিছুই নয়, অথচ তারা সকলেই কিতাব পড়ে, এমনিভাবে অজ্ঞ লোকেরাও তাদের মত কথা বলেছে। অতএব, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, যে বিষয় তারা বিরোধ করেছে।

(১১৪) এবং তদপেক্ষা অত্যাচারী কে? যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর মসজিদ সমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয়, আর তাকে উজাড় করতে চেষ্টা করে (অথচ) তাদের জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ব্যতীত সে ঘরে প্রবেশ করাই উচিত নয়। তাদের জন্যে রয়েছে এ জগতে অপমান এবং পরজগতে কঠিন শাস্তি।

(১১৫) এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমস্ত আল্লাহ্ পাকেরই। তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টি বিদ্যমান, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অনন্ত দাতা। তিনি মহাজ্ঞানী।

(১১৬) এবং তারা বলে যে, আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি ধারণ করেন অথচ আল্লাহ পাক সব কিছু থেকে পবিত্র, বরং আসমান যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, সব কিছুই তাঁর তাবেদার।

(১১৭) আসমান এবং যমীনের নব স্রষ্টা তিনিই। যখন তিনি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন "হও", ফলে তা হয়ে যায়।

তফসীরুল কোরআন

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ

শানে নুযুল

বর্ণিত আছে, নাজরান থেকে খৃষ্টান প্রতিনিধিদল যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়, তখন মদীনা শরীফের ইহুদী ধর্মযাজকরা খৃষ্টানদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ কথা-বার্তা উচ্চস্বরে হতে থাকে। তৌরাতের পাঠক ইহুদীদের নিকট একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহে মিন যালিক) বলে দাবী করে, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা বেহেশতে কোন দিন যেতে পারবে না। তার-ই পাশাপাশি খৃষ্টানদের বক্তব্য হলো, ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, তারা কোন অবস্থাতেই বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবেনা। তখন এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।[১]

আর যেহেতু মুশরেক বা পৌত্তলিকরাও ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মত সকলকে নিঃসংকোচে পথভ্রষ্ট বা ধর্মহীন বলে বেড়াত, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ ইসলামের এ দুশমনরা যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আল্লাহ পাক স্বয়ং কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের মত বিরোধের মীমাংসা করবেন এবং তাদের সম্পর্কে হুকুম দান করবেন।

কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তার এলম তো শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, তবে দুনিয়াতে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, তা এখানে পেশ করা যেতে পারে।

নিকৃষ্ট সৃষ্টি

যারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করবে না, যারা তাঁর নাফরমানী করবে, অস্বীকার করবে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে, অমান্য করবে সর্বশেষ

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৬৫

ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে, তারা নিকৃষ্ট সৃষ্টি, তাদের ভয়াবহ পরিণাম অবধারিত। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সূরা বাইয়্যেনায় এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"নিশ্চয় যারা হবে অবাধ্য নাফরমান, তারা আহলে কিতাব হোক বা মুশরেক, দোযখের অগ্নিতেই তারা চিরকাল থাকবে, তারাই তো নিকৃষ্ট সৃষ্টি"।

উত্তম সৃষ্টি

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হবে, তাদের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারাই উত্তম সৃষ্টি, তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বিনিময়। (আর তা হলো) চিরদিন অবস্থানের জন্যে বাগান সমূহ, যার তলদেশে নির্ঝরণী সমূহ প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে"।

আলোচ্য আয়াতে وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ ইহুদীরা খৃষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছে, আর খৃষ্টানরা ইহুদীদেরকে ধর্মহীন, গোমরাহ বলে প্রচার করেছে অথচ উভয় পক্ষই আসমানী কিতাব পাঠ করছে, কিন্তু সেই আসমানী কিতাবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করেনা, বরং অমান্য করে আসমানী কিতাবের নির্দেশ।

কেননা, তৌরাতে ও ইঞ্জিলে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে। যদি ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের নিকট সংরক্ষিত কিতাবের হেদায়েত মেনে চলতো তবে তারা অবশ্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হওয়ার গৌরব অর্জন করতো।

এ বাক্যটিতে মুসলমানদের জন্যেও রয়েছে সতর্কবাণী, যেন মুসলমানগণ সে রোগে আক্রান্ত না হয়, যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এবং পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে।[১]

১। মোয়ালেমুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১৪

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ-الاية

শানে নুযুল

এবনে জরীর আবদুর রহমান এবং এজীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৪শ' সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। এ সফর ছিল শুধুই কা'বা শরীফের তওয়াফ, জেয়ারত এবং নামাজের উদ্দেশ্যে। কোন প্রকার যুদ্ধের চিন্তাও তাতে ছিল না। মুসলমানগণ ছিলেন নিরস্ত্র। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকরা মক্কার অদূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বাধা দেয়, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।[১]

সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বায়তুল্লাহ শরীফ গমনে বাধাদানকারী পৌত্তলিকদেরকে সবচেয়ে বড় জালেম বলে আখ্যা দেন। তাই এরশাদ হয়েছে, তদপেক্ষা জালেম কে হবে? যে আল্লাহর মসজিদ সমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং মসজিদকে উজাড় করার প্রয়াস পায়। এ প্রশ্নের জবাব হলো সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম, যে মসজিদে আল্লাহর জিকর করতে মানুষকে বাধা দেয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), আতা (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, খৃষ্টান রাজা তাইতুস এবনে আছিয়ানুস রুমী ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তখন সে বায়তুল মোকাদ্দাসকে তছনছ করেছিল, তৌরাত পুড়িয়ে দিয়েছিল, এ ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রঃ) লিখেছেন যে, উভয় ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযুল হতে পারে এবং যে কেউ কোন মসজিদে আসতে বাধা দেয় বা মসজিদ উজাড় করার অপচেষ্টা করে, তার জন্যেও আয়াতে বর্ণিত হুকুম রয়েছে।[২]

আল্লামা আবদুল হক হক্কানী লিখেছেন, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে নামাজে রত ছিলেন। এই সময় কুখ্যাত আবু জেহেল একটি চাদর তাঁর গলায় লাগিয়ে অত্যন্ত জোরে টান দেয় এবং তাঁকে ভীষণ কষ্ট দেয়। এমনিভাবে অন্য একদিন কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করছিলেন। তিনি যখন সেজদায় রত হন তখন তাঁর পৃষ্ঠ মোবারকে উষ্ট্রের নাড়ী-ভূড়ি রেখে দেয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২০১
২। শায়খুল হিন্দ (রঃ), পৃষ্ঠা-২২

আর এমনিভাবে হযরত আবু জর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে তাঁকে অত্যন্ত বেশী প্রহার করা হয়, তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত হয়। দূরাত্মা পৌত্তলিকরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে একবার প্রহার করতে করতে সংজ্ঞাহীন করে ফেলেছিল এবং তাঁর এবাদতের জন্যে নির্মিত ঘরটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছিল।

এমনিভাবে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কা'বা শরীফের তওয়াফে আসতে বাধা দিয়েছিলো এবং তাদেরকে বহুভাবে বোঝাবার পরও তারা তাদের জেদ পরিত্যাগ করেনি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মদীনা তৈয়্যেবায় ফিরে যেতে হয়। এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।[১]

সর্বশ্রেষ্ঠ জালেমের শাস্তি

لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ

অর্থাৎ তাদের জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান, আর আখেরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

ইতিহাস সাক্ষী! মক্কার মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে। তাদেরকে কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে আসতে বাধা দিয়েছে, আল্লাহর ঘরে মূর্তি রেখে তাকে উজাড় করার অপচেষ্টা করেছে।

এজন্যেই কোরআনে হাকীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ তারাই আল্লাহর অবাধ্য, কাফের। তারা পবিত্র কা'বা শরীফে যেতে তোমাদেরকে বাধা দিয়েছে।

মূলতঃ মসজিদকে তারাই উজাড় করেছে কেননা, মসজিদে যদি আল্লাহর এবাদত করতে না দেয়া হয় তবে তার অর্থই হলো মসজিদকে উজাড় করা। আর মসজিদে যদি আজান একামত হয়, নামাজ হয়, আল্লাহর বন্দাগণ নিঃশঙ্ক মনে, নির্ভীক চিত্তে আল্লাহর এবাদত করতে পারে, তখনই মসজিদকে আবাদ করা হয়, শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধনের মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা সম্ভব হয় না, যে পর্যন্ত না তাতে আল্লাহকে স্মরণ করার এবং তাঁর বন্দেগীর পূর্ণ সুযোগ না থাকে। বর্তমান

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৩

পৃথিবীর বহুদেশে অনেক মসজিদ উজাড় হয়ে আছে। বিশেষতঃ যে সব দেশে এককালে মুসলমানদের হুকুমত ছিল, মুসলমানগণ তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল যুগে সুন্দরতর করে মসজিদ নির্মাণ করে।

কিন্তু মুসলমানদের ক্ষমতা হারা হওয়ার কারণে অমুসলিমদের প্রভাব, শক্তি এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে সব দেশ থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত হতে হয়েছে, অথবা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় জীবন যাপন করতে হচ্ছে, আর মসজিদ সমূহ এখন উজাড় অবস্থায় পড়ে আছে। এখন কোন কোন দেশের পূরাতত্ত্ব বিভাগ ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ মসজিদ সমূহের দেখাশুনা করছে, কিন্তু তাতে আল্লাহর এবাদতের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যদিও বায়তুল্লাহ শরীফের বিশেষ ঘটনায় এ আয়াত নাযিল হয়েছে কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের কালাম চিরন্তন, তাঁর ঘোষণা সর্বকালের জন্যে, তাই মসজিদ শব্দের বহুবচন "মাসাজেদ" শব্দটি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং যেভাবে মক্কার মুশরেকদের জন্যে দুনিয়াতে অবমাননা এবং আখেরাতে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, তেমনিভাবে যে বা যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর মসজিদকে উজাড় করার চেষ্টা করবে তাদের জন্যেও উপরোল্লিখিত শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

লন্ডনে সর্বপ্রথম মসজিদ

পক্ষান্তরে, যে বা যারা মসজিদ নির্মাণ কাজে বা মসজিদকে আবাদ রাখার ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করবে, আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়াতে সম্মানিত করবেন; এমনকি যদি সে অমুসলিম হয়, তবুও তার প্রাপ্য সম্মান সে অবশ্যই পাবে।

বর্ণিত আছে, ইংলন্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তদানীন্তন কালের বিখ্যাত সুফী বুজুর্গ হযরত মওলানা শাহ ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী (রঃ)-এর খেদমতে দোয়া-প্রার্থী হয়ে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুরাদাবাদী (রঃ) কয়েকটি "বাতাসা" তাকে দিয়ে বলেছিলেন, এগুলো রাণী ভিক্টোরিয়াকে খেতে বলবেন, আর লন্ডনে আজান একামতের ব্যবস্থা করতে বলবেন।

রাণী ভিক্টোরিয়া তাই লন্ডনে সর্ব প্রথম মসজিদ নির্মাণ করলেন। ঠিক এগারো মাস পর তার সন্তান হলো, তিনি মাতৃত্বের গৌরব অর্জন করলেন, আর তা করলেন মসজিদ নির্মাণের বরকতে।[১]

مَسْجِدَ اللّٰه

সমগ্র পবিত্র কোরআনে "মসজিদ" শব্দটি আল্লাহ পাক ২৮ বার ব্যবহার করেছেন। এতদ্বারা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। মসজিদ যে আল্লাহর ঘর– শান্তির নীড়; ইসলামী জিন্দেগীর প্রাণকেন্দ্র, এতে একথাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়। এ পর্যায়ে দু' একখানি আয়াতের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১। মাসিক হুদা (দিল্লী থেকে প্রকাশিত), মে-১৯৮২ সংখ্যা

আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"এবং নিশ্চয় মসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্যে, সুতরাং আল্লাহর সাথে আর কারো প্রার্থনা (এবাদত) করোনা"।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"যারা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে, শুধুমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদ সমূহ আবাদ করে থাকে"।

অন্য একখানি আয়াত শরীফে আছেঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

"তারা এমন ঘর সমূহে আছে, যে-ঘর (মসজিদ) সম্পর্কে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন যে, ঐগুলির সম্মান করা হোক এবং ঐগুলির মধ্যে আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হোক। ঐগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যায় লোকেরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে"।

এমনিভাবে মসজিদ সম্বন্ধে হাদীস শরীফে আছে, হযরত ওসমান (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে সেরূপ একটা ঘর নির্মাণ করবেন"।

অন্য একটি বর্ণনায় আছেঃ

بنى الله بيتا فى الجنة

অর্থাৎ "আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের কাছে সব চেয়ে প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ সমূহ এবং আল্লাহর কাছে দুনিয়ায় সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান হচ্ছে তার বাজার সমূহ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নিজ গৃহে পবিত্রতা অর্জন

করে, এরপর আল্লাহর ফরজ সমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্যে থেকে একটি ঘরের দিকে রওয়ানা হয়, তার পদক্ষেপগুলোর একটি তার গুনাহ মুছে দেয় এবং অপরটি তার মর্যাদা বুলন্দ করে দিতে থাকে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ নামাজে অধিক সওয়াব সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অপেক্ষা করে নামাজের এবং ইমামের সাথে জামাআতে নামাজ পড়ে, সে ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক সওয়াব পাবে যে (দ্রুত) নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেনঃ

بشر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيمة

"অন্ধকার বেলায় যারা মসজিদে গমন করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর"।

হযরত সালমান (রাঃ) হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর কাছে লিখলেন, হে ভাই! মসজিদ যেন তোমার গৃহ হয়। কারণ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মুত্তাকীনদের গৃহ হলো মসজিদ। আর মসজিদ যাদের গৃহ হয়েছে তাদের আরাম ও রহমতের জিম্মাদারী এবং পুলছেরাত অতিক্রম করিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) থেকে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেনঃ মসজিদ সমূহ মানুষের খুঁটি স্বরূপ। আর মসজিদে তাদের সঙ্গী হলো ফেরেশতাগণ। সুতরাং যখন তারা তাদের সঙ্গীদেরকে হারায় তখন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যদি তারা অসুস্থ থাকে তবে ফেরেশতাগণ তাদের সেবা-শশ্রুষা করে। আর যদি কোন প্রয়োজনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে ফেরেশতাগণ তাদের সাহায্য করে।

মূলতঃ মসজিদ হলো মুসলিম জীবনের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামী জিন্দেগীর কথা বললেই মানসপটে ভেসে ওঠে মসজিদের পবিত্র, নয়নাভিরাম দৃশ্য যা মনকে করে দেয় স্নিগ্ধ-সুন্দর। মসজিদের এমনি গুরুত্ব রয়েছে বলেই প্রিয়নবী হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদের ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনা করে আরও এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি কূপ খনন করে আর সে কূপের পানি দ্বারা যদি কোন তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারন হয়, তবে কূপ খননকারী বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, তার জন্যে জান্নাতের মধ্যে

মসজিদের সমতুল্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়, সে মসজিদ যত ক্ষুদ্র হোক না কেন, অর্থাৎ সকল মসজিদ নির্মাণকারীর স্থানই জান্নাতে হবে, সে যত ছোট মসজিদই নির্মাণ করে থাকুক। (এবনে খোজায়মা)

মসজিদ নির্মাণ করা সদকায়ে জারীয়ার অন্তর্ভুক্ত। (এবনে মাজা)

অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণকারী মৃত্যুর পরও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব পেতে থাকে।

মসজিদের ঝাড় দেয়া, মসজিদকে পাক-সাফ রাখা, মসজিদের ভেতর থেকে কুটা-লাকড়ী কুড়িয়ে ফেলা ও মসজিদের মধ্যে খুশবু ছিটিয়ে দেয়া, বিশেষ করে জুমআর দিন মসজিদের মধ্যে খুশবু ছিটিয়ে দেয়া প্রভৃতি কাজের দ্বারা জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত। (আবু দাউদ, এবনে মাজা)

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে মসজিদের গমন করে, তার একটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং তার মর্যাদার একটি স্তর উন্নীত করা হয়। যখন সে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণের কাজ অব্যাহত রাখেন। এরপর সে ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে তবে এতে তার নামাজের সওয়াবই হাসিল হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদে অপরকে কষ্ট না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফেরাত কামনা করতে থাকেন। (বোখারী ও মুসলিম)

জামায়াতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনকারীর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে নেকী লিখিত হয় এবং তার একটি করে গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (এবনে হাব্বান)

যে ব্যক্তি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে অজু করে মসজিদে গমন করে এবং ইমামের সাথে নামাজ আদায় করে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (এবনে খোযায়মা)

যে ব্যক্তি অজু করে গৃহ থেকে কেবল মাত্র নামাজের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে গমন করে, সে ব্যক্তি যখন মসজিদে উপস্থিত হয় তখন আল্লাহ পাক তার প্রতি এমনই সন্তুষ্ট হন, যেমন কোন ব্যক্তি দীর্ঘ দিনের সফর শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে দেখে তার পরিবার-পরিজন সন্তুষ্ট হয়। (এবনে খোযায়মা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

رب اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك

"হে আমার রব! আমার গুনাহ সমূহ মাফ করে দাও। আর তোমার রহমতের দরজা সমূহ আমার জন্যে খুলে দাও"।

যখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

رب اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك

"হে আমার রব! আমার গুনাহ সমূহ মাফ করে দাও এবং তোমার দানের দুয়ার সমূহ আমার জন্যে খুলে দাও"।[১]

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ পাকেরই, যেদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ পাকের দৃষ্টি বিরাজমান। একথা বিশেষভাবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পাক অনন্ত দাতা, তিনি মহাজ্ঞানী"।

এ আয়াতে وَجْهُ اللّٰهِ এর তফসীর হাসান (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এভাবেই করেছেন। আবার অনেক মুফাচ্ছের বলেন যে, যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহর রেজামন্দি আছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াত রূপক অর্থ বোধক। যেমন.

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

(সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু মাত্র তাঁর চেহারাখানি ব্যতীত) এবং

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

(আল্লাহর হাতখানি তাদের হাতের উপরে স্থাপিত) এগুলো রূপক অর্থবোধক। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মুসলিম, তিরমিজী ও নাসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে আছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারায় গমনকালে যানবাহন যেদিকেই তাকাতো, তিনি বাহনের পৃষ্ঠে থেকে নফল পড়তে থাকতেন। এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত এবনে ওমর (রাঃ) প্রমাণস্বরূপ আয়াত– وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (পূর্ব ও পশ্চিমে আল্লাহই বিরাজিত) পাঠ করলেন।

হাকেম বর্ণনা করেন যে, মুজাহেদ (রঃ) বলেনঃ আয়াত

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

এর অর্থ হলো যেদিকে তোমাদের বাহনের মুখ হবে সেদিকেই নফল পড়ে নাও।

১। তফসীরে-কবীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫০-৫১

হাকেম বলেন, মুসলিম শরীফের শর্ত মোতাবেক হাদীসের এটা সঠিক অর্থ।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পর যখন আয়াত

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا

(সেই কেবলা থেকে তাদেরকে কোন্ বিষয়টি ফিরিয়ে দিল যে কেবলা তারা আগে অবলম্বন করেছিল) নাযিল হলো তখন তার জবাবে আয়াত–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

(পূর্ব ও পশ্চিমে আল্লাহই বিরাজিত) নাযিল হয়েছিল।

মোট কথা, তিরমিজী, এবনে মাজাহ এবং দারে কুতনীতে বর্ণিত হাদীসে হযরত রাবিআ (রাঃ) বলেন যে, একবার আমরা অন্ধকার রাত্রে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করছিলাম। নামাজের সময় কেবলা কোন্ দিকে আছে কেউ জানতে পারেননি। সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী নামাজ আদায় করলেন। এরপর যখন সকালে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে বিষয়টি উপস্থাপন করলাম, তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো।

বায়হাকী এবং দারে কুতনীতে রয়েছে, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার একটি ক্ষুদ্র সেনাদল কোন স্থানে প্রেরণ করেছিলেন। তাতে আমিও ছিলাম। পথে অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ধরলো। কেবলা কোন্ দিকে বোঝা গেল না। সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী নামাজ আদায় করলো এবং যেদিকে নামাজ পড়লো সেদিকে একটি করে রেখা টেনে রাখলো। সকালে দেখা গেলো ঐসব রেখা কেবলার দিকে ছিল। এরপর যখন আমরা সফর শেষে ফিরে আসলাম তখন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি ঘটনাটি শ্রবণ করে নীরব রইলেন। তখনই আল্লাহ পাক আয়াত ولله المشرق নাযিল করেন।

এবনে মরদবিয়া হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর বিবরণে একথাটি আরও সংযোজন করা হয়েছে যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে কেবলা নির্ণয় করা যাচ্ছিল না।

এবনে জরীর (রঃ) মুজাহেদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন আয়াত اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করবো।) নাযিল হয় তখন আরবের লোকেরা জানতে চাইলো যে, আল্লাহ পাক কোথায় আছেন যে, আমরা তাঁর কাছে দোয়া করবো? এর জবাবে আয়াত وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ নাযিল হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা–২০১-০২

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ

আর আহলে কিতাবরা বলে, আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি ধারণ করেন (নাউজুবিল্লাহে মিন যালিক) কিন্তু আল্লাহ পাক সব কিছু থেকে পবিত্র, বরং আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তার সৃষ্টি, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থেকে তাঁর শান, তাঁর মকাম, তাঁর মর্যাদা ও মহিমা অনেক অনেক উর্দ্ধে, বিশ্ব নিখিল তাঁর সৃষ্টি, আর এমন সৃষ্টি যে, তিনি "কুন" তথা "হও" বললে, তা হয়ে যায়। অতএব, তাঁর সম্পর্কে এমন কথা চিন্তা করা অমার্জনীয় অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকের কোন সন্তান নেই।

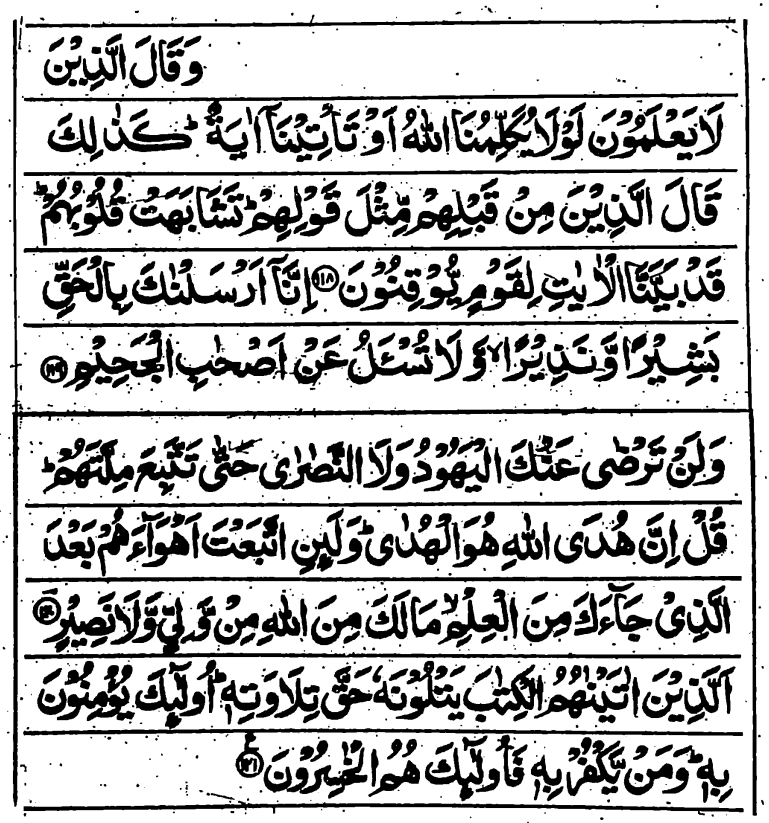
আল্লাহ পাকের কোন সন্তান নেই, সবই তাঁর সৃষ্টি

এ আয়াত এবং এর সাথের আয়াতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে খৃষ্টানদের ন্যায় ইহুদী এবং মুশরেকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কারণ এরাও আল্লাহ পাকের সন্তান আছে বলে ভ্রান্ত মত পোষণ করে থাকে। সুতরাং এদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, আসমান যমীন ইত্যাদি সব কিছুর মালিকই যখন আল্লাহ পাক এবং তিনিই এসবের সৃষ্টিকর্তা, এদেরকে আহার দাতা, তাদের নিয়ন্ত্রণকারী ও এদের মধ্যে পরিবর্তনকারী যখন আল্লাহ পাকই, তখন তাঁর সৃষ্ট বস্তু কেন তাঁর সন্তান হতে যাবে? ওজায়ের (আঃ)-ও আল্লাহর পুত্র হতে পারেন না, আর ঈসা (আঃ)-ও আল্লাহর পুত্র হতে পারেন না– যেরূপ ইহুদী এবং খৃষ্টানরা বলে থাকে। আরবের মুশরেক সম্প্রদায় যেরূপ মত পোষণ করতো যে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা তা-ও অবাস্তব, অসম্ভব, অকল্পনীয়। কারণ, পিতা এবং সন্তানকে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ পাকের সমান বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কোন কিছুই হতে পারেনা। তাঁর সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয় না, কোন কিছুর উদাহরণ দেয়া যায় না। তাঁর মহত্বের সমকক্ষতায় কোন কিছু দন্ডায়মান হতে পারে না, তাহলে তাঁর সন্তান কিভাবে হবে? তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন। করুণাময়, দয়াময় আল্লাহর সন্তান হতে পারে এরূপ দুর্বল এবং আজব কথা তোমরা বলতে চাও? এত নিকৃষ্ট কথা মুখ থেকে বের করছো যে, এ কথার দ্বারা আসমান সমূহ ফেটে যাবে, যমীন চৌচির হয়ে যাবে এবং পাহাড় সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তারা দাবী করছে যে, আল্লাহ পাক সন্তান বিশিষ্ট। কিন্তু তাঁর সন্তান হতেই পারে না। কারণ তাঁকে ছাড়া যা-কিছু আছে সব কিছুরই তিনি মালিক। আসমান যমীনের সব বস্তুই তাঁর দাসত্বের সদস্য এবং এগুলোর প্রত্যেকটিকেই তিনি ঘিরে রেখেছেন। এদের প্রত্যেককেই কেয়ামতের দিন একা একা তাঁর দরবারে পেশ করা হবে। সুতরাং দাস কখনও সন্তান হতে পারে না। মালিকানাধীন বস্তু হওয়া এবং সন্তান হওয়া- দুটি পৃথক এবং পরস্পর বিরোধী অবস্থা। অন্যত্র পূর্ণ সূরায় তাঁর সন্তান না হওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক এক। আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আর তিনিও কারো সন্তান নন। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই"।[১]

এ পর্যায়ে বোখারী শরীফে সংকলিত একখান হাদীস এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করে, অথচ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়, সে আমাকে গালি দেয় আর তা কোন অবস্থাতেই সমীচিন নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, সে মনে করে তার মৃত্যুর পর আমি তাকে পুনরায় জীবিত করতে পারবো না। আর গালি দেয়ার অর্থ সে আমার সন্তানের কথা বলে অথচ আমি এসব কিছু থেকে পবিত্র, মহান, স্ত্রী, পুত্র পরিবারের সম্পর্ক থেকে বহু উর্দ্ধে।


وَقَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۭ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۭ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۞ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۞
وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۭ
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۭ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۗءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِيْ جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖٓ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৭২

তরজমা

(১১৮) এবং মূর্খ লোকেরা বলে থাকে, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন কেন আসে না? ঠিক এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছিল। একই প্রকার তাদের মন। নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে আয়াত সমূহ বর্ণনা করেছি।

(১১৯) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য কথা নিয়ে সু-সংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরূপে প্রেরণ করেছি। আর আপনাকে দোযখীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা।

(১২০) এবং ইহুদী ও খৃষ্টানরা কোন দিনও (হে রসূল!) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা যে পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করেন। আপনি বলে দিন, আল্লাহ পাক যে পথ প্রদর্শন করেন তাই সরল সঠিক পথ। আর যদি (হে রসূল!) জ্ঞান লাভের পরও আপনি তাদের ভাবাবেগের অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ পাকের হাত থেকে রক্ষাকারী আপনার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নাই।

(১২১) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তা পড়ার মত পড়ে, তারা উক্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, পক্ষান্তরে, যারা অবিশ্বাস করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তফসীরুল কোরআন

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

মূর্খ লোকেরা এমন উদ্ভট মন্তব্য করতো যে, আল্লাহ পাক শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কেন কথা বলেন, আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না।

এ মূর্খ লোক কারা? তফসীরকারগণ এর জবাবে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম কাতাদাহ (রঃ) বলেন, এ মূর্খ লোক হলো আরবের মুশরেক বা পৌত্তলিকরা।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেন, খৃষ্টানরা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইহুদী।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এবং আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

শানে নুযুল

রাফে এবনে খুযাইমা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, "যদি আপনি সত্য (নবী) হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ পাক নিজে কেন সে কথাটি

আমাদেরকে বলে দেন না? আমরা নিজে বিষয়টি তাঁর ভাষায় শ্রবণ করি"। একথার দরুণ উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেন যে, কথাটি বলেছিল খৃষ্টানরা।[১]

এবনে জরীর (রঃ) এটা সমর্থন করতে গিয়ে বলেন যে, এটাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইহুদীদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে আয়াতের বাণী ব্যক্ত হয়েছে।

ইমাম কুরতবীর (রঃ) বক্তব্য হলো, তারা বলেছিল, "আপনার নবী হওয়ার সংবাদ আল্লাহ পাক নিজে কেন আমাদেরকে দিচ্ছেন না"? এ বক্তব্যই ঠিক হবে, বাকী আল্লাহ পাক অধিক জানেন।

কোন কোন মুফাচ্ছের বলেন, কথাটি ছিল আরবের কাফের সম্প্রদায়ের। এরপর আয়াতে যে বলা হয়েছে এরূপ কথা আহলে এলম বা শিক্ষিত লোকেরাও বলেছিল, এর দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ তাদের নিকট যখন কোন আয়াত আসে তখন তারা বলে, আমরা (এসব) মানি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর রসূলগণকে যা প্রদান করা হয়েছে তা আমাদেরকে না দেয়া হয়।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآئَنَا-الاية

অর্থাৎ আমার সাথে মোলাকাতকে যারা অস্বীকার করে তারা বলে যে, আমাদের নিকট ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হয় না? অথবা আল্লাহ পাক আমাদের সম্মুখে কেন প্রকাশিত হন না। ইত্যাদি।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ -الاية

"তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাদেরকে সরাসরি কোন কিতাব দেয়া হয়"।

এ সকল আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে আরবের মুশরেক সম্প্রদায় কেবল মাত্র অহঙ্কার ও শত্রুতার দরুণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭১

দরবারে এমন উদ্ভট প্রশ্ন করেছিল। আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন বেয়াদবী-পূর্ণ প্রশ্ন করে তাদের বেঈমান হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করতো। অথচ জীবন-সংগ্রামে সাফল্যের একমাত্র পথ হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, বা কামেল ঈমান। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছি আমার নিদর্শন সমূহ তাদের জন্যে, যারা ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ তথা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী।

পূর্বের আয়াতে যেহেতু কাফেরদের তরফ থেকে নিদর্শনের দাবী উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন তারা ইসলামের সত্যতার কোন নিদর্শন দেখতে পায় না। এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাই এরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয় অনেক নিদর্শন পেশ করা হয়েছে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-মায়া, শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও ঔদার্য্য, আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস-ভরসা, এর সবইতো বিস্ময়কর। এ সমস্ত গুণাবলী এক সঙ্গে এক ব্যক্তির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পবিত্র কোরআন একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। কেননা, সারা আরবের সমস্ত গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমবেত প্রচেষ্টার পরও পবিত্র কোরআনের একটি বাক্যের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে সক্ষম হয়নি। শত চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে তারা বলেছে, ليس هذا كلام البشر "এটি নয় মানুষের কথা"।

বস্তুতঃ নিদর্শন হিসেবে এসব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে চায়, যে সত্য সন্ধানী হয়, যে কল্যাণকামী হয়, শুধু তাঁর জন্যেই নিদর্শন উপকারী হয়। এজন্যেই তফসীরকারগণ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, এ নিদর্শন সমূহ সে সব লোকদের জন্যে, যারা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনে প্রয়াসী হয় (এবনে জরীর)।

আর আল্লামা বয়যাভী (রঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহর প্রতি এ'কীন বা বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়।

আল্লাহর প্রতি এ'কীনই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান, পরিপূর্ণ বিশ্বাস বা এ'কীন।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার মর্ম হলো, এ উম্মতের সর্ব প্রথম সংশোধন হয় এ'কীনের মাধ্যমে।

মসনদে ইমাম আহমদে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এভাবে দোয়া করতেনঃ

اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها

"হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান, এ'কীন এবং দ্বীন ইসলামকে বুঝবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দাও"।

বিখ্যাত বুজর্গ সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, যদি কারো অন্তরে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ এ'কীন এসে যায় তবে সে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা এবং দোযখের ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যখন এ'কীনের নেয়ামত অর্জিত হয় তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। জাগতিক বিষয়ের প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে না। আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনা বৃদ্ধি পায়। পরকালীন জীবনের সাফল্যের জন্যে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লাভ-ক্ষতি তখন আর বিচার্য বিষয় থাকে না। যেমন একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ এবনে হারেসাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ প্রত্যেকটি জিনিসের একটি মূল তত্ত্ব আছে, তোমার ঈমানের মূলতত্ত্ব কি? তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর আরশের এ'কীন আমার অন্তরে এত বেশী যেন আমি স্বচক্ষে দেখছি। আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেঃ

ان تعبد الله كانك تراه -الحديث

"তুমি এভাবে আল্লাহর এবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পার তবে একথা বিশ্বাস রাখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন"।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষের জন্যে এ'কীনই হলো বিশেষ সম্পদ। এ সম্পদে যারা সমৃদ্ধ হয় তারাই প্রকৃত মোমেন। আর তাদের জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিরশান্তি নিকেতন বেহেশতের খোশখবরী নিয়ে এসেছেন। আর এটিই ইসলামী আদর্শের মূলকথা।

ইসলামী আদর্শের মূল কথা

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবকে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই, একথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করা মুসলমান হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত। অতএব, একজন মুসলমানের কথা হচ্ছে, এক আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন উপাস্য নেই, নেই কোন প্রেমাস্পদ, আমার ভালবাসা, আমার আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আমার আনুগত্য লাভের যোগ্য হলেন একমাত্র মহিমময়, লা-শরীক আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন, শুধু তাঁরই সমীপে আমি আমার উন্নত শির নত করি, আমার সকল সাধনা ও আরাধনা

প্রেমময়, করুণাময়, অনাদি অনন্ত, চির সুন্দর, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুজুরেই পেশ করি। আমার আশা শুধু তাঁরই নিকট, আমি শুধু তাঁকেই ভয় করি, এই ভাব নিয়ে, প্রাণের অদম্য আবেগ নিয়ে যখন কোন মানুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ" তখনই হয় সে প্রকৃত মোমেন, খাঁটি মুসলমান।

অতএব, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণ, অনুসরণের শপথ গ্রহণ করার নামই আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। এটিই ইসলামী আদর্শের মূল কথা। ইসলামী পরিভাষায় একে এ'কীন বলা হয়।

এ'কীনের তাৎপর্য

তাসাওউফ বা সুফীবাদে যে আধ্যাত্মিক সাধনার তা'লিম রয়েছে তার মূল উদ্দেশ্যও হলো এ'কীনের এ মর্তবা অর্জন করা। এ'কীনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা দরকার। এ সম্পর্কে হযরত শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রঃ) বর্ণনা করেনঃ

"আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে যখন মানবীয় দুর্বলতা দূরীভূত হয়, মানব অন্তর আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়, তখন আল্লাহ পাকের এবাদতের প্রতি অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ হয়, মনের সে অবস্থাকে এ'কীন বলা হয়"।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ) এ'কীন সম্পর্কে বলেছেন, "এটি হলো মানব অন্তরের বিশেষ অবস্থা যা বন্দাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করে দেয়, আধ্যাত্মিক সাধকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে তা পাওয়া যায়"।

মূলতঃ মালিক এবং বন্দার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হলো এই এ'কীন। এটিই ইসলামী জীবনের প্রাণ। যেভাবে আত্মা ব্যতীত দেহ এবং জ্যোতিঃ ব্যতীত চক্ষু অকেজো থাকে, এমনিভাবে এ'কীনের এ মরতবা হাসিল না করা পর্যন্ত এবাদত-বন্দেগীও প্রাণহীন হয়ে থাকে।

একখানি হাদীসে রয়েছে, উম্মত মোহাম্মদীয়া ব্যতীত অন্যান্য উম্মতগণ যেন ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত কাজ করেছে এবং কোন কোন উম্মত যোহর থেকে আছর পর্যন্ত কাজ করেছে, কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়া আছর থেকে মগরিব পর্যন্ত এই সামান্য সময়ে কাজ করেও অন্য উম্মতের মোকাবেলায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

ইমাম এবনে তাইমিয়া এ পার্থক্যের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এটি হলো ঈমানী শক্তির তারতম্য, অর্থাৎ সেই এ'কীনের মরতবায় তফাৎ হওয়ার কারণে এ সওয়াবের ব্যাপারে পার্থক্য হবে।

আরও একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর ভাষায়ঃ "আমাকে সমগ্র উম্মতের মোকাবেলায় পাল্লাতে ওজন করা হয়, তখন আমার পাল্লা ভারী থাকে, এরপর ওমরকে পাল্লায় তোলা হয়, তখন তার ওজনও সবচেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়"।

ইমাম এবনে তাইমিয়া এ সম্পর্কেও বলেছেন, এসব কিছু হলো ঈমানী শক্তির বহিঃপ্রকাশ তথা এ'কীনের মরতবার প্রকৃত রূপ আর এই এ'কীন সম্পর্কেও প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যখন মানব অন্তরে নূরে ঈমান প্রবেশ করে তখন অন্তর হয় প্রশস্ত"।

সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেনঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তার নিদর্শন কি"? এরশাদ হলোঃ "পরকালের আকর্ষণ, ইহকাল সম্পর্কে নিরুৎসাহী ভাব এবং মৃত্যুর পূর্বে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ"।

অর্থাৎ মানব অন্তরে যখন এ তিন অবস্থা প্রকাশিত হবে, তখন নূরে ঈমানের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর অঙ্গীকার সমূহ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার পর আজকের মুসলিম সমাজ কতখানি এ'কীন অর্জন করেছে তা এ মুহূর্তে বিশেষ ভাবে বিচার্য। আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ পাক সব কিছু দেখেন, সব কিছু শ্রবণ করেন, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই আমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আমাদের লাভ-ক্ষতির ক্ষমতা একমাত্র তাঁর। বন্দেগীর মাধ্যমেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁর নাফরমানী হয় গজবের কারণ। একথাগুলো জানা এবং বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আজকের বিশ্ব-মুসলিম যাবতীয় অন্যায় অবিচারে লিপ্ত। আর এটিই হলো বর্তমান মুসলিম জাতির সকল দুর্গতির একমাত্র কারণ। সকল মুসলমান যদি একথাগুলোর প্রতি এ'কীনের মরতবা অর্জন করতে পারে, তবে আমাদের জীবনে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আসতে পারে।

ইতিহাস সাক্ষী! ইসলামী আদর্শ গ্রহণ ও বরণ করে, তথা তওহীদের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণ অনুসরণ করেই সেদিন আরব জাতি সমগ্র বিশ্বে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নির্যাতীত মানুষ সেদিন পেয়েছিল তার প্রাপ্য মর্যাদা। মানুষ হিসেবে, মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্বর্ণ-সিংহাসন।

যে আরবরা ছিল স্বপ্ন বিলাসী, যারা করে বেড়াত কবিতা আবৃত্তি, যারা ছিল অগণিত মূর্তির পূজারী, যারা সর্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ এবং কলহ-দ্বন্দ্বে থাকতো লিপ্ত, তারাই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁর মহান আদর্শকে বরণ করে, তথা এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বা

এ'কীন অর্জন করে নবজীবন লাভ করলো, একটা সম্পূর্ণ সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংহত জাতিতে পরিণত হলো, একটা আত্মবিশ্বাসী এবং অতীব শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রমাণিত হলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা সিরিয়া, মিশর, পারশ্য, পশ্চিম তুর্কিস্তান জয় করলো। মরক্কো, স্পেন পদানত করলো এবং উপমহাদেশে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলো। যে পারশ্য সাম্রাজ্য সুদীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে রুমের আক্রমণের মোকাবেলা করলো, সে মাত্র দশটি বছরও তওহীদে বিশ্বাসী এবং এ'কীন অর্জনকারী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হলোনা।

এসব কিছু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভেরই ফলশ্রুতি, তথা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং এ'কীন অর্জনের শুভ-পরিণতি, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং এ'কীন স্থাপন করা সম্ভব হলে মানুষের সামগ্রিক জীবনে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়। জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা এক কথায় সবকিছুতেই একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঈমান লাভের পর মানুষ এ জীবন ও জগৎকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করে। নব বলে সে বলীয়ান হয়, নতুন প্রেরণায় সে উদ্বুদ্ধ হয়, সে শুধু আল্লাহকে ভয় করে আর কাউকে নয়, শুধু আল্লাহর কাছে আশা করে আর কারো কাছে নয়, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হয়। এমনকি, আল্লাহ ছাড়া সে আর কিছুই চায় না। দুনিয়ার কোন লাভ লোভে সে প্রার্থী হয় না। এমনকি তাকে বাদশাহী দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন হযরত গওসুল আযম (রঃ)-কে যখন তাঁর জমানার বাদশাহ তার রাজত্বের অর্ধেক হাদীয়া স্বরূপ পেশ করলেন, তখন এই বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেনঃ

چو چترے سنجرے رخ بختم سیاہ باد
در دل اگر بود ہوس ملك سنجرم

"আমার চেহারা কালো হয়ে যাক, যদি আমার অন্তরে অর্থ সম্পদ বা রাজত্বের এতটুকু লোভ থাকে"।

হযরত গওসুল আযম (রঃ) আরও বললেনঃ

زا نگہ کہ خبر یا فتم از ملك نیم شب
من ملك نیمروز را بیك جو نمی خرم

"যখন থেকে রাতের শেষ প্রহরে দরবারে এলাহীতে হাযিরীর মরতবার সন্ধান পেলাম, তখন থেকে আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার বাদশাহাতের মূল্য একটি শষ্য পরিমাণও নয়"।

সত্য হলো, দুনিয়ার মালিকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে যাঁরা ধন্য হন, তাঁরা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল ক্ষমতা ও সম্পদকে তুচ্ছ মনে করেন। এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলখী (রঃ) তাঁর রাজত্বকে তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন এবং প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা হয়েছিলেন। এমনি বহু বুজর্গানে দ্বীনের দৃষ্টান্ত এ পর্যায়ে পেশ করা যায়, যাঁরা আল্লাহর প্রতি এ'কীন অর্জনের কারণে দুনিয়ার পদমর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি, দুনিয়ার সম্পদ ও ক্ষমতাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে করেননি; বরং এসব জিনিসকে তাঁরা সর্বদা ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করেছেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায়" লিখেছেন, সাধকের সাধনায় হাল ও মকামের যে উন্নতি সাধিত হয় তার বুনিয়াদ হলো এ'কীন। এ'কীন থেকেই তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ, এখলাস তথা এক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করা, তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর প্রতি ভরসা, আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মকাম অর্জিত হয়।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, এই এ'কীনই হলো ঈমান। যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (হে আল্লাহ!) আমাকে এমন এ'কীন নসীব কর যদ্বারা দুনিয়ার মসিবত সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

হযরত মওলানা ইসমাঈল শহীদ (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন মানব অন্তর আল্লাহর প্রতি ঈমানের নূরে আলোকিত হয়, ফলে অন্তরের রোগ সমূহ দূরীভূত হয়ে যায় তখন সে ব্যক্তি কয়েকটি গুণের অধিকারী হয়, যেমনঃ বীরত্ব, অল্পে-তুষ্টি, দানশীলতা, মনের পবিত্রতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট তকদীরে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা– এসব গুণাবলী তখন আপনা আপনিই অর্জিত হয়।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহর জিকরে এমনভাবে মশগুল হওয়া উচিত যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে এমনকি, নিজেকেও ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়, কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে মনে রাখার অর্থ আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফলত। এমন অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়না। অতএব, যে সত্যিকার আল্লাহর নৈকট্যের অন্বেষণকারী, সে নিজেকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবে। এমন অবস্থায় সে দুনিয়ার সব কিছুতে থেকেও দুনিয়া-ত্যাগী হবে, তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করবে, অল্পে তুষ্টি, সবর এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর তকদীরে সন্তুষ্টির ন্যায় গুণাবলী অর্জনে ধন্য হবে।

মূলতঃ যে আল্লাহর প্রতি এ'কীনের মর্তবা হাসিল করবে, সে আল্লাহ পাক ব্যতীত বন্দার নিকট কোন কিছুর প্রার্থী হতে পারেনা। এজন্যে হযরত রাবেয়া বসরী

(রঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহর সাথে শেরক করার তাৎপর্য কি? তিনি বলেছিলেন, জান্নাতের আকাংক্ষা করা এবং জান্নাতের মালিক থেকে বিমুখ হওয়া। এজন্যে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ এ'কীন অর্জনকারী কোন কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজর্গ জান্নাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও রাজী হননি। যেমন বিখ্যাত ওলী হযরত এবনুল ফারেজ (রঃ)-কে তাঁর জীবন-সায়াহ্নে যখন বেহেশতের মনোরম দৃশ্য অতি সুন্দর ইমারত সমূহ দেখানো হলো যা হবে তাঁর বাসস্থান, তখন তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ

ان كانت منزلتى فى الحب عندكم
ما قد راءيت فقد ضيعت عمرى

"হে আল্লাহ! তোমার প্রেমে সারা জীবন অতিবাহিত করার পর যদি এ হয় আমার বিনিময়, তবে আমি শপথ করে বলছি আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে"।

বস্তুতঃ আল্লাহর ভক্ত প্রেমিক তাঁর দীদার ব্যতীত অন্য কিছুতেই শান্ত হয়না, হতে পারেনা কেননা, তাঁরা এবাদত করেন এক আল্লাহ পাকের জন্যে, শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, দুনিয়া বা আখেরাতের কোন নেয়ামতের আশায় নয়; বরং সকল নেয়ামতের মালিকের আশায়। তাই যখন আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রকৃত প্রেমিককে নূরের তাজাল্লী প্রদর্শন করলেন তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করলেন। তাই মরমী কবি বলেছেনঃ

نشان مرد مومن باتو گويم
چو مرگ آيد تبسم بر لب اوست

"মর্দে মোমেনের নিশানী বলবো তোমায় আমি, যখন সে মৃত্যুর মুখোমুখি হবে তখন তার মুখে হাসি ফুটে উঠবে"।

অতএব, যে সত্যিকার আল্লাহ ওয়ালা, যে আল্লাহর প্রকৃত প্রেমিক, সে এ জীবন ও পর জীবন এ দু'য়ের কোনটিতেই মুগ্ধ হয় না, বরং শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আজীবন সাধনায় ব্রতী থাকে। মরমী কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেনঃ

دو عالم سے كرتى ہے بيگانہ دل كو
عجب چيز ہے لذت اشنائى

"ইহকাল পরকাল উভয় জগৎ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমনি বিস্ময়কর বস্তু হলো আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক"।

আর এজন্যেই হযরত গওসুল আযম (রঃ) প্রেমময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরযী পেশ করেছিলেনঃ

نه خواہم خوبئے دنیا نه خواہم راحت عقبی
اگر خواہم ترا خواہم نه خواہم باغ رضواں را

"এলাহী! আমি দুনিয়ার কোন কিছু তোমার নিকট চাই না, এমনকি আখেরাতের কোন নেয়ামতও আমার কাম্য নয়, হে আল্লাহ! আমি তো শুধু তোমাকে চাই। এমনকি বেহেশতের বাগানও চাইনা"।

تو جنت را بنیکاں ده من وبدرا بدوزخ بر
مرا آنجا بس که تمنائے وصال توست

"হে আল্লাহ! জান্নাত তুমি তোমার নেককার বন্দাদেরকে দিও, আর আমার ন্যায় গুনাহগারকে তুমি দোযখই দিও। আমার জন্যে সে স্থানই যথেষ্ট যেখান থেকে তোমার নৈকট্যের আকাঙ্ক্ষা করা যায়"।

এমনিভাবে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেছেনঃ যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এ সুযোগ দান করেন যে, যদি কিছু চাওয়ার থাকে তবে আরযী পেশ কর। তখন আমি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরযী পেশ করবো, "হে এলাহী! আজীবন তোমাকে না দেখে এবাদত করেছি, আজ আমাকে এ অনুমতি দান কর যেন তোমার আরশের ছায়ায় দন্ডায়মান হয়ে তোমার দিকে দেখে তোমাকে সেজদা করি"।

মূলতঃ এটিই হলো প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালার পরিচয়। এজন্যেই "ফতুহুল গায়ব" গ্রন্থে হযরত গওসুল আযম (রঃ) আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার পন্থা নির্দেশ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আখেরাতের এবং তার মর্তবার অনুসন্ধান করে তাকে দুনিয়া ত্যাগের নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাদ ও কামনা-বাসনা সমূহ ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অনুসন্ধান করবে, তাকে দুনিয়ার অতিরিক্ত আখেরাতের জোহদও অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আখেরাতের সুখ, আরাম, স্বাদ-বাসনা সমূহও ত্যাগ করতে হবে। এ কারণেই আখেরাতের জন্যে দুনিয়াকে আল্লাহ তায়ালার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়কে ত্যাগ করতে হবে।

অতএব, যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অন্তরে দুনিয়ার স্বাদের কামনা এবং সুখের অন্বেষণে থাকবে, আহারের, পানের, পোষাকের, স্ত্রীর, বাড়ী-ঘরের, সওয়ারীর, রাজ্যের ক্ষমতার কামনা থাকবে; ততদিন সে ব্যক্তি প্রকৃত জাহেদ বা দুনিয়া-ত্যাগী হতে পারেনা। কারণ এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে নফসের মজা, কামনার তৃপ্তি, স্বভাবের সন্তোষ এবং অন্তরের মমতা রয়েছে। এজন্যে সমস্ত বিষয় "দুনিয়ার" মধ্যে গণ্য, এ সমস্ত বিষয়ে মানুষ সন্তোষ, আরাম ও শান্তি পায়। তাই সকল বস্তুর মমতা যাতে করে অন্তর থেকে বের হয়ে যায় তার চেষ্টা করা কর্তব্য।

অতএব, প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার সাধনায় রত হতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং এ'কীন অর্জন করতে হবে। মনকে বন্দার প্রতি আশা ও ভয়ের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বদা হাযির রাখতে হবে।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

শুধু এ কর্মসূচীর মাধ্যমেই মুসলিম জাতি তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে, বিশ্ব শান্তি কায়েম হওয়ার পথ সুগম হতে পারে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হতে পারে।

يقين محكم عمل پيهم محبت فاتح عالم
جهاد زندگى ميں يه ہيں مردون كے شمشيريں

আল্লাহ পাকের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস বা এ'কীন, একটানা সাধনা এবং বিশ্ব বিজয়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত– জীবন-যুদ্ধে এগুলোই হলো মর্দে মোমেনের তলোয়ার। আর এগুলোই হলো ইসলামী আদর্শের মূল কথা।

সত্যের প্রতীক

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ

(হে রসূল!) আপনি হলেন সত্যের প্রতীক। আপনাকে সত্য ধর্ম নিয়ে সমগ্র বিশ্ব মানবের নিকট প্রেরণ করেছি। সত্যের ডাক দেয়া, সত্যকে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া আপনার দায়িত্ব। যারা সত্যকে গ্রহণ করবে তাদেরকে জান্নাতের খোশ-খবরী দেয়া আপনার কাজ। তাই আপনি বশীর বা সুসংবাদ দাতা। কিন্তু যারা সত্যকে গ্রহণ করবেনা, অমান্য করবে ইসলামের বিধি-নিষেধকে, সেই অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে পরকালীন জিন্দেগীর কঠোর শাস্তির কথা শুনিয়ে সতর্ক করাও আপনার কর্তব্য। এভাবে আপনি নজীর বা ভয় প্রদর্শক রূপে স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন।[১]

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ

(হে রসূল!) আপনাকে আমি প্রেরণ করেছি সত্যের সঙ্গে, এ সত্য কি? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সত্য হলো পবিত্র কোরআন। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালাম দিয়েই প্রেরণ করেছেন বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আইলাইহে ওয়াসাল্লামকে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭

আর আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেনঃ এই হক্ব এর অর্থ পবিত্র কোরআনও হতে পারে এবং ইসলামও হতে পারে, তখন অর্থ হবেঃ (হে রসূল!) আপনাকে প্রেরণ করেছি ইসলামের নেয়ামত দিয়ে।[১]

বস্তুতঃ ইসলাম হলো চিরন্তন সত্য, মানবতার কল্যাণের মূর্ত প্রতীক, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্যের একমাত্র পন্থা। তাই কোরআনে করীম তার জন্যে "হক্ব" শব্দটি ব্যবহার করেছে। পবিত্র কোরআনের আরও এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে সমগ্র মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে হক্ব, এসেছে সত্য, যে সত্যের বিদায় নেই, বিনাশ নেই, সে সত্যই হলো ইসলাম। সে সত্যের বিবরণ রয়েছে বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে আর সে সত্যের ধারক ও বাহকই হলেন বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

পক্ষান্তরে, এ সত্যের মোকাবেলায় যা রয়েছে তা হলো বাতিল বা অসত্য। ইসলাম হলো আলো। আর কুফর বা বাতিল হলো অন্ধকার। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জাতিকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাই যারা তাঁকে অবিশ্বাস করবে, অমান্য করবে তাঁর বিধি-নিষেধ, সে পৌত্তলিক হোক বা ইহুদী বা খৃষ্টান, সকলেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তাদের ইহকালীন জিন্দেগী হবে অপবিত্র, অশান্ত আর পরকালীন জিন্দেগী হবে দুর্বিষহ, দুর্দশাগ্রস্ত। কেননা, তারা হবে দোযখবাসী, চিরকালের জন্যে কোপগ্রস্ত। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই রয়েছে ঘোষণাঃ

وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যারা আপনাকে অবিশ্বাস করবে, তারা হবে দোযখবাসী, দোযখের কঠিন শাস্তিই তাদের ভাগ্যলিপি।

আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে যত ব্যাকুলই হন না কেন, তারা ঈমান না আনলে শাস্তি তাদের অবধারিত। আর এজন্যে আপনাকে আদৌ জিজ্ঞাসা করা হবে না, এ পর্যায়ে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা, অতএব, আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত থাকবেন না।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭০

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যদি কোন মুরীদ আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হতে ইচ্ছুক না হয় তবে তাকে বাধ্য করা মুর্শিদের কর্তব্য নয়।[১]

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ)-কে সান্ত্বনা প্রদান

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। (হে রসূল!) এ ইহুদী ও খৃষ্টানরা কখনও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের অনুসরণ করেন। আল্লাহ পাক আপনাকে যা দান করেছেন শুধু তাই সত্য ধর্ম বা দীনে হক্ব। সুতরাং আপনি তাতে সুদৃঢ় ও অটল থাকুন।

হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি জামাত হক্বের উপর সুদৃঢ়ভাবে থেকে অন্যের মোকাবেলা করতে থাকবে এবং তারা বিজয়ী হয়ে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে এই বলে সতর্ক করেছেন যেন তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে অথবা তাদের সাথে আপোষের জন্যে নিজ দ্বীনের প্রতি যেন গাফিলত প্রদর্শন না করেন এবং তাদের প্রতি মনোনিবেশ না করেন অথবা তাদের কথা না শোনেন। ফেকাহ বিশারদগণ এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন, যে কুফরী করে তা সে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় হোক সব মিলে অভিন্নভাবে একটি ধর্ম। কারণ ملت শব্দটি দ্বারা এখানে ইসলাম ব্যতীত সব ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

অর্থাৎ তোমাদের সবার জন্যে তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্যে আমার ধর্ম।[২]

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

ফেকাহ বিশারদগণের মতে, উপরোক্ত প্রমাণিত বিষয়ের উপর একটি মাসআলার ভিত্তি রচিত হয়েছে যে, মুসলমান এবং কাফের পরস্পর একজন আরেকজনের ওয়ারিষ হতে পারেনা। অথচ কাফেররা পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিষ হতে পারে। তা সে একই ধরণের কাফের হোক অথবা বিভিন্ন ধর্মের কাফের হোক। এটি হলো ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাযহাব।

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৭৫

يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা তা পড়ার মত পড়ে থাকে। তথা তেলাওয়াতের হক্ব আদায় করে।

এর দ্বারা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, তেলাওয়াতের হক্ব আদায়ের অর্থ এই যে, যেখানে জান্নাতের বর্ণনা আছে তেলাওয়াতকালে সেখানে জান্নাত কামনা করা এবং যেখানে জাহান্নামের বর্ণনা আছে সেখানে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাওয়া।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কিতাব থেকে হালাল-হারামের নির্দেশ ও নিষেধ জেনে নেয়া এবং বাক্যগুলোকে যথাস্থানে রেখে কোন হের-ফের না করে তেলাওয়াত করাই হলো হক্বভাবে তেলাওয়াত করা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, স্পষ্ট অর্থ-বোধক আয়াতের উপর যথা বিধি আমল করা, রূপক অর্থ-বোধক আয়াতের উপর শুধুমাত্র ঈমান স্থাপন করা এবং জটিল বিষয়গুলোকে আলেমগণের কাছে পেশ করাই হলো তেলাওয়াতের মত তেলাওয়াত করা।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করাই হলো এর অর্থ। সুতরাং তেলাওয়াত শব্দের মানে হচ্ছে অনুসরণ করা। যেমনঃ

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا

(সেই চাঁদের শপথ! যখন সে সূর্যকে অনুসরণ করে।)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, কোরআনে পাককে অনুসরণকারী শীঘ্রই জান্নাতের বাগান সমূহে অবতরণ করবে।[১]

যারা এভাবে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে তারাই বিশ্বাস করে এ মহা গ্রন্থের প্রতি।

অন্য একটি অর্থ হলো তারাই বিশ্বাস করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি।

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

পক্ষান্তরে, যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে, অমান্য করে পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ, তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত কেননা, তারা ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করেছে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৭৬

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মুসলিম শরীফে ও মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যে ইহুদী বা খৃষ্টান আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে নিশ্চয় দোযখে যাবে। এই হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেকের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। ইহুদী ও খৃষ্টানদের আলোচনা বিশেষভাবে এজন্যে করা হয়েছে যে, তারা হলো আহলে কেতাব, যখন তাদের নাজাত হবেনা তখন অন্যদের নাজাতের কথা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।[১]

অতএব, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশ করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى
اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ
اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ
اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

১। তফসীরে মোয়ালেমুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬১

তরজমা

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমার পুরস্কারের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি, আর পৃথিবীতে তোমাদেরকে যে প্রাধান্য দিয়েছি, একথাও স্মরণ কর।

(১২৩) আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো বিন্দু মাত্রও উপকারে আসবেনা, এবং কারো নিকট থেকে কোন প্রকার বিনিময় গৃহীত হবেনা, এবং কারো সুপারিশ উপকারী হবেনা, এবং তারা কারো সাহায্য পাবেনা।

(১২৪) আর যখন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এরপর ইব্রাহীম সমস্ত কথা সম্পূর্ণ করলেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির ইমাম মনোনীত করছি। ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ অত্যাচারীরা আমার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হবে না।

(১২৫) এবং আমি যখন কা'বা ঘরকে মানুষের জন্যে পূণ্য ও শান্তির স্থান বলে নির্দেশ দিয়েছিলাম, (আদেশ করেছিলাম যে) তোমরা মকামে ইব্রাহীমে নামাজ আদায়ের স্থান ঠিক কর, এবং যখন আমি ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফ, এ'তেকাফ ও রুকু সেজদাকারীদের জন্যে পাক পবিত্র করে রাখ।

(১২৬) আর যখন ইব্রাহীম (আঃ) বলছিলেন, হে প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তিধাম বানাও, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, তাদেরকে ফলমূলের উপজীবিকা দান কর, (তখন) আল্লাহ পাক এরশাদ করেছিলেনঃ আর যারা ঈমান না আনে, তাদেরকেও (ইহকালে) অল্প কাল ফল ভোগ করাবো, অবশেষে নিরূপায় অবস্থায় নরকানলের শাস্তির দিকে ধাবিত করবো, আর দোযখ অত্যন্ত মন্দ স্থান।

তফসীরুল কোরআন

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর তাদেরকে একথাও বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে– তোমাদের নিকট যে তৌরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উল্লেখ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে এবং তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবন-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অতএব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের নিকট রক্ষিত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসেরই নামান্তর।

এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য, নবুওয়্যতের নেয়ামত দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরগণই ধন্য হয়েছেন কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তওহীদ

আন্দোলনের ইমাম। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু' পুত্র, তন্মধ্যে (১) হযরত ইসহাক (আঃ), তাঁর মাতা ছিলেন হযরত সারা এবং (২) হযরত ইসমাঈল (আঃ), তাঁর মাতা ছিলেন হযরত হাজেরা। হযরত ইসহাক (আঃ)-এর দু' পুত্র সন্তান ছিল। (১) ইয়াকুব (আঃ) (২) ঈশাউ। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর খেতাবই হলো ইসরাঈল। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে বনী-ইসরাঈল তথা ইসরাঈলের বংশধরগণ বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং এই বনী-ইসরাঈলে দু' হাজার বছর যাবত আসমানী হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তারা আল্লাহর নেয়ামতে ধন্য হয়েছিল এবং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন, কিন্তু তারা সে মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। তাই আল্লাহ পাক নবুওয়্যত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এরই পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে দান করলেন। বনী ইসরাঈলের ভাগ্য অস্তমিত হলো এবং বনী-ইসমাঈলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তাই বনী ইসরাঈলের কর্তব্য হলো তাদেরই পিতৃব্য হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে আগমন করলেন, তখন তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর অনুসরণ করা। কিন্তু তারা হিংসানলে জ্বললো এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলো। তাই আল্লাহ পাক তাদের পূর্ব পুরুষের নাম ধরে তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এরশাদ করেছেনঃ

يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

এ সূরায় আল্লাহ পাক যখন সর্ব প্রথম বনী ইসরাঈলের সাথে কথা বলা শুরু করেছিলেন তখন সেখানেও এভাবে সম্বোধন করেছিলেন-

يٰبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ

(হে বনী ইসরাঈল! আমার দেয়া নেয়ামতকে স্মরণ কর।)

এরপর যখন তাদের প্রতি নছিহত এবং তাদের ছল-চাতুরীর বর্ণনা সমাপ্ত করলেন তখন উপসংহারে আবার ঐভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা সে নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন স্থানে প্রদান করেছি। এমনকি, আমি তোমাদের বংশকে এক সময় দুনিয়ার সকল বংশ থেকে উত্তম এবং মর্যাদা সম্পন্ন করে দিয়েছিলাম। এরপর তোমরা যে সব নাফরমানী করেছ তার শোচনীয় পরিণাম দুনিয়াতে ভোগ

করেছ। এখন যদি তোমরা নিজেদের না-ফরমানী এবং উচ্ছৃংখলতা থেকে বিরত না হও তবে একথা জেনে রাখ, আমি যেমন উদার ও দয়াবান তেমনি কঠোরও। আর তোমরা কেয়ামতের দিনের ভয় করতে থাক যেদিন কারো সুপারিশ উপকারী হবেনা। যেদিন কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং কোন সাহায্যকারীই কোনরূপ সাহায্য করে বাঁচাতে পারবে না। এখানে ভাষার সুন্দর অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথমে সংঘর্ষের বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে এবং এগুলো সত্য হিসেবে প্রমাণের জন্যে অনেক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রমাণিত ফলাফল দেখানোর পর তাদের কীর্তিকলাপ সংঘটিত হওয়ার দাবী আবার করা হয়েছে। আর উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে এসব যুক্তি অমোঘ প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

এরপর আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বর্ণনা করেন। কারণ এ বংশে হওয়ার জন্যে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরেক সম্প্রদায়ের বড় গর্ব ছিল। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বর্ণনা দ্বারা তারা সেই নবীর অনুসরণ কতটুকু করছে তা বোঝা যাবে এবং তাঁর বর্ণনা দ্বারা আখেরী নবীর বরহক হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। এভাবে তাদের পূর্ব পুরুষ নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। শুধু মক্কা নয়; বরং সারা আরবের ইহুদী, খৃষ্টান সকলেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে মেনে আসছে এবং প্রত্যেক গোত্রেরই এ ব্যাপারে অহংকার ছিল যে, তারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশের হতে পেরেছে। আর যেহেতু হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের তরীকার অনুসরণকারীর জন্যে আল্লাহ পাক বরকতের ওয়াদা করেছেন, তাই যে কোন অবস্থায় হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাদের জন্যে যথেষ্ট বলে তারা মনে করতো। কিন্তু আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন যে, তোমরা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) তরীকার উপর নও।

ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর অনুগত

তিনি ছিলেন আমার অত্যন্ত অনুগত। আমি কয়েকটি বিষয় দ্বারা তাঁকে পরীক্ষা করেছি, তিনি তাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছেলের কোরবানীর হুকুম দিয়েছি, তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে উদ্যোগী হয়ে গেছেন। নক্ষত্র পূজারীদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে এমনকি, দেশ-ত্যাগ করতে বলেছি, তিনি তাই করেছেন। সব ছেড়ে তিনি সিরিয়ায় চলে গেলেন। এরপর মরুময় আরবে এবাদতখানা বানাতে এবং তার হেফাজত করার জন্যে নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে আসতে বললাম, তিনি তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাঈলকে সেখানে রাখলেন এবং কা'বাঘর নির্মাণ করলেন। নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো, তিনি ঈমানের উপর কায়েম থেকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে বরণ করে নিলেন। তওহীদ অলম্বন করলেন, নামাজ ও যাকাতের নির্দেশ পালন করলেন, জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অবলম্বন করলেন এবং খতনা ইত্যাদি

সম্পাদন করলেন। এরপর আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তোমাকে সারা বিশ্বের ইমাম মনোনীত করলাম। তখন তিনি বললেন, হে এলাহী! আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও নবী এবং বরকত সম্পন্ন লোক পয়দা করো, যেন তোমার আনুগত্য এবং তোমার দানের খেদমত সর্বদা আমার বংশে হতে থাকে। আমি বললাম, তোমার বংশে একটি সম্প্রদায় অবশ্য এরূপ হবে কিন্তু

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ যারা নাফরমান হবে তাদের জন্যে আমার কোন স্বীকারোক্তি নেই, তাদের নছীবে কোন বরকতও থাকবে না।

হযরত একরামা হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে كَلِمٰت শব্দ দ্বারা এখানে ত্রিশটি বিষয়ের কথা বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইসলামী শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ব্যতীত কেউ এগুলো পালন করতে পারেননি। এজন্যে তিনি জাহান্নামের অগ্নি থেকে লিখিত নাজাত-নামা হাসিল করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা এভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى

(এবং ইব্রাহীম যিনি তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন)

সেই ত্রিশটি বিষয়ের দশটি সূরা তওবায় আছেঃ

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তারা হলো (১) তওবাকারী, (২) এবাদত মগ্ন, (৩) আল্লাহর প্রশংসাকারী, (৪) আল্লাহর পথে সফর অবলম্বনকারী, (৫) রুকুকারী, (৬) সেজদাকারী, (৭) নেক কাজের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী, (৮) মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী, (৯) আল্লাহ পাকের দেয়া সীমা রক্ষাকারী এবং (১০) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোমেনদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী।

আর দশটি সূরা আহযাবে আছেঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ

وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোক, অনুগত পুরুষ এবং অনুগত স্ত্রীলোক, সত্য অবলম্বী পুরুষ ও সত্য অবলম্বী স্ত্রীলোক, সবরকারী পুরুষ এবং সবরকারীনী স্ত্রীলোক, বিনয়ী পুরুষ এবং বিনয়ী স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও দানশীল স্ত্রীলোক, রোজাদার পুরুষ এবং রোজাদার স্ত্রীলোক, নিজ লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারীনী স্ত্রীলোক এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকরকারী পুরুষ ও অধিক পরিমাণে জিকরকারীনী স্ত্রীলোক।

আর অবশিষ্ট দশটি বিষয় রয়েছে "সূরা মু'মেনুন" এবং সূরা "সাআলা সায়েলুনে"ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.....هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

সেসব ইমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে অনুনয়-বিনয় করে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে। যারা অহেতুক অনর্থক বিষয় থেকে বিরত থাকে, তারা যাকাত দিয়ে থাকে, নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাজত করে থাকে, তবে নিজেদের স্ত্রীদের বেলায় অথবা ক্ষমতা দ্বারা অর্জিত (বাঁদী)দের বেলায়, কারণ এগুলোতে কোন দোষ নেই: আর যদি কেউ এগুলো ছাড়া অন্যের পেছনে লেগে যায় তবে সে সীমা অতিক্রমকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা নিজেদের আমানত এবং ওয়াদা (চুক্তি) রক্ষা করে থাকে, যারা নিজেদের নামাজ সমূহ হেফাজত করে থাকে, যারা নিজেদের নামাজে স্থায়ী হয়ে থাকে, যারা নিজেদের সম্পদের অংশ নির্ধারণ করে থাকে সওয়ালকারী এবং দরিদ্রদের জন্যে, যারা কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে থাকে, যারা নিজেদের প্রতিপালকের আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে– নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আযাব নির্ভয় হওয়ার বস্তু নয়, আর যারা নিজেদের আমানত সমূহ এবং কথা রক্ষা করে থাকে, যারা নিজের সাক্ষী দেয়াতে অটল থাকে এবং যারা নিজেদের নামাজের খবর রাখে।

তাউস বলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দশটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছেন। দশটি বিষয়ই স্বভাবের দাবী মোতাবেক ছিল। তন্মধ্যে পাঁচটি ছিল মাথায়। যেমন মোচ ছাঁটা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, মেছওয়াক করা এবং মাথায় সিঁথি কাটা। আর পাঁচটি ছিল দেহের অন্যান্য অংশের জন্যে। যেমন নখ ছোট করা,

বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভীর নীচের পশম ফেলে দেয়া, খতনা করা এবং পানি দ্বারা শৌচ কাজ সম্পন্ন করা।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, كَلِمٰتٍ (কিছু বিষয়) শব্দ দ্বারা হজ্জের তরীকা সমূহকে বোঝানো হয়েছে।

হাসান (রঃ) বলেনঃ সাতটি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। বিষয়গুলো দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পরীক্ষা করেছেন। নক্ষত্র, চাঁদ এবং সূর্যের প্রতি গবেষণার দৃষ্টিতে ইব্রাহীম (আঃ) দেখে বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ পাক সব সময়ের জন্যে স্থায়ী। তিনি এগুলোর মত লয়ঃ প্রাপ্ত নন। চতুর্থতঃ তাঁকে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। যখন নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন ইব্রাহীম (আঃ) সবর করেছিলেন। পঞ্চমতঃ হিজরত দ্বারা, ষষ্ঠতঃ পুত্রকে জবেহ করা দ্বারা এবং সপ্তমতঃ খতনা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। এসব কয়টি বিষয়েই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সবর করেছিলেন।[১]

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ

অর্থাৎ আর সে সময়কে স্মরণ কর যখন আমি কা'বা গৃহকে মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান এবং শান্তিধাম বানাই।

مَثَابَةً প্রত্যাবর্তন করা অথবা যে স্থানে প্রত্যাবর্তন করা হয় তাকে مَثَابَةً বলে।

আরবদের একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে, ثاب الماء অর্থাৎ নহরের পানি নহরেই ফিরে এসেছে। এ শব্দটি থেকে ثواب শব্দটি নিঃস্পন্ন হয়েছে। সওয়াব বলে সৎ কাজের ঐ সুফলকে যার বিনিময় একদিন সৎকর্মশীল ব্যক্তির জীবনে প্রত্যাবর্তন করবে। মোটকথা مثابة শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রত্যাবর্তনের স্থান। আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কা'বাকে مثابة (প্রত্যাবর্তনের স্থান) বলেছেন। কেননা, মুসলিম মিল্লাতের অন্তরে বায়তুল্লাহ শরীফের এত আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে মুসলমানগণ দূর-দূরান্ত থেকে এসে বায়তুল্লাহ'র পার্শ্বে একত্রিত হয়। এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ারই ফল।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ (হে আল্লাহ!) আপনি মানুষের মনের আকর্ষণ এদিকে করে দিন।

مَثَابَةً শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে অধিক সুফল লাভের স্থান।

اَلْبَيْتَ। শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘর, তবে এখানে আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট ঘর বায়তুল্লাহ শরীফকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১১-১২

وَاتَّخِذُوْا আদেশসূচক বহুবচন ক্রিয়া।

مَقَامِ অর্থ স্থান।

মকামে ইব্রাহীম হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, ঐ পাথরকে বলা হয় যে পাথরে দন্ডায়মান হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর ঘরের নির্মাণ কাজ সমাধা করেছেন। বর্ণিত আছে, দেয়াল ক্রমে ক্রমে যতটুকু উঁচু হতো ঐ পাথরও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিয়ে উপরে উঠতো। হযরত ইসমাঈল (আঃ) নীচ থেকে পাথর ও অন্যান্য মাল-মসলা সরবরাহ করতেন এবং এভাবে দোয়া করতেনঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের এ কাজ আপনি কবুল করুন। কেননা, আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কদম মুবারকের চিহ্ন আজও ঐ পাথরে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন, প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে এ পাথর বায়তুল্লাহ শরীফের সঙ্গে মিলিত ছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে বন্যার স্রোতে ভেসে গেলে পরে তিনি তা সংগ্রহ করে কা'বা শরীফ থেকে একটু দূরে পাথর দিয়ে পরিবেষ্টিত করে রেখে দেন, সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পাথরটি একই স্থানে রয়েছে।

وَاَمْنًا অর্থাৎ আমি কা'বা গৃহকে শান্তির স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করি।

শান্তির শহর

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এরশাদ করেছিলেন, "যেদিন আল্লাহ পাক আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে তিনি মক্কা শহরকে সম্মানিত শহর এবং শান্তির শহর বলে ঘোষণা করেছেন। মক্কা শরীফের এ বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মান কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এজন্যে এ শহরে মারামারি, খুন-খারাবী সর্বকালের জন্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু আমাকে এক ঘন্টার জন্যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, এরপর পুনরায় কেয়ামত পর্যন্ত হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। অতএব, এ শহরের কাঁটাও কর্তন করা হবে না, এর শিকারকেও ধাওয়া করা হবে না আর এখানের ঘাষও কাটা হবে না"।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى

"এবং ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানে তোমরা নামাজের স্থান নির্দিষ্ট কর"।

এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে তিনটি কথায় একাত্মতা প্রকাশ করেছি (অর্থাৎ যা আল্লাহ পাকের মর্জি ছিল তাই আমার রসনা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে)। আমি বলেছিলাম,"ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আমরা বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবলা বানাতে পারতাম"! তখনই এ আয়াত নাযিল হলো।

وَاتَّخِذُوْا الى اخره

এমনিভাবে আমি বলেছিলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি উম্মুল মোমেনীনগণকে পর্দার হুকুম দিতেন তবে কত ভাল হতো! তারপরই পবিত্র কোরআনে পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো"।

"আমি যখন জানতে পারলাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অসন্তুষ্ট তখন আমি তাঁদের নিকট গিয়ে বললাম, যদি আপনারা বিরত না হন তবে আল্লাহ পাক আপনাদের স্থলে উত্তম স্ত্রী তাঁর স্বীয় নবীকে দান করবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে নাযিল হলো এ আয়াত"ঃ[১]

عَسٰى رَبُّهٗ- الاية

এতদ্ব্যতীত, একথাও বর্ণিত আছে যে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, বদরের যুদ্ধে যে সব কাফের বন্দী হয়ে এসেছিল তাদের থেকে মুক্তিপণ না নেয়া হোক এবং তাদেরকে হত্যা করা হোক, অবশেষে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে জানা যায় যে এটি-ই ছিল আল্লাহ পাকের মর্জি।

এমনিভাবে আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের যখন মৃত্যু হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জানাযায় অংশগ্রহণের জন্যে তৈরী হন, সে-সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, আপনি কি এই মুনাফেকের জানাযার নামাজ পড়বেন? তখন তিনি আমাকে ধমক দিয়েছিলেন, এরপর এ আয়াত নাযিল হলোঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ

"এ মুনাফেকদের কারও নামাজে জানাযা আপনি পড়বেন না"।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৭৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২১৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৮০

আলোচ্য আয়াতে মকামে ইব্রাহীমে নামাজ আদায়ের নির্দেশ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমলের সঙ্গে তিন তওয়াফ এবং রমল ব্যতীত চার তওয়াফ সম্পন্ন করেছেন, অতঃপর তিনি মকামে ইব্রাহীমে দু' রাকাআত নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে হুকুম করেছি যেন আমার ঘরকে পবিত্র রাখে তওয়াফ, এ'তেকাফ, রুকু এবং সেজদাকারীদের জন্যে।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যেন আল্লাহর ঘরকে সকল অন্যায় আচরণ থেকে, যাবতীয় অপকর্ম থেকে এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করা হয় এবং কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফ না করে, এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করে।

বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার তাৎপর্য

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার আদেশ দিয়েছেন, প্রকাশ্য নাপাকী থেকে যেমন বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখতে হয় তেমনি অপ্রকাশ্য নাপাকী যথা কুফর, শেরক, বেদআত এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে পবিত্র রাখার আদেশও দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। এ কারণেই মসজিদকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার ফজিলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে মসজিদে থু-থু ফেলা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) "ফতহুল বারী"তে হযরত আবুজর (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার উম্মতের মন্দ কাজগুলোর মধ্যে মসজিদে থু-থু ফেলাও দেখেছি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে থু-থু ফেলা মন্দ কাজ, যার সম্পর্কে কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ পর্যায়ে আরও একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা মেশকাত শরীফে সংকলিত হয়েছ। একব্যক্তি ইমামতি করলো, ঘটনাচক্রে সে মসজিদেই কেবলার দিকে থুথু ফেলল যা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে দেকখলন, তখন তিনি নির্দেশ দিলেনঃ এই ব্যক্তিকে আর ইমাম হতে দিওনা, একথা যখন সে ব্যক্তি জানতে পারলো তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো, তিনি তার কথা শ্রবণ

করলেন এবং এরশাদ করলেন, আমিই নির্দেশ দিয়েছি যেন তুমি ইমামতি না কর কেননা,

انك اذيت الله ورسوله

"তুমি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছ"।[১]

অতএব, মসজিদকে অপবিত্র করা এবং তাতে থু-থু ফেলা কত বড় জঘন্য অপরাধ তা সহজেই অনুমেয়। এমনিভাবে মসজিদে কোন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করা, মারামারি, খুন-খারাবী করা নিষিদ্ধ।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বায়তুল্লাহ শরীফ হলো আল্লাহ পাকের তাজাল্লী এবং বরকত পাওয়ার স্থান, এজন্যে মানুষের অন্তরে রয়েছে তার জন্যে বিশেষ আকর্ষণ এবং মর্যাদাবোধ। আল্লাহ পাকের সাথে যার সম্পর্ক যতবেশী নিকটতর, তার অন্তরে বায়তুল্লাহ শরীফের তা'যীমের অনুভূতিও ততবেশী তীব্রতর। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ)-কে তাঁর একজন মুরীদ একজোড়া কালো রঙ্গের জুতা হাদীয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। হযরত হাজী সাহেব (রঃ) বলেছেনঃ আমার জুতার প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু এ জুতা আমি ব্যবহার করতে পারবো না, লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর এর মধ্যে কি দোষ? হযরত হাজী সাহেব (রঃ) বললেন, এর রঙ কালো আর বায়তুল্লাহ শরীফের গেলাফের রঙও কালো। তাই এ রঙ আমি জুতায় দেখতে পারব না। এ ছিল বায়তুল্লাহ শরীফের তা'যীমের অনুভূতি।

আল্লাহর ঘরের সম্মান না করার পরিণতি

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর ঘরের সম্মান করেনি তারা শুধু যে অপমানিত হয়েছে তাই নয়; বরং ধ্বংসও হয়েছে অনতিবিলম্বে। যেমন, আবরাহা বাদশা অনেক সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসেছিল বায়তুল্লাহ শরীফকে ধ্বংস করার জন্যে। কিন্তু তার সৈন্যবাহিনী ও হস্তী বাহিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র, দুর্বল আবাবিল পাখির মোকাবেলায় পরাভূত হয়েছিল। শুধু তাই নয়; বরং ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। আবরাহা বায়তুল্লাহ শরীফের কাছেও আসতে পারেনি।[২]

মূলতঃ এ কারণেই আইয়ামে জাহেলিয়াতে মুশরেকরাও বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান করতো বিশেষভাবে। যেহেতু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ শহরেকে শান্তি-ধাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এজন্যে হজ্জের মওসুমে বা অন্য সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়। সমবেত লোকদের ভাষা,

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৭৫
২। তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৭

জীবন-ধারা বিভিন্ন ধর্মী হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর কোনও কলহ দ্বন্দ্ব হয়না, সকলেই এক আল্লাহর বন্দা, এক রসূলের উম্মত, এক কোরআনের অনুসারী, এক কেবলাপন্থী, সকলের কণ্ঠে একই কথা, লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বন্দা তোমার মহান দরবারে হাযির। সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গণে হাযির হওয়াকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করে। এটি বায়তুল্লাহ শরীফের তা'যীমের অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

طهر। এ শব্দটির ব্যাখ্যায় এবনে জরীর (রঃ) বলেছেনঃ

"আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা, মূর্তি থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং শেরক থেকে"।

এ শব্দের ব্যাখ্যা তফসীরে মাদারেকে এভাবে করা হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফকে পবিত্র রাখার হুকুম হয়েছে মূর্তি থেকে এবং সমস্ত অপবিত্রতা থেকে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা শরীফের জন্যে সর্ব প্রথম এ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! হে প্রতিপালক! মরু প্রান্তরের এ এলাকাটিকে একটি জনবহুল, নিরাপদ এবং শান্তির নগরে পরিণত কর।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল হলো

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এ দোয়া কবুল করেছেন।

প্রথমতঃ এলাকাটি একটি শহরে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ একটি নিরাপদ এলাকা ও শান্তির কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৃতীয় দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কাবাসীকে ফলমুল সহ যাবতীয় রিয্ক প্রদান কর, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ রিয্কের ব্যাপারে মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবেনা। মোমেন হোক কি বেঈমান সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি আর সৃষ্টি মাত্রকেই এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমিত সময়ে রিয্ক দান করবো, তার প্রয়োজনের আয়োজন করবো কিন্তু পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তারা তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণতিস্বরূপ দোযখের কঠিন শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। এখানে দুনিয়ার নেয়ামতকে আল্লাহ পাক "কালীল" বা সামান্য বলেছেন; কেননা আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার সবকিছুই নিতান্ত সামান্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট যদি এ দুনিয়ার মর্যাদা একটি মাছির পাখার সমানও হতো তবে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তার এক ঢোকও পান করাতেন না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীর রিয্কের জন্যে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ পাক তা কবুল করেছেন, আর এজন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে সারা বিশ্ব থেকে রকমারী খাদ্য-দ্রব্য মক্কা শরীফে পৌঁছে থাকে। শুধু তাই নয়, হযরত

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে আদেশ দিলেন। তিনি সিরিয়ার একটি অংশকে উঠিয়ে মক্কার চারপার্শ্বে সাতবার ঘুরিয়েছেন এবং মক্কা শরীফের অদূরে তা স্থাপন করেছেন। এজন্যে এ স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে তায়েফ। হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর হাতেই বর্তমান তায়েফ শহরটির বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এখানে রকমারী ফল-ফলারী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা নিয়মিত মক্কাশরীফে আসে, এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার জীবন্ত প্রমাণ ও জ্বলন্ত স্বাক্ষর।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) তফসীরে রুহুল মাআনীতে বলেছেন, তায়েফের এ যমীনটি প্যালেষ্টাইন থেকে কেটে আনা হয়েছে। তিনি আরেকটি মতের উল্লেখ করেছেন যে, যমীনের এ অংশটি জর্ডান থেকে কেটে আনা হয়েছে।[২]

এতে একথা প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা করেন তখন কোন ব্যক্তি সমাজ বা জাতিকে এমন ভাবে রিয্ক দিয়ে থাকেন যা মানুষের কল্পনারও অতীত।

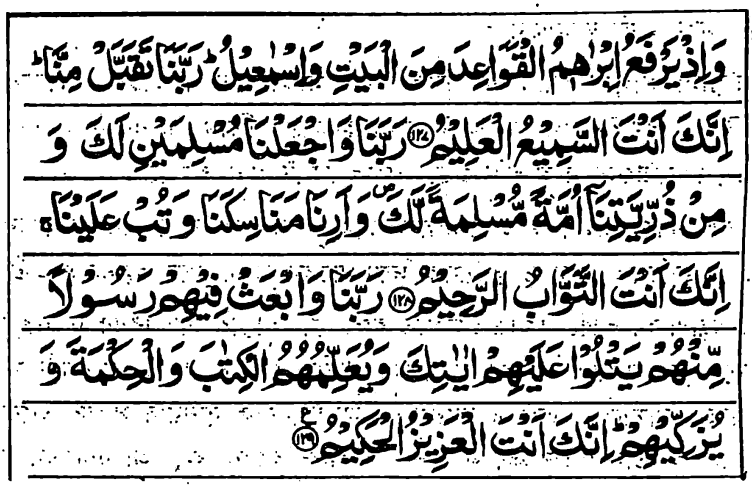
এতদ্বারা আরেকটি কথাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ পাক রিয্ক দানের ব্যাপারে ঈমানের শর্তারোপ করেন না যেমন হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সম্পদ তাকেও দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন অথবা অপছন্দ করেন কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত তথা দ্বীন ও ঈমান শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

বস্তুতঃ কেয়ামতের দিনই ভাল-মন্দের তারতম্য এবং পার্থক্য প্রকাশিত হবে। ঈমানদার এবং বেঈমানের মধ্যকার তফাত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে। যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে, আর বিশ্বাস মোতাবেক নেক আমল করবে তারা চিরশান্তি নিকেতন বেহেশতে তাদের জন্যে সংরক্ষিত স্থানে চলে যাবে। পক্ষান্তরে, যারা ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেনা তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি তথা দোযখ প্রস্তুত করা হয়েছে।

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আর তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২০
খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৭৬
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮২


وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۚ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

তরজমা

(১২৭) এবং যখন (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ) ও (হযরত) ইসমাঈল (আঃ) কা'বা শরীফের ভিত্তি উত্তোলন করেছিলেন তখন তাঁরা দোয়া করেছিলেন, হে প্রভু! আমাদের তরফ থেকে এ সাধনা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১২৮) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফরমাবরদার কর, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও একটি অনুগত ও আজ্ঞাবহ দল বানাও। আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

(১২৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত সমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞানের কথা শেখাবে এবং তাদেরকে শুদ্ধ করবে, নিশ্চয় তুমি প্রতাপশালী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণের পটভূমি বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা এত সুস্পষ্ট, এত আকর্ষণীয় এবং এত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যে, পাঠক মাত্রেরই সম্মুখে সে ঐতিহাসিক মুহূর্ত জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়, যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণাধিক পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে নিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফ

নির্মাণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং তাঁদের অন্তরের অবস্থা, আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁদের ভয়-ভীতি, তাঁদের এখলাছ ও আন্তরিকতা এবং বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের এ সাধনা কবুল করার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের দোয়া– এসবই এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে কা'বা শরীফকে জনসমাবেশের কেন্দ্র এবং নিরাপদ স্থান হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে, যেন কা'বা শরীফকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখা হয়। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) পবিত্র কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় যে আকর্ষণীয় ভাবে দোয়া করেছিলেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

এতদ্বারা পবিত্র কোরআন এ শিক্ষা দিয়েছে যে, আল্লাহর নামে যদি কেউ কোন কাজ করে তবে তা যে আল্লাহর দরবারে অবশ্য কবুল হবে এমন নয়, বরং কবুল করা না করা আল্লাহর মর্জির ব্যাপার। আল্লাহ পাকের ই মর্জি পাওয়ার আদব হলো সর্ব প্রথম নিয়ত সঠিক করা, শুধু এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে কাজ করা, আর কাজ করে গর্ব না করা, আত্ম প্রচার না করা। দ্বিতীয়তঃ কাজ করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা এজন্যে যে, যদি আল্লাহ পাক কবুল না করেন কেননা, সাধনা মাত্রই সার্থক হবে তা নয়, বরং ব্যর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আর এজন্যে ভয়-ভীতি, বিনয় ও মিনতি নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলিয়তের জন্যে আরজী পেশ করা। এজন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) تقبل শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ হলো যদিও এ মেহনত কবুল হওয়ার যোগ্য নয়, তবুও দয়া করে কবুল করুন।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করার সময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কবুলিয়তের জন্যে যে বিনীত আরযী পেশ করেছেন তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যাঁকে আল্লাহ পাক বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا

"এবং আল্লাহ পাক ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন"।

যাঁকে আল্লাহ পাক তওহীদ পন্থীদের ইমাম বলে ঘোষণা করেছেনঃ

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৭৬

"আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ "নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের ইমাম নির্বাচন করেছি"।

যাঁকে আল্লাহ্ পাক পরীক্ষা করেছেন কঠিন ভাবে, যেমন নমরূদের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে, প্রাণাধিক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কোরবানি করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যাঁর আলোচনা পবিত্র কোরআনে ৬১ বার হয়েছে।

যিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রী এবং পুত্রকে শষ্য-শ্যামলিমায় ভরপুর সিরিয়া থেকে এনে কঙ্করময় শুস্ক যমীনে তথা মক্কায় অসহায় অবস্থায় রেখে গেছেন।

সেই ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কা'বা শরীফ নির্মাণ করতে গিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ মিনতি জানাচ্ছেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

হে পরওয়ারদেগার! আমাদের তরফ থেকে এ সাধনা কবুল কর। তুমি নিশ্চয় সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত, তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবগত, আমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, তুমি আমাদের এ নজরানা কবুল করলে আমরা ধন্য হই। অতএব, হে পরওয়ারদেগার! কবুল কর।

বায়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণের ইতিকথা

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাক যমীন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে কা'বা শরীফের স্থান সৃষ্টি করেছিলেন, স্থানটি ছিল একটি সাদা ফেনা, যা পানি রাশির উপর স্থির হয়েছিল। তার নীচে থেকে যমীনের বিস্তার শুরু হয়। আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)-কে যমীনে অবতীর্ণ করেছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আশ্রয়ের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরযী পেশ করলেন। তখন আল্লাহ্ পাক জান্নাত থেকে ইয়াকুতের তৈরী বায়তুল মা'মুর অবতীর্ণ করে তা কা'বা ঘরের স্থানে স্থাপন করলেন। এর দ্বার ছিল জমরূদের। একটি ছিল পূর্ব দিকে অপরটি ছিল পশ্চিম দিকে। এরপর হুকুম হলো, হে আদম! আমি তোমার জন্যে একটি ঘর অবতীর্ণ করেছি। ঘরটিতে তুমি এমনভাবে তওয়াফ কর যেমন আরশের চারিপার্শ্বে তওয়াফ করতে এবং এর কাছে এমনভাবে নামাজ আদায় কর যেভাবে আমার আরশের নিকট নামাজ আদায় করতে। এই সময় হাজারে আসওয়াদও অবতীর্ণ হয়েছে, তখন এ পাথরটি উজ্জ্বল সাদা ছিল। অন্ধকার যুগে ঋতুবতী স্ত্রীলোকদের স্পর্শের দরুন তা কালো হয়ে পড়ে। হযরত আদম (আঃ) উপরোক্ত হুকুম শ্রবণ করে

হিন্দুস্তান থেকে পায়ে হেঁটে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌঁছলেন। তাঁকে কা'বা শরীফের রাস্তা দেখাতে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌঁছে আল্লাহর ঘরে হজ্জ সম্পাদন করলেন। হজ্জের সম্পূর্ণ বিধান তিনি পালন করেছিলেন। যখন হজ্জ পর্ব সুসম্পন্ন করলেন তখন ফেরেশতাগণ বলেছিলঃ হে আদম! আপনার হজ্জ কবুল হয়েছে। আর আমরা আপনার দু' হাজার বছর পূর্বে এ ঘরের হজ্জ সম্পাদন করেছি।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) ৪০ বার হজ্জ করেছেন। নূহ (আঃ)-এর যুগের তুফান পর্যন্ত বায়তুল মা'মুর এভাবেই ছিল। এরপর আল্লাহ পাক তাকে আসমানে উত্তোলন করেন। প্রতিদিন ৭০ হাজার নতুন ফেরেশতা বায়তুল মা'মুরের তওয়াফ করেন। এ অবস্থা সর্ব কালে অব্যাহত থাকবে।

পরবর্তীতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, একটি মেঘখন্ড বায়তুল্লাহ শরীফের স্থানে ছায়া ফেলে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সে ছায়ার পরিমাপ মোতাবেক কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করেছেনঃ

(১) তুরে সাইনা, (২) তুরে যীতা, (৩) লুবনান (সিরিয়ার একটি পাহাড়), (৪) জুদী (এটি আরব উপদ্বীপের একটি পাহাড়) এবং (৫) হিরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করেন। হিরা মক্কার একটি পাহাড়। এরপর যখন হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের সময় হলো তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-কে বললেন যে, এখানে একটা সুন্দর পাথর স্থাপন করা দরকার যেন তা মানুষের জন্যে একটা নিদর্শন হয়ে থাকে। তখন ইসমাঈল (আঃ) একটা সুন্দর পাথর আনলেন। ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, "এর চেয়ে সুন্দর পাথর নিয়ে এস"।। হযরত ইসমাঈল (আঃ) পুনরায় গেলেন। আবু কোবাইস পাহাড় চিৎকার করে বললো, "আপনার একটা আমানত আমার নিকট রয়ে গেছে, তা নিয়ে যান"। হযরত ইসমাঈল (আঃ) হাজারে আসওয়াদ সেখান থেকে সংগ্রহ করে যথাস্থানে স্থাপন করে দিলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ পাক আসমানে বায়তুল মা'মুর নামে একটা ঘর নির্মাণ করে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেন যেন তার অনুকরণে দুনিয়াতে কা'বা ঘর নির্মাণ করে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৩

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, প্রথমে হযরত আদম (আঃ) কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু তা তুফানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে আবার সে ঘরের নমুনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্মুখে তুলে ধরা হয়, সে নমুনা মোতাবেক তিনি তা পুনঃ নির্মাণ করেন। الله اعلم। আল্লাহ পাক সবচেয়ে ভাল জানেন।[১]

কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণের পূর্ব প্রস্তুতি

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাস করছিলেন জেরুজালেমে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাজেরার গৃহে যখন হযরত ইসমাইল (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন, স্ত্রী হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে তদানীন্তন অনাবাদী এলাকা মক্কায় রেখে যেতে।

বলাবাহুল্য, এ স্থানটি তখন ছিল সম্পূর্ণ অনাবাদী প্রান্তর। এর মরণ পিয়াসী কঙ্করময় শুস্ক ভূমির চতুর্দিকে যেন মৃত্যুই ছিল বিরাজমান। কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য অথবা মানুষের নাম-নিশানাও ছিল না এ প্রাণহীন উপত্যকায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর রেখে প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। হযরত হাযেরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তাঁর অনুসরণ করলেন আর বলতে লাগলেন, আপনি কি আমাকে এমন স্থানে একাকী রেখে যাচ্ছেন? যেখানে জীবন-শ্যামলিমার কোন নিদর্শন নেই, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্বাক, নিস্তব্ধ, সম্পূর্ণ নিরুত্তর, আপন মনে চলে যাচ্ছেন। অবশেষে হযরত হাযেরা জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ পাকই কি আপনাকে এ আদেশ দান করেছেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জবাব দিলেন হ্যাঁ, এ কাজ আল্লাহ পাকের আদেশেই করা হয়েছে। হযরত হাযেরা একথা প্রবণ করে বললেনঃ যদি আল্লাহ পাকের আদেশে এ কাজ হয়ে থাকে তবে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না, পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চলতে চলতে একটি পর্বত শৃঙ্গের উপর আরোহণ করে দেখলেন যে তাঁর পরিবারবর্গ দৃষ্টিগোচর হয়না, তখন দু' হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করে এ মুনাজাত করলেনঃ

رَبَّنَآ اِنِّىٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ-الاية

"হে প্রভু! আমি তোমার গৃহের নিকট এমন একটি ভূমিতে আমার সন্তানকে বসবাস করিয়েছি, যেখানে শষ্য-শ্যামলিমার কোন নিশানাও নেই, হে প্রভু! যেন তারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে, সুতরাং মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট কর এবং যমীনের উৎপন্ন ফসল থেকে তাদেরকে উপজীবিকা দান কর, হয়তো তারা শোকর গুজার হবে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৪

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দেয়া পানি এবং খেজুর দ্বারা হযরত হাযেরা কয়েক দিন অতিবাহিত করলেন এবং ইসমাঈল (আঃ)-কে দুগ্ধ পান করালেন, কিন্তু তা আর ক'দিন? অল্প ক'দিন পরই তাঁর সীমাবদ্ধ আর সামান্য রসদ নিঃশেষ হয়ে গেল, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের কষ্টের সীমা রইল না, মাতার ক্ষুধার দরুণ শিশুর দুধের ব্যবস্থাও হলোনা। সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অবস্থা দূরবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছিল, তাঁর অস্থিরতা, ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, শিশুর মৃত্যু আসন্ন ভেবে মাতা অপেক্ষাকৃত একটু দূরে এবং বৃক্ষের আড়ালে চলে গেলেন। কারণ স্বীয় কলিজার টুকরা সম সন্তানকে এভাবে অনাহারে মরতে দেখার মত মনের বল কোন মাতারই থাকেনা। একটু পর মনের অস্থিরতায় বাধ্য হয়ে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন. হয়তো আল্লাহ পাকের কোন বন্দা আগন্তুক মুসাফিরের আগমনে তাঁর সমূহ বিপদ আপাততঃ দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু সেখানে কাউকে না দেখে শিশুর মায়ায়, প্রাণের আবেগে পুনরায় ছুটে এলেন পুত্রের নিকট। তাঁর সকরুণ অবস্থা দেখে দ্রুতবেগে গমন করলেন মারওয়াহ পাহাড়ের দিকে, পুনরায় স্বীয় প্রাণাধিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে সাতবার গমনাগমন করলেন। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ স্থানে পৌঁছে এরশাদ করেছেনঃ এটাই হলো সাফা ও মারওয়ার ছায়ী (দৌড়) যা হাজীদেরকে হজ্জ পর্ব সু-সম্পন্ন করার সময় আদায় করতে হয়। যাহোক, শেষবার যখন হযরত হাযেরা মারওয়াহ পাহাড়ে উপস্থিত হলেন তখন তিনি একটি অদৃশ্য আওয়াজ শ্রবণ করলেন, তিনি কর্ণপাত করলেন, সে আওয়াজ পুনরায় শ্রবণ করে হযরত হাযেরা বললেনঃ যদি আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হও, তবে সম্মুখে উপস্থিত হও।

জমজম কূপের আবিস্কার

তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পদাঘাত করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে জমজম কূপ আবিস্কার হলো, সজোরে পানি উঠতে লাগলো। হযরত হাজেরা পানি পান করে প্রাণ শীতল করলেন, আর ইসমাঈল (আঃ)-কেও দুগ্ধ পান করালেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাজেরাকে বললেনঃ তুমি ভীত শঙ্কিত হয়োনা। আল্লাহ পাক তোমাকে এবং এ শিশুকে ধ্বংস করবেন না। এ স্থানটি হলো বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর। এর নির্মাণ কাজ এ শিশু এবং তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এজন্যে আল্লাহ পাক এ পরিবারকে ধ্বংস করবেন না। বায়তুল্লাহ শরীফের এ স্থানটি নিকটবর্তী ভূমিতে উঁচু ছিল, কিন্তু প্রবাহিত পানি তার সমান হচ্ছিল। এই সময় বনী যুরহাম নামক এক গোত্র এ স্থানে পানির সন্ধান পেয়ে বসবাস করার ইচ্ছা করে হযরত হাজেরার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলো, তিনি এ শর্তে বাসস্থানের অনুমতি দান করলেন যে, পানি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। যুরহাম গোত্র এ প্রস্তাবে সম্মতি

জানিয়ে এখানেই বসবাস করতে লাগল। শুধু তাই নয়; বরং তাদের অবশিষ্ট লোকদেরও এখানে আসতে আহ্বান জানায়। কবিলায়ে যুরহাম কা'বা শরীফের নিকট রীতিমত অবস্থান করতে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাদের মাঝেই জীবনের শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং তাদের গোত্রেই তিনি বিবাহ করলেন। কিছু দিন পর হযরত হাযেরার এন্তেকাল হলো। মাঝে মাঝে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এসে তাঁর পরিবারবর্গকে দেখে যেতেন। একবার এসে বাড়ীতে ইসমাঈল (আঃ)-কে পেলেন না, তাঁর স্ত্রীকে তিনি কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রী উত্তর দিলেনঃ তিনি উপজীবিকার অন্বেষনে গমন করেছেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের দিন কিভাবে কাটছে? পুত্রবধূ উত্তর করলেন, অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে আমরা কাল যাপন করছি। একথা শ্রবণ করে তিনি বললেনঃ তাকে আমার সালাম দিও এবং একথা বলবে যেন অনতিবিলম্বে গৃহের চৌকাঠ পরিবর্তন করে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী ফিরে একথা শ্রবণ করলেন এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেনঃ যিনি এসেছিলেন তিনি আমার পিতা। তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেই অতএব, আমি এখনই তোমাকে বিদায় দিচ্ছি।

এরপর হযরত ইসমাঈল (আঃ) অন্য একটি বিবাহ করলেন। কিছু দিন পর পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এসে দেখলেন নববধূ ঘরে এসেছে। তবে হযরত ইসমাঈল (আঃ) আজও অনুপস্থিত, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেনঃ আল্লাহ পাকের রহমতে আমরা অত্যন্ত সুখেই আছি। এজন্যে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ সাধারণতঃ তোমরা কি খেয়ে থাক? তিনি উত্তর দিলেনঃ খাওয়ার জন্যে গোশ্ত আর পানীর দ্রব্য হিসাবে জমজমের পানি। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁদের জন্যে দোয়া করলেনঃ

اللهم بارك لهم فى اللحم والماء

"হে আল্লাহ! তাদের গোশ্ত এবং পানিতে বরকত দান কর"।

তিনি পুত্রবধূকে বললেনঃ ইসমাঈলকে আমার কথা বলবে যে, এ চৌকাঠটির যেন হেফাজত করে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর স্ত্রীর নিকট সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করে বললেনঃ তিনি ছিলেন আমার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ), আর তাঁর পয়গাম এই, তুমি যেন আজীবন আমার জীবন-সঙ্গিনী থাক। এ বিবরণ বোখারী শরীফের "কেতাবু র‍্যোয়্যা"য় এবং "কেতাবুল আম্বিয়া"য় বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মূলতঃ এভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আবাদ করেছেন এবং তাঁর দ্বারা কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

কা'বা শরীফের নির্মাণ যুগে যুগে

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন।

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) "ফতহুল বারী"তে একখানি রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সর্ব প্রথম কা'বা শরীফের বুনিয়াদ রেখেছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দেন যা এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কয়েক হাজার বছরের আবর্তন-বিবর্তন এবং পরিবর্তনের কারণে সে ঘরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবুও তার একটি নিদর্শন উঁচু যমীনের ন্যায় ছিল। আল্লাহর ওহী দ্বারা হযরত আদম (আঃ) জানতে পারলেন যে, এ স্থানটিই বায়তুল্লাহ শরীফের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে তওহীদের প্রতীক হিসেবে এবং একমাত্র সেই আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করার মানসে সর্ব প্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়েছে তা হলো কা'বা শরীফ। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

(সূরা আল এমরান)

"নিশ্চয় দুনিয়ার সর্ব প্রথম ঘর মানুষের জন্যে (আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উদ্দেশ্যে) মক্কা শরীফে নির্মাণ করা হয়েছে। এ ঘরখানি বরকতময় এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যে হেদায়েতের মূল উৎস"।

ইমাম বায়হাকী তাঁর "শোয়াবুল ঈমান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উল্লেখ করেছেনঃ হযরত আদম (আঃ) বেহেশত থেকে যমীনে অবতরণের পর কোন আবাস গৃহ দেখতে না পেয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলেনঃ হে আল্লাহ! এখানে ছাদ বিশিষ্ট কোন গৃহ নেই এবং সকলে একত্রিত হয়ে আপনার বন্দেগী করারও কোন সুব্যবস্থা নেই।

হযরত আদম (আঃ)-এর নির্মাণ

আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেনঃ তুমি একটি গৃহ নির্মাণ কর। হযরত আদম (আঃ) জানতে চাইলেন, কোন্ স্থানে গৃহ নির্মাণ করবো? তখন

হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর আদেশে স্থান নির্বাচন করে দিলে হযরত আদম (আঃ) নীচু থেকে যমীনের সমান পর্যন্ত পাথরের গাথুনি দ্বারা ভিত্তি নির্মাণ করে তার উপর সোনালী তাঁবু দ্বারা একটি গৃহ তৈরী করলেন এবং তিনি তাকে কেবলা গ্রহণ করে নামাজ আদায় করতেন।[১]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুনঃ নির্মাণ

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) সম্মিলিত ভাবে এ ঘরখানি পুনঃনির্মাণ করেন। যখন বায়তুল্লাহ শর্য়ীফের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে তখন আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জানিয়েছেন, এটিই মিল্লাতে ইব্রাহীমের জন্যে কেবলা হলো। আমার নিকট মাথা নত করার এটাই হলো নিদর্শন আর এটিই তওহীদের কেন্দ্রভূমি। এ সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট এ মর্মে তিনটি দোয়া করলেনঃ

(১) হে পরওয়ারগোর! আমাদের তরফ থেকে এ সাধনা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

অবশিষ্ট দু'টি দোয়া পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, যার বিবরণ যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ সন্নিবেশিত হবে।

যুরহাম

অনেক দিন পর দেখা গেল, একটি পাহাড়ী ঝর্ণা প্রবাহের কারণে বায়তুল্লাহ শরীফের দেয়াল ভেঙ্গে গেছে, তখন যুরহাম গোত্র তা পুনঃ নির্মাণ করলো। কয়েক যুগ পর এ নির্মাণও ভেঙ্গে গেল, পরে আমালেকা গোত্র তা পুনঃ নির্মাণ করেন। এরপর কোশাই বিন কিলাব নির্মাণ করেন এবং কা'বা শরীফকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করেন।

কোরায়শদের নির্মাণ

এ নির্মাণ দীর্ঘ দিন থাকার পর পুনরায় যখন নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন মক্কার বিখ্যাত কোরায়শ গোত্র পুনঃনির্মাণ করলো। এ সময় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তবে তাঁর নবুওয়্যতের ঘোষণা তখনও হয়নি।

কোরায়শগণ পূর্বের চেয়ে কিছু অংশ বাদ দিয়ে নির্মাণ করলো এবং কিছু কিছু পরিবর্তনও করলো। যেমনঃ

১. হাতীমের দিক থেকে কয়েক গজ বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের পশ্চিম প্রান্তের দেয়াল নির্মাণ করলো।

১। তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮

২. দ্বার প্রায় ছয় ফুট উঁচুতে রাখা হলো, যাতে করে তাদের ইচ্ছার বাইরে কেউ বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

৩. দেয়ালগুলো পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ উঁচু করলো।

৪. ছাদে ওঠার জন্যে "রোকনে শামীর" অভ্যন্তর দিয়ে একটি সিঁড়ি নির্মাণ করলো।

এ নির্মাণ কালে হাজারে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ পাথর স্থাপন নিয়ে কোরায়শ সর্দারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলে সকলে প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সকলকে নিয়ে এ কাজ সমাধা করেন। তিনি একটি চাদর নিয়ে পাথরটি তাতে স্থাপন করেন এবং সকল গোত্রের প্রতিনিধিকে ঐ চাদর হাজারে আসওয়াদের স্থানে নিয়ে যেতে বললেন, ফলে সকলেই সন্তুষ্ট হলো। কোরায়শদের দ্বারা বায়তুল্লাহ শরীফের যে নির্মাণ হয় তাতে প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না, একদিন তিনি সে কথা হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট প্রকাশ করলেনঃ

"আয়েশা! আমার ইচ্ছে হয় বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নির্মাণের ন্যায় করি। দ্বার যমীনের সঙ্গে মিলিত থাকবে এবং দ্বার দু'টি থাকবে, একটি প্রবেশের অপরটি প্রস্থানের"।

একথা বলার কিছুদিন পরই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহজগত ত্যাগ করেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)

এরপর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীস শ্রবণের পর সেভাবেই বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) এ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ৬৪ হিজরীর রমজান মাসের ২৭ তারিখ।

বনু উমাইয়া

কিন্তু তার অল্প কিছু দিন পরই উমাইয়া বংশ ক্ষমতা লাভ করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গে শত্রুতাবশতঃ বায়তুল্লাহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৮৯

শরীফের এ নির্মাণ ধ্বংস করে কোরায়েশদের নির্মাণানুসারে পুনঃ নির্মাণ করে এবং শুধু পূর্ব দিকে একটি দ্বার রাখে।

এরপর আব্বাসীয় গোত্রের শাসনামলে হারুন-অর-রশিদ খলীফা হওয়ার পর তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) ন্যায় পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করে ইমাম মালেক (রঃ) সহ ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ চাইলেন। ওলামায়ে কেরাম এই বলে নিষেধ করলেন যে, যে কেউ খলীফা হওয়ার পরই যদি বায়তুল্লাহ শরীফের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে পুনঃ নির্মাণ করতে থাকে, তবে আল্লাহর এ পবিত্র ঘর তাদের ভাঙ্গা-গড়ার শিকারে পরিণত হবে।[১]

৭৪ হিজরী থেকে ১০৪০ হিজরী পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফের একই নির্মাণ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এরপর ১০৪০ হিজরীতে সুলতান মুরাদ পূর্বের নির্মাণ অত্যন্ত পুরনো হবার কারণে হাজারে আসওয়াদের কোণ ব্যতীত পুনরায় নির্মাণ করেন।

দেয়ালের অভ্যন্তর ভাগে ও মেঝেতে মর্মর পাথর স্থাপন করেন। বর্তমানে বায়তুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগ গেলাফ দিয়ে আবৃত করা রয়েছে।

বহির্ভাগে যে গেলাফ রয়েছে তা সম্পূর্ণ গাঢ় কাল রং এর। উপরের দিকে চতুঃস্কোণ বেষ্টনি দিয়ে স্বর্ণাক্ষরে কোরআনে পাকের কিছু কিছু আয়াত লিখে রাখা হয়েছে এবং সারা গেলাফ জুড়ে কাপড়ের বুননের মাধ্যমেই কালেমা তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ও সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আজীম লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শত শত শ্রমিক ও শিল্পী দ্বারা গেলাফ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রতি বছর তা পরিবর্তন করা হয়। পুরাতন গেলাফের অংশ বরকত স্বরূপ এবং মূল্যবান সম্পদ স্বরূপ বিশিষ্ট মেহমানদেরকে উপহার দেয়া হয়।

হাতীম

কা'বা শরীফের যে অংশ কোরায়শরা পুনঃ নির্মাণের সময় বাদ দিয়ে রেখেছে এবং পরে তা দেয়ালের বেষ্টনি দিয়ে রাখা হয়েছে, ঐ অংশকে হাতীম বলে।

মিজাবে রহমত

এ হাতীমের দিকেই মধ্যস্থলে বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে একটি ঝর্ণা রয়েছে, তাকে মিজাবে রহমত বলা হয়। এখানে দোয়া কবুল হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৯০

মাতাফ

বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের কিছু অংশ- যে স্থানে ঘুরে ঘুরে মানুষ বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করে, ঐ স্থানকে মাতাফ বলা হয়।[১]

হরমে কা'বা

কা'বা শরীফের চতুর্দিকে ছোট ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট মনোরম দৃশ্যের সুদৃঢ় দালান নির্মাণ করে রাখা হয়েছে, তাকে "কা'বার হরম" বলা হয়। সুলতান মুরাদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ সুবিশাল ও মনোরম দৃশ্যের ইমারত নির্মাণ করেছেন।

জমজম

সেই প্রসিদ্ধ কূপ যা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর অসীম কুদরতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্যে অলৌকিকভাবে প্রবাহিত করেছিলেন। আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘরের নিকটেই এ বরকতময় কূপটি অবস্থিত। প্রতিদিন হাজার হাজার মোমেন লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি এ কূপ থেকে নিয়ে যায়। হজ্জের মৌসুমে লক্ষ লক্ষ হাজী হজ্জ পালনের পর দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় এ পানি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি প্রতিদিন এ কূপ থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তোলন করা হচ্ছে কিন্তু তাতেও এতটুকু পানি কমেনা। মুসলিম মিল্লাত অত্যন্ত ভক্তি ভরে ও বরকত লাভের আশায় কেবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান অবস্থায় এই পানি পান করে।

প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ماء زمزم لما شرب

"জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবে সে উদ্দেশ্যই সফল হবে"।

হাজারে আসওয়াদ

হাজার অর্থ পাথর, আসওয়াদ অর্থ কৃষ্ণ, অতএব হাজারে আসওয়াদ অর্থ কৃষ্ণ পাথর যা পবিত্র কা'বা শরীফের এক কোণে স্থাপিত রয়েছে। এ কৃষ্ণ পাথরে চুম্বন করেছেন স্বয়ং প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও যারা আল্লাহর ঘর জেয়ারত করেছেন তাঁরা সকলে। এজন্যেই হজ্জ যাত্রীগণ সর্বদা এ বরকতময় পাথরে চুম্বন দেয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকেন। এ পাথরটি ছিল ধবধবে সাদা যেমন হাদীস শরীফে আছেঃ হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আসমান থেকে যখন হাজারে আসওয়াদ যমীনে অবতীর্ণ হলো তখন তা সাদা ধবধবে ছিল কিন্তু পরে তা মানুষের গুনাহে কালো হয়ে গেল।

১। তফসীরে হাক্কানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৩

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, হাজারে আসওয়াদ ও মকামে ইব্রাহীম বেহেশতের দু'টি ইয়াকুত পাথর।

অন্য একখানি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কৃষ্ণ পাথরের নিকট যে ব্যক্তি দোয়া করবে আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ পাথর সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের শপথ! আল্লাহ্ পাক অবশ্যই কেয়ামতের দিন এ পাথর উপস্থিত করবেন, তার দু'টি চক্ষু হবে যদ্বারা সে দেখবে এবং তার বাকশক্তি থাকবে, সে সেসব লোকদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে যারা আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে চুম্বন করেছে।

এ কৃষ্ণ পাথরটিকে চুম্বন করার সময় খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাঃ) যে মন্তব্য করেছিলেন এখানে তা-ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের শপথ করে বলছি, আমি নিশ্চিতভাবে জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। তোমার দ্বারা উপকার কিছুই হয়না। যদি আমি প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চুম্বনের কারণে এ পাথরটিকে চুম্বন করার আগ্রহ প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে চির জাগরুক রয়েছে।

কা'বা শরীফ নির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়া

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ- الاية

(২) "হে প্রভু! আর আমাদেরকে তোমার অনুগত কর, তোমার ফরমাবরদার ও আজ্ঞাবহ বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্যেও একটি দলকে অনুগত বানাও এবং আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দাও এবং আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ কর। নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী, তুমি অত্যন্ত দয়াময়"।

বর্ণিত আছে, এ দোয়ার পর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিলেন এবং কা'বা শরীফের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবহিত করলেন।[১]

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৭৬

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ দোয়ায় একথার শিক্ষা রয়েছে যে, প্রত্যেক পিতা-মাতার সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করা উচিত, তারা যেন আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, সেদিকে পিতা-মাতার লক্ষ্য রাখা উচিত।

সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা দেয়া, জীবন-যাপনের পন্থা বাতলানো, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশধরদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মুনাজাত করেছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে সন্তান-সন্ততির ইহকালীন জিন্দেগীর ভবিষ্যত নিয়ে পিতা-মাতা চিন্তা করলেও পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্য তারা কিভাবে লাভ করবে, এ বিষয় তেমন কোন চিন্তা-চর্চা এবং চেষ্টা সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়না।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে এ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার মাধ্যমে তাঁর আদর্শের বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং অতি আকর্ষণীয় ভাবে।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

"হে প্রভু! আমাদেরকে তোমার পূর্ণ এবং প্রকৃত অনুগত বানাও"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "প্রকৃত মুসলমান" সে ব্যক্তি যার হাত এবং রসনা থেকে (তথা তার মন্দ আচরণ থেকে) অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয় না এবং যার দ্বারা অন্য মানুষও কষ্ট পায়না তাকেই প্রকৃত মুসলমান বলা হবে।[১]

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

অর্থাৎ আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[২]

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো ইসলামের যাবতীয় নিয়ম-কানুন বিশেষতঃ হজ্জের নিয়ম-কানুন আমাদেরকে শিক্ষা দাও।[৩]

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ দোয়াও কবুল করেছেন। ফেরেশতাগণের দলপতি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরফার দিন আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৪
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১০
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৫

-কে যাবতীয় নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। সে সময় তারা আরফার ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কি হজ্জের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত হয়েছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ হয়েছি। সেদিন থেকে এ স্থানের এবং এ দিনের নাম "আরফা" হয়েছে। অর্থাৎ এ দিনকে আরফার দিন বলা হয়, আর এ ময়দানকে আরফার ময়দান বলা হয়।

وَتُبْ عَلَيْنَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে তওবা করার তওফিক দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর।

তওবার তাৎপর্য

আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ তওবাকারীদের বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তওবার মর্মার্থ বা ব্যাখ্যায়ও রদবদল হয়ে থাকে। যেমন সাধারণ মুসলমানের তওবার অর্থ হলো অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, ভবিষ্যতে এমন অন্যায় না করার সংকল্প গ্রহণ করা এবং কারো প্রতি জুলুম অত্যাচার হয়ে থাকলে তার প্রতিকার করা তথা ক্ষতিপূরণ করা। আর যদি তা সম্ভব না হয় অন্ততঃ ক্ষতিপূরণের নিয়ত বা সদিচ্ছা পোষণ করা।

আর বিশেষ ব্যক্তিদের তওবার অর্থ হলো যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা। এমনকি, মনের গহণ থেকে যাবতীয় কুচিন্তা দূর করা এবং আমলের যাবতীয় ত্রুটি বর্জন করা।

এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী বিশেষ ব্যক্তিদের তওবার অর্থ হলো তাঁদের মর্তবার উন্নতির সাধনা, তাঁদের শান ও মকামের উন্নয়নে প্রয়াসী হওয়া।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) যদি তাঁদের নিজেদের থেকে তওবার কথা বলে থাকেন, তবে আয়াতের অর্থ তাই হবে যা সবশেষে বর্ণিত হয়েছে।[১]

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের জন্যে দোয়া

(৩) কা'বা শরীফের ভিত্তি উত্তোলনের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে তিনটি দোয়া করেছিলেন তন্মধ্যে তৃতীয় দোয়াখানি এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ হে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৫

আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বংশধরদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ কর যিনি তাদের নিকট তোমার মহান বাণী পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদেরকে আত্ম-সংশোধনের পথ বাৎলাবেন। আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

"আমি আমার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ায় ফলস্বরূপ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ স্বরূপ", (কেননা) হযরত ঈসা (আঃ) এভাবে সুসংবাদ দিয়েছেন (পবিত্র কোরআনের ভাষায়)ঃ

يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ

অর্থাৎ তাঁর পরে আর একজন নবী আসবেন, যার নাম হবে আহমদ।

"আর আমি আমার মাতার স্বপ্ন"।

যিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন তার নিকট থেকে যেন একটি নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে যদ্বারা সিরিয়া দেশ পর্যন্ত আলোকিত হয়েছে।[১]

হযরত এরবাজ এবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

كنت نبيا وادم بين الماء والطين

"আমি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) পানি এবং মাটির মধ্যে ছিল", অর্থাৎ যখন আদম (আঃ)-এর জন্ম হয়নি।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) উভয়ে এ দোয়া করেছেন, আর মক্কা শরীফে নবী প্রেরণের জন্যে দোয়া করেছেন। এতদ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তা হলোঃ যে নবীর জন্যে দোয়া করা হয়েছে তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হবেন আর তিনি মক্কা শরীফে প্রেরিত হবেন। একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজন নবীই প্রেরিত হয়েছেন। তিনি হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অতএব, আলোচ্য আয়াতের দোয়া শুধুমাত্র হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের জন্যেই যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর একখানি হাদীসে এভাবে পাওয়া যায়ঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৮৬

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট নও? যে, (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ) এবং (হযরত) ঈসা (আঃ) কেয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে থাকবেন। ইব্রাহীম (আঃ) আমাকে বলবেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তোমার আবির্ভাব আমার দোয়ার ফল স্বরূপ। অতএব, তুমি আমাকে তোমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে লও।[১]

কাজী ইয়াজ (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "আশ্ শেফা"তে এই হাদীসখানির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে এর চেয়ে বড় ফজিলত আর কি হতে পারে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় নবী এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ একথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভাষায় প্রকাশিত হলো যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের জন্যেই দোয়া করেছেন।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশ পরিচয় পেশ সমীচিন মনে হয়। কেননা, ইতিহাস বেত্তাগণ হযরত আদম (আঃ) থেকে তাঁর সঠিক বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, যা দুনিয়ায় আর কোন মানুষের জন্যে করা হয়নি এবং সম্ভবও হয়নি। এটি শুধু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশ তালিকা

(১) আদম (আঃ),
(২) শীশ (আঃ),
(৩) ইউনুস (আঃ),
(৪) কাইনান,
(৫) মহলিল,
(৬) ইয়ার্দ,
(৭) ইদ্রিস,
(৮) মাতুশালাখ্,
(৯) লমক,
(১০) নুহ্ (আঃ),
(১১) শাম,
(১২) আশফাখ্শাদ,
(১৩) সালিক্,
(১৪) আইবর,
(১৫) ফালিস্,
(১৬) রাউ,
(১৭) সরুগ্,
(১৮) নাহুর,
(১৯) তারিহ (আযর),
(২০) ইব্রাহীম (আঃ),
(২১) ইসমাঈল (আঃ),
(২২) কাইজার,
(২৩) আওয়াম,
(২৪) ঔস্,
(২৫) মুররাহ,
(২৬) সাম্ঈ,
(২৭) রোজাহ,
(২৮) নাজিব,
(২৯) মোয়াসির,
(৩০) ঈহাম,

১। নুজহাতুল মাজালেস, পৃষ্ঠা-৪৮৭

(৩১) আফ্‌তাফ,
(৩২) ঈসা,
(৩৩) হাসান,
(৩৪) আনফা,
(৩৫) অরওয়া,
(৩৬) বলখী,
(৩৭) হারী,
(৩৮) হারী,
(৩৯) ইয়াসিন,
(৪০) হুমরান,
(৪১) আলরুয়া,
(৪২) ওবাইদ,
(৪৩) আনফ্,
(৪৪) আসকী,
(৪৫) মাহী,
(৪৬) মাখুর,
(৪৭) কাজেম,
(৪৮) কালেহ্
(৪৯) বদলান,
(৫০) ইয়ালদারুম,
(৫১) হেররা,
(৫২) নাসিল,
(৫৩) আবিল আউয়াম,
(৫৪) মাতা সাবিল,
(৫৫) বর,
(৫৬) ঔস,
(৫৭) সাল্‌মান,
(৫৮) হামিসা,
(৫৯) উদ্‌দ,
(৬০) আদনান,
(৬১) মুঈদ,
(৬২) হলম,
(৬৩) নবিত,
(৬৪) সলমান,
(৬৫) হুমিসা,
(৬৬) আলঈসাউ,
(৬৭) উদ্‌দ,
(৬৮) উদ্,
(৬৯) আদনান,
(৭০) মা'দ,
(৭১) নজর,
(৭২) মুদার,
(৭৩) ইলিয়াস,
(৭৪) মুদারিকা,
(৭৫) খুজাইমা,
(৭৬) কিনান,
(৭৭) নযর,
(৭৮) মালিক,
(৭৯) ফিহির (কোরেশ),
(৮০) গালিব,
(৮১) লোবাই,
(৮২) কা'ব,
(৮৩) মোরা,
(৮৪) কিলাব,
(৮৫) কেনসাহ,
(৮৬) আবদুল মন্নাফ,
(৮৭) হাশিম,
(৮৮) আবদুল মুত্তালিব,
(৮৯) আবদুল্লাহ,
(৯০) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।*

* প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনী-লেখক এবনে এসহাক রচিত "সীরাতে রসূলুল্লাহ" সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে সংগৃহীত।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে রসূল প্রেরণের জন্যে আমরা আরযী পেশ করছি তাঁর কয়েকটি দায়িত্ব থাকবে। প্রথমতঃ তিনি তোমার আয়াত সমূহ মানুষকে পাঠ করে শোনাবেন। অতএব, তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ মোবাল্লিগ বা ধর্ম প্রচারক। দ্বিতীয়তঃ তিনি মানুষকে সেই কিতাবের মর্মার্থ এবং গুঢ় রহস্যও শিক্ষা দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী পৌছে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবেনা; বরং মানব জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে যে মহান শিক্ষার সর্বাধিক প্রয়োজন তা তিনি মানুষকে প্রদান করবেন, এদিক থেকে তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

কিন্তু শুধু শিক্ষা দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হবেনা, বরং সে শিক্ষার যে হেক্‌মত এবং রহস্য রয়েছে তা-ও সুস্পষ্টভাবে মানুষকে তিনি জানাবেন এবং সেই মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন কিভাবে করতে হবে তা-ও তিনি হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবেন, এদিক থেকে তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুরশিদ।

وَيُزَكِّيْهِمْ

অর্থাৎ রসূলের কাজ শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি কয়েকটি বিষয়ে মানুষকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলবেন; বরং তাঁর কাজ হলো সকল কুকথা এবং কুকর্ম থেকে মানুষের মনকে পবিত্র করা, তাদেরকে আত্ম-সংশোধনে সাহায্য করা। মানুষের চরিত্রে যা কিছু মন্দ থাকে তা দূর করে দেয়া আর যা কিছু ভাল এবং কল্যাণকর হয়, তা গ্রহণে অভ্যস্ত করা, এদিক থেকে রসূল হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক।[১]

বস্তুতঃ এটি পবিত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে আল্লাহর রসূলের মহান দায়িত্ব, তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী! সত্যিই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুয়াল্লিম বা শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ মুরশিদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। যেমন হযরত ইব্রাহীম তাঁর দোয়ার মাধ্যমে চেয়েছিলেন তেমন, আর যেমন আল্লাহ পাক পছন্দ করেছেন, ঠিক তেমন (আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের তওফিক দান করুন)।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ
إِبْرٰهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ
وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ أَسْلِمْ ۙ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَ
يَعْقُوْبُ ۭ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

তরজমা

(১৩০) এবং যে নিজেকে নির্বোধ করে রেখেছে, সে ব্যতীত (হযরত) ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম থেকে কে বিমুখ হতে পারে? (ইব্রাহীম সেই ব্যক্তি) যাকে আমি পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং আখেরাতেও সে নিশ্চয় পূণ্যাত্মাদের মধ্যে পরিগণিত হবে।

(১৩১) যখন তার প্রভু তাকে বললেনঃ অনুগত হও, তৎক্ষনাৎ সে বলেছিল, আমি বিশ্ব জগতের প্রভুর অনুগত হয়েছি।

(১৩২) এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) তাদের পুত্রদেরকে এই ওসিয়ত করে গেছেন, "হে বৎসগণ! নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে এ ধর্মকে পছন্দ করেছেন, অতএব তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা"।

তফসীরুল কোরআন

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِمَ

শানে নুযুল

এবনে আসাকের বলেন যে হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তাঁর দু' ভ্রাতস্পুত্র সাল্‌মা এবং মুজাহেরকে বললেন, "তোমরা মুসলমান হয়ে যাও"। তোমরা একথা ভালভাবেই জান যে, আল্লাহ পাকের এরশাদ তৌরাত কিতাবে রয়েছে, "আমি ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজন নবী পয়দা করবো যাঁর নাম হবে "আহমদ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। যারা তাঁকে মেনে চলবে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না তারা হবে অভিশপ্ত"। পিতৃব্যের

এ উক্তি শ্রবণ করে সালমা মুসলমান হলেন কিন্তু মুজাহের স্পষ্টভাবে অস্বীকার করে বসলো, তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

যে বা যারা নিজেদেরকে নির্বোধ করে রেখেছে, নিজেদের বিচার-বিবেচনা শক্তিকে অকেজো করে ফেলেছে, যুক্তি-বুদ্ধি-পরিণামদর্শিতা কোন কিছুরই আবেদন তাদের নিকট রয়নি এমন নির্বোধ লোক ব্যতীত মিল্লাতে ইব্রাহীমী থেকে কে বিমুখ হবে? কেননা ইসলাম হলো স্বভাব ধর্ম। যে স্বভাব ও প্রকৃতির রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করে শুধু সে-ই মিল্লাতে ইব্রাহিমী থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। মানবতার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন এবং বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের এক পূর্ণ পরিণত পরিকল্পনা পেশ করেছে ইসলাম।

অতএব, যে নির্বোধ বা অপ্রকৃতস্থ, শুধু সে-ই মিল্লাতে ইব্রাহিমী থেকে বিমুখ হতে পারে, তথা ইসলাম থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

এ আয়াত সমূহে মুশরেকদের মিথ্যা দাবীকে খন্ডন করা হয়েছে। কেননা, তারা মুশরেক হয়ে নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো। অথচ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তওহীদবাদীদের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তিনি তওহীদ বা একত্ববাদের আহ্বায়ক ছিলেন। তওহীদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা বর্ণনাতীত। তিনি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ পাকের সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করেননি; বরং প্রতিটি শেরেকী কর্মকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন এবং সেগুলোর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এরই জন্যে তিনি স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করলেন এবং দেশ ত্যাগ করলেন। এমনকি, তাঁর পিতার বিরোধিতা করতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেনঃ

إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

তোমরা যেসব শেরেকী কাজ করছো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি খাঁটিভাবে আমার সমস্ত মনযোগ সেই পবিত্র সত্ত্বার দিকে ফিরিয়েছি যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। যারা শেরেকী করে তাদের দলে আমি নেই।

অন্যত্র বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা এবং কওমকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যে, তোমাদের উপাসনার বস্তুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি কেবলমাত্র আমার স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৬

আরও বলা হয়েছেঃ

مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে শুধুমাত্র একটা ওয়াদার কারণে এস্তেগফার করতেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী এবং সহনশীল।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ ইব্রাহীম (আঃ) আন্তরিকতাপূর্ণ এবং অনুগত উম্মত ছিলেন। তিনি কখনও মুশরেক ছিলেন না। তাঁর প্রভূর নেয়ামত সমূহের শোকর গুজার ছিলেন। আল্লাহ পাকের নিকট তিনি ছিলেন পছন্দনীয় এবং সঠিক পথে ছিলেন। দুনিয়ার সেরা লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আখেরাতেও শীর্ষস্থানীয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আলোচ্য আয়াতে এই সকল আয়াতের ন্যায়ই এরশাদ হয়েছে যে, নির্বোধ, নিজের উপর অত্যাচারী, নিয়ন্ত্রণহীন এবং গোমরাহ লোকেরাই শুধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে ত্যাগ করতে পারে। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক হেদায়েতের জন্যে মনোনীত করেছিলেন এবং শৈশব থেকেই তাঁকে 'হক্ব' অবলম্বন করার তওফিক দিয়ে রেখেছিলেন। "খলীল" হিসাবে সম্মানিত উপাধি দান করেছিলেন। পরকালেও নেককার লোকদের মধ্যে তিনি থাকবেন। অতএব, তাঁর ধর্ম এবং মিল্লাত ত্যাগ করে গোমরাহী অবলম্বন করার চেয়ে অধিক মূর্খতা এবং দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

এ আয়াতে ইহুদীদের দাবীও খন্ডন করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا

অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন তওহীদবাদী বা একত্ববাদী এবং প্রকৃত মুসলমান। তাঁর নিকটবর্তী তারাই হতে পারবে যারা তাঁকে মেনে চলবে। কেননা, তিনি ইসলামের মহান শিক্ষায় নিজেকে এমনভাবে বিলীন করে ফেলেছিলেন যে, তাঁর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিলনা। যখন নক্ষত্রপুঞ্জের আলো তাঁর সম্মুখে ভেসে উঠেছে, চাঁদের মনোহারী সৌন্দর্য তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছে এবং অবশেষে সূর্য তার শ্রেষ্ঠত্বের গাম্ভীর্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে, যেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রভাবিত করে তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنِّىْ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ

"নিশ্চয় আমি ধ্বংসশীল বস্তুকে পছন্দ করিনা"।

অতএব, তাঁর অনুসরণই হলো সৌভাগ্য, পক্ষান্তরে তাঁর অনুসরণ থেকে বিমুখ হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্ভাগ্য।

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ

অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে সেই ধর্ম যাকে স্বভাব-ধর্ম বলা হয়। এ ধর্মের বিধি-নিষেধ একটি সুস্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র সে-ই অবলম্বন করতে পারে যার প্রকৃতি সুস্থ নয় অথবা যার প্রকৃতির বিলুপ্তি ঘটেছে। বিষয়টি বিশ্বাস করেই যেন মানুষ ক্ষান্ত না হয়; বরং পরীক্ষা করেও দেখতে পারে। ইসলাম জামাত-বদ্ধ (সমাজ বদ্ধ) হয়ে কাজ করার যে ব্যবস্থা প্রদান করেছে তা একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা। ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে কাজের যে বিধান প্রদান করেছে তা ব্যক্তির জন্যেও একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান। বিবেক-বিবেচনা ও আবেগ প্রবণতা, ব্যক্তি ও সমাজ, অন্তর ও মস্তিস্ক, দেহ ও প্রাণ, আযাদী ও আনুগত্য মোট কথা মানব জীবনের পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে ইসলাম যে ব্যবস্থা প্রদান করেছে দুনিয়ার কোন ব্যবস্থাতেই তার নজীর পাওয়া যাবে না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্ম আসলে সেই একত্ববাদের (তৌহীদের) ধর্ম যার প্রতি এ যুগে ইসলাম মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে। আর তোমরা সেই মহান পথ প্রদর্শক ইব্রাহীম (আঃ)-এর আনুগত্যের দাবী করছো অথচ তাঁর সেই তৌহিদী ধর্ম ইসলামকে ছেড়ে বসেছো। مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ (ইব্রাহীমের (আঃ) ধর্ম অবলম্বনকারী জাতি) এই পদটি চয়ন করে কোরআনে পাক এখানে ভাষার এক অদ্ভুত অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে এবং যুক্তির এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেছে। এখানে ইসলামকে আল্লাহ পাকের দিকে সম্পর্কিত করা হয়নি এবং সর্বশেষ রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকেও সম্পর্কিত করা হয়নি; বরং ইসলামকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এখানে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরেক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে কথাটি বলা হয়েছে, কারণ এ তিনটি সম্প্রদায়ই মুসলমানদের ন্যায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নিজেদের মহান পথ-প্রদর্শক হিসেবে মানতো। বর্ণনার এ কৌশল অবলম্বন করে যেন একথাই বলা হয়েছে যে, এই কোরআন তোমাদেরকে কোন নতুন ধর্মের দিকে আহ্বান করছে না; বরং তোমাদেরই পথ-প্রদর্শক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। চিত্তাকর্ষক এবং সুকৌশলে তবলীগের নমুনা এর চেয়ে অধিকতর সুন্দর আর কী হতে পারতো! আরবের মুশরেক সম্প্রদায়ের নিকট আসমানী কিতাব হিসেবে কোন কেতাবের চিহ্নও মওজুদ ছিল না। অবশ্য ইহুদী এবং খৃষ্টানদের নিকট হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী তখন লিখিত

অবস্থায় ছিল এবং এখনও তা রয়েছে। প্রচলিত কৃত্রিম তৌরাতে আছে, "তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এবং সারা যাদের থেকে তোমাদের জন্ম হয়েছে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যখন আমি তাকে আহ্বান করলাম তখন তিনি একা ছিলেন, আমি তাঁকে বরকতময় করলাম (ইয়াসায়াহ ৫১ঃ২)"।

"হে ইব্রাহীম! তুমি ভয় পেয়োনা, আমি তোমার মহান পুরস্কার" (জন্ম ১৫ঃ১)।

"তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং এই ঈমান তাঁর সত্য হিসেবে গণ্য হলো" (জন্ম ১৬ঃ২)।

খৃষ্টানদের প্রচলিত কৃত্রিম ইঞ্জিলে আছে, "ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং এ ঈমান তাঁর জন্যে সঠিক কাজ হিসেবে গণ্য হলো। এতটুকু জেনে রাখ যে, যারা ঈমানদার তারাই শুধু ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধর" (রোমী ৪০ঃ৩)।[১]

وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا

"এবং নিশ্চয় আমি দুনিয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-কে মনোনীত করেছি"।

কেননা, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন।[২]

আরও একটি ব্যাখ্যা হলো এই, আমি ইব্রাহীমকে পছন্দ করেছি নবুওয়্যতের জন্যে, ইসলামের খেদমতের জন্যে এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি প্রদানের জন্যে।[৩]

এতদ্ব্যতীত, তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্যে নমরুদের অগ্নিকে গুলবাগে পরিণত করেছেন, নমরুদকে ধ্বংস করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে অনেক ধন-দওলত দান করেছেন, তাঁর বংশের মধ্যেই নবুওয়্যত রেখে দিয়েছেন, দুনিয়াতে যা কিছু হলে মানুষের ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পায় তার সবই আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। আর শুধু দুনিয়াতেই নয়, বরং আখেরাতেও তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন।

যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন তখন তাঁর অনুসরণ না করা, তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং বদ-নসিবী ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৪]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৮
৩। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-১৯
৪। খোলাসাতুত্ তাফাসীর পৃষ্ঠা-৭৮

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর প্রভূ বললেনঃ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর, তিনি বললেনঃ আমি বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করেছি"।

যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসলামের প্রথম আহ্বায়ক, তাই তাঁর জীবনে ইসলামের মহান শিক্ষার পরিপূর্ণ রূপায়ন হয়েছিল। কেননা, যদি কেউ কোন সমাজের সম্মুখে নতুন দাওয়াত এং নতুন শিক্ষা পেশ করে, তবে সে শিক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি হতে হয় স্বয়ং তাঁকেই। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইসলামের মহান শিক্ষার এক সুন্দর নমুনা হিসেবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি কাজ যেন ইসলামেরই প্রতিধ্বনি। আর এজন্যেই তিনি হতে পেরেছিলেন মুসলমানদের জন্যে আদর্শ। শুধু এ কারণেই আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত কার্যাবলীকে অমর অক্ষয় করে রেখেছেন। তাঁর মহান রীতি আজও দুনিয়ার মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। তাই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন, চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ

এ পর্যায়ে "যখন তাঁর প্রভু তাঁকে বললেনঃ আনুগত্য প্রকাশ কর" তিনি বললেনঃ "আমি আনুগত্য প্রকাশ করেছি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি"।

একথা চিন্তা করতে হবে যে, ইসলামের কোন্ মহান শিক্ষা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল?

যাঁকে আল্লাহ পাক এ উম্মতের জন্যে সুন্দর নমুনা বা মহান আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বস্তুতঃ তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর পূর্ণ আত্মসমর্পণ, পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ। আর ইসলামের মূল শিক্ষাই হলোঃ আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। এক শব্দে তাকেই বলা হয় ইসলাম।

ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা

কেননা, "ইসলাম" শব্দটি سَلَمٌ থেকে নিঃস্পন্ন হযেছে سَلَمٌ এবং سلام এর অর্থ হলো, কোন বস্তু কাউকে অর্পণ করা। আর এ ধাতু থেকেই নিঃস্পন্ন হয়েছে سَلَمَ অর্থাৎ সঁপে দেয়া। اَسْلَمَ অর্থাৎ আদেশ পালন করা। বাস্তবিক পক্ষে ইসলাম শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনে এ অর্থে প্রমাণ স্বরূপ বহু আয়াত পরিদৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক বস্তুর মৌল বা তত্ত্ব তাই হতে পারে যা সে বস্তুর নামে বর্তমান থাকে। দ্বীনে এলাহী বা আল্লাহ পাকের দ্বীনের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে "ইসলাম" শব্দটিতেই। "ইসলাম" শব্দটি আদেশ পালন, পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কোন বস্তুকে পুরোপুরি ভাবে

সোপর্দ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, ইসলামের মূলতত্ত্বও হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করে দেয়া। তার সমস্ত শক্তি, তার যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবাবেগ, তার সমস্ত প্রিয় বস্তু- এককথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যত কিছু আছে সব কিছুকে আল্লাহ্ পাকের নিকট অর্পণ করার নামই ইসলাম। মানুষ যেন তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে অবনত মস্তকে হাযির হয় এবং সকল দিক থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায় এভাবে রত হয়, যেন কখনো তাঁর বিরোধিতা না করে, সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির হুকুম থেকে মানুষকে বিদ্রোহী হতে হবে, এই সমস্ত কথাই ইসলামের মূলতত্ত্ব। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে ইব্রাহীম! তুমি অনুগত হও, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেনঃ আমি বিশ্ব স্রষ্টার হুজুরে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূতঃ পবিত্র জীবনের প্রতিটি ঘটনা এ আত্মসমর্পণেরই উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং জ্বলন্ত নিদর্শন।

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁদের সন্তানদের এই অসিয়ত করে গেছেনঃ

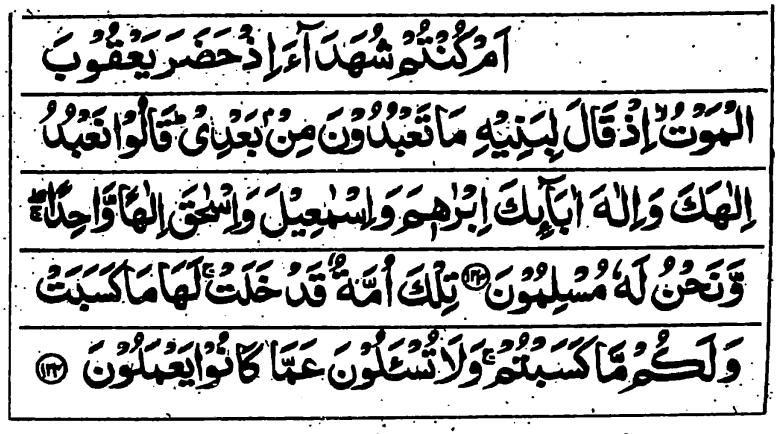
যে দ্বীন ইসলামের এত গুণাবলী এবং এমনি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই দ্বীন ইসলামকে তোমরা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চল, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, প্রকৃত খাঁটি মুসলমান হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করোনা। কেননা, এ জগতে যেমন অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হয় তেমনি আখেরাতে প্রয়োজন হবে ঈমান ও নেক আমলের। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশরদের এই অসিয়ত করেছেনঃ

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

"অতএব, তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করোনা"।

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়োনা। কেননা মৃত্যুর সময় কারোই জানা নেই, যে কোন সময় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী আর সেই সময় যদি ইসলামের নেয়ামত তোমাদের নিকট না থাকে, ঈমানের সম্পদ দ্বারা তোমরা যদি ধন্য না হও, তবে চিরদিন কোপগ্রস্ত থাকতে হবে। অতএব, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান রাখ, নেক আমল করতে থাক, যাতে করে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়।[১]

১। খোলাসাতুত্ তাফাসীর, পৃষ্ঠা-৭৮


أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

তরজমা

(১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের নিকট তার মৃত্যু হাযির হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা আমার অবর্তমানে কার উপাসনা করবে? তখন তারা বলেছিল, আমরা তোমার ও তোমার পিতা-পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ইসহাকের উপাস্য এক আল্লাহ পাকের উপাসনা করবো, এবং আমরা সকলে তাঁরই তাবেদার থাকব।

(১৩৪) সেই একদল ছিল যা বিদায় নিয়েছে, তাদের জন্যে তাদের কীর্তি এবং তোমাদের জন্যে রয়েছে তোমাদের কীর্তি, তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ইহুদীরা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে বলেছিলঃ আপনি কি জানেন? ইয়াকুব (আঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রদেরকে একত্রিত করে অসিয়ত করেছিলেন, "তোমরা সকলে ইহুদীবাদের প্রতি অনুগত থেক"। অথচ আপনি ইহুদীবাদ বর্জনের তা'লিম দিচ্ছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদীদের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ করে তাদেরকে প্রশ্ন করেছেনঃ হে ইহুদীরা! তোমরা যে ইয়াকুব (আঃ)-এর নামে মিথ্যা দাবী করছো,

১ : তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৯

তোমরা কি তাঁর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে? জবাব সুস্পষ্ট, অবশ্যই ছিল না, তাহলে ইয়াকুব (আঃ)-এর নামে মিথ্যা কথা কেন রটাচ্ছ?

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অসিয়ত

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ আরবের মুশরেক বা পৌত্তলিকরা ছিল হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর, তাদের সকলকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তওহীদের তবলীগ করে গেছেন, যখন তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে একত্রিত করে এভাবে অসিয়ত করেছেনঃ তোমরা আমার অবর্তমানে কার বন্দেগী করবে? তখন তারা সকলে সমবেতভাবে তাঁকে কথা দিয়েছে, যে আল্লাহর বন্দেগী আপনি করেছেন এবং আমাদের পিতামহ ইসহাক (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) এরং ইব্রাহীম (আঃ) করেছেন, আমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করবো, আমরা থাকব খাঁটি মুসলমান।

অতএব, হে ইহুদী ও খৃষ্টানরা! হে পৌত্তলিকরা! তোমরা সকলে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, শুধু তাঁর-ই বন্দেগী কর। কেননা, তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ) জীবন-সায়াহ্নে তাঁর পুত্রদেরকে ঈমানের তবলীগ এবং অসিয়ত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।[১]

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ইহুদীদের দাবী ছিল আমরা নবীগণের বংশধর, অতএব পরকালে আমাদের কোন চিন্তা নেই। নবীগণের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে যথেষ্ট, আমরা যা ইচ্ছা করি আমাদের কোন অসুবিধা হবেনা।

আর খৃষ্টানদের দাবী হলো, হযরত ঈসা (আঃ)-এর বরকতে আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ)-কে শূলে চড়ানো হয়েছে, তিনি আমাদের সকলের তরফ থেকে কাফ্ফারা হবেন। অতএব, আমাদের ক্ষমা অনিবার্য।

আর পৌত্তলিকরা বলতো, আমরাতো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর, তিনি ছিলেন আল্লাহর বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তার প্রেক্ষিতে তিনি আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন এবং আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৯০

ইহুদী, খৃষ্টান এবং পৌত্তলিকদের এসব ভিত্তিহীন কল্পনার ফানুস ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, কোন আত্মীয়তার বন্ধন বা কারো সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক আখেরাতের নাজাতের কারণ হবেনা; বরং এজন্যে ঈমান ও নেক আমল পূর্বশর্ত, এটিই হলো আখেরাতের নাজাতের চিরন্তন নিয়ম।

এতদ্ব্যতীত, যে সব আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম তোমরা নিয়েছ, তাঁরা একটি দল। তাদের ঈমান বা বিশ্বাস এক। পক্ষান্তরে, তোমরা আরেকটি দল। আর তোমরা বেঈমান ও বদকার লোকদের দল। দু' দলের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই, তাঁরা হলেন আল্লাহ পাকের অনুগত ও বাধ্য, আর তোমরা হলে আল্লাহ পাকের অবাধ্য।

নবুওয়্যতের আলোকেও যারা ঈমান এবং নেক আমলের অধিকারী, তারা একদল আর যারা ঈমান ও নেক আমল থেকে বঞ্চিত তারা একটি দল।

তোমরা নবীগণের বংশধর হতে পার, কিন্তু তাঁদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই, তাই তোমাদের শাস্তি অবধারিত।[১] তাঁদের নেক আমলের ফল তাঁরা অবশ্যই ভোগ করবেন। পক্ষান্তরে, তোমাদের অন্যায় আচরণ ও বেঈমানী তোমাদের শাস্তির কারণ হবে।

বর্তমান যুগে দেখা যায় কেউ পীরজাদা বলে গৌরব করে, কেউ আলেমজাদা বলে কিছু বাড়তি সুযোগের আশা করে। কিন্তু এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে যে, এ ধরণের সম্পর্ক আখেরাতের নাজাতের ব্যাপারে আদৌ উপকারী হবেনা; বরং এ উদ্দেশ্যে সকলকে ঈমান ও আকীদা শুদ্ধ করে নেক আমলের সাধনায় রত হতে হবে। এমনকি, তোমাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবেনা, একজনের অন্যায়ের জন্যে অন্য কাউকে শাস্তি দেয়া হবেনা, এখানে রয়েছে পূর্ণ সুবিচার। কারো প্রতি এতটুকু জুলুম হবেনা।

১। তফসীরে মোয়ালেমুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬১০

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ
آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ
عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾

তরজমা

(১৩৫) আর তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহলে সুপথ লাভ করবে, (হে রসূল!) আপনি বলে দিন কখনও নয়, বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মেই থাকব, তিনি মুশরেক ছিলেন না।

(১৩৬) (হে মোমেনগণ!) তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতিও যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের বংশধরদের প্রতি হয়েছিল আর যা মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাঁদের পালনকর্তার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল, সমস্তের উপরে আমরা ঈমান এনেছি। তাঁদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করিনা। আর আমরা আল্লাহ পাকেরই অনুগত।

(১৩৭) অতঃপর তারাও যদি তোমাদের ঈমানের ন্যায় ঈমান আনে তবে নিশ্চয় তারাও হেদায়েত লাভ করলো, আর যদি তারা ফিরে যায় তবে তারা নিশ্চয় জেদের বশবর্তী হলো, অতএব, তাদের জন্যে তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। আমরা আল্লাহ পাকের রঙ্গে রঙ্গীন, এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের চেয়ে কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই বন্দেগীকারী।

তফসীরুল কোরআন

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

অভিশপ্ত ইহুদী এবং পথভ্রষ্ট খৃষ্টান জাতি মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো। বিভিন্ন সময় ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে মুসলমানদেরকে তাদের মত পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াসী হতো, তাদেরই জবাব রয়েছে এ আয়াত সমূহে।

শানে নুযুল

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইহুদী এবনে ছুরিয়া একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললোঃ "যা" আমরা অবলম্বন করেছি তাই হেদায়েত। অতএব, আমাদের অনুসরণ করুন। এমন কথা ইতিপূর্বে খৃষ্টানরাও বলেছিল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত এবনে আব্বাস (রঃ) বলেনঃ মদীনার বিখ্যাত ইহুদী যেমন কা'ব বিন আশরাফ, মালেক বিন হানীফ, ওহাব বিন ইয়াহুদা ও ইয়াসির বিন আখতাব এবং নাজরান থেকে খৃষ্টানরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। প্রত্যেক দলই নিজেকে 'হক্ব' বলে দাবী করতে লাগলো। ইহুদীরা বললোঃ "আমাদের নবী মূসা (আঃ) সমস্ত নবীগণের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের তৌরাত সমস্ত কিতাব থেকে উত্তম আর আমাদের ধর্ম সকল ধর্মের উপরে"। তারা হযরত ঈসা (আঃ), ইঞ্জিল কিতাব, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং কোরআনে পাককে সরাসরি অস্বীকার করে বসলো। একই ভাবে খৃষ্টানরা তাদের নবী, তাদের কিতাব ও তাদের ধর্মকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে দাবী করলো এবং কোরআনে পাক ও অন্যান্য কিতাবকে অস্বীকার করে বসলো। সব দলই নিজেদের ধর্ম অবলম্বন করার জন্যে মুসলমানদেরকে আহ্বান জানালো। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াতখানি নাযিল করেনঃ

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى

(আর এই লোকেরা বলে যে তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও।)

অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার দিকে আহ্বান জানালো ইহুদীরা এবং খৃষ্টান হওয়ার আহ্বান জানালো খৃষ্টানরা।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩১

মিল্লাতে ইব্রাহীমির অনুসরণেই রয়েছে হেদায়েত

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা সুস্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমরা তোমাদের বিভ্রান্তিকর আহবানে সাড়া দেবনা, তোমাদের প্রদর্শিত ধ্বংসের পথে আমরা পা দেবনা। আমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমির অনুসারী ইব্রাহীমের (আঃ) ধর্মকে বরণ করে নিয়েছি, তাঁকে আমরা দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেছি। কেননা, তাঁর অনুসরণেই রয়েছে হেদায়েত।

আর তিনি মুশরেক ছিলেন না। অতএব, যে সব মুশরেক নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভক্ত বলে গৌরব করে তাদেরও গৌরব করার কিছুই নেই কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আজীবন শেরকের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। ফলে, তাঁর সাথে মুশরেকদের কোন সম্পর্কই থাকতে পারেনা।

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ

মিল্লাতে ইব্রাহীম বুঝতে হলে আমাদের আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে। প্রত্যেকটি ধর্মে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকেঃ

(১) সে সব বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাস রাখতে হয়, যেমন তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ইত্যাদি, এমন সব বিষয়ে সকল ধর্মই একমত, এতে মত বিরোধের প্রশ্ন অবান্তর, অচিন্তনীয়।

(২) ধর্মের সামগ্রিক মূলনীতি সমূহ, যার আলোকে ধর্মের যাবতীয় নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয় এবং ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসন যে নীতিমালা থেকে উৎসারিত হয়। মিল্লাত মূলতঃ এ নীতিকেই বলা হয়।

(৩) আর ধর্মের সকল রীতি-নীতি পদ্ধতির সমন্বিত রূপকে শরীয়ত বলা হয়।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত এক, শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন।[১]

মসনদে আহমদ এবং তেরবানীতে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছেঃ

সকল ধর্মের মধ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম কোন্‌টি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মিল্লাতে ইব্রাহীমিয়া অত্যন্ত সহজ সরল।

১। হযরত শেয়খুল হিন্দ (রঃ), পৃষ্ঠা-২৬

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) বলেছেনঃ আল হানীফিয়া সেই জীবন-বিধান যা মিল্লাতে ইব্রাহীমির ন্যায় আল্লাহর বিধান সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং শেরককে বাতিল করে এবং বাতিল আকিদা সমূহের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করে।

আর "আস্ সামাহ" শব্দটির তাৎপর্য হলো এমন বিধান যার শিক্ষায় বৈরাগ্য নেই এবং যাতে এমন কঠোর সাধনা নেই যা মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ অসম্ভব, যাতে এমন সুবিধা থাকে যে, মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতাকে স্বীকার করা হয়।

আর 'আল বায়জা" শব্দটির তাৎপর্য হচ্ছে, যে জীবন-বিধানের হেকমত এবং কারণগুলো এত সুস্পষ্ট যে, বুদ্ধিমান মাত্রেরই তার মর্মার্থ উপলব্ধি করা সহজ হয়।[১]

শাহ আবুল আযীয (রঃ) তাঁর তফসীরে এমন চল্লিশটি বিধানের উল্লখ করেছেন যা মিল্লাতে ইব্রাহীমের মহান শিক্ষা আর এসব বিধান দ্বীনে মোহাম্মদীতেও রয়েছে, অর্থাৎ এগুলো শরীয়তের সেই মৌলিক বিধান যাকে মিল্লাতে ইব্রাহীমই বলা যায় এবং যার নির্দেশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও দিয়েছেনঃ

(১) আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে জেহাদ করা,

(২) মূর্তি ভাঙ্গা,

(৩) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মানত না করা,

(৪) আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নামে জবেহ না করা,

(৫) রিয্ক দান, আরোগ্য লাভ করা এবং মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, একথার প্রতি বিশ্বাস করা,

(৬) নিজেকে আল্লাহর রাহে বিলীন করা,

(৭) গণকের কাজকে বাতিল মনে করা,

(৮) শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসী না হওয়া,

(৯) কোন সময়কে অশুভ মনে না করা,

(১০) নক্ষত্র পূজাকে অস্বীকার করা,

(১১) গণকদের নিকট জিজ্ঞাসা না করা,

(১২) কোরবানীর নিয়ম-কানুন,

(১৩) স্বভাবগত চরিত্র সমূহ,

(১৪) হজ্জের সকল নিয়ম-কানুন,

১। হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগা, পৃষ্ঠা-১২৮

(১৫) কা'বা শরীফের কেবলা হওয়া,

(১৬) বিপদে ধৈর্য-ধারণ করা,

(১৭) শরীয়ত-বিরোধী পন্থায় শোক প্রকাশ না করা,

(১৮) ছবির হেফাজত ও ছবি গ্রহণ উভয় কাজ থেকে দূরে থাকা,

(১৯) বিবাহ বর্জন, বৈধ ভোগ্য বিষয় সমূহ পরিত্যাগ, উত্তম লেবাস পরিহার তথা দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে বেঁচে থাকার নীতি অবলম্বন না করা,

(২০) অধিক পরিমাণে এবাদতে মশগুল হয়ে মানুষের হক্ব বিনষ্ট করার নীতি অবলম্বন না করা,

(২১) জীবিকা উপার্জন,

(২২) নিঃস্প্রয়োজনে কারও সাহায্য প্রার্থনা না করা,

(২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখা,

(২৪) যাবতীয় খেলাধুলা থেকে বিরত থাকা,

(২৫) পিতাকে সন্তানের এবং সন্তানকে পিতার অপরাধে গ্রেফতার না করা,

(২৬) ব্যাভিচার প্রভৃতি অবৈধ হওয়া,

(২৭) দেহের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরজ তা ঢেকে রাখা,

(২৮) খত্না করা,

(২৯) আকীকা করা,

(৩০) মেহমানদারীর রীতি-নীতি পালন করা,

(৩১) পোষাকের নিয়ম-কানুন,

(৩২) এবাদতের সময় ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ সহ ভাল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা,

(৩৩) হজ্জের মাস সমূহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা,

(৩৪) বিয়ে-শাদীর নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে পালন করা,

(৩৫) বিয়ে-শাদীতে সাক্ষীর ব্যবস্থা রাখা,

(৩৬) যাকাত,

(৩৭) চাশ্তের চার রাকাআত নামাজ,

(৩৮) তকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠান,

(৩৯) সেজদার আগে রুকু হওয়া,

(৪০) নামাজের প্রত্যেক কাজে তকবীর বলা।[১]

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ "আমরা রসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা", তথা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীর প্রতি আমরা বিশ্বাস করি এবং যা কিছু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে সেগুলোর প্রতিও আমরা বিশ্বাস করি।

ইসলাম বিশ্ব-ধর্ম

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই বিশ্ব-ধর্ম। ইসলামের উদার নীতি ইসলামকে ধর্মের জগতে সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করেছে। ইহুদীরা তৌরাত ব্যতীত অন্য সব আসমানী গ্রন্থকে অবিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আঃ) সহ অন্যান্য নবীগণের প্রতিও তারা বিশ্বাস করেনা। এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তারা অবিশ্বাস করে। আর একই অবস্থা খৃষ্টানদের, তারা তৌরাত সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে। কিন্তু ইসলাম বলে, হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারেনা যতক্ষণ না সে পবিত্র কোরআন সহ অন্যান্য সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী না হয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে ইসলামের আবেদন বিশ্ব-জনীন, ইসলামের শিক্ষা মহান, অতুলনীয়। এমনিভাবে পবিত্র কোরআনও বিশ্বগ্রন্থ, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের কালাম। ইসলামের লক্ষ্য বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। আর ইসলামের নবী বিশ্ব নবী, তিনি সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের মানুষের নিকট প্রেরিত।

সকলের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ইহুদী ও খৃষ্টান তথা সর্ব ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ

অর্থাৎ (হে মুসলমান!) যদি তারাও তোমাদের ঈমানের ন্যায় ঈমান আনে, তবে তারা নিশ্চয় হেদায়েত লাভ করলো কেননা, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান,

১। তফসীরে মোয়ালেমুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬১৯

পবিত্র কোরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি নবীগণের দলপতি, তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। অতএব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ অনুসরণ হলো হেদায়েত লাভের একমাত্র পন্থা।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ

কিন্তু যদি তারা ফিরে যায় তথা মুসলমানদের ন্যায় ঈমান আনতে প্রস্তুত না হয়, তবে একথা প্রমাণিত হবে যে তারা জেদের বশবর্তী হয়ে শত্রুতা বশতঃ ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো, এমন অবস্থায় তাদের হিংসা ও শত্রুতার কাণে ভীত হবার প্রয়োজন নেই, কেননা

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ পাকই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ পাকই মুসলমানদেরকে সাহায্য করবেন এবং ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দেবেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্যের এ আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়েছিল। কেননা, এ আশ্বাসের ফলশ্রুতি স্বরূপই মদীনা তৈয়্যেবার অধিবাসী বনু নযীর গোত্রকে দেশ ত্যাগ করতে হয় এবং বনু কোরায়জার লোকদেরকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয় এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি জিযিয়া কর (অমুসলিম ট্যাক্স) আরোপ করা হয়।[১]

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

উপরোক্ত আয়াতে ইসলাম কবুল করার যে উদাত্ত আহ্বান ছিল তাতে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সাড়া দেয়নি, তারা বঞ্চিত হয়েছে ইসলামের মহান নেয়ামত থেকে। শুধু তাই নয়, বরং খৃষ্টানরা বড়াই করে বলতে শুরু করে, আমাদের নিকট একটি রঙ আছে যা মুসলমানদের নিকট নেই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা পীত বর্ণের এক প্রকার রঙ তৈরী করে রেখেছিল এবং যখনই তাদের কোন শিশু জন্মগ্রহণ করতো, তাকে উক্ত রঙে নিমজ্জিত করে বলতো, ভারী সুন্দর! একেবারে শুদ্ধ এবং পবিত্র, এভাবে তারা আত্ম প্রবঞ্চিত হতো।

তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা বলো, আমরা তোমাদের এ প্রতারণাময় রঙের স্থলে খাঁটি রঙ আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছি,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৪

আর আল্লাহর প্রদত্ত রঙের চেয়ে ভাল রঙ কার হতে পারে? কেননা, আল্লাহ পাকের দ্বীন কবুল করলে তার বরকতে সকল অপবিত্রতা, যাবতীয় কালিমা দূর হয়ে যায়।

وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

"আর আমরা সকলে এক আল্লাহর বন্দেগীকারী"।

এতদ্বারা আহলে কিতাবের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে, আমরা তোমাদের ন্যায় আল্লাহর সাথে শেরক করিনা, আমরা শুধু তাঁর বন্দেগী করি। অতএব, তোমরাও আল্লাহর রঙ গ্রহণ কর, আর তাই হলো চির শান্তির পথ।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ
اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ
اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

তরজমা

(১৩৯) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ পাক সম্পর্কে আমাদের সাথে কলহ করছো? অথচ তিনিই তোমাদের ও আমাদের প্রভূ, আমাদের কার্যাবলী আমাদের জন্যে, আর তোমাদের কার্যাবলী তোমাদের জন্যে, আমরা একমাত্র তাঁরই গোলাম।

(১৪০) তোমরা কি বলতে চাও? যে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন? (হে রসূল!) আপনি বলুন তোমরাই কি অধিক জান না আল্লাহ পাক অধিক জানেন? এবং তদপেক্ষা অত্যাচারী কে হবে? যে আল্লাহ পাক সম্বন্ধে সাক্ষ্য যা সে জানে তা গোপন করে এবং আল্লাহ পাক তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গাফেল নন।

(১৪১) সেই একদল ছিল যারা বিদায় হয়ে গেছে, তারা যা করেছে তার ফল তারা ভোগ করবে। আর তোমরা যা করছো, তার ফলও তোমাদের জন্যে। আর তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা।

তফসীরুল কোরআন

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বাগাড়ম্বর করতো যে, আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় রহমত, যাবতীয় দয়া-মায়া নাকি তাদেরই জন্যে। তাদের এ দুরাশার প্রতিবাদে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুনঃ তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চাও? অথচ এ কলহের কোন অধিকার তোমাদের নেই কেননা, আল্লাহ্ পাক আমাদের ও তোমাদের এক কথায় সকলের প্রভূ। তিনি সকলেরই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি সকলেরই রিয্কদাতা। অতএব, তাঁর সমস্ত দানের তোমরাই একমাত্র অধিকারী বলে দাবী করার মত অন্যায়, অযৌক্তিক, অসুন্দর, অবাস্তব এবং অসম্ভব কথা আর কিছুই হতে পারেনা।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে কাকে? এরপর এর একাধিক জবাব দিয়েছেন (১) এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে ইহুদী ও নাসারাদেরকে (২) আরবের পৌত্তলিকদেরকে (৩) এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে সকলকে, অর্থাৎ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে তাদের সকলেই এই খেতাবের আওতাধীন।

. আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল হক্ব সাহেব (রঃ) তাঁর "তফসীরে হাক্কানী"তে বলেছেনঃ

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا

ইহুদীরা যে বলে হেদায়েত নির্ভর করে ইহুদী ধর্মের উপর এবং খৃষ্টানরা বলে, খৃষ্ট মতবাদের উপর হেদায়েত নির্ভরশীল। আবার তারা এমনও বলে থাকে যে, ইহুদীরা ব্যতীত কেউই জান্নাতে যাবেনা এবং খৃষ্টানরাও বলে যে তারাই একমাত্র জান্নাতের অধিকারী। সুতরাং হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যে আল্লাহ্ পাককে নিয়ে বিতর্ক করছো তিনি কি শুধু তোমাদেরই প্রভূ যে তাঁর নিকট থেকে তোমরা বিশেষ সুবিধা লাভের দাবী করছো? প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি তোমাদের যেমন প্রভূ, তেমনি তিনি আমাদেরও প্রভূ। তিনি প্রত্যেককেই নিজ নিজ আমলের বিনিময়ে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন। আমরা বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে নিজেকে তাঁর দরবারে পেশ করে থাকি। তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার বন্দেগী করি। পক্ষান্তরে, তোমরা তাঁর দরবারে অহংকারী

রূপ প্রকাশ কর, এতদসত্ত্বেও কি কারণে তোমরা তাঁর নিকট থেকে অধিকতর সুবিধা লাভ করবে তা আদৌ বোধগম্য নয়।

قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ মুশরেকদের সঙ্গে বিতর্কের যবনিকাপাত করার জন্যে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন যেন তিনি তাদেরকে বলে দেনঃ কেন তোমরা আল্লাহর একত্ববাদ, আন্তরিকতা এবং আনুগত্য অবলম্বনের কারণে আমাদের সাথে বিতর্ক করছো? তিনি শুধু আমাদের নয় তোমাদেরও তো প্রভু। আমাদের এবং তোমাদের উভয়ের অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী এবং পরিবর্তনকারী একমাত্র তিনিই, আমাদের আমল আমাদের সাথে থাকলো, আর তোমাদের আমলের ফল তোমাদের জন্যে। আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমাদের শেরেকী কার্যাবলী থেকে দূরে অনেক দূরে থাকি। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ- الاية

(হে রসূল!) যদি তারা মিথ্যা জ্ঞান করে তবে আপনি বলে দিন যে, আমার আমল আমার জন্যে রইল আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে থাক। তোমরা আমার কর্ম থেকে এবং আমি তোমাদের কর্ম থেকে পৃথক।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِنْ حَآجُّوْكَ- الاية

"যদি ওরা আপনার সাথে বিতর্ক করতে আসে তবে আপনি বলে দেবেন, "আমি এবং আমার অনুসারীগণ সকলেই আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-ও তাঁর সম্প্রদায়কে একথাই বলেছিলেনঃ

اَتُحَآجُّوْنِّىْ فِىْ اللّٰهِ

"আল্লাহকে নিয়ে আবার মতভেদ কেন"?

আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْنَ حَآجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ

"আপনি কি দেখেছেন? সে ব্যক্তিকে যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে নিজ 'রবকে' নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল"? মোট কথা, এসব কলহ-প্রিয় লোকদেরকে একথাই বলা হয়েছে যে, আমাদের আমল আমাদের জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে রইল। আমরা তোমাদের থেকে পৃথক এবং তোমরা আমাদের থেকে পৃথক।

আমরা এবাদত-বন্দেগীতে আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা অবলম্বন করেছি।

اَمْ تَقُوْلُوْنَ

এরপর তাদের একটি মিথ্যা দাবী এভাবে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না। সুতরাং হে ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়! তোমরা কেন এসব উদ্ভট কথা আবিষ্কার করছো? আল্লাহ পাকের চেয়ে কি তোমরা অধিক জান? আল্লাহ পাক তো একথা বলেই দিয়েছেন যেঃ

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না বা মুশরেকও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ

অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে বড় জুলুম এবং সবচেয়ে বড় অন্যায় এই যে, তাদের নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাবের সে কথাকে গোপন করা কেননা, তিনি ঘোষণা করেছেনঃ "সত্য ধর্ম হলো ইসলাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রসূল। ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) প্রমুখ নবীগণ ইহুদী এবং খৃষ্টান মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন"। কথাগুলো তারা শুধু অমান্যই করলো না; বরং গোপনও করে ফেললো।

এরপর এরশাদ হয়েছে, তোমাদের আমল সমূহ আল্লাহর নিকট গোপন থাকেনা। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত যে তা সব জিনিসকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তিনি সব ভাল কাজ এবং সব মন্দ কাজের খুঁটি-নাটি বিনিময় প্রদান করবেন। হুশিয়ারী প্রদান করার পর আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ

সেই পবিত্র দল আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। যতক্ষণ তোমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করছো ততক্ষণ শুধু তাঁদের বংশধর হওয়ার দাবী তোমাদেরকে আল্লাহর দরবার থেকে সম্মান এবং কোন রকম ফায়দা এনে দিতে পারবে না। তাদের (নেক) আমলের কোন অংশ তোমরা পাবেনা আর তোমাদের (বদ) আমলের বিপদও তাদের উপর পড়বে না। "যে যা করবে সে তার ফল ভোগ করবে"। তোমরা একজন নবীকে অমান্য করে সমগ্র নবীকূলকে অমান্য করার ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছ। বিশেষতঃ হে সে সব লোকেরা! যারা আখেরী যমানার নবীর যুগ প্রাপ্ত হয়েছে,

তোমরা সেই নবীকে অমান্য করেছ যিনি নবীগণের দলপতি, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের বিশেষ এবং সর্বাধিক প্রিয় রসূল। যিনি রেসালত প্রাপ্ত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতি এবং জ্বীন জাতির জন্যে। যাঁর রেসালতে বিশ্বাস করা ব্যতীত কারোই গত্যন্তর নেই। অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি বর্ষিত হতে থাকুক।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম খন্ড সমাপ্ত হলো

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

وصلى الله تعالى علٰى خير خلقه محمدوعلى اله واصحابه اجمعين

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা-৯৬

গ্রন্থ-পঞ্জী

তফসীরে নূরুল কোরআন রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(১) তফসীর এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) (মৃত্যু ৭৮ হিঃ), তফসীর সম্পর্কীয় বর্ণনা সমূহের সংকলন।

(২) জামেউল বয়ান বা তফসীরে তাবারী, খন্ড-৩০, আল্লামা এবনে জরীর আত-তাবারী (রঃ), (মৃত্যু-৩১০হিঃ)।

(৩) মাফাতীহুল গায়ব বা তফসীরে কবীর, খন্ড- ৩২, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ) (মৃত্যু-৬০৬ হিঃ)।

(৪) তফসীরে এবনে কাসীর, খন্ড-৮, হাফেজ এমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল এবনে কাসীর দামেশকী (রঃ) (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ)।

(৫) তফসীরে রুহুল মাআ'নী, খন্ড-৩০, আল্লামা শেহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (রঃ) (মৃত্যু-১২৯১ হিঃ)।

(৬) তফসীরে বয়জাবী, ৫ খন্ডে প্রকাশিত, কাজী নাসিরুদ্দীন আবু সাঈদ আবদুল্লাহ এবনে ওমর বয়জাভী, (মৃত্যু-৭৯১ হিঃ)।
(মৃত্যু ৬৩৮হিঃ)।

(৭) খোলাসাতুত্যাফাসীর, খন্ড-৬, মওলানা ফাতেহ মোহাম্মদ লখনভী (রঃ)।

(৮) তফসীরে মাজহারী (উর্দু অনুবাদ), খন্ড-১২ কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ), (মৃত্যু

(৯) সাফওয়াতুত্যাফাসীর- মোহাম্মদ আলিউস্যাবুণী- বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

(১০) তফসীরে কাশফুর রহমান- খন্ড-২ হযরত মওলানা আহমদ সাঈদ (রঃ)।

(১২) তফসীরে বয়ানুল কোরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)

(১৩) তফসীরে ফাতহুল মান্নান, বা তফসীরে হাক্কানী, খন্ড ৭, হযরত মওলানা আবদুল হক হাক্কানী দেহলভী (রঃ)

(১৪) তফসীরে মোয়ালেমুল কোরআন, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী (রঃ)।

(১৫) ফাওয়ায়েদে ওসমানী- হযরত মওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ)।

(১৬) আত্তফসীরুল কাইয়েম- ইমাম এবনুল কাইয়েম (রঃ) (মৃত্যু-৭৫১ হিঃ)।

(১৭) তফসীরে মাজেদী, খন্ড-২, মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ)।

(১৮) তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, খন্ড-৭, আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ)।

(১৯) এতদ্ব্যতীত, বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও হাদীসের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ

(২০) তারীখে আরজুল কোরআন, মওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রঃ)।

(২০) কাসাসুল কোরআন, হযরত মওলানা হেফজুর রহমান (রঃ)।

(২২) উলুমুল কোরআন, মওলানা মোহাম্মদ তাকী উসমানী (রঃ)।

(২৩) তাজকেরাতুল মুফাস্সেরীন-কাজী মোহাম্মদ জাহেদুল হুসাইনী

লেখক পরিচিতি

মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম ১৯৩২ সালে কুমিল্লা জেলার বরুরা থানাস্থ বাঘমারা মিয়া বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্জ মওলবী মোহম্মদ আলী মিয়া সাহেব একজন সুফী সাধক, অত্যন্ত বড় আবেদ, পরহেজগার, দানশীল ও সমাজসেবী ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন স্থানীয় রহমতগঞ্জ মাদ্রাসায়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় তিনি ৫ম স্থান অধিকার করেন। সরকারী বৃত্তি পেয়ে পরবর্তী দু'বছর তিনি হাদীস শাস্ত্রে গবেষণা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি দেশ-বিদেশে ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রথম হজ্জ সুসম্পন্ন করেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা ডেলিগেশনের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে ৪০ খানারও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁর 'বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থখানি তিনটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ও বিস্তারিত তফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর দীর্ঘ প্রায় দু' যুগের নিরলস সাধনা অবশেষে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর রচিত 'তফসীরে নূরুল কোরআন' এর ৩০তম খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থ রচনায় যেমন তৎপর রয়েছেন, তেমনি ইসলামের প্রচার-প্রসারেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও তিনি উর্দু ও আরবীতে বক্তৃতা করেন। এ-ছাড়া তিনি লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব, মাসিক আল বালাগ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, চেয়ারম্যান, তফসীরে তাবারী প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড, আল বারাকা ব্যাংক লিঃ এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল-নাহিয়ান ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য সহ বহু মাদ্রাসা, মসজিদ ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন থেকে নিয়মিত পবিত্র কোরআনের তফসীর বর্ণনা করেন। তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি তাঁর মৌলিক রচনার জন্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে' (১৯৮৯) সম্মানিত হয়েছেন।

ইসলামের সেবায় নিবেদিত বিশ্বের যে তেরজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে (১৪১৩ হিঃ) ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে মিশরের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক (ফাষ্ট গ্রেড) প্রদান করেন, তিনিও ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব রচিত কয়েকটি গ্রন্থ

১। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খন্ডে সমাপ্ত)

২। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব জীবন

৩। এনায়েতুল কোরআন

৪। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (প্রথম খন্ড)

৫। যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা

৬। মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম (দঃ)

৭। দালায়েলুল খায়রাত

৮। স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী (দঃ)

৯। দরুদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম

১০। হযরত গওসুল আযমের অমরবাণী

১১। আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন-ধারা

১২। ইমাম বোখারী (রঃ)

১৩। ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে ও পরে

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ ৯১১০৭১০, ৯১১০৭৭৮

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা।

আন্ নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
চকবাজার
ঢাকা।

মুনাজাত

আমি তো পাপী; তব নাম যে গাফ্‌ফার,
হে আল্লাহ্‌,
আমি তো দোষী; তব নাম যে সাত্তার,
হে আল্লাহ্‌।।

আমি যেন লভিতে পারি
তোমার ক্ষমা
সবই তোমার দয়া, খোদা,
তোমার মহিমা।।

যখন আমি আঁধার কবরে,
থাকবো সাথী হারা,
আসে যেন মাগফেরাতের
আলোর ধারা।।

রোজ হাশরে আসবে সবাই,
আমলনামা হাতে,
হাযির হবে এই ফকীর
তফসীরে কোরআন সাথে।

হে খোদা, তুমি দয়াময়,
আমরা তোমারই রহমতের ভিখারী।।

